কার্ত্তিক—চৈত্র, ১৩৫২

শনিবারের চিঠি
১৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫২

সাম্য ও স্বাধীনতা

ইতিহাসের আলোচনা যে পরিমাণে করা যায় সেই পরিমাণে যে সত্যটি প্রকটীভূত হইয়া উঠে এবং চিত্ত বিষণ্ণ করিয়া দেয় সেটি হইল এই যে, সাম্য ও স্বাধীনতা, একমাত্র savage societyতে ভিন্ন, এ-পর্য্যন্ত কখনও পূর্ণমাত্রায় একই সঙ্গে একই সমাজে উপলব্ধ হয় নাই। হয়তো "পূর্ণমাত্রায়" কথাটি এই সম্পর্কে ব্যবহার করাই অন্যায়, কারণ কেবল সাম্য বা কেবল স্বাধীনতাও যে পূর্ণমাত্রায় কখনও কোন সভ্য সমাজে সুসিদ্ধ হইয়াছিল তাহাও বলা যায় না। তৎসত্ত্বেও কিন্তু এ-কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, স্বাধীনতা বহুলপরিমাণে খর্ব না করিয়া মানুষ আংশিক সাম্যও লাভ করিতে পারে নাই (যেমন রাশিয়ায়), এবং সাম্য সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন না দিয়া মানুষ এ-পর্যন্ত এমন কোন সমাজের সৃষ্টি করিতে পারে নাই যাহাতে একটা নিঃসার স্বাধীনতাও (যেমন ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়) বর্তমান আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। আমি অবশ্য মনে করি না যে, রাশিয়ায় বাস্তবিকই মানবোচিত কোন স্বাধীনতা খর্ব করা হইয়াছে, যদিও Laski-র এই কথাটি সম্পূর্ণভাবে সত্য যে "in the classic sense of absolute liberalism freedom does not exist in the Soviet Union"। তথাপি রাশিয়ার সর্বসাধারণ যে ইতিমধ্যেই পূর্বোপভুক্ত কিন্তু অধুনালুপ্ত ক্ষুদ্র স্বাধীনতার সবগুলিকেই অন্যায় স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতি প্রকৃতই হতানুরাগ হইয়া পড়িয়াছে—একথা বলা যায় না, এবং যে-পরিমাণে তাহারা তাহা হয় নাই সেই পরিমাণে যে তাহাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—একথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। মোটামুটি তাহা হইলে বর্তমান জগৎ সম্বন্ধে বাস্তবিকই বলা যায় যে, সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল দেশগুলিতেও হয় সাম্য নয় স্বাধীনতা অল্লাধিক পরিমাণে উপলব্ধ হইয়াছে, কিন্তু কোন দেশে যে ঐতিহ্যের দুইটিই সমপরিমাণে মানুষের করায়ত্ত হইয়াছে তাহা স্বীকার করার উপায় নাই।

প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্যও এই একই। ভারতবাসী যে প্রাচীন যুগে কোনদিন রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রমাণ নাই। চীনের ন্যায় এখানেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমাজ ছিল প্রকৃত বা কল্পিত কোন পূর্ব-পুরুষে'র পুরুষাধরের মধ্যে আবদ্ধ, মাতৃপক্ষীয় জ্ঞাতিগণের তাহাতে কোন স্থান ছিল না; অর্থাৎ সমাজ ছিল clan বা tribe-এ বিভক্ত।* রোমান সমাজও যে প্রথম যুগে বিভিন্ন

---

* যে-সমাজের গোত্রপ্রবর্তক পুরুষ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সেই সমাজকে বলা হয় "clan"। গোত্রপ্রবর্তক পুরুষ ঐতিহাসিক ব্যক্তি না হইলে "tribe" কথাটি প্রয়োগ করা হয়।

tribe-এ বিভক্ত ছিল তাহা সুবিদিত। ফলে চীন, ভারতবর্ষ এবং ইটালি এই তিন দেশেই প্রাচীন যুগে পিতৃপূজা (ancestor worship) হইয়া পড়িয়াছিল গার্হস্থ্যধর্মের প্রধান অঙ্গ। পিতৃপূজা অবশ্যই এক-একটি গোত্রের সংহতিবিধানের সহায়ক, কিন্তু সেই কারণেই তাহা রাষ্ট্রগঠনের পরিপন্থী। এই পিতৃপূজা চীনে ও ভারতে আজ পর্যন্ত গোত্রের মধ্যেই আবদ্ধ, এবং আমার বিশ্বাস এই যে, রাষ্ট্রগঠনে চীনা ও ভারতীয়গণের লজ্জাকর অসামর্থ্যের ইহাই একটি প্রধান কারণ।

রোমে কিন্তু পিতৃপূজা জাতিগঠনের প্রতিবন্ধক হয় নাই, কারণ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট Augustus তাঁহার নিজের গৃহদেবতাকে সমস্ত জাতির দেবতা-পদে উন্নীত করিয়া রাজ্য ও রাজার মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা Nero, Elagebalus প্রভৃতি নরপশুর বীভৎস অনাচার ও অত্যাচারের ফলেও দুর্বল বা শিথিল হইয়া পড়ে নাই। রোমে প্রথমে সম্রাটের গৃহদেবতা সমস্ত জাতির দেবতায় পরিণত হওয়ার পর সম্রাট স্বয়ং দেবতারূপে পূজিত হইতে লাগিলেন। প্রতি গোত্রে পৃথক পিতৃপূজা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও এইজন্য রোমে বিভিন্ন গোত্রের দৃঢ়সংহতি সম্ভব হইয়াছিল। ভারতে কিন্তু অশোকের ন্যায় সম্রাটের আবির্ভাব সত্ত্বেও অনুরূপ কিছু ঘটে নাই। সেইজন্য এখানে (এবং চীনে) আদিম পিতৃপূজার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। আজও তাই স্বর্গত পিতৃপুরুষ রক্তমাংসের জীবিত প্রতিবেশী অপেক্ষা ভারতবাসীর বেশি আপনার। এ-অবস্থায় রাষ্ট্রসংহতির সম্ভাবনা যে অত্যল্প, তাহা সহজেই অনুমেয়। সংহত রাষ্ট্রের অস্তিত্বই প্রাচীন চীন ও ভারতবর্ষে ছিল না বলিয়া এই দুই দেশে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য দীপ্ত আকাঙ্ক্ষাও কখনও দেখা যায় নাই। সাম্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষাও কি ভারতবাসীর ছিল না?

এইখানে একটু বিচার করিয়া দেখা দরকার, "সাম্য" কথাটির প্রকৃত অর্থ কি। সকল মানুষ সমান নয়, এমন কি কোন দুইটি মানুষও সমান নয়, সুতরাং 'সমসমাজ' (এই কথাটি সিংহলে আজকাল প্রচলিত, আমাদের দেশেও প্রচলিত হইলে ভাল হয়) বলিতে এমন কোন সমাজ বুঝাইতে পারে না, যে-সমাজে সকল মানুষই সমান। যে-সমাজে সকলকেই বড় হইবার সমান সুযোগ দেওয়া হয় (ইংলণ্ড ও আমেরিকার অধিকাংশ লোক মনে করে যে, তাহাদের দেশে এই সমসুযোগ বর্তমান) সেই সমাজকেও সমসমাজ বলা যায় না, কারণ সমসুযোগ সকলের সমভাবে কাজে লাগাইবার ক্ষমতা নাই জানিয়াও সকলকে সমান সুযোগ মাত্র দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা মানুষকে ব্যঙ্গ করারই নামান্তর। যে-সমাজে সকলকে সমান করিবার প্রকৃত চেষ্টা আছে, যেমন রাশিয়ায়, সেই সমাজও সমসমাজ রূপে গণিত হওয়ার যোগ্য নয়, কারণ যে-সমাজে এক শ্রেণীর দ্বারা আর এক শ্রেণীকে শাসন করার প্রয়োজনীয়তা এখনও বর্তমান, সেই সমাজকে

সমসমাজ বলিব কিরূপে ? সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, যাহারা প্রকৃতই অসমান, তাহাদিগকে জোর করিয়া টানিয়া সমান করার চেষ্টা অপেক্ষা worse tyranny আর কিছুই হইতে পারে না। সকলের মধ্যে সমান হইবার ইচ্ছাও যে সমভাবে বর্তমান, তাহাও আদৌ সত্য নহে; বরঞ্চ সকলের মধ্যেই সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবার ইচ্ছা বীভৎসাকারে বর্তমান, যদিও বাস্তবিকই সকলকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইলে যে কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, তাহা বরণ করিয়া লইতে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই প্রস্তুত। সর্টকাট-এ বাজিমাৎ করিবার চেষ্টাই আমরা করিয়া থাকি, এবং তাহা হইতেই সমাজে সর্বপ্রকার অন্যায় ও অনাচারের সৃষ্টি হয়।

সমতা যদি মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম না হয়, বলপূর্বক অসমানকে সমান করার চেষ্টাও যদি নীতিবিরুদ্ধ হয়, তবে কি সাম্যবাদীকেও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, সমাজে তথাকথিত সমসুযোগের প্রতিষ্ঠাই—অর্থাৎ ব্রিটিশ লেবার পার্টির পলিসিই—মানুষের সম্ভবপর চরম লক্ষ্য ? বোধ হয় constitutional communist না হইলে কোন ব্যক্তিই এই কথা স্বীকার করিয়া লইবে না। সাম্য ও স্বাধীনতার সহোপলব্ধি অসম্ভব নয়। ইতিহাসে এ-পর্যন্ত এতদ্দ্বয়ের সুসংযোগ সাধিত হয় নাই বলিয়া ভবিষ্যতেও যে কখনও তাহা হইবে না, এ-কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সাম্য ও স্বাধীনতা যেহেতু psychological antitheses (ইহাই উপরে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি) সেইহেতু অবশ্য এতদ্দ্বয়ের সংযোগ কেবল transcendental plane-এই সম্ভব, এবং অন্তত দুই উপায়ে সেই লোকোত্তর ক্ষেত্রে এই সংযোগ সাধন করা যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই দুইটি পন্থার একটি অবলম্বন করিয়া ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই সাম্যাকাঙ্ক্ষা পরিপুষ্ট ও আংশিক পরিতৃপ্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং সেইটির আলোচনাই আগে করিব।

যাহা লৌকিক-জগৎ-নিরপেক্ষ, কিন্তু লৌকিক জগৎ যাহা উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, তাহাই হইল লোকোত্তর। সূর্য প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবী যে-বৃত্তপথে নিরন্তর ছুটিয়া চলিয়াছে, সেটিকে লোকোত্তর বলা যায়, কারণ পথটি অশরীরী হইলেও সুনির্দিষ্ট, এবং পৃথিবীর ন্যায় বিরাট জড়পিণ্ডেরও ক্ষমতা নাই যে, সেই অশরীরী বৃত্তপথের নির্দেশ মুহূর্তের জন্যও অমান্য করে। দুই আর তিনে পাঁচ হয়—ইহা জানি বলিয়াই আমরা বলিতে পারি যে, দুইটি ঘোড়া ও তিনটি ঘোড়ায় পাঁচটি ঘোড়া হইবে, দুইটি গাধা ও তিনটি গাধায় পাঁচটি গাধা হইবে, ইত্যাদি। আমাদের যদি কেবল এইমাত্র জানা থাকিত যে, দুইটি ঘোড়া ও তিনটি ঘোড়ায় পাঁচটি ঘোড়া হয়, তাহা হইলে কখনই সেই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হইত না যে, দুইটি গাধা ও তিনটি গাধায় পাঁচটি গাধা হইবে। অবশ্য সমজাতীয় দুইটি ও তিনটি বস্তুর সমন্বয়ে যে পাঁচটি

সমজাতীয় বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহা কোন না কোন লৌকিক দৃষ্টান্ত হইতে উপলব্ধ হওয়ার পূর্বেই যে ২+৩=৫ এই বিশুদ্ধ জ্ঞান মানব-মনে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এ কথা বলা সঙ্গত নয়; কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে, বস্তুসম্বন্ধে সংখ্যা-সম্পর্কিত সাধারণ সূত্র উচ্চারণ করিতে পারার পূর্বে মানুষকে অশরীরী শুদ্ধসংখ্যা আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতে সংখ্যা-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে বস্তুর সংখ্যা-সম্পর্কিত কোন বাক্য উচ্চারণ করা সম্ভব নয়।

এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করার উদ্দেশ্য এতদ্দ্বারা প্রমাণ করা যে, জড়জগৎ সম্বন্ধেও মানুষের বাস্তব (logical) বুদ্ধি লোকোত্তর (transcendental) বিজ্ঞানের আধীন্যেই সম্ভব। এই অধীন বাস্তব জ্ঞান যে স্বক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইতে পারে তাহাও নহে, কারণ সক্রিয় বুদ্ধি কতকগুলি বিশেষ রূপে (categories) ভিন্ন প্রকট হইতে পারে না। দিক্ (space) এবং কাল (time) দুইটি পৃথক্ বুদ্ধিরূপ (categories) এবং মানুষের বাস্তব জ্ঞানে এতদ্দ্বয় চিরদিনই পৃথক্ থাকিয়া যাইবে, যদিও বুদ্ধিধর্মের (categorical imperative) দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মানুষ আজ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, পৃথক দিক ও কালের পরিবর্তে একটি অদ্বৈত দিক-কাল-সমন্বয় (space-time continuum) স্বীকার করাই সমীচীন। বিচারের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের মানুষ দিক ও কালের সমন্বয় স্বীকার করিতে বাধ্য, কিন্তু আচারের ক্ষেত্রে সেই সমন্বয় এখনও অনেক দূর, হয়তো চিরদিন তাহা অনেক দূরই থাকিয়া যাইবে।

সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্কেও বোধ হয় মানুষের এইরূপ ক্ষেত্রভেদ স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই। অর্থাৎ মানিয়া লইতে হইবে, বিচারের ক্ষেত্রে দিক-কাল-সমন্বয়ের মত সাম্য-স্বাধীনতা-সমন্বয়ই যে একমাত্র সত্য এ-কথা স্বীকার করিলেও আচারের ক্ষেত্র হইতে এতদ্দ্বয়ের চিরবৈকল্য সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা কখনই সম্ভব হইবে না। কিন্তু সাম্য ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিচার ও আচারের মধ্যে যে কোন সম্পর্ক থাকিবে না বা বিচারের দ্বারা আচার কিছুমাত্র প্রভাবান্বিত হইবে না—এরূপ কথা মনে করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। জড়জগৎ সম্বন্ধে দিক-কাল-সম্পর্কিত বাস্তববুদ্ধি যেমন লোকোত্তর বিজ্ঞানের সীমা লঙ্ঘন করিতে অক্ষম হইয়াও বুদ্ধিধর্মের প্রণোদনায় সেই সীমারই প্রাচীর-গাত্রে নিরন্তর আঘাত করিয়া ব্যর্থতার মধ্য দিয়া স্বীয় সত্তার সার্থকতা প্রমাণ করিতেছে, মনোজগতেও সেইরূপ সাম্য ও স্বাধীনতার স্বতঃপ্রবৃত্ত সমন্বয়বুদ্ধি লোকোত্তর উপলব্ধির দ্বারে পৌঁছিয়াও বার বার ব্যর্থ ও প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। বাহ্যজগৎ ও মনোজগতে কিন্তু এই বিষয়ে একটি বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। বাহ্যজগতে দিক ও কালের সমন্বিত অনুভূতি অসম্ভব, এবং দিক-কাল-সমন্বয় আচারের ক্ষেত্রে এখনও আমাদের নিকট একটি mathematical abstraction মাত্র। মনোজগতে সাম্য

ও স্বাধীনতার সহোপলব্ধি কিন্তু psychological abstraction মাত্র নহে, কারণ যে-লোকোত্তর ক্ষেত্রে এই উপলব্ধি সম্ভব হয়—যাহার নাম প্রীতি—তাহা space-time-continuum-এর মত সম্পূর্ণরূপে মানবীয় অনুভূতির অতীত নহে। বাস্তব জগতের সাম্য ও স্বাধীনতা লোকোত্তর ক্ষেত্রে এই প্রীতির মধ্যে আত্মলাভ করিয়া পরস্পরের পূর্ণতা সাধন করিয়া থাকে ।॰ অর্থাৎ সাম্য ও স্বাধীনতার solvent হইল প্রীতি। ফরাসীগণ তাহাদের বিপ্লবের যুগে কেবল সাম্য ও স্বাধীনতার ধুয়া তুলিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই, সঙ্গে সঙ্গে সার্বজনীন মৈত্রীর জন্যও অন্তত একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল, এবং এই ব্যর্থ প্রচেষ্টাই তাহাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও গান্ধীর প্রচেষ্টাও এই প্রীতির মধ্যে সাম্য ও স্বাধীনতা বিলীন করিয়া দেওয়া। সাম্য ও স্বাধীনতা এই দুইই হইল অধিকারবুদ্ধি, এবং সর্বপ্রকার অধিকারবুদ্ধির নাশক হইল প্রীতি ও মৈত্রী। সুতরাং সমাজে প্রীতি ও মৈত্রী সংস্থাপিত হইলে সাম্য ও স্বাধীনতার লোকোত্তর নিষ্পত্তি আপনা হইতেই সংঘটিত হইবে।

এই লোকোত্তর নিষ্পত্তির সম্ভাবনা হইতে বুঝা যায় যে, বাস্তব জগতে সাম্য ও স্বাধীনতার পূর্ণ সহোপলব্ধি অসম্ভব হইলেও প্রীতির পথে এতদ্দ্বয়ের বৈষম্যনিরাকরণের চেষ্টা যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইবে তাহা নহে। আমার মনে হয় প্রাচীন ভারতে এই প্রীতির পথ অবলম্বন করিয়াই অন্তত দ্বিজাতিগণের মধ্যে জাতিভেদের ভিত্তিতে এক ধরনের functional democracy প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছিল। জাতিভেদরূপ ঘৃণ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতেও যে প্রকৃত মঙ্গলবুদ্ধি বিদ্যমান থাকিতে পারে, এ-কথা কল্পনা করাও কঠিন। কিন্তু আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিৎ Edward Alsworth Ross-এর এই কথাগুলি সম্যকরূপে বিবেচনা না করিয়া এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত হইবে না :— "The chief alternative to competition as a means of assigning each to his place is hereditary status. In the later Roman Empire the well-placed families protected their position by allowing none to aspire to a calling above his father's. In Prussia, before the Emancipation Edict of 1807, both lands and occupations were built into the caste system." (Principles of Sociology, Third Edition, 1938, p. 216)। বাস্তবিকই জাতিভেদ যদি ঘৃণ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান হয় তবে বর্তমান যুগের capitalist সমাজের নির্মম প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে ঘৃণ্যতর, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতের জাতি-ভিত্তি প্রাচীন সমাজে কিন্তু দুর্বলের প্রতি মমতার কোন অভাব ছিল না। এ-কথা মনুসংহিতার মত গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝা যাইবে না, কারণ এই সকল গ্রন্থ এক শ্রেণীর

স্বার্থকে ব্রাহ্মণ আপনাদের স্বার্থ বিস্তারের উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের বহিঃস্থিত মহাভারতাদি গ্রন্থ হইতে যে-সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে বাস্তবিকই মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতে শূদ্রেতর ত্রিবর্ণের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা হইয়াছিল। এমন কি শূদ্রের প্রতি—অর্থাৎ ভারতীয় helot-এর প্রতি—মহাভারতকার যে-করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা Aristotle ও Cicero-র মধ্যেও দুর্লভ।

আজিকার দিনে ভারতবর্ষে গান্ধীজী সাম্য ও স্বাধীনতার যে-আদর্শ প্রচার করিতেছেন, তাহা বহু বিষয়ে মহাভারতীয় আদর্শের অনুরূপ। গান্ধীজীর রচনাবলী হইতে আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা হইল এই যে, তিনি economic revolution অপেক্ষা psychological revolution এর পক্ষপাতী। ধনী ও দরিদ্র যদি পরস্পরের প্রতি প্রীতিপরায়ণ হইতে পারে, তবে সামাজিক অসাম্য আপনা হইতেই দূর হইবে, এ-কথা গান্ধীজী কেন, আমরাও বুঝিতে পারি; কিন্তু এই পথেই সাম্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রচেষ্টা বোধ হয় গান্ধীজীর পূর্বে বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট ভিন্ন তৃতীয় কোন ব্যক্তি করে নাই। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই, গান্ধীজীর প্রচেষ্টাও নিষ্ফল হইবে না, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ যে তাঁহার লোকোত্তর প্রীতিমন্ত্র পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে—তাহাই বা কিরূপে স্বীকার করা যায়! প্রীতি লোকোত্তর পদার্থ, অর্থাৎ কোন লৌকিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম প্রীতির প্রয়োগ করা চলে না, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে বা কারণে যদি কেহ কাহাকেও ভালবাসে, তবে সেই ভালবাসা যে প্রকৃত ভালবাসা নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সাম্য ও স্বাধীনতা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে লৌকিক পদার্থ। তাহার প্রমাণ এই যে, সর্বসমাজের সর্বাবস্থায় প্রীতির স্থান আছে, কিন্তু সাম্য ও স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থিত হয় কেবল কতকগুলি বিশেষ সমাজের বিশেষ অবস্থায়। সুতরাং প্রীতির সাহায্যে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার "চেষ্টা" করা অবৈধ ও অযৌক্তিক। প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইলে সামাজিক অসাম্য নিশ্চয়ই অপসৃত হইবে, কিন্তু তথাপি সামাজিক অসাম্য অপসারণের "উদ্দেশ্যে" প্রীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করা অন্যায়। গান্ধীজী আমাদিগকে সে-রূপ চেষ্টা করিতে বলেন নাই। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, "যদি পরস্পরের প্রতি প্রীতিপরায়ণ হইতে পার, তবে সামাজিক অসাম্য আপনা হইতেই দূর হইবে এবং স্বাধীনতাও আপনা হইতেই আসিয়া যাইবে, কারণ যাহাকে ভালবাসা যায় লোকে তাহার অধীনই হইতে চায়, এবং সেই ধরনের প্রণয়াধীন ব্যক্তিই জগতে প্রকৃত স্বাধীন, কারণ সেই ব্যক্তিই কেবল স্বাধীনতালিপ্সার অধীনতাও কাটিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছে।" এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য, এবং এইরূপ কথা Aristotle-এর Ethics-এ ছাড়া আর কোথাও আমি পাই নাই।

গান্ধীজীর এই প্রীতিমন্ত্র কিন্তু লোকোত্তর, ব্যাবহারিক জীবনে এই মন্ত্রের পূর্ণোপলব্ধি ও তন্নির্দিষ্ট আচরণ সম্ভব নয়, গান্ধীজী নিজেও যে সর্বত্র এই মন্ত্রানুযায়ী কার্য করিতে

সমর্থ হইয়াছেন তাহা মনে হয় না। স্বর্গত সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হইলে তাঁহার প্রতি গান্ধীজীর যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা প্রীতিপূর্ণ ছিল বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। উপরন্ত, গান্ধীজী নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই প্রীতিধর্মের পূর্ণ অনুবর্তন সাধারণের পক্ষে অসম্ভব, এবং কায়মনোবাক্যে অহিংসার পরিবর্তে কেবল কায়িক ও বাচনিক অহিংসাই তিনি সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র কায়িক ও বাচনিক অহিংসা প্রীতি তো নহেই, এমন কি অহিংসাও নহে,—ইহা policy মাত্র। এবং policy হিসাবে ইহা যে অপর সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক কর্মপন্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাও স্বীকার করা যায় না। এমন কি, Masaryk এর যে policy-র অনুকরণ করিয়া সুভাষচন্দ্র বন্দী ভারতীয় সেনার সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই policy-ও যে সাধারণের জন্য প্রচারিত গান্ধীজীর রাষ্ট্রনৈতিক অহিংসা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না। ইংরেজের মত honesty-কে কেবল মাত্র policy মনে করা যদি পাপ হয়, তবে লোকোত্তর প্রীতিধর্ম policy-রূপে ব্যবহার করা আরও পাপ। আমার মনে হয়, এতদ্দ্বারা প্রীতিধর্মই কেবল ক্ষুণ্ণ হইবে, সাম্য বা স্বাধীনতা লাভ ঘটিবে না।

আসল কথা এই যে, "স্বাধীনতা" কথাটির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিয়া আমরা যদি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করি, তবে স্বাধীনতা কেন, সঙ্গে সঙ্গে সাম্যও আমাদের করায়ত্ত হইবে। 'স্বাধীন' কথাটির, আক্ষরিক অর্থ হইল 'নিজের অধীন'। এই একটি কথার মধ্যেই ভারতীয় কৃষ্টির উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। কোন পাশ্চাত্য ভাষায় এই কথাটির উপযুক্ত প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। 'Independence' বলিতে বুঝায় 'অনধীনতা', কিন্তু এরূপ কথা যে কোন বিশেষ অবস্থার বাচক হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য; 'Liberty' হইল libertine-এর ধর্ম, সুতরাং কথাটির অর্থ হওয়া উচিত 'উচ্ছৃঙ্খলতা'; এবং 'freedom' বলিতে বুঝায় অগ্রগতির সামর্থ্য, যাহা অধীনতার মধ্যেও সম্ভব। এই তিনটি কথা হইতেই বুঝা যায় যে, ইউরোপ স্বাধীনতার নামে কেবল অধিকার দাবি করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ভারতবাসী এতদ্দ্বারা সর্বাগ্রে বুঝিয়াছে আত্মার দায়িত্ব। রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় যে-কোন পাশ্চাত্য text-book খুলিলেই দেখা যাইবে যে, তাহাতে স্বীকার করা হইয়াছে privilege without obligation সম্ভব নয়, কিন্তু liberty without responsibility-ও যে সম্ভব নয়, এই কথা আধুনিক ইউরোপের কোন গ্রন্থকার স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। John Stuart Mill এর Essay on Liberty হইল স্বাধীনতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতের Bible; এবং সাম্প্রতিক যুগে Laski এবং Joad Mill-এর এই যুগান্তকারী

গ্রন্থের দুইটি নূতন ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই বিশ্ববিশ্রুত মনীষীত্রয়ের কেহই কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে, স্বাধীনতার সহিত আত্মার দায়িত্ব* অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; এবং ইহাও তাঁহারা বলেন নাই যে, ক্ষীয়মাণ privilege যে-পরিমাণে শুদ্ধ liberty-র নিকটবর্তী হয়, obligation-ও ঠিক সেই পরিমাণে responsibility-তে রূপান্তরিত হইতে থাকে। Privilege বলিতে বুঝায়, অপরকে খাটাইবার ক্ষমতা। যে-সমাজে মানুষ অপর কেহ না খাটাইলে খাটিতে চাহে না, সেই সমাজে একরূপে না হয় আর একরূপে privilege-এর উদ্ভব হইবেই—অর্থাৎ অল্পসংখ্যক কতকগুলি লোক অপর সকলকে খাটাইতে আরম্ভ করিবেই, কারণ ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক মানুষকে খাটিতে হইবেই, যেহেতু মানুষ না খাটিলে সমাজ-জীবনই অচল হইয়া পড়ে। যে-সমাজে মানুষ সামাজিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রম স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই করিয়া থাকে, সেই সমাজে জনসাধারণকে খাটাইবার জন্য কোন privileged সম্প্রদায়ের প্রয়োজন হইবে না, এবং privilege-এর অস্তিত্ব না থাকায় সেই সমাজ আপনা হইতেই সমসমাজে পরিণত হইবে। এক কথায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, অপরের আধীন্যের পরিবর্তে নিজের আধীন্যেই যে-ব্যক্তি সামাজিক প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন, কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্যবাধকতার অভাব স্বাধীনতার চিহ্ন নহে।

এই কথা যদি ব্যক্তির পক্ষে সত্য হয়, তবে রাষ্ট্রের পক্ষেও এই কথা কেন সত্য হইবে না, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মানুষ শতাধিক বৎসর ধরিয়া নিজের আধীন্যে অকর্তব্য করিবার অধিকার-কেই laissez-faire নাম দিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে, এবং বর্তমান যুগে এই laissez-faire-এরই animistic version যে Marxian Materialism—তাহাই সারাবিশ্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। Laissez-faire নীতির মূল কথা হইল, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি নীরন্ধ্র স্বার্থপরতাকেই স্বাভাবিক নরধর্ম বলিয়া মনে করিবার এবং তদনুযায়ী কার্য করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে আপনা হইতেই সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হইবে। ইংরেজী সভ্যতার ইতিহাস-প্রণেতা Buckle তাঁহার বিরাট গ্রন্থের প্রতি ছত্রে কেবল এই কথা প্রমাণ করিবারই

---

* আমার এক ছাত্র সেদিন জিজ্ঞাসা করিল, আত্মার অস্তিত্ব যে স্বীকার করে না আত্মার দায়িত্ব সে কিরূপে স্বীকার করিবে? ইহার উত্তরে কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আত্মা theological কিন্তু আত্মার দায়িত্ব ethical, সুতরাং এতদ্দ্বয় পরস্পরাশ্রয়ী নহে। আত্মা না মানিয়াও স্বচ্ছন্দে আত্মার দায়িত্ব স্বীকার করা যায়।

উৎকট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। Marxist দৃষ্টিভঙ্গী ইহা হইতে একটু স্বতন্ত্র। Benthamite সম্প্রদায় প্রচার করিয়াছিল যে, নীরন্ধ্র স্বার্থপরতাই নরধর্ম হওয়া উচিত; Marxist সম্প্রদায় কিন্তু প্রচার করিতেছে যে, নীরন্ধ্র স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নরধর্ম হইতে পারে না, কারণ এই সম্প্রদায়ের মতে দৈহিক ভোগলিপ্সাই হইল একমাত্র শক্তি যাহা মানুষকে কর্মে প্রণোদিত করিতে পারে ও করিয়া থাকে। Benthamite-গণও* ভোগলিপ্সাকেই একমাত্র প্রণোদক শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভোগের আদর্শ ছিল অন্যরূপ—অনেকটা Epicurean আদর্শের মত, যে-আদর্শে 'ত্যাগেন ভুঞ্জীথাঃ' এই অমোঘ বাণীই অজ্ঞাতে মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল। Marxist-গণ কিন্তু অত কাঁচা ছেলে নন। তাঁহাদের ভোগলিপ্সা হইল রীতিমত দৈহিক ভোগলিপ্সা, এবং জড়শক্তির দ্বারা প্রবুদ্ধ সেই দৈহিক ভোগলিপ্সাই তাঁহাদের মতে একমাত্র শক্তি, যাহা মানুষকে কর্মপথে প্রবর্তিত করিতেছে। সুতরাং Marxist ধর্মের প্রকৃত নাম হওয়া উচিত—Animistic Materialism। পাছে কেহ ভুল করিয়া বসে যে Marxist ভোগলিপ্সা নিছক দৈহিক ভোগলিপ্সা নহে, এই ভয়ে Marxist-গণ অনবরত 'Materialist' কথাটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাঁহাদের এই দৈহিক ভোগলিপ্সা যে প্রকৃত পক্ষে আধিভৌতিক, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা আর একটি magic word ব্যবহার করিয়া থাকেন,—সেটি হইল 'Dialectic'! 'পাথর বাটি' কথাটা বড়ই শ্রুতিকটু,—এতই শ্রুতিকটু যে এরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু বিশেষণরূপে 'সোনার' কথাটি ব্যবহার করিলে কেমন হয়! ঠিক এই মনোবৃত্তি হইতে Marxist-গণ তাঁহাদের Materialism-এর মুখরক্ষা করিবার জন্য বিশেষণ-রূপে 'Dialectical' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন।—Marxian Dialectic-এর আলোচনা কিন্তু প্রবন্ধান্তরে করিতে হইবে। আপাতত এ-সম্বন্ধে এইটুকু বলিয়া রাখাই যথেষ্ট যে লেনিন যে গ্রন্থে† জড়বাদ বিসর্জন দিয়া Bolshevik পার্টির প্রোগ্রাম নির্ধারণ করেন, সেই গ্রন্থে 'Dialectic' কথাটি কোন magical sense-এ ব্যবহৃত হয় নাই।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেকে নিজের অধীন করাই যদি স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হয়,

---

* Utilitarian-গণ পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা Bentham-এর মতেরই কেবল উল্লেখ করিতেছি।

† ইহাই সর্বসম্মতিক্রমে লেনিনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, নাম "What to do"। বইটি নাকি আজকাল আর পাওয়া যায় না। বইটির ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে কিনা জানি না। আমার নিকট কেবল ফরাসী অনুবাদটি আছে।

তবে Marxistদের মত যাহারা Materialist Animism-এ বিশ্বাসবান, তাহাদের মনে যে স্বাধীন হইবার স্বতঃপ্রবৃত্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। Animism যাহাদের ধর্ম, স্বাধীনতা অবশ্যই তাহাদের নিকট taboo। এই কথা স্মরণ না রাখিলে Marxist সম্প্রদায়ের High priest সেই unconscious humourist, Plekhanov এর এই উক্তিটির প্রকৃত অর্থ বুঝা যাইবে না: "by submitting to nature, [man] increases his power over nature"।* যাহারা জড়শক্তির দাসত্ব স্বীকার করা ছাড়া আত্মোন্নতির অপর কোন পন্থাই কল্পনা করিতে পারে না, তাহারা যে নরশক্তির দাসত্ব সর্বাগ্রে স্বীকার করিবে তাহা সুস্পষ্ট, এবং ইহাও সুস্পষ্ট যে যে-পদার্থ তাহাদের মনে সর্বাপেক্ষা ভীতির সঞ্চার করিবে তাহা হইল স্বাধীনতা। শুধু তাহাই নয়, ভীতিগ্রস্ত সকল মানুষই যেমন সর্ববিধ নীচবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে, Marxian animist-গণও যে সেইরূপ স্বাধীনতার আতঙ্কে ঘৃণ্যতম কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এইবার বুঝা যাইবে ভারতীয় Marxist-গণ কেন চিরদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করিয়া আসিয়াছে। যে-স্বাধীনতার নামে Marxian animist-দের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসে, সেই স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করে এই কংগ্রেস, এবং সেই সংগ্রাম আবার কংগ্রেস যে নিষ্কামভাবেই করিয়া থাকে তাহারও ভীতিপ্রদ প্রমাণ বর্তমান, কারণ Wavell parley-র সময়েই কংগ্রেসের নেতৃগণ কংগ্রেসের অস্তিত্বের অবসান ঘটাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এহেন যে কংগ্রেস, তাহার ধ্বংসসাধনে যে Marxian animist গণ বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিবে তাহাতে কি বিস্ময়ের কোন কারণ আছে? বিস্ময় উপস্থিত হয় কেবল ইহারা যে নীচতার পরিচয় দিয়াছে তাহার গভীরতা লক্ষ্য করিয়া। Weimar constitution এর অক্ষর মাত্রও লঙ্ঘন না করিয়া যেরূপে

---

* Plekhanov-এর প্রতি এই শ্রদ্ধাহীন ভাষা প্রয়োগ করিতেছি বলিয়া আমার Marxist বন্ধুগণ আশা করি ক্ষুব্ধ হইবেন না। তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, বাতুলালয়ের অধিবাসী নয় এমন কোন ব্যক্তি কি বলিতে পারে "Eleutheropoulos is acquainted with Marxian historical materialism, but his acquaintance is altogether inadequate, as is shown by the fact that he wants to rectify it after his own fashion"? এই কথা কিন্তু Plekhanov বলিয়াছেন (Fundamental Problems of Marxism, p. 67)। শুধু তাহাই নহে, Plekhanov-এর গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠাতেই প্রায় এই ধরনের কথা পাওয়া যায় যাহা হইতে বাস্তবিকই মনে হয় যে, "Plekhanov was a clown posing as a prophet"। এই উক্তিটি আর কাহারও নয় আমারই, Plekhanov-এর বই পড়িবার সময় পৃষ্ঠাপ্রান্তে একাধিকবার না লিখিয়া থাকিতে পারি নাই।

নাৎসিগণ দ্বিতীয় Reich ভিতর হইতে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপে ভিতর হইতে কংগ্রেসের ধ্বংসসাধন করাই ভারতীয় Marxist গণের সুস্পষ্ট দুরভিসন্ধি। কংগ্রেসের উদারতার সুযোগ লইয়া এইরূপে কংগ্রেসেরই অনিষ্ট সাধনে তৎপরতা দেখানো এতই নীচ অন্তঃকরণের পরিচায়ক যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এই নীচতার তুলনা মিলিবে কিনা সন্দেহ। Voltaire-এর মত কোন ব্যক্তি আজ ভারতে থাকিলে Church-এর পরিবর্তে এই Marxism লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই তিনি বলিতেন : écrasez l'infame অর্থাৎ "ধ্বংস কর এই পাপ"। গান্ধীজীর লোকোত্তর প্রীতিধর্ম যেরূপ supra-logical এবং সেইজন্য দুরাচরণীয়, ভারতীয় Marxist-দের এই অনম্বুয়ের নীচতাও সেইরূপ infra-logical এবং সেইজন্যই নরধর্মবিগর্হিত। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম যাহারা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া পশুত্ব বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহারা কখনই মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না। সুতরাং কংগ্রেসের মত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইতেও Marxian animist-দের নিষ্কাশন সর্বতোভাবে প্রয়োজন।

লেনিন অন্ততঃ শেষজীবনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর তবে প্রত্যেক জাতির সমাজতন্ত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, এবং এইজন্য তিনি ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। Borkenau মারফৎ কিন্তু আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, লেনিনের এই নীতির প্রতিবাদ করিয়াছিল ভারতেরই একজন স্বনামধন্য ex-communist, যে এখন ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের উৎকোচে ভীমবিক্রমে কংগ্রেসের বিপক্ষতা করিয়া জগৎসমক্ষে প্রমাণ করিতেছে যে, পাকা Marxist হইতে পারিলে জীবিকার কখনও অভাব ঘটে না। এই ব্যক্তিই যদি তাহার এক পুস্তকে Kant প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগকে 'Bourgeois' এবং ভারতের প্রাচীন মনীষীদিগকে 'ন্যাঙ্গোটা বাবা' বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিয়া থাকে তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই, কারণ বৃক্ষশাখা হইতে মানুষের প্রতি একবার দন্তবিকাশ করিয়া বানরেই কেবল মনে করিতে পারে যে দ্বিপদ জাতিটার বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া লওয়া হইয়াছে। এই ধরনের লোকের পক্ষে মার্ক্সবাদ কেন কোন বাদই যে বুঝিতে পারা সম্ভব নয় তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহারাই আজ অসংখ্য penny-pamphlet প্রচার করিয়া বাংলার তরুণ ছাত্র ও ছাত্রীদের মনে Marxian animism-এর উৎকট বিষ প্রবেশ করাইতেছে। "ভারত উদ্ধার বা চারি আনা মাত্র" বাংলা দেশে এক সময়ে একটা রহস্যের বিষয় ছিল ; আজ কিন্তু দেখিতেছি যে "মার্ক্সবাদ বা চারি আনা মাত্র" রীতিমত একটি সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। লেনিন যে "infantile disease of leftism"-এর কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহারই সুযোগ লইয়া ভারতীয় Marxist-গণ তাহাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমার আশা

আছে এবং বাংলার তরুণ সমাজ এই ঘৃণ্য Marxian animism-এর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিবে, কিন্তু leftism কখনও পরিত্যাগ করিবে না। যে-leftism কেবল Marxian animism-এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ তাহাই শুধু disease, নতুবা leftism সর্বদেশে সর্বযুগে স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ।

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, sabotage movement-এ কমিউনিষ্টরা যোগ দেয় নাই বলিয়াই কংগ্রেস তাহাদিগকে দোষী করিতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রিটিশ গভর্মেণ্টও কংগ্রেসকে প্রত্যক্ষভাবে sabotage-এর জন্ম দায়ী করিতে সাহস করে নাই, কিন্তু কমিউনিষ্টরা তাহাই করিল। পরোক্ষভাবে কংগ্রেস যে এই sabotage-এর জন্ম দায়ী তাহা অবশ্যই সত্য, এবং কংগ্রেসের নেতৃগণ সে দায়িত্ব অস্বীকারও করেন নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, কেবল গভর্মেণ্টকে sabotage করাই অপরাধ, আর কংগ্রেসকে sabotage করা অপরাধ নয়? কংগ্রেসের ভিতর হইতে যে-সব কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসকে sabotage করিয়া আসিয়াছে, তাহারা John Amery অপেক্ষা কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ?—কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে অনেক নিঃস্বার্থ ব্যক্তি আছেন আমি জানি এবং তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাও করিয়া থাকি। কিন্তু মার্ক্সীয় জড়বাদের ভূত তাঁহাদের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া আছে এবং এই ভূত তাঁহাদিগকেও ঘৃণ্যতম কার্যে প্রবর্তিত করিতেছে, যদিও এই কার্য তাঁহারা পরমার্থ জ্ঞানেই করিতেছেন। জড়বাদ যে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে opportunism ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি। পরিতাপের বিষয় এই যে কমিউনিষ্ট পার্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও জড়বাদী হওয়ার ফলে ঘৃণ্যতম সুবিধাবাদীতে পরিণত হইয়াছেন। ইংরেজের যুদ্ধকে ভারতের জনযুদ্ধরূপে প্রচার করিয়া কমিউনিষ্টগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা Churchill প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের খিদ্‌মৎগার। আমি বলিতেছি না যে ফ্যাশিষ্ট-শক্তির বিরুদ্ধে ইংরেজকে যুদ্ধ করিতে সাহায্য করাই কমিউনিষ্টদের পক্ষে অন্যায় হইয়াছে, কারণ ভারতের স্বাধীনতা লাভ অপেক্ষাও ফ্যাশিজ্‌মের ধ্বংসসাধন—অন্তত কমিউনিষ্টের নিকট—অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ইংরেজের যুদ্ধকে ভারতের জনযুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়া কমিউনিষ্টগণ যে কলঙ্ক অর্জন করিয়াছেন, অনন্তকালেও তাহার কালিমা দূর হইবে না। ভারতবাসী—অর্থাৎ কংগ্রেস—ইংরেজকে সাহায্য করিতে শুধু প্রস্তুত নয় উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল, কিন্তু কেবল এই শর্তে যে ইংরেজকে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে যে-ভারত সাহায্য করিবে সেই ভারতও যেন সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন হয়। ইংরেজ কিন্তু এই শর্তে রাজি হয় নাই। অর্থাৎ ইংরেজ প্রত্যুত্তরে প্রকারান্তরে ইহাই বলিয়াছিল "আমরা জার্মানির অধীন হইব সে-ও ভাল তবু তোমাদের স্বাধীন হইতে দিব না।" ইহার পর কোন ভারতবাসীর কি ইংরেজের

সহিত কোন বিষয়ে সহযোগিতা করা সম্ভব? ইচ্ছা থাকিলেও কংগ্রেসের এ-ক্ষেত্রে ইংরেজকে সাহায্য করার উপায় ছিল না। কমিউনিষ্টরা কিন্তু তাহাই করিয়াছে। এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা জগৎসমক্ষে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, যে-ইংরেজের নিকট ভারতবাসী cat's paw ভিন্ন আর কিছুই নয়, সেই ইংরেজ প্রধানত আপনার সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য যে-যুদ্ধ করিতেছে, সেই যুদ্ধকেই ভারতীয়গণ নিজেদের জাতীয় যুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। তাই বলিতেছি, ভারতীয় কমিউনিষ্টদের এই কলঙ্ক অনন্তকালেও ঘুচিবে না।

কিরূপে কমিউনিষ্টদের এই ঘৃণ্য মনোবৃত্তি সম্ভব হইয়াছে? আমার বিশ্বাস Marxian materialism (=materialist animism) ইহার একমাত্র কারণ। Animist কখনও স্বাধীন হইতে পারে না, স্বাধীনতার চিন্তাও তাহার মনে আসা অসম্ভব, কারণ ইচ্ছাশক্তি যাহার মতে কেবল জড় প্রকৃতিতেই সম্ভব, তাহার পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব যে, তাহার নিজের কোন ইচ্ছা আছে, এবং যাহার নিজের কোন ইচ্ছা নাই সে নিজের অধীন হইবে কিরূপে? সুতরাং স্বাধীনতা যাহার ঈপ্সিত, তাহাকে মার্ক্সবাদ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। এবং কোন মার্ক্সবাদী যদি কখনও বলে যে, স্বাধীনতা তাহার ঈপ্সিত তখনই বুঝিতে হইবে যে, সে মিথ্যা কথা বলিতেছে।

স্বাধীনতার কথা কেবল সে-ই বলিতে পারে, যে বিশ্বাস করে যে, ইচ্ছাশক্তি তাহার নিজের মনেই বর্তমান, এবং সেই শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষমতাও তাহার নিজের মধ্যেই আছে। যে-মানুষ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজেকে নিজের অধীন করিয়াছে সে-ই কেবল—সেই ইচ্ছাশক্তিরই সাহায্যে—নিজের অধীনতার অবসান ঘটাইতে পারে, এবং বাস্তব জগতে স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝায় বা বুঝানো সম্ভব, তাহা নিজের ইচ্ছায় নিজের অধীনতার অবসান ঘটানো যে সম্ভব এই বিশ্বাস ও অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে; কারণ স্বাধীনতাকামী বাস্তবিকই কখনও স্ব-এর অধীনতারও অবসান ঘটাইতে পারে না, যেহেতু স্ব-এর অধীনতার অবসান স্বাধীনতার অবসানেরই নামান্তর। এবং যে-সমাজে প্রত্যেক মানুষ সমান অনুপাতে—অবশ্য সমান পরিমাণে নয়—নিজেকে নিজের অধীন করিতে সমর্থ হইয়াছে কেবল সেই সমাজই সমসমাজরূপে গণ্য হইবার যোগ্য, কারণ মানুষ যখন অসমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, তখন সাম্যের অপর কোন মাপকাঠি সম্ভব নয়। সুতরাং যে সমাজে দেখিব, যে-যত বড়, সামাজিক দায়িত্ব তাহার তত বেশি, এবং যে যত ছোট, সামাজিক দায়িত্বও তাহার তত কম,—সেই সমাজকেই সমসমাজ বলিয়া স্বীকার করিব। যত দূর জানি, একমাত্র রাশিয়াতে এই ধরনের সমসমাজ কিয়ৎপরিমাণে গড়িয়া উঠিয়াছে, কারণ অপর সমস্ত দেশে ক্ষমতা যাহাদের যত বেশি দায়িত্ব তাহাদের তত কম।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীহর্ষ

শ্রীহর্ষ মিরাটে চাকরি করত। যেটুকু সময় বাসায় থাকত, প্রভাবতীর চাহিদা থেকে বাঁচবার আশায় মাথা গুঁজে সাহিত্যচর্চ্চা করত, গল্প লিখত। ক্রমে কিছু অভ্যাসও হয়ে গিয়েছিল। তিনি পেড়াপিড়ি করলে, হাসিমুখে বলত, যদি উতরে যায়, মোটা টাকা পাবার মওকা ছাড়ি কেন? বড় মেয়ে বিভার বিবাহকাল আসন্ন, তার ভাগ্যে যদি মেলে,—ইত্যাদি। কথাটা কাজ দেয়।

বিভাও তেরো বছর উত্তীর্ণ, শ্রীহর্ষকে সেই চেষ্টায় বাড়ি আসতে হয়েছে। কলকাতার ফুটপাথে বাল্যবন্ধু কেশবের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। কথা কইবার আগেই কেশব-তাকে জড়িয়ে ধরলে, অ্যাঁ, বেঁচে আছিস? এক যুগ পেরিয়ে গেছে যে! আমি বলি বুঝি—

শ্রীহর্ষ বললে, তার উপায় নেই কেশব! মিরাট যে বিখ্যাত 'স্যানাটোরিয়ম', বিরাট স্বাস্থ্যকর শহর, তা কি জানতুম? অন্নেরও দেখা নেই, মৃত্যুও খোঁজবার সুবিধে পায় না। তারও যে অবলম্বনের অভাব। দেখ না, পাঁচ-পাঁচটি মেয়ে, সবগুলিই addition-দুরন্ত, subtraction জানে না। সব বেশ আছে। বেশ নেই কেবল আমি, অবশ্য শরীর দেখলে বুঝতে পারবে না। প্রভাকে একদিন বলতে শুনলুম না, অম্বল কি বুকজ্বালা। সব জ্বালাটা একাই ভোগ করছি যে ভাই। এই অবস্থা।

শুনে কেশব অবাক। —যা শোনালে তাতে দুঃখের তো কোন স্পর্শ পেলুম না ভাই। সবই তো "মথি" লিখিতের ওপর যায়, and most desirable too—

শ্রীহর্ষ বললে, কিন্তু আসল সুখের কথাটা যে শোন নি, যেটা কেরানির মূলধন;—মাইনে হে! সাত বছর থেকে আমাকে সেই যে খাটের লাট বানিয়ে রেখেছে, কখনও একবটি শুনতে বা আনতে দিলে না। প্রভা বিশ্বাস করে না। দশ তারিখের পর মুদির দয়ায় চলে যে ভাই। সে দয়ার দান ক্রমে ভিটেটায় টান দিয়েছে—হাজার দেড়েক পাবে। আরও একটা ভয়ঙ্কর desirables আছে। মিরাটের জলের গুণ এমন, এক গেলাস খেলেই খিদে। জলটা খাওয়া ছেড়ে দিতে হয়েছে ভাই—

কেশব বললে, ও হয় হয়, অমন হয়েই থাকে। ওটা শহরে এসে নতুন বাড়ি বানাবার সূচনা। ও না হ'লে তালুক থেকে ফিরে, দেশে এসে, কোন্ প্রভাবতী ঘোমটা টেনে সেই এঁদোপড়া গাঁয়ের ডোবায়, 'পানা' ঠেলে বাসন মাজতে বসত, সেটা ভেবেছ কি? Impossible—

শ্রীহর্ষ বললে, ভেবেছি বন্ধু, ভেবেছি। তাই দেশে আসবার পথে, আমাদের সেরা তারণ-তীর্থ গয়াটা সেরে ফিরেছি।—নিজের পিণ্ড নিজে দিলে শুনেছি নাকি, বছরের মধ্যেই রেহাই, স্বর্গ লুফে নেন। হেসো না, শাস্ত্রবাক্য। সর্ব্বাগ্রে পিণ্ডটা বাবাকেই দিলুম। দেখলুম, সত্যই জ্যান্ত তীর্থ যে ভাই। কানের কাছে স্পষ্ট শুনলুম, বাবা বলছেন, কিছু বলবার থাকে তো এই বেলা বল, পাঁচ মিনিটের বেশি সময় পাব না।

বললুম, কি ভেবে ছেলের নাম শ্রীহর্ষ রেখেছিলে, বলে যাও বাবা, সদাই বড় বিমর্ষে আছি। তোমার দেওয়া নামের সম্মান রাখতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। মিছে হাসি-মুখে আর কত থাকব। মিথ্যা "হর্ষ-এর" অভিনয়ে পাপের ভার যে বিষম বেড়ে চলেছে, বইতে পারছি না। শুনে বাবা বললেন, এ চিন্তা তোর ঘটে এল কি ক'রে? কে আনিয়েছে? এই যুগ সোনামুগ চালিয়ে, কপির ফুল আর ল্যাংড়া-বোম্বাই খেয়ে, ভাদ্দুরে ফজলি মেরে, বাপকে আজ দু পয়সার ছোলার ছাতু খাওয়াতে এনেছ রাসকেল? নিত্য জুতোয় ব্রঙ্কো লাগাবার খরচটা কত ছিল রে পাজি? আজ বিমর্ষ করেছে কে? ইংরিজী-স্কুলে পড়িয়েছিলুম, তাই অনেক ভেবেই আমি তোর শ্রীহর্ষ নাম রেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, সহজেই বুঝে নিবি। Law-year-এর মেয়ে 'লাক্‌সরির' লোভে বুঝতে দেয় নি। বুঝলে আজ ভিটে বেচতে যেতে হ'ত না।

বললুম, না বাবা, তাঁকে মিছে দুষছেন, তিনি এ সব কথা কিছু জানেন না। আমি একাই সই আর বই।

বাবা বললেন, That's like a goc ooy, এই তো পুরুষের কাজ। তাঁদেরও কি কম বইতে হয়! গিনি-গোল্ডের হারের ওজন বেড়েই চলেছে। বইবার তো সীমা আছে! বিবেচক আর কাকে বলে! তোর মার গলায় একটা তাঁবার মাদুলি, দেড়-হাত সুতোয় ঝুলত। সুতোর ওজন আর কত, তাই বুঝি নি। যাক, নামটা কেন রেখেছিলুম শুনে রাখ। ইংরিজীতে হর্ষ (horse) মানে ঘোড়া, অশ্ব, যাদের ছোলা বা ছোলার ছাতু পরম প্রিয়, যেমন পুষ্টিকর তেমনই বল-বর্দ্ধক। দুষ্প্রাপ্যও নয়, দুর্মূল্যও নয়। আমারই ভুল, বাঙালীর ছেলের এমন স্থূল বুদ্ধি জানলে, 'অশ্বঘোষ' নামটাই রাখতুম।

বললুম, অমন পাঁচমিশেলি নাম বুঝব কি ক'রে বাবা!

বললেন, সে কি রে? ভেজাল ছাড়া আজকাল কোন বস্তু আছে? 'Victoria, লিলিবার্লি', মেরি শুনিস নি? Anglo vernacular যে অস্থিমজ্জায় ঢুকেছে। তাই ভেবেছিলুম, যে দুর্দ্দিনের আভাস পাচ্ছি, বাঙালী অনাহারে অপঘাৎ এড়াতে চায় তো ছোলার ছাতুই তার একমাত্র উপায়, তাই ওই সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়েছিলুম। বোঝে তো অন্তত কাচ্চা-বাচ্চাদেরও কাঁচ্চা পরিমাণেও অভ্যাস করাবে। বাংলার ভাগ্য তখন ভোজনে-ওজন ঠেলে চলেছে। দেখে ভয় পেয়েছিলুম। ডিম আর মাংসই তখন বংশ-লোপের টোপ ফেলেছে। শেষ, খাবার উপকরণ, 'খাবি'টাই ছিল।

আজ বিমর্ষের কারণ ঘোচাতে সোজা পথে গয়ায় এসেছ, তেরো বছর পোলাও মেরে ছাতুটা বুঝি বাপের জন্যে তুলে রেখেছিলে, দু'পয়সায় আজ কর্ত্তব্য সারতে এসেছ, মরা

সমর্থ হইয়াছেন তাহা মনে হয় না।' স্বর্গত সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হইলে তাঁহার প্রতি গান্ধীজীর যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা প্রীতিপূর্ণ ছিল বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। উপরন্তু, গান্ধীজী নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই প্রীতিধর্মের পূর্ণ অনুবর্তন সাধারণের পক্ষে অসম্ভব, এবং কায়মনোবাক্যে অহিংসার পরিবর্তে, কেবল কায়িক ও বাচনিক অহিংসাই তিনি সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র কায়িক ও বাচনিক অহিংসা প্রীতি তো নহেই, এমন কি অহিংসাও নহে,—ইহা policy মাত্র। এবং policy হিসাবে ইহা যে অপর সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক কর্মপন্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাও স্বীকার করা যায় না। এমন কি, Masaryk এর যে policy-র অনুকরণ করিয়া সুভাষচন্দ্র বন্দী ভারতীয় সেনার সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই policy-ও যে সাধারণের জন্য প্রচারিত গান্ধীজীর রাষ্ট্রনৈতিক অহিংসা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না। ইংরেজের মত honesty-কে কেবল মাত্র policy মনে করা যদি পাপ হয়, তবে লোকোত্তর প্রীতিধর্ম policy-রূপে ব্যবহার করা আরও পাপ। আমার মনে হয়, এতদ্দ্বারা প্রীতিধর্মই কেবল ক্ষুণ্ণ হইবে, সাম্য বা স্বাধীনতা লাভ ঘটিবে না।

আসল কথা এই যে, "স্বাধীনতা" কথাটির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিয়া আমরা যদি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করি, তবে স্বাধীনতা কেন, সঙ্গে সঙ্গে সাম্যও আমাদের করায়ত্ত হইবে। 'স্বাধীন' কথাটির, আক্ষরিক অর্থ হইল 'নিজের অধীন'। এই একটি কথার মধ্যেই ভারতীয় কৃষ্টির উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। কোন পাশ্চাত্য ভাষায় এই কথাটির উপযুক্ত প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। 'Independence' বলিতে বুঝায় 'অনধীনতা', কিন্তু এরূপ কথা যে কোন বিশেষ অবস্থার বাচক হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য; 'Liberty' হইল libertine-এর ধর্ম, সুতরাং কথাটির অর্থ হওয়া উচিত 'উচ্ছৃঙ্খলতা'; এবং 'freedom' বলিতে বুঝায় অগ্রগতির সামর্থ্য, যাহা অধীনতার মধ্যেও সম্ভব। এই তিনটি কথা হইতেই বুঝা যায় যে, ইউরোপ স্বাধীনতার নামে কেবল অধিকার দাবি করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ভারতবাসী এতদ্দ্বারা সর্বাগ্রে বুঝিয়াছে আত্মার দায়িত্ব। রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় যে-কোন পাশ্চাত্য text-book খুলিলেই দেখা যাইবে যে, তাহাতে স্বীকার করা হইয়াছে privilege without obligation সম্ভব নয়, কিন্তু liberty without responsibility-ও যে সম্ভব নয়, এই কথা আধুনিক ইউরোপের কোন গ্রন্থকার স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। John Stuart Mill এর Essay on Liberty হইল স্বাধীনতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতের Bible; এবং সাম্প্রতিক যুগে Laski এবং Joad Mill-এর এই যুগান্তকারী

গ্রন্থের দুইটি নূতন ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই বিশ্ববিশ্রুত মনীষীত্রয়ের কেহই কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে, স্বাধীনতার সহিত আত্মার দায়িত্ব* অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; এবং ইহাও তাঁহারা বলেন নাই যে, ক্ষীয়মাণ privilege যে-পরিমাণে শুদ্ধ liberty-র নিকটবর্তী হয়, obligation-ও ঠিক সেই পরিমাণে responsibility-তে রূপান্তরিত হইতে থাকে। Privilege বলিতে বুঝায়, অপরকে খাটাইবার ক্ষমতা। যে-সমাজে মানুষ অপর কেহ না খাটাইলে খাটিতে চাহে না, সেই সমাজে একরূপে না হয় আর একরূপে privilege-এর উদ্ভব হইবেই—অর্থাৎ অল্পসংখ্যক কতকগুলি লোক অপর সকলকে খাটাইতে আরম্ভ করিবেই, কারণ ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক মানুষকে খাটিতে হইবেই, যেহেতু মানুষ না খাটিলে সমাজ-জীবনই অচল হইয়া পড়ে। যে-সমাজে মানুষ সামাজিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রম স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই করিয়া থাকে, সেই সমাজে জনসাধারণকে খাটাইবার জন্য কোন privileged সম্প্রদায়ের প্রয়োজন হইবে না, এবং privilege-এর অস্তিত্ব না থাকায় সেই সমাজ আপনা হইতেই সমসমাজে পরিণত হইবে। এক কথায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, অপরের আধীন্যের পরিবর্তে নিজের আধীন্যেই যে-ব্যক্তি সামাজিক প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন, কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্যবাধকতার অভাব স্বাধীনতার চিহ্ন নহে।

এই কথা যদি ব্যক্তির পক্ষে সত্য হয়, তবে রাষ্ট্রের পক্ষেও এই কথা কেন সত্য হইবে না, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মানুষ শতাধিক বৎসর ধরিয়া নিজের আধীন্যে অকর্তব্য করিবার অধিকারকেই laissez-faire নাম দিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে, এবং বর্তমান যুগে এই laissez-faire-এরই animistic version যে Marxian Materialism—তাহাই সারাবিশ্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। Laissez-faire নীতির মূল কথা হইল, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি নীরন্ধ্র স্বার্থপরতাকেই স্বাভাবিক নরধর্ম বলিয়া মনে করিবার এবং তদনুযায়ী কার্য করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে আপনা হইতেই সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হইবে। ইংরেজী সভ্যতার ইতিহাস-প্রণেতা Buckle তাঁহার বিরাট গ্রন্থের প্রতি ছত্রে কেবল এই কথা প্রমাণ করিবারই

---

* আমার এক ছাত্র সেদিন জিজ্ঞাসা করিল, আত্মার অস্তিত্ব যে স্বীকার করে না আত্মার দায়িত্ব সে কিরূপে স্বীকার করিবে? ইহার উত্তরে কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আত্মা theological কিন্তু আত্মার দায়িত্ব ethical, সুতরাং এতদুভয় পরস্পরাশ্রয়ী নহে। আত্মা না মানিয়াও স্বচ্ছন্দে আত্মার দায়িত্ব স্বীকার করা যায়।

উৎকট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। Marxist দৃষ্টিভঙ্গী ইহা হইতে একটু স্বতন্ত্র। Benthamite সম্প্রদায় প্রচার করিয়াছিল যে, নীরন্ধ্র স্বার্থপরতাই নরধর্ম হওয়া উচিত; Marxist সম্প্রদায় কিন্তু প্রচার করিতেছে যে, নীরন্ধ্র স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নরধর্ম হইতে পারে না, কারণ এই সম্প্রদায়ের মতে দৈহিক ভোগলিপ্সাই হইল একমাত্র শক্তি যাহা মানুষকে কর্মে প্রণোদিত করিতে পারে ও করিয়া থাকে। Benthamite-গণও* ভোগলিপ্সাকেই একমাত্র প্রণোদক শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভোগের আদর্শ ছিল অন্যরূপ—অনেকটা Epicurean আদর্শের মত, যে-আদর্শে 'ত্যাগেন ভুঞ্জীথাঃ' এই অমোঘ বাণীই অজ্ঞাতে মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল। Marxist-গণ কিন্তু অত কাঁচা ছেলে নন। তাঁহাদের ভোগলিপ্সা হইল রীতিমত দৈহিক ভোগলিপ্সা, এবং জড়শক্তির দ্বারা প্রবুদ্ধ সেই দৈহিক ভোগলিপ্সাই তাঁহাদের মতে একমাত্র শক্তি, যাহা মানুষকে কর্মপথে প্রবর্তিত করিতেছে। সুতরাং Marxist ধর্মের প্রকৃত নাম হওয়া উচিত—Animistic Materialism। পাছে কেহ ভুল করিয়া বসে যে Marxist ভোগলিপ্সা নিছক দৈহিক ভোগলিপ্সা নহে, এই ভয়ে Marxist-গণ অনবরত 'Materialist' কথাটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাঁহাদের এই দৈহিক ভোগলিপ্সা যে প্রকৃত পক্ষে আধিভৌতিক, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা আর একটি magic word ব্যবহার করিয়া থাকেন,—সেটি হইল 'Dialectic'! 'পাথর বাটি' কথাটা বড়ই শ্রুতিকটু,—এতই শ্রুতিকটু যে এরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু বিশেষণরূপে 'সোনার' কথাটি ব্যবহার করিলে কেমন হয়! ঠিক এই মনোবৃত্তি হইতে Marxist-গণ তাঁহাদের Materialism-এর মুখরক্ষা করিবার জন্য বিশেষণরূপে 'Dialectical' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন।—Marxian Dialectic-এর আলোচনা কিন্তু প্রবন্ধান্তরে করিতে হইবে। আপাতত এ-সম্বন্ধে এইটুকু বলিয়া রাখাই যথেষ্ট যে লেনিন যে গ্রন্থে† জড়বাদ বিসর্জন দিয়া Bolshevik পার্টির প্রোগ্রাম নির্ধারণ করেন, সেই গ্রন্থে 'Dialectic' কথাটি কোন magical sense-এ ব্যবহৃত হয় নাই।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেকে নিজের অধীন করাই যদি স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হয়,

---

* Utilitarian-গণ পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা Bentham-এর মতেরই কেবল উল্লেখ করিতেছি।

† ইহাই সর্বসম্মতিক্রমে লেনিনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, নাম "What to do"। বইটি নাকি আজকাল আর পাওয়া যায় না। বইটির ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে কিনা জানি না। আমার নিকট কেবল ফরাসী অনুবাদটি আছে।

সুতরাং Marxist-দের মত যাহারা Materialist Animism-এ বিশ্বাসবান, তাহাদের মনে যে স্বাধীন হইবার স্বতঃপ্রবৃত্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। Animism যাহাদের ধর্ম, স্বাধীনতা অবশ্যই তাহাদের নিকট taboo। এই কথা স্মরণ না রাখিলে Marxist সম্প্রদায়ের High priest সেই unconscious humourist, Plekhanov এর এই উক্তিটির প্রকৃত অর্থ বুঝা যাইবে না: "by submitting to nature, [man] increases his power over nature"।* যাহারা জড়শক্তির দাসত্ব স্বীকার করা ছাড়া আত্মোন্নতির অপর কোন পন্থাই কল্পনা করিতে পারে না, তাহারা যে নরশক্তির দাসত্ব সর্বাগ্রে স্বীকার করিবে তাহা সুস্পষ্ট, এবং ইহাও সুস্পষ্ট যে যে-পদার্থ তাহাদের মনে সর্বাপেক্ষা ভীতির সঞ্চার করিবে তাহা হইল স্বাধীনতা। শুধু তাহাই নয়, ভীতিগ্রস্ত সকল মানুষই যেমন সর্ববিধ নীচবৃত্তির দাতক হইয়া পড়ে, Marxian animist-গণও যে সেইরূপ স্বাধীনতার আতঙ্কে ঘৃণ্যতম কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এইবার বুঝা যাইবে ভারতীয় Marxist-গণ কেন চিরদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করিয়া আসিয়াছে। যে-স্বাধীনতার নামে Marxian animist-দের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসে, সেই স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করে এই কংগ্রেস, এবং সেই সংগ্রাম আবার কংগ্রেস যে নিষ্কামভাবেই করিয়া থাকে তাহারও ভীতিপ্রদ প্রমাণ বর্তমান, কারণ Wavell parley-র সময়েই কংগ্রেসের নেতৃগণ কংগ্রেসের অস্তিত্বের অবসান ঘটাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এহেন যে কংগ্রেস, তাহার ধ্বংসসাধনে যে Marxian animist গণ বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিবে তাহাতে কি বিস্ময়ের কোন কারণ আছে? বিস্ময় উপস্থিত হয় কেবল ইহারা যে নীচতার পরিচয় দিয়াছে তাহার গভীরতা লক্ষ্য করিয়া। Weimar constitution-এর অক্ষর মাত্রও লঙ্ঘন না করিয়া যেরূপে

---

* Plekhanov-এর প্রতি এই শ্রদ্ধাহীন ভাষা প্রয়োগ করিতেছি বলিয়া আমার Marxist বন্ধুগণ আশা করি ক্ষুণ্ণ হইবেন না। তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, বাতুলালয়ের অধিবাসী নয় এমন কোন ব্যক্তি কি বলিতে পারে "Eleutheropoulos is acquainted with Marxian historical materialism, but his acquaintance is altogether inadequate, as is shown by the fact that he wants to rectify it after his own fashion"? এই কথা কিন্তু Plekhanov বলিয়াছেন (Fundamental Problems of Marxism, p. 67)। শুধু তাহাই নহে, Plekhanov-এর গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠাতেই প্রায় এই ধরনের কথা পাওয়া যায় যাহা হইতে বাস্তবিকই মনে হয় যে, "Plekhanov was a clown posing as a prophet"। এই উক্তিটি আর কাহারও নয় আমারই, Plekhanov-এর বই পড়িবার সময় পৃষ্ঠাপ্রান্তে একাধিকবার না লিখিয়া থাকিতে পারি নাই।

নাৎসিগণ দ্বিতীয় Reich ভিতর হইতে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপে ভিতর হইতে কংগ্রেসের ধ্বংসসাধন করাই ভারতীয় Marxist গণের সুস্পষ্ট দুরভিসন্ধি। কংগ্রেসের উদারতার-সুযোগ লইয়া এইরূপে কংগ্রেসেরই অনিষ্ট সাধনে তৎপরতা দেখানো এতই নীচ অন্তঃকরণের পরিচায়ক যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এই নীচতার তুলনা মিলিবে কিনা সন্দেহ। Voltaire-এর মত কোন ব্যক্তি আজ ভারতে থাকিলে Church-এর পরিবর্তে এই Marxism লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই তিনি বলিতেন : écrasez l'infame অর্থাৎ "ধ্বংস কর এই পাপ"! গান্ধীজীর লোকোত্তর প্রীতিধর্ম যেরূপ supra-logical এবং সেইজন্য দুরাচরণীয়, ভারতীয় Marxist-দের এই অনসূয়ের নীচতাও সেইরূপ infra-logical এবং সেইজন্যই নরধর্মবিগর্হিত। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম যাহারা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া পশুত্ব বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহারা কখনই মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না। সুতরাং কংগ্রেসের মত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইতেও Marxian animist-দের নিষ্কাশন সর্বতোভাবে প্রয়োজন।

লেনিন অন্ততঃ শেষজীবনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর তবে প্রত্যেক জাতির সমাজতন্ত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, এবং এইজন্য তিনি ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। Borkenau মারফৎ কিন্তু আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, লেনিনের এই নীতির প্রতিবাদ করিয়াছিল ভারতেরই একজন স্বনামধন্য ex-communist, যে এখন ব্রিটিশ গভর্মেন্টের উৎকোচে ভীমবিক্রমে কংগ্রেসের বিপক্ষতা করিয়া জগৎসমক্ষে প্রমাণ করিতেছে যে, পাকা Marxist হইতে পারিলে জীবিকার কখনও অভাব ঘটে না। এই ব্যক্তিই যদি তাহার এক পুস্তকে Kant প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগকে 'Bourgeois' এবং ভারতের প্রাচীন মনীষীদিগকে 'ন্যাঙ্গোটা বাবা' বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিয়া থাকে তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই, কারণ বৃক্ষশাখা হইতে মানুষের প্রতি একবার দন্তবিকাশ করিয়া বানরেই কেবল মনে করিতে পারে যে দ্বিপদ জাতিটার বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া লওয়া হইয়াছে। এই ধরনের লোকের পক্ষে মার্ক্সবাদ কেন কোন বাদই যে বুঝিতে পারা সম্ভব নয় তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহারাই আজ অসংখ্য penny-pamphlet প্রচার করিয়া বাংলার তরুণ ছাত্র ও ছাত্রীদের মনে Marxian animism-এর উৎকট বিষ প্রবেশ করাইতেছে। "ভারত উদ্ধার বা চারি আনা মাত্র" বাংলা দেশে এক সময়ে একটা রহস্যের বিষয় ছিল ; আজ কিন্তু দেখিতেছি যে "মার্ক্সবাদ বা চারি আনা মাত্র" রীতিমত একটি সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। লেনিন যে "infantile disease of leftism"-এর কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহারই সুযোগ লইয়া ভারতীয় Marxist-গণ তাহাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমার আশা

আছে যে, বাংলার তরুণ সমাজ এই ঘৃণ্য Marxian animism-এর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিবে, কিন্তু leftism কখনও পরিত্যাগ করিবে না। যে-leftism কেবল Marxian animism-এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ তাহাই শুধু disease, নতুবা leftism সর্বদেশে সর্বযুগে স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ।

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, sabotage movement-এ কমিউনিষ্টরা যোগ দেয় নাই বলিয়াই কংগ্রেস তাহাদিগকে দোষী করিতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রিটিশ গভর্মেণ্টও কংগ্রেসকে প্রত্যক্ষভাবে sabotage-এর জন্ত দায়ী করিতে সাহস করে নাই, কিন্তু কমিউনিষ্টরা তাহাই করিল। পরোক্ষভাবে কংগ্রেস যে এই sabotage-এর জন্ত দায়ী তাহা অবশ্যই সত্য, এবং কংগ্রেসের নেতৃগণ সে দায়িত্ব অস্বীকারও করেন নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, কেবল গভর্মেণ্টকে sabotage করাই অপরাধ, আর কংগ্রেসকে sabotage করা অপরাধ নয়? কংগ্রেসের ভিতর হইতে যে-সব কমিউনিষ্ট কংগ্রেসকে sabotage করিয়া আসিয়াছে, তাহারা John Amery অপেক্ষা কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ?—কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে অনেক নিঃস্বার্থ ব্যক্তি আছেন আমি জানি এবং তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাও করিয়া থাকি। কিন্তু মার্ক্সীয় জড়বাদের ভূত তাঁহাদের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া আছে এবং এই ভূত তাঁহাদিগকেও ঘৃণ্যতম কার্যে প্রবর্তিত করিতেছে, যদিও এই কার্য তাঁহারা পরমার্থ জ্ঞানেই করিতেছেন। জড়বাদ যে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে opportunism ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি। পরিতাপের বিষয় এই যে কমিউনিষ্ট পার্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও জড়বাদী হওয়ার ফলে ঘৃণ্যতম সুবিধাবাদীতে পরিণত হইয়াছেন। ইংরেজের যুদ্ধকে ভারতের জনযুদ্ধরূপে প্রচার করিয়া কমিউনিষ্টগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা Churchill প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের খিদ্‌মৎগার। আমি বলিতেছি না যে ফ্যাশিষ্ট-শক্তির বিরুদ্ধে ইংরেজকে যুদ্ধ করিতে সাহায্য করাই কমিউনিষ্টদের পক্ষে অন্যায় হইয়াছে, কারণ ভারতের স্বাধীনতা লাভ অপেক্ষাও ফ্যাশিজ্‌মের ধ্বংসসাধন—অন্তত কমিউনিষ্টের নিকট—অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ইংরেজের যুদ্ধকে ভারতের জনযুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়া কমিউনিষ্টগণ যে কলঙ্ক অর্জন করিয়াছেন, অনন্তকালেও তাহার কালিমা দূর হইবে না। ভারতবাসী—অর্থাৎ কংগ্রেস—ইংরেজকে সাহায্য করিতে শুধু প্রস্তুত নয় উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল, কিন্তু কেবল এই শর্তে যে ইংরেজকে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে যে-ভারত সাহায্য করিবে সেই ভারতও যেন সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন হয়। ইংরেজ কিন্তু এই শর্তে রাজি হয় নাই। অর্থাৎ ইংরেজ প্রত্যুত্তরে প্রকারান্তরে ইহাই বলিয়াছিল "আমরা জার্মানির অধীন হইব সে-ও ভাল তবু তোমাদের স্বাধীন হইতে দিব না।" ইহার পর কোন ভারতবাসীর কি ইংরেজের

সহিত কোন বিষয়ে সহযোগিতা করা সম্ভব? ইচ্ছা থাকিলেও কংগ্রেসের এ-ক্ষেত্রে ইংরেজকে সাহায্য করার উপায় ছিল না। কমিউনিষ্টরা কিন্তু তাহাই করিয়াছে। এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা জগৎসমক্ষে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, যে-ইংরেজের নিকট ভারতবাসী cat's paw ভিন্ন আর কিছুই নয়, সেই ইংরেজ প্রধানত আপনার সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য যে-যুদ্ধ করিতেছে, সেই যুদ্ধকেই ভারতীয়গণ নিজেদের জাতীয় যুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। তাই বলিতেছি, ভারতীয় কমিউনিষ্টদের এই কলঙ্ক অনন্তকালেও ঘুচিবে না।

কিরূপে কমিউনিষ্টদের এই ঘৃণ্য মনোবৃত্তি সম্ভব হইয়াছে? আমার বিশ্বাস Marxian materialism (=materialist animism) ইহার একমাত্র কারণ। Animist কখনও স্বাধীন হইতে পারে না, স্বাধীনতার চিন্তাও তাহার মনে আসা অসম্ভব, কারণ ইচ্ছাশক্তি যাহার মতে কেবল জড় প্রকৃতিতেই সম্ভব, তাহার পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব যে, তাহার নিজের কোন ইচ্ছা আছে, এবং যাহার নিজের কোন ইচ্ছা নাই সে নিজের অধীন হইবে কিরূপে? সুতরাং স্বাধীনতা যাহার ঈপ্সিত, তাহাকে মার্ক্সবাদ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। এবং কোন মার্ক্সবাদী যদি কখনও বলে যে, স্বাধীনতা তাহার ঈপ্সিত তখনই বুঝিতে হইবে যে, সে মিথ্যা কথা বলিতেছে।

স্বাধীনতার কথা কেবল সে-ই বলিতে পারে, যে বিশ্বাস করে যে, ইচ্ছাশক্তি তাহার নিজের মনেই বর্তমান, এবং সেই শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষমতাও তাহার নিজের মধ্যেই আছে। যে-মানুষ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজেকে নিজের অধীন করিয়াছে সে-ই কেবল—সেই ইচ্ছাশক্তিরই সাহায্যে—নিজের অধীনতার অবসান ঘটাইতে পারে, এবং বাস্তব জগতে স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝায় বা বুঝানো সম্ভব, তাহা নিজের ইচ্ছায় নিজের অধীনতার অবসান ঘটানো যে সম্ভব এই বিশ্বাস ও অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে; কারণ স্বাধীনতাকামী বাস্তবিকই কখনও স্ব-এর অধীনতারও অবসান ঘটাইতে পারে না, যেহেতু স্ব-এর অধীনতার অবসান স্বাধীনতার অবসানেরই নামান্তর। এবং যে-সমাজে প্রত্যেক মানুষ সমান অনুপাতে—অবশ্য সমান পরিমাণে নয়—নিজেকে নিজের অধীন করিতে সমর্থ হইয়াছে কেবল সেই সমাজই সমসমাজরূপে গণিত হইবার যোগ্য, কারণ মানুষ যখন অসমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, তখন সাম্যের অপর কোন মাপকাঠি সম্ভব নয়। সুতরাং যে সমাজে দেখিব, যে-যত বড়, সামাজিক দায়িত্ব তাহার তত বেশি, এবং যে যত ছোট, সামাজিক দায়িত্বও তাহার তত কম,—সেই সমাজকেই সমসমাজ বলিয়া স্বীকার করিব। যত দূর জানি, একমাত্র রাশিয়াতে এই ধরনের সমসমাজ কিয়ৎপরিমাণে গড়িয়া উঠিয়াছে, কারণ অপর সমস্ত দেশে ক্ষমতা যাহাদের যত বেশি দায়িত্ব তাহাদের তত কম।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীহর্ষ

শ্রীহর্ষ মিরাটে চাকরি করত। যেটুকু সময় বাসায় থাকত, প্রভাবতীর চাহিদা থেকে বাঁচবার আশায় মাথা গুঁজে সাহিত্যচর্চ্চা করত, গল্প লিখত। ক্রমে কিছু অভ্যাসও হয়ে গিয়েছিল। তিনি পেড়াপিড়ি করলে, হাসিমুখে বলত, যদি উতরে যায়, মোটা টাকা পাবার মওকা ছাড়ি কেন? বড় মেয়ে বিভার বিবাহকাল আসন্ন, তার ভাগ্যে যদি মেলে,—ইত্যাদি। কথাটা কাজ দেয়।

বিভাও তেরো বছর উত্তীর্ণ, শ্রীহর্ষকে সেই চেষ্টায় বাড়ি আসতে হয়েছে। কলকাতার ফুটপাথে বাল্যবন্ধু কেশবের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। কথা কইবার আগেই কেশব-তাকে জড়িয়ে ধরলে, অ্যাঁ, বেঁচে আছিস? এক যুগ পেরিয়ে গেছে যে! আমি বলি বুঝি—

শ্রীহর্ষ বললে, তার উপায় নেই কেশব! মিরাট যে বিখ্যাত 'স্যানাটোরিয়ম', বিরাট স্বাস্থ্যকর শহর, তা কি জানতুম? জ্বরেরও দেখা নেই, মৃত্যুও খোঁজবার সুবিধে পায় না। তারও যে অবলম্বনের অভাব। দেখ না, পাঁচ-পাঁচটি মেয়ে, সবগুলিই addition-দুরন্ত, subtraction জানে না। সব বেশ আছে। বেশ নেই কেবল আমি, অবশ্য শরীর দেখলে বুঝতে পারবে না। প্রভাকে একদিন বলতে শুনলুম না, অম্বল কি বুকজ্বালা। সব জ্বালাটা একাই ভোগ করছি যে ভাই। এই অবস্থা।

শুনে কেশব অবাক। —যা শোনালে তাতে দুঃখের তো কোন স্পর্শ পেলুম না ভাই। সবই তো "মধি" লিখিতের ওপর যায়, and most desirable too—

শ্রীহর্ষ বললে, কিন্তু আসল সুখের কথাটা যে শোন নি, যেটা কেরানির মূলধন;— মাইনে হে! সাত বছর থেকে আমাকে সেই যে বাটের লাট বানিয়ে রেখেছে, কখনও একবাট্টি গুনতে বা আনতে দিলে না। প্রভা বিশ্বাস করে না। দশ তারিখের পর মুদির দয়ায় চলে যে ভাই। সে দয়ার দান ক্রমে ভিটেটায় টান দিয়েছে—হাজার দেড়েক পাবে। আরও একটা ভয়ঙ্কর desirable আছে। মিরাটের জলের গুণ এমন, এক গেলাস খেলেই খিদে। জলটা খাওয়া ছেড়ে দিতে হয়েছে ভাই—

কেশব বললে, ও হয় হয়, অমন হয়েই থাকে। ওটা শহরে এসে নতুন বাড়ি বানাবার সূচনা। ও না হ'লে তালুক থেকে ফিরে, দেশে এসে, কোন্ প্রভাবতী ঘোমটা টেনে সেই এঁদোপড়া গাঁয়ের ডোবায়, 'পানা' ঠেলে বাসন মাজতে বসত, সেটা ভেবেছ কি? Impossible—

শ্রীহর্ষ বললে, ভেবেছি বন্ধু, ভেবেছি। তাই দেশে আসবার পথে, আমাদের সেরা তারণ-তীর্থ গয়াটা সেরে ফিরেছি।—নিজের পিণ্ড নিজে দিলে শুনেছি নাকি, বছরের মধ্যেই রেহাই, স্বর্গ লুফে নেন। হেসো না, শাস্ত্রবাক্য। সর্ব্বাগ্রে পিণ্ডটা বাবাকেই দিলুম। দেখলুম, সত্যাই জ্যান্ত তীর্থ যে ভাই। কানের কাছে স্পষ্ট শুনলুম, বাবা বলছেন, কিছু বলবার থাকে তো এই বেলা বল, পাঁচ মিনিটের বেশি সময় পাব না।

বললুম, কি ভেবে ছেলের নাম শ্রীহর্ষ রেখেছিলে, ব'লে যাও বাবা, সদাই বড় বিমর্ষে থাকি। তোমার দেওয়া নামের সম্মান রাখতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। মিছে হাসি-মুখ আর কত থাকব! মিথ্যা "হর্ষ-এর" অভিনয়ে পাপের ভার যে বিষম বেড়ে চলেছে, বইতে পারছি না। শুনে বাবা বললেন, এ চিন্তা তোর ঘটে এল কি ক'রে? কে আনিয়েছে? এক যুগ সোনামুগ চালিয়ে, কপির ফুল আর ল্যাংড়া-বোম্বাই খেয়ে, আন্দুরে ফজলি মেরে, বাপকে আজ দু পয়সার ছোলার ছাতু খাওয়াতে এনেছ রাস্‌কেল? তোর জুতোর ব্রঙ্কো লাগাবার খরচটা কত ছিল রে পাজি? আজ বিমর্ষ করেছে কে? ইংরিজী-স্কুলে পড়িয়েছিলুম, তাই অনেক ভেবেই আমি তোর শ্রীহর্ষ নাম রেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, সহজেই বুঝে নিবি। Law-year-এর মেয়ে 'লাক্‌সরির' লোভে বুঝতে হয় নি। বুঝলে আজ ভিটে বেচতে যেতে হ'ত না।

বললুম, না বাবা, তাঁকে মিছে দুষছেন, তিনি এ সব কথা কিছু জানেন না। আমি একাই সই আর বই।

বাবা বললেন, That's like a good boy, এই তো পুরুষের কাজ। তাঁদেরও কি কম বইতে হয়! গিনি-গোল্ডের হারের ওজন বেড়েই চলেছে। বইবার তো সীমা আছে! বিবেচক আর কাকে বলে! তোর মার গলায় একটা তাঁবার মাদুলি, দেড়-হাত সুতোয় ঝুলত। সুতোর ওজন আর কত, তাই বুঝি নি। যাক, নামটা কেন রেখেছিলুম শুনে রাখ। ইংরিজীতে হর্ষ (horse) মানে ঘোড়া, অশ্ব, যাদের ছোলা বা ছোলার ছাতু পরম প্রিয়, যেমন পুষ্টিকর তেমনই বল-বর্দ্ধক। দুষ্প্রাপ্যও নয়, দুর্মূল্যও নয়। আমারই ভুল, বাঙালীর ছেলের এমন স্থূল বুদ্ধি জানলে, 'অশ্বঘোষ' নামটাই রাখতুম।

বললুম, অমন পাঁচমিশেলি নাম বুঝব কি ক'রে বাবা!

বললেন, সে কি রে? ভেজাল ছাড়া আজকাল কোন বস্তু আছে? 'Victoria, লিলিবালি', মেরি শুনিস নি? Anglo vernacular যে অস্থিমজ্জায় ঢুকেছে। তাই ভেবেছিলুম, যে দুর্দ্দিনের আভাস পাচ্ছি, বাঙালী অনাহারে অপঘাৎ এড়াতে চায় তো ছোলার ছাতুই তার একমাত্র উপায়, তাই ওই সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়েছিলুম। বোঝে তো অন্তত কাচ্চা-বাচ্চাদেরও কাঁচ্চা পরিমাণেও অভ্যাস করাবে। বাংলার ভাগ্য তখন ভোজনে-ওজন ঠেলে চলেছে। দেখে ভয় পেয়েছিলুম। ডিম আর মাংসই তখন বংশ-লোপের টোপ ফেলেছে। শেষ, খাবার উপকরণ, 'খাবি'টাই ছিল।

আজ বিমর্ষের কারণ ঘোচাতে সোজা পথে গয়ায় এসেছ, তেরো বছর পোলাও মেরে ছাতুটা বুঝি বাপের জন্যে তুলে রেখেছিলে, দু'পয়সায় আজ কর্ত্তব্য সারতে এসেছ, মরা

মানুষকে খাইয়ে? আজ ছাতুর ওপর অসম্ভব আস্থা যে দেখছি! কেন? মরা বাপকে গেলাবে ব'লে? না নিজের রেহাই পাবার চাড়ে?

বললুম, তোমার কাছে আর মিথ্যে কথা কইব না, তুমি তো পাওনাদার নও।

বাবা বললেন, তা জানি রে রাস্কেল, দামটা দু টাকা হ'লে কি আর পেতুম? দু-পয়সায় মেলে ব'লেই ওটা উদ্ধারের পথ হয়ে আছে। বহুকালের এই প্রাচীন ইঙ্গিৎটা বোঝ না? কেউ ভাবে কি, 'পিণ্ডিটা' ছাতুর হ'ল কেন? ওটি যে-সে বস্তু নয়, দু পয়সায় দিন চলে, বউমাদের এক ডাঁই বাসন মাজতে, এক কাঁড়ি কুটনো কুটতে আর ডাল ভাল মসলা বাটতে হয় না। সারা দিন রান্নাঘরের ধোঁ খেতেও হয় না, অনটনের চিন্তাও থাকে না। দেশে আধ কোটী লোক অন্নাভাবেও মরে না।

এখনও বুঝলে বাংলা দেশ বাঁচতে পারে। ওতে ভেজাল নেই। বুদ্ধিজীবী বণিকদের 'হর্লিক্'টা কি, 'বার্লি'টা কি? একটু ভেবে দেখিস; সে ওই ছাতুরই চাতুরি! বাঁচতে ও দেশকে বাঁচাতে চাস তো, এখনও ছাতুর শরণ নে; বাংলাকে আবার "সোনার বাংলা" বলবার অধিকার পাবি। নচেৎ ওই ফুটপাথ পাতাই আছে, "মহাজনো যেন গতঃ",—চললুম। বাবা চ'লে গেলেন। আমাকেও ভাবিয়ে গেলেন।

আমিও স্বচক্ষে দেখেছি কেশব, ও প্রদেশে মোটা ময়লা কাপড় পরা, বড় বড় মহাজনেরা, কোমরে না হয় পাগড়িতে লাখ টাকা বেঁধে কোর্টে মামলা-মকদ্দমা করতে আসে। উকিলরা পঁচিশ পঞ্চাশ যা ফী চায়, দেয়। গামছায় বাঁধা থাকে, ওই ছাতু আর একটু গুড়। একটা কুয়োর ধারে ব'সে সেই দু পয়সার ছাতু হৃষ্টমুখে খায়, গামছাখানা ধুয়ে ফেলে। বাস, সারাদিনের মত ছুটি।

কেশব বললে, কলকেতায় জেটিতে কুলি-মজুরেরাও ওই কাজই করে। তারা তো করবেই। আমরা আলবৎ বিশ-ত্রিশ টাকা বেতন পেলেই 'রেস্তোরাঁ' খুঁজি। তারপর, ধার করা টাকা ছুটো রেস্তোরাঁর মালিকের ট্যাঁকেই যায়। পরে সিজার মার্কা, made in London, সিগারেট বার করে, ধোঁ দেখি। কি আরাম! বাড়িতে পাওনাদার এলেই, খিড়কির দোর আছে, সদরে কাবলেওলাও ঘোরে। সত্য কথা সবারই জানা আছে দাদা, বড় রূঢ় লাগে, থাক্।

শ্রীহর্ষ কেশবকে বললে, বাবা আর একটা কথাও বলেছিলেন। আধ কোটী ভাই অন্নাভাবে ম'রে যায় কেন? তোদেরই পাপে। সেটা কোনদিন ভাবিস কি? ভাবিস না বলছি না, ভাবিস বইকি। দেখেছি সেটা কবিতায় ফোটে; সোনার কাটারির মত, তাতে কাজ হয় না। পদ্যের মিল খুঁজতে মিছে ঘাম ছোটে মাত্র। ভাবিস বইকি। তবু স্বরাজ আসছে না, কম দুঃখু কি? ওরে, ভগবান অত মুখ্খু নন। না খেয়ে একটা দিন দেখ্ না, কি ক'রে ভায়েরা মরেছে।

কেশব বললে, স্বীকার করি পথটা ঠিকই পেয়েছ, কিন্তু blind lane, অন্দরে পৌঁছেই তার সমাপ্তি। তারা কেন ছাতু খেতে যাবে, বিয়ের মন্তরে তা তো বলে নি!

এখন থাক্ ভাই, বেলা হয়েছে, চল গলদাচিংড়ি নিয়ে বাসায় ফেরা যাক, বেলায় মাছ পড়ে যাবে। কথা আবার বৈকালে হবে, ওই নিয়েই তো থাকা ও বাঁচা, সেটা ফুরিয়ে ফেলা কিছু নয় হে।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনপদ

সাত

উনিশ শো পাঁচ সাল। বঙ্গব্যবচ্ছেদকে উপলক্ষ্য ক'রে অকস্মাৎ দেশময় একটা সাড়া জেগে উঠেছে। ঘুমন্ত জীবের ধমনীতে অপূর্ব্ব কৌশলে ছিদ্র ক'রে এক শ্রেণীর বাদুড়ে রক্ত পান করে, ঘুমন্ত জীব রক্তক্ষয়ে দুর্ব্বলতার জন্য একটা অশান্তি অনুভব করে, দুঃস্বপ্নাতুরের মত ঘুম ভেঙে উঠতেও চায়, কিন্তু উঠতে পারে না; সে সময় যদি কৌশলী বাদুড় কৌশল ভুলে চঞ্চুর আঘাত করে দেহে, তবে সে আঘাতে জীব যে বেদনা, যে জ্বালা, যে ক্ষোভ নিয়ে চীৎকার ক'রে জেগে ওঠে, বঙ্গব্যবচ্ছেদের জাগরণ ঠিক সেই ধারার জাগরণ। সে জাগরণের কথা পৃথিবীর ইতিহাসে আজ গণ্য হবার মর্য্যাদা লাভ করে নাই, কিন্তু সরকারী রিপোর্টে আছে। এ দেশের ঐতিহাসিকেরাও সে তথ্য সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন। একদিন সে জাগরণের কাহিনী প্রকাশিত হবে। মানুষের মুখে মুখে পুরুষানুক্রমে তার কাহিনী প্রবহমান হয়ে চলেছে। এ গ্রামের রাধাকান্তবাবু নিয়মিত জীবনের দিনলিপি রেখে থাকেন, তিনিও লিখে রেখেছেন।

এর জন্য সরকারও সজাগ এবং তৎপর হয়ে উঠেছেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদের টুর-প্রোগ্রাম বেড়েছে। আগে সাধারণতঃ এস. ডি. ও. সাহেবরাই আসতেন, যেতেন; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মহাশক্তির রহস্যের মত অদৃশ্য এবং দুর্ল্লভ ছিলেন; কদাচিৎ বর অভয় করবার নিমিত্ত, অথবা দেবলোকে দানবোত্থানের মত কিছু সমুপস্থিত হ'লে তাকে দমনার্থ আবির্ভূত হতেন। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মোটর ছিল না, রেল-লাইন জেলাটার মধ্যে সবে একটা ছিল, কাজেই ছ্যাকরা-গাড়িতেই যাতায়াত করতে হ'ত। এই থানার পাশে শঙ্করপুর থানা, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শঙ্করপুর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। পথে এই গ্রামপ্রান্তে নদী। নদী পার হয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা সড়ক চ'লে গিয়েছে সদর শহরে। নদীর ঘাটে সাহেবের গাড়ি ভেঙেছে। সাহেব এসে ঢুকলেন এই গ্রামে।

পথে স্বর্ণবাবুর বাবার প্রতিষ্ঠিত এম. ই. স্কুল দেখে ঢুকে পড়লেন। বেহার প্রদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশীয় ব্যক্তি, আই. সি. এস.। সম্ভ্রান্তদর্শন চেহারা, সর্ব্বোপরি জবরকালো

একজোড়া গোঁফ। হেডমাষ্টার তাঁকে দেখেই তটস্থ নয়, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কুর্নিশের মত আভূমি-নত সেলাম জানিয়ে সত্য সত্যই হাতজোড় ক'রে দাঁড়ালেন।

সাহেব বললেন, আমি এ জেলার কালেক্টার এবং ম্যাজিষ্ট্রেট। তুমি হেডমাষ্টার?

হেডমাষ্টার কেঁপে উঠলেন, তাঁর গলা শুকিয়ে গেল, কোন রকমে শুষ্ককণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, আই হ্যাভ দি অনার টু বি স্যার, ইয়োর মোষ্ট ওবিডিয়েন্ট সার্‌ভেণ্ট।

ধন্যবাদ তোমাকে। আমি তোমার স্কুল দেখতে চাই।

হেডমাষ্টার করতলযুগল প্রসারিত ক'রে পথ দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন ভিতরে।

স্বর্ণবাবুর অবস্থা খারাপ না হ'লেও, সচ্ছলতার সমস্তটুকুই এখন ব্যয়িত হচ্ছে, তাঁর জ্ঞাতি এবং সন্ত-উদীয়মান ধনী গোপীচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতায়। মামলা-মকদ্দমা দিয়ে মালা গাঁথা যায়। স্কুলটা স্বর্ণবাবুর বাড়ির সীমানার মধ্যেই, তাঁর কাছারি এবং বৈঠকখানার সামনেই, তবুও তাঁর সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশও নাই, সামর্থ্যও নাই। স্কুলের আসবাবপত্র ভেঙেছে, চেয়ার-বেঞ্চগুলোর অধিকাংশই নড়ে, ব্ল্যাকবোর্ডগুলোর রঙ নষ্ট হয়েছে, দেওয়ালের চুন উঠে গিয়ে তৈলাক্ত টাক-পড়া মাথার মত মনে হচ্ছে, অনেক জায়গায় পলেস্তারা উঠেছে, খড়ের চাল থেকে ছাওয়ানো-অভাবে সারি সারি জলের ধারা প'ড়ে সারা দেওয়ালটাকে তার উপর কর্দ্দমাক্ত ক'রে তুলেছে। কিন্তু ছেলের সংখ্যা কম নয়।

সাহেব বিস্মিত হয়ে নোট-বই খুলে এ গ্রামের তথ্যগুলির উপর চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন, তাতেও তাঁর বিস্ময় কাটল না।

প্রাচীন জমিদারপ্রধান গ্রাম, ধনের খ্যাতি আছে, খ্যাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। সভ্য সমাজ। তিনি প্রশ্ন করলেন, হেডমাষ্টার, এমন গ্রামে স্কুলের অবস্থা এমন কেন?

হেডমাষ্টার সবিনয়ে বললেন, হুজুরের কৃপাদৃষ্টি হ'লে অবস্থা এখুনি ভাল হবে।

সাহেব তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, গভর্মেণ্ট অবশ্যই তাঁর কর্ত্তব্য করবেন; এবং আমি আশা করি, এখনও করেন। গ্র্যাণ্ট পাও নিশ্চয়।

পাই। কিন্তু অত্যন্ত অল্প।

বাকিটা স্থানীয় লোকেরা দেবে।

হেডমাষ্টার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন

স্কুলের ফাউণ্ডার কি দেন?

আগে সবই দিয়েছেন, যখন যা অভাব হয়েছে যুগিয়েছেন, কিন্তু এখন অবস্থা তাঁর পূর্ব্বের মত নাই, নানা কারণে তিনি এখন বিব্রত। কথা অসমাপ্ত রেখেই তিনি চুপ করলেন। বাকিটা বুঝে নিতে সাহেবের কষ্ট হ'ল না।

এখানে অনেক সম্রান্ত লোক আছে শুনেছি, তারা কেউ দেয় না কেন?

হেডমাষ্টার মাথা চুলকাতে লাগলেন। অবশেষে বললেন, তাঁরা এ বিষয়ে উদাসীন। হুজুর, এই এতগুলি ছেলে পড়ে স্কুলে, তার মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেদের বেতনই নিয়মিত পাই না।

সাহেব একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে হেসে বললেন, সেটাতে এরা ধারে ছেলে পড়াবার একটা গৌরব অনুভব করে। ওতে এদের ক্রেডিট বাড়ে ব'লে মনে করে। তোমরা কখনও সাহায্য চেয়েছ?

হেডমাষ্টার বললেন, চাই নি এমন নয়। তবে—

তবে খুব আর্নেষ্টলি চাও নি, কেমন?

হেডমাষ্টার চুপ ক'রে রইলেন।

সাহেব একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আমি যদি চাঁদা আদায় ক'রে দিই? মাষ্টারের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তোমাদের ফাউণ্ডার-প্রোপ্রাইটারের নিতে আপত্তি হবে না তো?

হেডমাষ্টার বললেন, তাঁকে খবর পাঠিয়েছি সার, তিনি আসবেন এক্ষুনি।

সাহেব পা দুলিয়ে বললেন, আমি এই সব লোকগুলকে জানি হেডমাষ্টার। এরা হচ্ছে ফাঁকা ড্রামের মত দাম্ভিক।

হেডমাষ্টার কোন উত্তর দিতে সাহস করলেন না।

সাহেব একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, এখানকার ইয়ং জেনারেশন কি রকম? তারা রটন 'বন্দে মাটরম্' করে না? বিলাতী কাপড় পুড়িয়ে বন্‌ফায়ার করে না? নিজেই ব'লে উঠলেন—প্রশ্ন-শেষের এক মুহূর্ত্ত পরে, ইয়েস—ইয়েস। বন্‌ফায়ার করেছিল এখানে। পুলিস রিপোর্ট পেয়েছি আমি।

হেডমাষ্টার বললেন, সে সব অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার। সে সব এখানে কিছু নাই।

আমি আশা করি তাই। বিশেষ ক'রে আমি রয়েছি এ জেলায়।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন, শোন হেডমাষ্টার! গবর্মেণ্ট সব করতে প্রস্তুত তোমাদের জন্যে। আমি দেখব, যাতে তোমাদের গ্র্যাণ্ট বাড়ে। আমি গ্রামে স্থানীয় লোকদের কাছে সাহায্য আদায় ক'রে দেব। কিন্তু—। কিন্তু তুমি দেখো, (But you see) এই ছেলেদের সংশিক্ষা দিতে হবে তোমাদের। এই সব রটন খিংস—হুজুক, এতে যেন তারা না মাতে, ওদিকে তাদের টেণ্ডেন্সি না যায়।

বার কতক চুরুটে টান দিয়ে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এ গ্রামের সবচেয়ে অর্থশালী ব্যক্তিটি কে?

হেডমাষ্টার বললেন, বাবু গোপীচন্দ্র ব্যানার্জি।

জমিদার?

জমিদারি তিনি সম্প্রতি কিনেছেন বটে, কিন্তু জমিদার হিসেবে বড়লোক নন। তিনি মার্চেণ্ট।

মার্চেণ্ট? ধান-চালের ব্যবসা করে?

না সার্। তিনি কলিয়ারি-প্রোপ্রাইটার, কোল-মার্চেণ্ট। বাংলা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোল-মার্চেণ্টদের একজন।

সাহেব সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বল কি? তবে তো তার মূল্য লক্ষাধিক টাকা?

অনেক লক্ষ টাকার মালিক তিনি সার্।

স্বর্ণবাবু এসে সাহেবকে আভূমি-নত সেলাম ক'রে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যেই তিনি বাড়ির ভিতর গিয়ে জামা-কাপড় পাল্টে চোগা-চাপকান প'রে এসেছেন। মুখে বললেন, গুডমর্নিং সার্।

হেডমাষ্টার বললেন, ইনিই আমাদের প্রোপ্রাইটার এবং সেক্রেটারি।

সাহেব বললেন, গুডমর্নিং।

দারোগা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। বললে, হুজুরের কত দেরি হবে এখানে? আমরা ডাকবাংলোয় হুজুরের খানার সমস্ত ব্যবস্থা করেছি। জিনিসপত্র সেখানে পাঠিয়েছি, বাবুর্চী খবর পাঠিয়েছে—

ওয়েষ্ট-কোটের পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে সাহেব দেখলেন, উঃ, দেড়টা বাজে প্রায়। তিনি উঠলেন। হেডমাষ্টারকে বললেন, ভেবো না হেডমাষ্টার, আমি ব্যবস্থা করব একটা, আজই করব। স্বর্ণবাবুকে বললেন, স্বর্ণবাবু বিকেলে পাঁচটার সময় ডাকবাংলোয় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। সাবইন্সপেক্টর, তুমি গ্রামের জমিদার এবং ভদ্রলোকদের খবর দাও, সাড়ে-পাঁচটায় যেন আমাকে ডাকবাংলোয় সেলাম দেয়। হেডমাষ্টার, তুমি আমার সঙ্গে আসবে? আমি তোমাদের এই গোপীচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

স্বর্ণবাবু সেলাম জানিয়ে বললেন, আমি পাঁচটায় যাব। তিনি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। সাহেবের সঙ্গে কিছুদূর যাওয়াটাই বিধি, কিন্তু সে বিধি তিনি লঙ্ঘন করলেন। গোপীচন্দ্রের বাড়ি চলেছেন সাহেব, সেখানে যেতে তিনি বাধ্য নন।

গোপীচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণ চাটুজ্জের বাড়িতে। নায়েব হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গেল। সাহেব বারান্দায় একখানা চেয়ারে ব'সে ছড়িটা মেঝেতে ঠুকতে লাগলেন, দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ ছিল গোপীচন্দ্রের নবনির্ম্মিত ঠাকুর-দালান ও নাটমন্দিরের দিকে। হেডমাষ্টার দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মনে হ'ল, সাহেব যেন লাঠির প্রান্ত দিয়ে ঠুকে গোপীচন্দ্রের

কীর্ত্তির ভিতের দৃঢ়তা পরীক্ষা করছেন, যেমন ডাক্তারে বুকের উপর আংলের টোকা মেরে বুক পরীক্ষা করেন।

হঠাৎ সাহেব প্রশ্ন করলেন, এ সব তো তোমাদের দেবতাদের জন্তে করা হয়েছে?

হ্যাঁ সার্।

কি হয় এখানে? ফুল আর পাতা দিয়ে পূজো? ঢোল-ট্রাম্পেট-বেল্‌স বাজাও? নানা রকম সুখাদ্য খেতে দাও? কতগুলো গোট্‌স স্যাক্‌রিফাইস করা হয়? অনেক? না?

না, সার্। গোট্‌স এখানে স্যাক্‌রিফাইস করা হয় না। রাধাকৃষ্ণ—বৈষ্ণবের দেবতা—

আই সি। বৃন্দাবন—অ্যাঁ?

ইয়েস সার্।

এ সব তো খুব বেশি দিনের নয়। খুব সম্প্রতি হয়েছে, না?

হ্যাঁ সার্। বৎসর তিনেক বোধ হয়। এই নাটমন্দির শেষ হয়েছে সেদিন, সেভ্‌ন অর এইট মান্‌থ্‌স ওন্‌লি।

আর কি কীর্ত্তি করেছেন তিনি?

হেডমাষ্টার একটু ভেবে বললেন, আর? আরও দুটি শিব প্রতিষ্ঠা করেছেন, এখানকার সর্ব্বসাধারণের দেবস্থান মহাপীঠে দেবীর মন্দির ক'রে দিয়েছেন।

আর কি?

হেডমাষ্টার ব্যস্ত হয়ে বললেন, এই যে উনি আসছেন।

বিস্মিত দৃষ্টিতে গোপীচন্দ্রের দিকে চেয়ে রইলেন সাহেব। বাঙালীর মধ্যে এ চেহারা সুদুর্লভ। ছ ফুটের উপর লম্বা একটি মানুষ, কাঁচা সোনার মত গৌর দেহবর্ণ, তুষারশুভ্র মাথার চুল, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পাতলা রক্তাভ দুখানি ঠোঁটের মিলনরেখায় স্নিগ্ধ প্রশান্ত হাসি যেন লেগে রয়েছে। পরনে সাদা থানধুতি, গায়ে তেমনই সাদা কফওয়ালা শার্ট, পায়ে দুপাশে স্প্রিংওয়ালা জুতো। গোপীচন্দ্র ঈষৎ অবনত হয়ে সেলাম করলেন—গুডমর্নিং সার্।

সাহেব তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, গুডমর্নিং বাবু। গোপীচন্দ্র হাত বাড়ালেন সসম্ভ্রমে ঈষৎ অবনত হয়ে। সাহেব গোপীচন্দ্রের হাতখানি তুলে নিতে গিয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এমন গাঢ় রক্তাভ হাত তিনি কখনও দেখেন নাই। লাল পদ্মের পাপড়ির মত কোমল রক্তাভ।

গোপীচন্দ্র বাংলাতেই বললেন, হুজুর আমার বাড়িতে এসেছেন, এ আমার সৌভাগ্য।

সাহেব বাংলা বুঝতে পারেন, ভাল বলতে পারেন না। তিনি স্থির দৃষ্টিতে

গোপীচন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি একজন বড় কলিয়ারি-প্রোপ্রাইটার এবং কয়লার ব্যবসাদার, তোমাকে নিশ্চয়ই অনেক ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। আমি আশা করি, ইংরিজীতে কথা বললে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। অসুবিধা হ'লে আমি হিন্দীতে বলতে পারি।

হেডমাষ্টার বললেন, ইংরিজী উনি বুঝতে পারেন সার্, বলার অভ্যাস নাই।

গুড। তারপর একখানা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, তুমি বসতে পার গোপীচন্দ্রবাবু।

রাস্তার সামনে তখন অনেক লোক জ'মে গিয়েছে। জেলার হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছেন, এ সংবাদে অনেক লোক ছুটে দেখতে এসেছে। কৃষ্ণ চাটুজ্জের কাশীযাত্রার বিস্ময়কর সংঘটনটি আজই না ঘটলে হয়তো রাস্তা আজ জনতায় ভ'রে যেত। তারা বিস্মিত হয়ে গেল, সাহেব নিজে হাত বাড়িয়ে গোপীবাবুর সঙ্গে 'হ্যাণ্ডশেক' করলেন, তাঁকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। দু-চারজন যারা গোড়া থেকেই সাহেবের সঙ্গে আছে, স্কুলে স্বর্ণবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা দেখেছে, তারা মৃদুস্বরে গুঞ্জন ক'রে উঠল, স্বর্ণবাবুকে বসতেও বলে নাই, শেকহ্যাণ্ডও করে নাই।

সাহেব বললেন, ওয়েল গোপীচন্দ্রবাবু, তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে।

গোপীচন্দ্র একটু ভীত হলেন। বললেন, আমি তো কোন অপরাধ করি নাই হুজুরের কাছে!

না, আমার কাছে কর নাই, কিন্তু তুমি তোমার গ্রামের লোকের প্রতি কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছ। তাদের কাছে তোমার ত্রুটি রয়েছে।

গোপীচন্দ্র বললেন, হুজুর, আমি সামান্য ব্যক্তি। গ্রামের লোকের প্রতি আমার কর্ত্তব্য আমি—

না, তুমি সামান্য ব্যক্তি নও। তুমিই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। তোমার মত লোক থাকতে গ্রামের স্কুলের অবস্থা এত খারাপ কেন?

গোপীচন্দ্রের মুখ এবার কঠিন হয়ে উঠল। তিনি সহসা উত্তর দিলেন না, যোগ্য উত্তর ভাবতে লাগলেন।

সাহেব বললেন, স্কুলে তুমি সাহায্য কর না কেন?

গোপীচন্দ্র তবু চুপ্ ক'রে রইলেন।

সাহেব বললেন, কেন? তোমাকে স্কুলে সাহায্য করতে হবে। স্কুলটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে হবে তোমাকে।

সম্পদ ও প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা হেতু প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী স্বর্ণবাবুদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে সাহায্য দিতে অনিচ্ছা থাকলেও সে কথা ভদ্রতাসম্মত নয় ব'লেই হোক, অথবা তাঁর মনের সত্য অভিপ্রায়ই হোক, গোপীচন্দ্র এবার বললেন, একটা জীর্ণ এম. ই. স্কুলের উপর

অর্থব্যয় করাটা আমার বেশ ভাল লাগে না হুজুর, আমার ইচ্ছা, এখানে আমি একটি সর্বাঙ্গসুন্দর হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করি।

সাহেব হাত বাড়িয়ে গোপীচন্দ্রের হাত ধ'রে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, তোমার এই মহৎ সংকল্পের জন্য তোমাকে আমি অন্তর থেকে অভিনন্দিত করি গোপীচন্দ্রবাবু।

গোপীচন্দ্র বললেন, হুজুর আমার মহৎ সম্মান করলেন। আমি সামান্য ব্যক্তি—

নো নো নো। তুমি এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এর পর একটু হাসলেন, হেসে বললেন, দিজ পিপ্‌ল—আমি জানি গোপীবাবু, এরা তোমাকে এখনও মানতে চায় না। তোমার সঙ্গে বিরোধিতা করে। আই নো। এই হ'ল এদের চরিত্র। কিন্তু তোমাকে এসব জয় করতে হবে।

গোপীচন্দ্র বললেন, সেই বিরোধিতার ভয়ই আমি করছি হুজুর। আমার ভয় হয়, এ কাজে এখানকার সকলে—বিশেষ ক'রে যাঁরা জমিদার, তাঁরা বাধা দেবেন।

সাহেব হাসলেন, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

তা হ'লে আমি নির্ভয়ে কাজ করতে পারি।

নির্ভয়ে কাজ কর তুমি, এবং আমি আগামী এক বৎসরের মধ্যে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। ইউ সি। আর এক বৎসর আমি এ জেলায় আছি। আমি স্কুল ওপ্‌ন করব।

কাল থেকে আমি কাজ আরম্ভ করব।

গুড। আশা করি, দু মাসের মধ্যেই আমি এখানে এসে ফাউণ্ডেশন ষ্টোন পত্তনের আনন্দ লাভ করতে পারব।

নিশ্চয়ই হুজুর। এত বড় সৌভাগ্য আমার হবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি কোনদিন।

সাহেব বললেন, এইটা তোমাদের ভুল ধারণা। সরকার তোমাদের সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত। ভাল কাজের জন্যে পুরস্কৃত করতে পারলে, সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হন গভর্মেণ্ট। কীর্তিমানদের টাইট্‌ল দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়, সম্মানিত করা হয়, শাসনকার্যে তাঁদের পরামর্শ নিয়ে থাকি আমরা। কিন্তু ইউ সি—এই বেঙ্গল আজ সুরেন ব্যানার্জি অ্যাণ্ড আরও কতকজন অ্যাজিটেটারদের পাল্লায় প'ড়ে হুজুক করছে; দিস রটন বন্দেমাটরম্, বিলিতী কাপড় বন্‌কায়ার, বয়কট, দিজ থিংস ভেরি ব্যাড—ভেরি ব্যাড।

গোপীচন্দ্র বললেন, না, সেসব আমাদের এখানে কিছু নাই।

সাহেব উঠলেন, বললেন, যাতে না থাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা তোমাদের মত লোকের কর্তব্য। ছেলেদের লেখাপড়া শেখাও, সেণ্ড দেম টু ইংল্যাণ্ড ফর হায়ার

এডুকেশন। দেখে আনুক ইংরেজ কতবড় জাত। কতবড় তাদের কাল্‌চার।…আচ্ছা গোপীবাবু, এখন আমি ডাকবাংলোয় যাচ্ছি। তুমি বিকেলে এসো ওখানে. আমি গ্রামের জমিদারদের সংবাদ দিয়েছি। তারা আসছে। আজই হাই স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করব।…ওয়েল, এ গাড়ি কার? বিউটিফুল্‌ পেয়ার অব হর্স! গাড়িও সুন্দর। আমি আশা করি, এ গাড়ি তোমার?

হাঁা সার্।

গোপীচন্দ্রের জুড়ি এসে দাঁড়াল।

গোপীচন্দ্র সবিনয়ে বললেন, হুজুর এই গাড়িতে ডাকবাংলো গেলে আমি খুশি হব।

সাহেব অগ্রসর হলেন গাড়ির দিকে। গোপীচন্দ্র তাড়াতাড়ি কাছারি-ঘরের ভিতরে ঢুকে একটি রেশমী রুমাল ঢাকা ছোট একটি পাত্র নিয়ে বেরিয়ে এলেন। গাড়ির ভিতরে উপবিষ্ট সাহেবের সম্মুখে, রুমালখানি তুলে ধ'রে বললেন, হুজুর আমার বাড়িতে এসেছেন, এ আমার সৌভাগ্য। আপনার সম্মান—। যদি অনুগ্রহ ক'রে হুজুর এই সামান্য—। একখানি রূপার রেকাবির উপর একটি সোনার ঘড়ি। এবারই তিনি এটি কিনে এনেছিলেন নিজের ব্যবহারের জন্য। টাকা বা গিনি দেওয়াটা ঠিক হবে না, হয়তো সাহেব অন্য রকম ভাবতে পারেন ভেবে এই ঘড়িটিই তিনি উপঢৌকনস্বরূপ রূপার রেকাবির উপর রেখে সাহেবের সামনে ধরলেন। সাহেব একটু হেসে রেকাবখানি সমেত টেনে নিয়ে গাড়িতে নিজের পাশে রাখলেন। বললেন, তোমার সঙ্গে আলাপে আনন্দ পেলাম। অনেকদিন মনে থাকবে আমার। তুমি বিকেলে নিশ্চয় আসছ? আমি সমস্ত আজ পাকা করতে চাই। কোচম্যান, চালাও।

সন্ধানে সমস্ত ত্যাগ ক'রে মৃত্যুর মধ্যে শিবত্ব-কামনায় কৃষ্ণ চাটুজ্জে কাশী যাত্রা করলেন ওই গাড়িতেই। সাহেবকে ডাকবাংলোয় নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ফিরে এসে দাঁড়াল চাটুজ্জে মশায়ের দরজায়। বয়স্ক সমাজপতিদের সঙ্গে যাত্রাকালে চাটুজ্জের দেখা হ'ল না। সমাজপতিরা সকলেই জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সাহেব ডাকবাংলোয় দরবার করছেন—দারোগা সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন সাহেবের অভিপ্রায়; তাঁরা সকলেই সেখানে যেতে বাধ্য হয়েছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তের মধ্যে নাকি আছে, সরকারী কর্মচারী, সরকারী ফৌজ যখন যেখানে যাবে, তখন সেখানকার জমিদারেরা এই বন্দোবস্তের শর্ত্তানুযায়ী তাঁদের তদ্বির-তদারক করবেন, রসদ সংগ্রহে সাহায্য করবেন, পুলিসকে শান্তি রক্ষায় সাহায্য করবেন। এক পুরুষ আগেও যাঁর জমিদারির সীমানায় খুন-ডাকাতি হ'ত, তাঁকে আংশিকভাবে জবাবদিহি করতে হ'ত। চৌকিদারদের জমি দিয়ে পোষণ করতে হ'ত। বর্ত্তমানে পুলিস-বিভাগের দায়িত্ব

অনেকটা কমেছে, চৌকিদারী জমি সরকার বাজেয়াপ্ত ক'রে নিজে তার আর গ্রহণ ক'রে চৌকিদার পুরা থানার আয়ত্তে এনেছেন। কৌরও আজকাল যাতায়াত করে না, কিন্তু সাহেবরা যখন আসেন, তখন মুর্গী মাছ ডিম, ঘি দুধ কলা, ক্ষেত্রবিশেষে মূলা বেগুন সংগ্রহ ক'রে পাঠাতে হয়, ডাকবাংলোয় অথবা থানায় সেলাম দিতে যেতে হয়।

সাধারণ মানুষের অশ্রুসিক্ত চোখের ঝাপসা দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে এক সকরুণ রহস্যের মতই বৃদ্ধ চাটুজ্জে চ'লে গেলেন। গাড়িখানা দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেল। তারা চোখ মুছে ফিরল।

সূর্য্যাস্ত হয়ে গিয়েছে।

গ্রামখানি তখন আবার মুখর হয়ে উঠেছে অভিনব উত্তেজনায়। গ্রামে হাই ইংলিশ স্কুল হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ডাকবাংলোয় দরবার করছেন। গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকেরা সেখানে গিয়েছেন। হ্যাঁ, একটা মহৎ অভাব দূর হ'ল। গোপীচন্দ্র দীর্ঘজীবী হোন। ভগবান যাঁকে বড় করেছেন, তাঁর স্তবগান তো করবেই মানুষ। তাঁকে না মেনে উপায় কি?

গ্রামান্তরের মধ্যবিত্তেরা চাষীরা, যারা এসেছিল পুণ্যবান কৃষ্ণ চাটুজ্জের দর্শনের আশায়, জীবনের নশ্বরত্বহেতু বৈরাগ্য-অভিভূত মন নিয়ে যারা ফিরে যাচ্ছিল, তারাও না দাঁড়িয়ে এ আলোচনা না শুনে পারলে না। এ দলের মধ্যে ছিল এক ক্রোশ দূরের চাষী রংলাল পাল। সে বললে, গোপীবাবুর জয় হোক। আমাদের ছেলেগুলানের এইবার একটা 'স্থপার' হবে। ঘরের খেয়ে ই পাসটা তো হবে। মুরুখ্যু নামটা তো ঘুচবে।

রাধাকান্তবাবুদের পাড়ায় চণ্ডীমণ্ডপে মেয়েদের মধ্যেও এই আলোচনা চলছিল। রজনী বা রজন-ঠাকরুণ এ পাড়ারই মেয়ে, স্বর্ণবাবুদের জ্ঞাতি-কন্যা, সম্বন্ধে ভগ্নী। তিনিই ছিলেন মুখপাত্রী। তিনি বলছিলেন, আমাদের স্বর্ণর দোষ আছে অনেক স্বীকার করি, তা ব'লে গোপীবাবুর ও কাজটা ভাল হ'ল না। একজনের কীর্ত্তি নষ্ট ক'রে—না, এ আমি ভাল বলতে পারি না। স্বর্ণর বাপের নামে যে ইস্কুল রয়েছে, সেই ইস্কুলকেই বড় করলে হ'ত।

বরদা দেবীও অন্যতমা প্রবীণা এবং প্রধানা এ পাড়ার। তিনি বললেন, তা ভাই, এ কথাটা তোমার ঠিক হ'ল না।

কেনে?

ধর একজনা পুকুর প্রতিষ্ঠে করেছে, গাঁয়ের লোকে তার জল খায়। এখন সে পুকুরের জল আর কেউ খাবে না, তার মহাত্মি নষ্ট হবে ব'লে আর কেউ তার চেয়ে ভাল পুকুর প্রতিষ্ঠে করতে পাবে না?

কিসের সঙ্গে কি? ইস্কুলে আর পুকুরে বরদা-দিদি? নতুন পুকুর প্রতিষ্ঠে করলে পুরনো পুকুরটা তো বুজে যায় না! জল থাক্, না থাক্, কীর্ত্তিটা থাকে। আর এতে পুরনোটা যে উঠে যাবে।

বরদা হেসে বললেন, তা বোন, আমার যেমন বুদ্ধিতে কুলাল বললাম। এখন আমাদের উপকার নিয়ে কথা। ছেলেপুলেরা ঘরের খেয়ে পড়বে।

হ্যাঁ। পড়বে—ইংরিজী প'ড়ে সায়েব হবে, মুর্গী খাবে। এর পর মেয়েরা ইংরিজীতে কথা বলবে। হঠাৎ রঞ্জন-ঠাকরুণ থামলেন। বললেন, দাঁড়াও। তারপর দুর্গাঘরের বারান্দার দিকে উদ্দেশ ক'রে কাউকে ডাকলেন, কাশীর বউ, শোন।

কাশীর বউ, রাধাকান্তের স্ত্রী, কাশী বাপের বাড়ি, তাই লোকে কাশীর বউ ব'লে ডেকে থাকে। কাশীর বউ উত্তর দিলেন না, ধীরপদক্ষেপে এসে সামনে দাঁড়ালেন, বললেন, বলুন। দীপ্তিমতী মেয়ে, দেহবর্ণের উজ্জ্বলতায় একটা প্রখর প্রভা আছে। চোখ দুটি পিঙ্গল; মাথায় ছোট, মেয়েটির বয়স কুড়ির কাছাকাছি, কিন্তু দেখে মনে হয়, পনরো-ষোলর বেশি নয়। কিন্তু ওই পিঙ্গল চোখের তারায় এবং মুখের গঠনের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাতে তাঁকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না।

রঞ্জন-ঠাকরুণ মেয়েটিকে বিশেষ ভাল চোখে দেখেন না। কাশী শহরের এই মেয়েটি এসে অবধি তাঁর সূচীবিদ্যার পারদর্শিতার গৌরব কিছু খর্ব্ব হয়েছে। মেয়েটি সূচীবিদ্যার অদ্ভুত পারদর্শিনী। লেখাপড়াও নাকি ভাল জানে। হাতের লেখাও নাকি রঞ্জন-ঠাকরুণের চেয়ে ভাল। রঞ্জন সে কথা বিশ্বাস করেন না।

কাশীর বউ বললেন, বলুন, কি বলছিলেন?

ইস্কুলের জন্যে মিটিং ডেকেছেন সাহেব, রাধাকান্ত নাকি তাতে যায় নাই?

কাশীর বউ শান্ত স্বরে জবাব দিলেন, আমি তো জানি নে ঠাকুরঝি।

রাধাকান্ত এসব ভাল করছে না। গ্রামের লোকের সঙ্গে যা করে তাই করে, সাহেব জেলার মালিক, তাঁদের সঙ্গে এসব ভাল নয়। বারণ ক'রো।

একটু হেসে কাশীর বউ বললেন, বলব তাঁকে। তিনি অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে চ'লে গেলেন।

রঞ্জন-ঠাকরুণ বললেন, সংসারে অহঙ্কারটা কখনও ভাল নয়।

রাত্রে রাধাকান্ত সন্ধ্যা শেষ ক'রে দিনলিপি লিখে থাকেন। বাপ উকিল ছিলেন, তাঁর টেবিলখানির উপরে বাবার শেষ চটিজুতা জোড়াটি একখানি মখমলের আসনের উপর সাজানো রয়েছে, নিত্য চন্দন দিয়ে, ফুল সাজিয়ে অর্চ্চনা ক'রে থাকেন; এই টেবিলের উপর ব'সেই তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন, দিনলিপি লেখেন।

দিনলিপি লিখছিলেন তিনি। কাশীর বউ এসে দাঁড়ালেন। কোলে তাঁর ঘুমন্ত শিশু। ছেলেটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

মুখ তুলে রাধাকান্ত বললেন, বল।

তুমি ইস্কুলের মিটিঙে যাও নি?

না।

অত্যন্ত মিষ্ট এবং কতকটা আবদারের সুরে বললেন, কেন?

একটু চুপ ক'রে থেকে রাধাকান্ত বললেন, ভাল লাগল না যেতে। কৃষ্ণ চাটুজ্জে গেলেন সজ্ঞানে মৃত্যুকামনায় কাশী, স্বেচ্ছায় সব ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। ইচ্ছা ছিল, গ্রামের বাইরে, পথের ধারে দাঁড়িয়ে কেমন মুখের ভাব নিয়ে তিনি যান, সেইটুকু দেখব। দেখলাম, নিঃশব্দে চোখ বুজে গেলেন তিনি, দুটি জলের ধারা শুধু গড়িয়ে পড়ছে। দেখে বাগানেই ব'সে রইলাম সারাক্ষণ। মিটিঙে আর যেতে ইচ্ছে হ'ল না। তারপর একটু হেসে বললেন, কেন বল তো? গেলে তুমি খুশি হতে?

কাশীর বউ বললেন, দেশের কাজ, ভাল কাজ, তাতে তুমি যাবে না, থাকবে না, এ কি ভাল লাগে আমার?

রাধাকান্ত উঠে ঘুমন্ত ছেলের মুখে চুমো খেলেন। বললেন, সে গৌরব বাড়াবে তোমার খোকা। তারপর গাঢ়স্বরে বললেন, গোপীচন্দ্র দেশের কল্যাণ করলেন। ভগবান তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন। আরও উপকার তাঁর দ্বারা হোক এ গ্রামের এ দেশের। স্কুল হচ্ছে, হাজার হাজার ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক। কিন্তু তাঁর এ নামের কাঙালীপনা ভাল লাগল না। তিনি স্বর্গের বাপের নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুল উঠিয়ে নিজের নামে স্কুল করছেন। নিজের বাপের নামেও করলে পারতেন।

কাশীর বউ বললেন, তবু তোমার এ কাজ ভাল হয় নি। নাম যার হোক, কাজটা যে ভাল। দেশের কত বড় সুপ্রভাত আজ বল তো?

রাধাকান্ত বললেন, হ্যাঁ, আমরা অস্তমিত হলাম। গোপীচন্দ্র উদিত হলেন। একটা দিন গিয়ে আর একদিন এল। তবে সুপ্রভাত এটা ঠিক। কিন্তু যে ডোবে সে থাকে পশ্চিমে, আর যে ওঠে সে থাকে পূর্বে, এমন ক্ষণে দুজনে মেলে কি ক'রে বল তো?

কাশীর বউ স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, রাগ করলে তুমি?

রাগ? একটু চুপ ক'রে থেকে রাধাকান্ত একটু হেসে বললেন, না।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকখানি নাট্যগ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন তথ্য

(২)

উষা (গীতিনাট্য)। পৃ. ৬৯

কিছু দিন হইল, শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' (অগ্রহায়ণ ১৩৪৮) নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্রে'র ন্যায় এখানিও একখানি তথ্যপূর্ণ জীবনচরিত। গ্রন্থখানি পাঠকালে দু-একটি ত্রুটি আমাদের নজরে পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থে তথ্যগত কোনরূপ ত্রুটি আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে ভাবিয়া আমরা সেগুলি আলোচনা করিতেছি।

'উষা' অমরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম নাট্যগ্রন্থ। এ-সম্বন্ধে 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রকাশ :—

> "উষা অমরেন্দ্রনাথের বাল্য রচনা।* নাট্যসাহিত্য পুষ্টিকল্পে তাঁহার লেখনী ধারণের প্রথম অবদান—এই ত্র্যঙ্ক গীতিনাট্য। ...বাংলা ১২৯৬ সালে 'উষা' রচিত হয় ও আমাদের অনুমান তাহার ২।৩ ৎসরের মধ্যে ইহা মুদ্রিত হয়। আমরা ঐ মুদ্রিত গ্রন্থের যে খণ্ড দেখিয়াছি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার মলাট বা টাইটেল পৃষ্ঠা নাই, তাই কোন্ সালে এবং কোথায় ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার সঠিক সংবাদ দিতে আমরা অক্ষম। বর্ত্তমানে এই পুস্তকের চিহ্ন আছে কি না জানি না।" পৃ. ৫৩—৫৪।

সুখের বিষয়, আমরা কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এক খণ্ড 'উষা' দেখিয়াছি। উহার মলাট বা আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

> উষা। / গীতি-নাট্য / (১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা)। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত / প্রণীত ও প্রকাশিত /

পুস্তকের প্রকাশকাল নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রিত-পুস্তকের তালিকা হইতে আমরা মুদ্রাকরের নাম ও প্রকাশকাল উদ্ধৃত করিতেছি :—

> প্রকাশকাল—১ মার্চ ১৮৯৩
>
> মুদ্রাকর—ইউ. সি. বসু এণ্ড কোং, ৬ নং ভীম ঘোষের লেন।

* * *

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"অমরেন্দ্রনাথ কয়েকখানি নাটিকা লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথম হইতেছে 'নির্ম্মলা' (১৩০৫)।" আমাদের অন্যরূপ জানা আছে। 'নির্ম্মলা'র (১৩০৫) পূর্ব্বে অমরেন্দ্রনাথের আরও দুইখানি নাটিকা—'উষা' (১২৯৯) ও 'মানকুঞ্জ' (১৩০০) প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমখানি 'অমর-গ্রন্থাবলী'তে স্থান পায় নাই, দ্বিতীয়খানি 'শ্রীরাধা' নামে মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ (নাট্যরূপক)। পৃ. ৭

'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' পুস্তকের ৩৯১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ :—

ইতিমধ্যে কলিকাতায় বঙ্গভঙ্গ লইয়া খুব আন্দোলন হইতেছিল। সময়োপযোগী নাট্যরচনায় অমরেন্দ্রনাথ কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তিনি এই উপলক্ষে 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' নামে এক রূপক রচনা করিয়া, ১৬ই অক্টোবর —যে দিন লর্ড কর্জ্জন বঙ্গ বিভক্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন, সেই দিনই—তাহা গ্র্যাণ্ডে অভিনীত করাইলেন। বইখানি মুদ্রিত হইয়া দর্শকগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইল।

লেখক 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' পুস্তিকাখানি দেখেন নাই বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা বঙ্গ-বিভাগ-ঘোষণার দুই মাস পূর্ব্বে—১২ আগষ্ট ১৯০৫ তারিখে, প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' ৯ই আগষ্ট (২৪ শ্রাবণ ১৩১২) গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়—পরবর্ত্তী ১৬ই অক্টোবর তারিখে নহে। পুস্তিকার মূল্য ছিল ✓০ আনা। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এক খণ্ড 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' আছে ; ইহার আখ্যাপত্রটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল ; ইহা হইতেই আমাদের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে :—

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ / বা / The Partition of Bengal / (নাট্যরূপক) / শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। / (২৪শে শ্রাবণ ১৩১২ বুধবার 'গ্রাণ্ড থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত) / কলিকাতা / ৯১ নং হ্যারিসন রোড—"গ্রাণ্ড থিয়েটার বুকষ্টল" হইতে / ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত / ১১৫।২ গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা ইলেকট্রিক মেসিন যন্ত্রে" / শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত / মূল্য ✓০ দুই আনা মাত্র /

• • • •

হরিরাজ (ঐতিহাসিক নাটক)। পৃ. ১৫১

'হরিরাজ' শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' অনুসরণে লিখিত একখানি "ঐতিহাসিক ঘটনা-মূলক বিয়োগান্ত নাটক"। সেকালে নাটকখানি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।

১৩০২ সালে (ইং ১৮৯৬) 'হরিরাজ' সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থসংগ্রহে প্রথম সংস্করণের পুস্তক আছে, তাহা হইতে আখ্যা-পত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

হরিরাজ।

(ঐতিহাসিক ঘটনামূলক বিয়োগান্ত নাটক)

"I could a tale unfold whose lightest word
Would harrow up thy soul, freeze thy young blood,

Make thy two eyes, like stars, start from their spheres,
Thy knotted and combined locks to part,
And each particular hair to stand on end,
Like quills upon the fretful porpentine :"
(Hamlet; Act 1.; Scene 5,)

(৬ নং ভীম ঘোষের লেন হইতে)
শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
বঙ্গাব্দ ১৩০২
মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

নাটকখানির আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। তিনি কে, তাহাই অগ্রে বিচার করা যাক। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রিত-পুস্তকের তালিকায় 'হরিরাজ' নাটকের নাম আছে। ইহাতে প্রকাশ—

গ্রন্থকার—নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী
প্রকাশকাল—৬ মে ১৮৯৬
পৃষ্ঠা-সংখ্যা—১৫১

নাটকের উপহার-পৃষ্ঠায়

পরম পূজনীয়
শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঘোষ
—মহাশয় শ্রীচরণেষু

মুদ্রিত আছে। পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী রমানাথ ঘোষ মহাশয় গ্রন্থকারের মাতুল ছিলেন। পরবর্ত্তী সংস্করণ 'হরিরাজে'র উপহার-পৃষ্ঠায় "পরম পূজনীয়……মাতুল মহাশয় শ্রীচরণেষু" আছে।

'হরিরাজ' নাটকখানি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলীর দিন—২১ জুন ১৮৯৭—মহাসমারোহে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করেন। তিনি নিজে হরিরাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলেও 'হরিরাজে'র লেখক হিসাবে নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর নাম ছিল।* অতীব সাফল্যের সহিত অভিনীত হওয়ায়

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত প্রথম গ্রন্থ হইতেছে 'হরিরাজ' নাটক (? ১৮৯৬) এবং 'শিবরাত্রি' গীতিনাট্য। হরিরাজ অমরেন্দ্রনাথের লেখা না হওয়াই সম্ভব।...হরিরাজের লেখক সম্ভবত নগেন্দ্রনাথ বসু।" ডক্টর সেনের এই উক্তি আদৌ ঠিক নহে। এমারেল্ড থিয়েটারে ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী কর্ত্তৃক অভিনয় আরম্ভ হয়

কিছু দিন পরেই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'হরিরাজ' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রিত-পুস্তকের তালিকায় প্রকাশ,—

গ্রন্থকার—নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী
প্রকাশকাল—৭ আগষ্ট ১৯০১
পৃষ্ঠা-সংখ্যা—১৫১

'হরিরাজ' নাটকের ৪র্থ সংস্করণ (পৃ. ১৫১) প্রকাশিত হয়—১৩১৭ সালে। তখন গ্রন্থকার পরলোকে; কারণ, আখ্যাপত্রে "স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত" মুদ্রিত আছে। প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণের প্রকাশক ছিলেন—গ্রেট ইডিন প্রেসের সুরেশচন্দ্র বসু।

সুতরাং 'হরিরাজ'-এর লেখক যে নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আধুনিক পাঠক 'হরিরাজ'-এর লেখক-হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ দত্তেরই নাম জানেন,—নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে বিস্মৃত হইয়াছেন। কেন এরূপ হইল, সেই কথাই বলিব।

১৩১৩ সালে অমরেন্দ্রনাথ বসুমতীর সহিত তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ জুলাই ও ২৯এ আগষ্ট তারিখে যথাক্রমে 'অমর-গ্রন্থাবলী'র ১ম ও ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। অমরেন্দ্রনাথের ভুলের জন্যই নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'হরিরাজ' 'অমর-গ্রন্থাবলী'তে স্থান লাভ করিয়াছে। অমরেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়—১৩১৫ সালে (ইং ১৯০৮) ও আরও দুই-একবার 'অমর-গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও 'হরিরাজ' গ্রন্থাবলীর পুরোভাগে স্থান পাইয়াছে। অপর দিকে আবার ১৩১৭ সালে 'হরিরাজ' "স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত" মুদ্রিত হইয়া গ্রেট ইডিন প্রেস হইতে প্রচারিত হইয়াছে। তখনও অমরেন্দ্রনাথ জীবিত। ইচ্ছা থাকিলে তিনি অনায়াসেই নিজের ভুল সংশোধন করিয়া যাইতে পারিতেন। এই বিসদৃশ ব্যাপারের পরিসমাপ্তি এইখানেই ঘটে নাই। অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'হরিরাজ' স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথের নামে শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরি কর্তৃক প্রচারিত হইয়া আধুনিক পাঠককে অধিকতর বিভ্রান্ত করিয়াছে।*

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* ১৬ এপ্রিল ১৮৯৭ গুড ফ্রাইডের দিন। উদ্বোধন-দিবসে গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী' ও 'বেল্লিক-বাজার' অভিনীত হইয়াছিল,—'হরিরাজ' নহে। এই প্রসঙ্গে 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' পুস্তকের পৃ. ১৩৮ দ্রষ্টব্য।

সপ্তাষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দুয়ারে টোকা পড়ল।

কে?

আমি, তনিমা।

ও, এস বউদি।

তনিমা ঘরে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গেল ছবিটা দেখে।

বাঃ, কার মুখ এটা?

একটা সাহেবের। চমৎকার নয়?

হ্যাঁ, বেশ সুন্দর। এখন কিন্তু খাবে চল, কাটলেটগুলো ভাজছি, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভাল লাগবে না।

হঠাৎ কাটলেট?

শুক্তি-মুক্তা এসেছে, তাদের খাওয়াচ্ছি ক'রে।

ও।

শুক্তি-মুক্তার ঘন ঘন আসাটা রজত তেমন পছন্দ করত না। অন্য কোন কারণে নয়, তার মনে হ'ত, এখানে বার বার এসে ওরা যেন খুড়ীমাকে অপমান করছে। খুড়ীমা যখন নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে এত কাণ্ড করেছেন, তখন তাঁর মেয়েরা এমন ভাবে গায়ে-প'ড়ে এখানে আসে কেন? নবনীর নির্লিপ্ততা ভাল লাগত তার। খেতে ব'সে এই শুক্তি-মুক্তাই কিন্তু তাকে নূতন পথের ইঙ্গিত দিলে। রাজনৈতিক আলোচনা উঠল। শুক্তি-মুক্তার কথার ভাবে বোঝা গেল, তারাও বিদ্রোহিনী। মেয়ে দুটোকে যত অপদার্থ ভেবেছিল, ঠিক তত অপদার্থ নয় তারা। দুজনেই সুভাষ বোসের ভক্ত। সুভাষ বোসের চরম পন্থায় তারা আস্থাবান। মহাত্মাজীও শেষকালে যে চরমপন্থী হয়ে উঠে আইন-অমান্য শুরু করেছেন, এতে তারা মহাখুশি। তাদের মতে এখন সকলেরই উচিত মহাত্মাজীর পতাকার তলে এসে দাঁড়ানো। রজত তাদের সামনে কিছু না বললেও—বয়ঃকনিষ্ঠদের সামনে অতিশয় স্বল্পভাষী সে চিরকালই—মনে মনে ভেবে দেখলে যে, বিপ্লব-পন্থা ত্যাগ ক'রে দেশের রাজনীতির সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখতে হয় তা হ'লে সুভাষ-পন্থী হওয়াই উচিত। লুকিয়ে-চুরিয়ে লোক খুন না ক'রে ব্যাপকভাবে আইন-অমান্য আন্দোলনই চালানো উচিত যতক্ষণ না আমরা পূর্ণ-স্বাধীনতা পাচ্ছি। কংগ্রেস যখন এত,

বড় বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে পেরেছে সারা দেশে, তখন কংগ্রেসে যোগ দেওয়ারও আর কোন সঙ্গত বাধা নেই। বিদ্রোহ ক'রে স্বাধীনতা লাভ করাই তো উদ্দেশ্য।

এর পর কিছুদিন কংগ্রেসের কাজে উৎসাহী হয়ে উঠল সে। যদিও দেশের সব নেতা জেলে, যারা বাইরে আছে তারাও পুলিসের লাঠির চোটে নিস্তেজ হয়ে আসছে ক্রমশ, তবু এখনও থামবার সময় হয় নি, রজতের মনে হ'ল। এখনও দেশে এত লোক আছে যে, দশ বছর এ সত্যাগ্রহ চালানো যায়, এবং তাই চালাতে হবে। ছবি-আঁকা ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত উৎসাহভরে সে ভলান্টিয়ার সংগ্রহ ক'রে বেড়ালো কিছুদিন, আবার মহিষ-বাথানে যাবার জন্যে। সতীশ দাশগুপ্ত, সুরেশ বাঁড়ুজ্জে জেলে গেছে তো কি হয়েছে? রজত নিজেই যাবে এবার। ওদের দেখিয়ে দিতে হবে যে, দেশে লোকের অভাব নেই।

হঠাৎ নীল আকাশ থেকে বজ্রপাত হ'ল।—গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট। তার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল যেন। লোকটা আবার আপোস করতে উদ্যত হয়েছে! জওহরলাল নেহেরু পর্য্যন্ত প্রতিবাদ করলেন না! প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকে সহযোগিতা করতে দেশ যে কারণে অস্বীকার করেছিল, সে কারণ কি অন্তর্হিত হয়েছে? দ্বিতীয় বৈঠকে কংগ্রেস যাবে কোন্ মুখ নিয়ে? সদাশয় আরুইন কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিলেন কেবল অহিংস-রাজবন্দীদের জন্যে। রজতের মনে হ'ল, কেন, দেশের জন্যেই কি সবাই কারাবরণ করে নি? এক দলকে ছেড়ে দিয়ে আর এক দলকে আটকে রাখবার মানে? মহাত্মাজী চুপ ক'রে রইলেন। শোনা গেল কেবল, তিনি চেষ্টা করছেন। তাঁর চেষ্টা বিফল হ'ল যখন, তখন তিনি প্যাক্ট ভঙ্গ করলেন না, চুপ ক'রে রইলেন। বিপ্লবপন্থীরা নিজেরাই চেষ্টা করতে লাগল জেল থেকে। গভর্মেণ্টকে আবেদন জানালে তারা যে, গভর্মেণ্ট সত্যিই যদি দেশের শান্তি চান, তা হ'লে কেবল মহাত্মাজীর সঙ্গে প্যাক্ট করলেই হবে না, তাদের সঙ্গেও করতে হবে এবং তা তারা করতে প্রস্তুত আছে গভর্মেণ্ট যদি পুলিসের মারফত কথাবার্ত্তা না চালিয়ে নিজেরা চালান। যতীন সেনগুপ্ত এ সম্পর্কে বক্সা জেলে গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে দেখাও করলেন, গভর্মেণ্ট কিন্তু পুলিসের সম্পর্ক ছাড়তে রাজি হলেন না কিছুতে। সব ভেঙে গেল। তাদের কথা কেউ শুনলে না, শোনবার দরকারও মনে করলে না। মাত্র কিছুদিন আগে প্রকাশ্য রাজপথে

পুলিস যে মেয়র সুভাষ বোসকে, এডুকেশন-অফিসার মিস্টার চ্যাটার্জ্জিকে, লাইসেন্স-অফিসার মিস্টার ঘোষালকে ধ'রে মার দিলে, আইন-অমান্য-প্রতিরোধ-ওজুহাতে মেদিনীপুরে, যুক্তপ্রদেশে, গুজরাটে পুলিসের যে যথেচ্ছাচার হয়ে গেল, তার কোন অনুসন্ধান পর্য্যন্ত হবে না, মহাত্মাজী বড়লাটের সঙ্গে শর্ত্ত করেছেন। রজত-শুভ্রের সমস্ত বুকটা যেন জ্বলতে লাগল। সে জ্বালা আরও বাড়ল, যখন বিঘোষিত হ'ল, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল আগামী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করবেন। প্রচলিত বিধি অনুসারে সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'ল না, হ'ল ওয়ার্কিং কমিটির খেয়াল অনুসারে। মহাত্মাজী লাট সাহেবের সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন, তা যাতে করাচী কংগ্রেসের অনুমোদন পায় তার ব্যবস্থা করতে ওয়ার্কিং কমিটি বদ্ধপরিকর। তা না হ'লে মহাত্মাজীর অপমান হবে যে! মতিলাল নেহেরু মারা গেছেন, জওহরলাল 'বাপুজী'র বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। আর কারও কাছ থেকে কোন বিরুদ্ধাচরণ প্রত্যাশা করা যায় না, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার আগেই বিতাড়িত হয়েছেন। আমেদাবাদ-বম্বে-দিল্লীর বড় বড় ব্যবসায়ীরাও শান্তির জন্যে উন্মুখ, কারণ আন্দোলনে তাঁদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে যে! সুতরাং গান্ধী-আরুইন প্যাক্টকে করাচী কংগ্রেসে পাকা করবার জন্যে তাঁরা অজস্র টাকা ঢালতে লাগলেন অর্থাৎ তাঁদের মনোমত ডেলিগেট সংগৃহীত হতে লাগল, তাঁদের যাতায়াতের ভাড়া ইত্যাদির ব্যবস্থাও হয়ে গেল। লেফ্‌ট-উইংগাররা সব জেলে। গভর্মেণ্টের চক্ষে তাঁরা নন-ভায়োলেণ্ট নন ব'লে ছাড়া পান নি কেউ। সুতরাং বিরুদ্ধাচরণ করবে কে? সুভাষবাবু ছাড়া পেয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি একা কি করবেন? তাঁর সপক্ষে বাংলা দেশে যারা জেলের বাইরে আছে, তাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত-ঘরের যুবক, বাংলা দেশ থেকে করাচী পর্য্যন্ত যাবার গাড়িভাড়াই জোটাতে পারবে না অনেকে। এদের ভাড়া দেবার মত দেশ-বন্ধু আর তো দেশে নেই। হঠাৎ রজত-শুভ্র ক্ষেপে উঠল। যেমন ক'রে হোক, একাই এর প্রতিবাদ করবে সে। কংগ্রেস শুরু হবার সাত দিন আগে হঠাৎ সে উধাও হ'ল একদিন বাড়ি থেকে। ঝড়ের মত ছুটে চলেছিল সে দিল্লী এক্সপ্রেসে করাচীর দিকে। আর কিছু না পারুক, সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে কংগ্রেস-প্যাণ্ডেলে লাফিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে বলবে সে, ভুল করছ, তোমরা ভুল করছ। এরা সব দেশের প্রতিনিধি নয়, ভাড়া-করা লোক এরা, বড়লোকদের সুবিধা করবার জন্যে এসেছে, দেশের নয়। কিন্তু দিল্লীতে নেবেই

একটা খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সে। তার দেহের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। ভগৎ সিং আর তার দুজন সঙ্গীর ফাঁসি হয়ে গেছে।* যে গভর্মেণ্ট কংগ্রেসের আনুকূল্য চায়, কংগ্রেস বসবার ঠিক চারদিন আগে তার এ কি ব্যবহার! এর একটি অর্থই হতে পারে, রজতের মনে হ'ল। যারা নাম-লেখানো গান্ধী-পন্থী নয়, কংগ্রেস তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবে না এবং গভর্মেণ্ট সে কথা ভালভাবে জানে ব'লেই তাদের নিয়ে যা খুশি করবে। ফাঁসি দেবে, বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটকে রাখবে, তাদের বাপ-মা-ভাই-বোনকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে, তাদের বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখবে না। যদিও তারা ভারতের মুক্তির জন্যেই সর্ব্বস্ব রিসর্জ্জন দিয়েছে, কিন্তু ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তাদের হয়ে একটি কথাও বলবে না, যেহেতু তারা খদ্দরের লেংটি প'রে অহিংসার ভণ্ডামি ক'রে নি, দুর্গম পথে নির্ভীক বীরের মত যাত্রা করেছে স্বদেশের স্বাধীনতা-কামনায়। রজতের হঠাৎ মনে হ'ল, এ কংগ্রেসে গিয়ে লাভ কি? সেখানে কিছু বলতে যাওয়া তো অরণ্যে রোদন করা। দিল্লীর রাস্তায় পাগলের মত ঘুরতে লাগল। একবার ইচ্ছে হ'ল, মামার বাড়িতে যাই, কিন্তু রায়বাহাদুর মাতামহর কথা মনে পড়তেই সে ইচ্ছা অন্তর্হিত হ'ল। খুড়ীমাও এখানে আছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করলে কেমন হয়! কিন্তু কি জানি তিনি কি মনে করবেন, এই ভেবে তাঁর খোঁজ করবার চেষ্টাও করলে না সে। চাঁদনি-চকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরে ঘুরে অবশেষে ঠিক করলে, যাব। সুভাষবাবুর সঙ্গে অন্তত একবার দেখা করা দরকার।

সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে, তাঁর কথা শুনে আরও অবাক হয়ে গেল সে। তিনি ঠিক করেছেন, লেফ্‌টিস্টদের তরফ থেকে একটা লিখিত বিবৃতি দেবেন কেবল যে, গান্ধী-আরুইন-প্যাক্ট তাঁরা সমর্থন করেন না; কিন্তু প্রকাশ্য সভায় র বিরুদ্ধাচরণ করবেন না তিনি। হেরে যাবার আশঙ্কা তো ছিলই, আর কটা কারণও তিনি দেখালেন। তিনি বললেন, কংগ্রেস বসবার ঠিক চার ন আগে, ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি দেওয়ার অর্থ—গভর্মেণ্ট চান,* এই নিয়ে কটা বিরোধ হোক কংগ্রেসের মধ্যে। সুতরাং সে বিরোধ সৃষ্টি করা সমীচীন ব না। তা ছাড়া তিনি বললেন, মহাত্মাজীকে আমরা যখন নেতা ব'লে মেনে য়েছি, তখন বিপক্ষের কাছে তাঁর মান-রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। সুভাষবাবুর ওপর রজতের ভক্তি ছিলই, এ কথা শুনে তা গাঢ়তর হ'ল। তা আরও বাড়ল

নওয়াওয়ান ভারত-সভায় তাঁর বক্তৃতা শুনে। ভক্তি বাড়ল বটে, কিন্তু বক্তৃতায় তিনি যা বললেন, যুক্তির দিক দিয়ে তা মূল্যবান হ'লেও রজত-শুভ্রের রুচিকর হ'ল না। তিনি বললেন, কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে কংগ্রেস দখল করবার চেষ্টা কর তোমরা। কংগ্রেস দখল করবার চেষ্টা মানে—নিজেদের দলে লোক সংগ্রহ ক'রে নিজেদের ভোট বৃদ্ধি করা, অর্থাৎ টাকা খরচ ক'রে খোশামোদ ক'রে বেড়ানো। কিন্তু দেশের টাকাওয়ালা বণিকেরা স্বার্থের খাতিরে শান্তি-প্রিয় গান্ধী-ভক্ত হয়ে উঠেছে, চাকুরেরা তো বটেই, অধিকাংশ ভদ্রলোকও হয় শান্তি-কামনায় না হয় মহাত্মা-ভক্তিতে আন্দোলন করতে আর চায় না। এদের খোশামোদ ক'রে বেড়াতে হবে? স্বাধীনতার জন্যে অশান্তির আগুন জ্বালাবে যারা, তাদের সাহায্য করবার মত বোকা লোক কটা আছে? এই সব লোককে খোশামোদ ক'রে ভজানো রজত-শুভ্রের কর্ম্ম নয়। তার চেয়ে বরং··· সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ট্রামে-দেখা সাহেবের মুখটা—বলিষ্ঠ চোয়াল চিবুক—রেশমের মত চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে।

তা হ'লে কি করবে সে? তার পৌরুষ ব্যর্থ হয়ে যাবে কোন পথ না পেয়ে? সুভাষবাবুর দলে লোক-সংগ্রহ ক'রে বেড়ানোই তার জীবনের কাজ হবে নাকি? এ কাজ সে পারবে না। হঠাৎ ঠিক ক'রে ফেললে, ছবি আঁকব আবার। দেশের কথা ভাবলে পাগল হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 'প্রবাসী' না 'ভারতী' কোথায় যেন অবনীবাবুর লেখা একটা প্রবন্ধ পড়েছিল, তার প্রথম লাইন কটা প্রায় মুখস্থই ছিল তার। মনে পড়ল সেই লাইন কটা, ইন্দ্রনীলমণির ঢাকনা দিয়ে ঢাকা এই প্রকাণ্ড রসের পেয়ালা সামনে রয়েছে, এর ঢাকনা খুলতে বাধা কি? কত শক্ত শক্ত কাজে আমরা এগিয়ে যাই, এইটেই কি খুব দুঃসাধ্য হ'ল? দুঃসাধ্য কথাটা উদ্দীপ্ত ক'রে তুলল তার কল্পনাকে। ঠিক ক'রে ফেললে, এই দুঃসাধ্য কাজই সাধ্য করতে হবে তাকে। স্বদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান অপরে করুক, তার দ্বারা হ'ল না ওসব।

রীতিমত 'স্টুডিও'ই গ'ড়ে তুললে আলাদা একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে। কল্পনা-তুরঙ্গম এমন দ্রুতবেগে ছুটল যে, দেশী-বিদেশীর সম্বন্ধে হুঁশ রইল না আর বড়। বিদেশী রং তুলি কাগজ ক্যাম্বিস কিনতেও দ্বিধা হ'ল না। টাকা যোগালেন হংস-শুভ্র। বস্তুত হংস-শুভ্র যেন মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। গোঁয়ারটা যা খুশি করুক, কিন্তু চোখের সামনে করুক। আজ বম্বে, কাল মীরাট,

পরশু করাচী, তার পরদিন চট্টগ্রাম ক'রে বেড়ানোর চেয়ে কতকগুলো রঙ আর তুলি নিয়ে যদি ভুলে থাকে, থাক্‌। তা ছাড়া মুখে যদিও তিনি রঞ্জতের ছবি নিয়ে ব্যঙ্গই করতেন, কিন্তু মনে মনে তারিফ করতেন খুব। তাই টাকা দিতে কার্পণ্য করলেন না তিনি। শশাঙ্ক-শুভ্র অবশ্য মনে মনে চটছিলেন, বাজে ব্যাপারে এতগুলো টাকা নষ্ট হচ্ছে ব'লে। কিন্তু কিছু বলবার উপায় ছিল না তাঁর, সাহসও ছিল না। এক হিসেবে অবশ্য নিশ্চিন্তও হয়েছিলেন তিনি, যে দলে মিশছিল তা ত্যাগ ক'রে যদি ছবি-আঁকা নিয়ে থাকে, তাও মন্দের ভাল। তাই চুপ ক'রে ছিলেন, তার স্টুডিওতে অবশ্য যান নি একদিনও, ওসব ননসেন্স ভালই লাগত না তাঁর। বাসন্তী কিন্তু খুব মেতে উঠল ছেলের স্টুডিও নিয়ে। পরিচিত-মহলে আস্ফালন করবার নতুন একটা বিষয় পাওয়া গেল, তার যে ছেলেকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না এতদিন, তার গুণপনা এবার দেখুক সবাই। প্রথম প্রথম রঞ্জত নিতান্ত অবহেলা-ভরে যে ছবিগুলো এঁকেছিল, এক ঝাঁক প্রজাপতি, একরাশ ফুল, একটা ময়ূর, ছিঁড়ে ফেলার আগেই কাঙালের মত সেগুলো সংগ্রহ করেছিল বাসন্তী এবং আরও সংগ্রহ করবার আশায় প্রায়ই যেত স্টুডিওতে। যা দেখত, যা পেত, এত বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তা নিয়ে যে, রঞ্জত বিরক্ত হ'ত।

একদিন সে ব'লেই ফেললে, ছবির তুমি কিছু বোঝ না মা। কতকগুলো বাজে ছবি বাঁধাচ্ছ খালি দামী ফ্রেম দিয়ে। কি হবে ওগুলো রেখে ?

আমার ভাল লাগে, তাই রাখি।

কিন্তু ওগুলো যে আমার আঁকা, তা ব'লে বেড়াতে পারবে না সকলকে। একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল বাসন্তী। মনে মনে একটু শঙ্কিতও হ'ল। আস্ফালন করবার জন্যেই সে ছবি সংগ্রহ করছিল না কেবল, উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বেড়াজালে বন্দী করবার চেষ্টাও করছিল তাকে। ধরবার ছোঁবার আগেই হীরক জেলে চ'লে গেল নিঃশব্দে। একে যেতে দেওয়া হবে না, ভুলিয়ে-ভালিয়ে আটকাতেই হবে কোন রকমে। রঞ্জতই তার লক্ষ্য, ছবিগুলো উপলক্ষ্য মাত্র।

যেন অসম্ভব কিছু একটা করতে বলছে, মুখের এমনই একটা ভাব ক'রে বাসন্তী বললে, আমি আর কার মুখ চাপা দেব, বল ? ননটু, ময়না, মিসেস হালদার, বক্সীর বউ, যে দেখছে, সেই প্রশংসা করছে। সেদিন আমার সঙ্গে সেই যে মেয়েটি এসেছিল, পূর্ণিমা ব্যানার্জি, সে তো বললে, নামজাদা,

ইটালিয়ান আর্টিস্টদের আঁকা ছবির চেয়েও তোর ছবি ভাল। 'খুনে' নাম দিয়ে যে ছবিটা এঁকেছিস, সেটা তো সে চেয়েই নিলে আমার কাছ থেকে। আমার দেবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মুখ ফুটে চাইলে যখন—

রজত ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ছবিতে রঙ দিয়ে যেতে লাগল কোন উত্তর না দিয়ে। অনেকক্ষণ উভয়েই চুপ ক'রে রইল। বাসন্তী ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেল। তন্ময় অথচ নির্ব্বিকার কে এ? প্রশংসা দিয়ে কি একে ভোলানো যাবে?

স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে হঠাৎ বললে, পূর্ণিমা মেয়েটিকে কেমন লাগল তোর?

দেখি নি ভাল ক'রে।

তোর যদি আপত্তি না থাকে তো বল্, সম্বন্ধ করি।

খুনে ছবিটা যদি ওর ভাল লেগে' থাকে, তা হ'লে ওর সঙ্গে সারা জীবন বাস করা যাবে না।

খুনে ছবির বিষয়ে পূর্ণিমা কোন মন্তব্যই করে নি। বস্তুত কোন বিষয়েই কিছু বলে নি সে। গল্পটা বাসন্তী বানিয়ে বলেছিল। নিজের অস্ত্রে নিজেই আহত হয়ে চুপ ক'রে রইল।

তোর খাবার টিফিন-কেরিয়ারে দিয়ে গেলুম, খাস যেন মনে ক'রে।

অত রকম খাবার আন কেন রোজ রোজ, কে খাবে অত?

আজ বেশি নেই।

বাসন্তী বেরিয়ে চ'লে গেল। কিছুতেই ছেলেটাকে বাগাতে না পেরে সে ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছিল। আর কেউ না বুঝলেও তার মাতৃহৃদয়ের কাছে এ কথা অবিদিত ছিল না যে, এই খেয়ালের খেলাঘরেও বাঁধা পড়ে নি, আর এক খেয়ালের ঝোঁকে এক নিমিষে সমস্ত চুরমার ক'রে দিয়ে চ'লে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না ও।

কিছুদিন নির্ব্বিঘ্নেই কাটল। তার কারণ, রজত নিজেই জেদ ক'রে নিজেকে বন্দী ক'রে রেখেছিল। খবরের কাগজ পড়ত না, পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা করত না, পাছে দেখা হয়ে যায়—এই ভয়ে ট্যাক্সি ছাড়া রাস্তায় বেরুত না সে। স্টুডিওর দরোয়ানের ওপর কড়া হুকুম ছিল, বাড়ির লোক ছাড়া আর কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়। সে যেন চোখ বুজে কানে তুলো দিয়ে

বাইরের খবরকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। সে খবর ভয়ঙ্কর, তা জানতে পারলেই শরীরের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠবে, তার হলকায় শিল্পকলার সমস্ত সৌন্দর্য্য পুড়ে কালো হয়ে যাবে এক নিমিষে—এ ধারণা তার ছিল ব'লেই জোর ক'রে সে নিজেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল রাজনৈতিক আবর্ত্ত থেকে। বারম্বার বোঝাতে চেষ্টা করছিল মনকে—ছবির জগতেই মূর্ত্ত কর তুমি নিজেকে। নখদন্তের নির্ব্বিচার ব্যবহার করতে সঙ্কুচিত হও যখন, তখন পশুর জগতে তোমার স্থান নেই। নিরন্তর এই মন্ত্র জপ ক'রে সে ক্রমাগত ছবি এঁকে যাচ্ছিল। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে একটা অস্বস্তির তুষানল ধিকিধিকি জ্বলছিল গোপনে গোপনে। নানা রঙের প্রলেপ দিয়েও আহত আত্ম-সম্মানের কুৎসিত কালো রঙটাকে কিছুতেই অবলুপ্ত করতে পারছিল না সে একেবারে।

মনে হ'ত, ভীরু ভীতু নপুংসক আমি, তাই পালিয়ে এসেছি, যতীন ঘোষের বিধবাকে বাঁচিয়ে তার স্বামীপুত্রকে হত্যা করতে পেরেছিল যে, সে-ই বীর। তুলি থেমে যেত। মনে পড়ত ইন্দুপিসীর কথাগুলো, পুলিস-অফিসাররা মরতে ভয় পায় না, তারা জানে যে তারা ম'রে গেলে তাদের স্ত্রীপুত্রদের গভর্মেণ্ট প্রতিপালন করবে। চাকরি দেবে, জায়গীর দেবে। তাই পুলিস-অফিসারটিকে মেরে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না, তাদের বংশলোপ করতে হবে। বিধবাটা বেঁচে থাকবে শুধু হাহাকার করবার জন্যে।

রজত শিউরে উঠত, প্রাণপণে চেষ্টা করত ছবিতে মন দেবার। লজ্জায় ক্ষোভে আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত সমস্ত অন্তর।

হঠাৎ একদিন স্টুডিওতে এসে দেখলে, তার টেবিলের ওপর মোটা লম্বা খাম রয়েছে একখানা। দরোয়ান বললে, বাইসিক্লে ক'রে এক বাবু এসে চিঠিখানা দিয়ে গেছেন। কোন ঠিকানা নেই—খোলা খাম। তার থেকে বেরুল এক তাড়া কাগজ এবং খবরের কাগজের কাটিং। রজত পড়তে লাগল এবং পড়তে পড়তে নিজের অজ্ঞাতসারেই চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধ'রে গেল তার। করাচী কংগ্রেসের পর থেকে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক খবর লেখা ছিল কাগজগুলোতে। সে এতদিন ইচ্ছে ক'রেই কিছু জানতে চায় নি, জানবার পর কিন্তু পাগল হয়ে উঠল। কংগ্রেস কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী একাই চ'লে গেছেন বিলেতে গোল-টেবিল-বৈঠকে যোগ দেবেন ব'লে।

কংগ্রেসের এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভঙ্গিতে রজতের আপাদমস্তক জ্ব'লে উঠল যেন। লর্ড আরুইনও বিদায় নিয়েছেন এবং তার পরিবর্ত্তে এসেছেন লর্ড ওয়েলিংডন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে প্যাক্ট করবার দুর্ব্বলতা দেখিয়ে খ্রীষ্ট-প্রতিম লর্ড আরুইন ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের যে মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন, লর্ড ওয়েলিংডন সেই মর্য্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। প্যাক্টের শর্ত্ত যে গভর্মেণ্টের তরফ থেকে পুরোপুরি প্রতিপালিত হচ্ছে না, এ কথা জেনেও মহাত্মাজীর বিলেত যাবার আবেগ কিছুমাত্র কমে নি। গুজরাটের চাষীদের বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দিতে নানা বখেড়া করেছেন গভর্মেণ্ট, যুক্ত প্রদেশের গরিব চাষীদের খাজনা মাপ করা হয় নি, বাংলা দেশে এখনও দলে দলে লোককে বিনা বিচারে আটক করা হচ্ছে। মহাত্মাজী শেষ মুহূর্ত্তে এসব সম্বন্ধে যা হোক একটা আপোস ক'রে বিলেত চ'লে গেছেন। সবাই কিন্তু চুপ ক'রে থাকে নি। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থীরা ছাড়া বাকি সকলে তারস্বরে প্রতিবাদ করেছে প্যাক্টের। বাংলা দেশ প্রতিবাদ করেছে আরও সক্ষমভাবে। কিছুদিন আগেই ঢাকা-ময়মনসিংহে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার অন্তরালে যে রূঢ় সত্য প্রত্যক্ষ করেছে বাঙালী, তার ফলে মিস্টার লোম্যানকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আসামীকে খোঁজবার জন্যে পুলিস বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যে কাণ্ড করছে…হঠাৎ হাত থেকে কাগজের তাড়াটা কে যেন ছিনিয়ে নিলে। রজত চমকে চেয়ে দেখলে, ইন্দু-শুভ্রা। তার চোখে মুখে যেন ঝঞ্ঝা স্তব্ধ হয়ে আছে।

অতিশয় ধীরকণ্ঠেই সে কিন্তু বললে, এ নিয়ে আর তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন, এগুলো আমার জন্যে এসেছে।

আমি যদি ঘামাই, ক্ষতি কি?

এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার অধিকার নেই তোমার। তুমি ছবি আঁক।

রজতের মনে হ'ল, তার গালে কে যেন চড় মারলে একটা।

ইন্দু-শুভ্রা কাগজের তাড়াটা হাতে ক'রে চ'লে যাচ্ছিল।

ছোট পিসী, যেও না, একটা কথা শোন আমার।

কাগজগুলো পড়বার পর রজতের যে ব্যবহার ইন্দু প্রত্যাশা করেছিল, রজতের কম্পিত কণ্ঠস্বরে তারই আভাস পেয়ে ফিরে দাঁড়াল সে।

তোমার প্রলাপ শোনবার অবসর আমার নেই। সত্যি যদি কাজ করতে চাও, সঙ্গে আসতে পার।

বাধ্য বালকের মত উঠে গেল রজত-শুভ্র।

প'ড়ে রইল স্টুডিও আর চতুর্দ্দিকে ছড়ানো অসংখ্য ছবি।

এর পর কিছুদিন তার যে ভাবে কাটল, তার বর্ণনা সে নিজেও বোধ হয় করতে পারত না সম্পূর্ণভাবে। সব কথা সম্পূর্ণভাবে জানবার সুযোগই হয় নি তার। অন্ধভাবে যন্ত্রচালিতবৎ যেসব কাজ তাকে করতে হয়েছে, তার কোন অর্থই সে বুঝতে পারে নি অনেক সময়ে। বোঝবার হুকুমও ছিল না। ছবিই আঁকতে হয়েছে নানা রকম। উড়ন্ত পাখীর, ঘুমন্ত শিশুর, ভিখারীর, তরুণীর, মন্দিরের, ঘড়ির, কত রকম যে তার ঠিক নেই। ছবিগুলোর সংকেত যে কি, কার কাছে সেগুলো কবে কেন পাঠানো হচ্ছে, এসব কিছুই জানবার উপায় ছিল না। দিনকতক রিভলভার নিয়ে চাঁদমারি করতে হ'ল এক অচেনা পল্লীগ্রামের জনমানবহীন ধ্বংসোন্মুখ বাগান-বাড়িতে গিয়ে। সেই নিঃসঙ্গ পুরীতে চোরের মতন লুকিয়ে বাস করতে হ'ত শুকনো পাঁউরুটি চিবিয়ে, আর যে কোনও বস্তুর ওপর গুলি চালিয়ে ঠিক করতে হ'ত হাতের লক্ষ্য। ঠিক ছিল, পরীক্ষক আসবেন একদিন। হঠাৎ অচেনা যুবক এলেন একজন কোন খবর না দিয়েই, আবির্ভূত হলেন যেন ঝোপের ভেতর থেকে। পকেট থেকে বার ক'রে দেখালেন তারই আঁকা উড়ন্ত পাখীর ছবি, বোঝা গেল দলেরই লোক। গাছ থেকে একটা ডাব পেড়ে পুকুরের জলে ভাসিয়ে বললেন, মারুন দিকি। রজতের হাতের লক্ষ্য দেখে খুশি হয়ে গেলেন। বললেন, আচ্ছা, আপনি কলকাতায় ফিরে যেতে পারেন। হাওড়া স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে কালো রঙের সাহেবী স্যুট-পরা এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করবেন আপনার জন্যে, কাল ঠিক বেলা বারোটার সময়। তিনি আপনাকে যথাস্থানে নিয়ে যাবেন। কালো সাহেবী স্যুট-পরা ভদ্রলোক তাকে নিয়ে গেলেন একটা হোটেলে। সেখানে আরও কয়েকটি যুবক অপেক্ষা করছিল। নাম লটারি করা হ'ল। রজতের নাম উঠল না, উঠল বিনয়ের। মিস্টার সিম্‌প্‌সনকে গুলি করবার ভার পড়ল তার ওপর। রজতকে বলা হ'ল, পরশু রাত্রে তুমি লুপ লাইনের মোথা আর কহলগাঁয়ের মাঝামাঝি জায়গায় রেল-লাইনের বাঁ ধারে দাঁড়িয়ে

থাকবে টর্চ হাতে ক'রে। লুপ এক্স্‌প্রেস যখন যাবে, তখন কয়েকবার টর্চ জ্বালাবে কেবল, আর কিছু করতে হবে না তোমাকে। অন্ধকার রাত্রে এক-হাঁটু ঘাসের মধ্যে প্রেতের মতন দাঁড়িয়ে রইল সে। যথাসময়ে টর্চও জ্বালালে, কিন্তু কেন তা জানবার উপায় ছিল না। এই ষড়যন্ত্রের বিরাট ফ্যাক্টরিতে সে যেন একটা 'নাট' কিংবা 'বল্টু', যখন যেখানে দরকার লাগানো হচ্ছে তাকে। রিভলভারও সংগ্রহ ক'রে বেড়াতে হ'ল আবার কিছুদিন। সায়ানাইডও। নানা রকম ছদ্মবেশ ধ'রে একজন সি. আই. ডি. অফিসারের পেছনে ঘুরে ঘুরে তার গতিবিধির ইতিহাসও যোগাড় করতে হ'ল। সুসঙ্গে কুসঙ্গে অনাহারে অনিদ্রায় পদব্রজে ট্রেনে স্টীমারে নৌকোয় কত জায়গায় কত দুর্গতির মধ্যে ঘুরে বেড়ালে যে সে, তার আর ইয়ত্তা নেই। কিছুদিন পরে মনে হতে লাগল, তার দেহ-প্রাণ-মন-আত্মা কিছুই যেন তার নিজের নয়। হৃদয়ের নেপথ্যলোকে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের বিদ্যুৎ চিকমিক ক'রে উঠত। মনে হ'ত, নির্ব্বিচারে এমন ভাবে নিজের স্বাধীন সত্তার শ্বাসরোধ করা কি ঠিক হচ্ছে? তখনই মনে পড়ত ছেলেবেলায় পড়া সেই ইংরেজী কবিতাটা, They are not to make reply, They are not to reason why, They are but to do and die…… প্রাণপণে আত্মসম্বরণ ক'রে থাকত সে। বহুদিন আগে ট্রামে সাহেবের সুন্দর মুখশ্রী দেখে তার মনে যে সুকুমার-বৃত্তি জেগে উঠেছিল, সবলে তার টুঁটি চেপে ধরবার চেষ্টা করত সে। বার বার আবৃত্তি করত মনে মনে, ওসব দুর্ব্বলতাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, You are but to do and die। মেরে মরবার জন্যে প্রস্তুতই হয়েছিল সে মনে মনে, লটারিতে নাম উঠলে সে-ই যেত।…হঠাৎ খবর এল, সিম্‌প্‌সন মারা পড়েছে, কিন্তু বিনয়ও পালাতে পারে নি। ধরা প'ড়ে গেছে সে। একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হ'ল, লুকিয়ে পড়ল সবাই। হ্যাঁ, ভয়ে ভয়েই। খবর এল, পুলিস তার বাড়ি সার্চ করেছে। চট্টগ্রামে, ঢাকায়, মেদিনীপুরে প্রতি ঘরে ঘরে পুলিস হানা দিচ্ছে। গ্রেপ্তার করেছে অনেককে। অনেক নিরীহ লোককে, বিপ্লবের 'ব'ও যারা জানে না। তবু চোরের মত আত্মগোপন ক'রে থাকতে হ'ল। পুলিসের ছায়ামাত্র দেখলে পালিয়ে যেতে হ'ত, বেরালের ভয়ে ইঁদুর যেমন পালায়। পালিয়ে গিয়ে কিন্তু লজ্জায় মাথা কাটা যেত তার। এ কি হীনতা! একদিন সে দলপতিকে বললে, এ রকম পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে,

আসুন, আমরা প্রকাশ্যভাবে সবাই মিলে আক্রমণ করি ওদের। যদি কিছু নাও করতে পারি, ওদের গুলি খেয়ে রাস্তায় ম'রে প'ড়ে থাকাও ঢের বেশি গৌরবজনক। তিনি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, ওয়েট, ইওর চান্স উইল কাম। কিন্তু কিছুতেই চান্স এল না তার। আরও তিন তিন বার লটারি হ'ল, কিন্তু কিছুতেই তার নাম উঠল না। পর পর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট মারা গেল মেদিনীপুরে, কিন্তু তার ভাগ্যে এক লুকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার সুযোগ এল না। কি গ্লানিকর এই লুকিয়ে থাকা! ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরের লোমহর্ষণ কাহিনী সব কানে আসছে, তবু লুকিয়ে থাকতে হবে নিজের প্রাণ-ভয়ে নয়, দলের খাতিরে! অসংখ্য নিরীহ লোক নির্য্যাতিত হচ্ছে, কিন্তু মুখ ফুটে সত্য কথা বলবার উপায় নেই। হিজলি ক্যাম্পে রাজবন্দীদের ওপর গুলি চলল—সন্তোষ মিত্তির, তারকেশ্বর সেন ম'রে গেল, তবু স্থির হয়ে থাকতে হবে। শুধু বাংলা দেশ নয়, অন্যত্রও অশান্তির আগুন জ্বলছিল। পশ্চিম-সীমান্তে আবদুল গাফ্ফার খাঁ এবং তাঁর খুদাই খিদমৎকাররা পুলিসের বেড়াজালে ধরা প'ড়ে জেলে পচছিলেন। খাজনা দিতে অসমর্থ যুক্তপ্রদেশের চাষীরা কিষাণ-সভার নেতৃত্বে আবার নো-রেণ্ট-ক্যাম্পেন শুরু করতে উদ্যত হওয়ায় নিজেদের মান বাঁচাবার জন্যে কংগ্রেস সে ক্যাম্পেন শুরু করেছিলেন, কিন্তু গভর্মেণ্ট নূতন অর্ডিনেন্স ক'রে সব থামিয়ে দিলেন। সেখানেও দলে দলে লোক জেলে যাচ্ছে। হঠাৎ খবর এল, গোল-টেবিল-বৈঠক থেকে মহাত্মা গান্ধী শূন্যহস্তে বম্বেতে অবতরণ করেছেন যদিও, তবু মহাসমারোহ প'ড়ে গেছে সেখানে। জওহরলাল এবং সেরওয়ানি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ট্রেনেই পুলিস গ্রেপ্তার করেছে তাঁদের। দেশে যখন তুমুল ঝড় বইছে, তখনও ভস্ম মেখে দাড়ি-জটা প'রে রঞ্জতকে লুকিয়ে থাকতে হবে! খবর এল পুলিস আরও দুবার তার বাড়ি সার্চ করেছে, মাকে বউদিদিকে পর্য্যন্ত অপমান করেছে নাকি! বাড়ি ফিরে যাবে কি না ভাবছিল, এমন সময় বড়লাটের সঙ্গে টেলিগ্রাম-চিঠিপত্র আদান-প্রদান ক'রে মহাত্মাজী আবার শুরু ক'রে দিলেন সত্যাগ্রহ-আন্দোলন। গভর্মেণ্ট এবার প্রস্তুতই ছিলেন। তাঁরাও কংগ্রেস সম্পর্কিত সব-কিছুকে ঘোষণা করলেন বে-আইনী ব'লে। পুলিসের আইন অমান্য ক'রে তবু কিন্তু শুরু হয়ে গেল পার্কে পার্কে মাঠে মাঠে সভা, বেরুতে লাগল বড় বড় শোভাযাত্রা পথে পথে। জওহরলাল নেহেরুর বৃদ্ধা জননী

পুলিসের হাতে মার খেলেন এক শোভাযাত্রার নেত্রীরূপে, থামলেন না তবুও। শুরু হ'ল পিকেটিং, শুরু হ'ল বয়কট, উড়তে লাগল আবার ত্রিবর্ণ-পতাকা হাটে বাটে মাঠে, হর্ম্যে মন্দিরে কুটীরে, গাইতে লাগল সবাই স্বদেশী গান, তৈরি হতে লাগল নুন। কংগ্রেস-অধিবেশন দিল্লীতেই বসল, সভাপতি মদনমোহন মালবীয়কে গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও। চাঁদনি-চকের ক্লক-টাওয়ারের নীচে বসল, আমেদাবাদের রণছোড়দাস অমৃতলাল সভাপতিত্ব করলেন। পুলিস বাধা দিলে অবশ্য, কিন্তু কংগ্রেস-অধিবেশন বসল এবং কংগ্রেস তার পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষণা না ক'রে ছাড়ল না। ভ'রে উঠতে লাগল ভারতবর্ষের সমস্ত জেল। রজত যদিও গান্ধী-ভক্ত নয়, তাঁর গোল-টেবিল-বৈঠকে যাওয়া, তাঁর সমস্ত কার্ড টেবিলের ওপর রাখা, রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অহিংসা-মন্ত্র প্রচার, তাঁর প্রথমে ছলে-বলে-কৌশলে বামপন্থীদের ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা এবং পরে বেগতিক বুঝলেই অপটুভাবে তাদের অনুসরণ করা, তাঁর গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট, কথায় কথায় উপবাস, এর কোনটাই রজতের পছন্দ হ'ত না, তবু কিন্তু সত্যাগ্রহীদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। এক-একবার ইচ্ছে করতে লাগল, ছুটে গিয়ে ওদের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে পুলিসের মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়তে, পারলে না কেবল দলের খাতিরে। স্পোর্টস্‌ম্যান-লাইক হবে না ব'লে। অসীম কষ্ট সহ্য ক'রে অজ্ঞাত-বাসই সে করতে লাগল।...ম্যালেরিয়া ধরল, ডিসেন্টি্‌ হ'ল, খাবার ঠিক নেই, শোবার জায়গা নেই, তবু কিন্তু আত্মপ্রকাশ করলে না সে। যত কষ্টই হোক, দলের আদেশ মানতে হবে। হঠাৎ একদিন দলের একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও রজতকে চিনতে পেরেছিল সে। আড়ালে ডেকে বললে, পালাও, পালাও, বনে জঙ্গলে হিমালয়ে বর্মায় যেখানে পার, পালাও শিগগির। আমাদের দলের কয়েকজন অ্যাপ্রুভার হয়েছে, আরও হবে। যে কজনের নাম করলে, তারা সবাই রজতের পরিচিত। এরা অ্যাপ্রুভার হয়েছে?...নির্বাক হয়ে ব'সে রইল সে। মনে হ'ল, পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য আর কিছু নেই যেন...পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে। হঠাৎ ঠিক ক'রে ফেললে, যে দলে অ্যাপ্রুভার থাকে, সে দলের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না সে। সে দলের হুকুম মানবার প্রয়োজন নেই আর, স্পোর্টস্‌ম্যানদের সঙ্গেই স্পোর্টস্‌ম্যান-লাইক ব্যবহার করা চলে, বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে নয়। আর সে অজ্ঞাতবাস করবে না, আত্মপ্রকাশ করবে এবার। পুলিস যদি ধরে,

ধরুক। এর মধ্যে বরং খানিকটা বীরত্ব আছে, লুকিয়ে থাকার মধ্যে নেই। জটা-দাড়ি খুলে ফেলে একটা পুকুরে নেবে ভাল ক'রে স্নান করলে সে। স্নান ক'রে উঠে ব্যাগ থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি বার ক'রে পরতে পরতেই কিন্তু কম্প দিয়ে জ্বর এল—ভীষণ কম্প। কিছুদূর গিয়েই আর চলতে পারলে না সে। রাস্তার ধারে একটা বাড়ির সামনে শুয়ে পড়ল চোখ বুজে, ব্যাগটা মাথায় দিয়ে। দিন দশেক পরে যখন চোখ খুললে, তখন দেখলে, রাস্তায় নয়, বিছানায় শুয়ে আছে সে এবং তার দিকে উৎসুক আগ্রহে চেয়ে আছে একজোড়া কালো চোখ। কাজল।

ক্রমশ

"বনফুল"

গড়ার কাজ এবং তাহা রক্ষা করার কাজ

একটি রূপক

এক বাড়িতে ভাই আর বোন থাকিত। বোন বড়, ভাই ছোট। ছোট হইলেও ভাইয়ের দুরন্তপনার সীমা ছিল না। রাতদিনই সে বাগানে বাগানে ঘুরিয়া কোথায় পাখীর বাসা, কোন্ গাছে ফল পাকিয়াছে, তাহারই সন্ধানে সময় কাটাইত। দিদির ছিল বাগানের শখ। সে খেলার সাথীদের বাড়ি হইতে ফুল তুলিয়া আনিত, গাছের চারা সংগ্রহ করিয়া সেগুলিতে সযত্নে জল দিত। আবার ফুল ধরিলে ভাইবোনে মিলিয়া সরস্বতীপূজার সময়ে সেই ফুলে অঞ্জলি দিত।

এমনই ভাবে দুইজনে বড় হইতে লাগিল। একদিন ভাইয়েরও দিদির মত বাগান করিবার শখ হইল। বাহিরে বৈঠকখানার পাশে পাঁচিলের ধারে কতকগুলি আগাছা জন্মিয়াছিল। সে কোদাল দিয়া চাঁচিয়া জায়গাটি পরিষ্কার করিল, কোথা হইতে বুনো ফুলের একটি গাছ আনিল এবং পাছে ছাগলে খায় এই ভয়ে এক বৃহৎ বাঁশের বেড়া বাঁধিতে বসিল। দিদির বাগানে কিন্তু বেড়া নাই। সে সর্বদাই ঘরে থাকে, সতর্কভাবে বাগানে পাহারা দেয়। দিদি ভাইকে ডাকিয়া বলে, অত উঁচু বেড়া বাঁধিও না; লোকে যে তোমার ফুলগাছই দেখিতে পাইবে না। তারপর জিজ্ঞাসা করে, ভাই, তোমার কিসের গাছ? ভাই বলিতে পারে না, সে অতশত জানেও না। শেষে দিদি বৈঠকখানার ধারে গিয়া দেখে, ভাই ধুতুরাফুলের গাছ লাগাইয়াছে। তখন সে হাসিয়া বলে, এরই জন্তে এত বড় বেড়ার ঘটা!

• • •

আমাদের দেশে আগে সমাজের মধ্যে মানুষের ভাত-কাপড়ের যে বন্দোবস্ত ছিল, তাহা বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি এবং যত্নের প্রয়োজন হইত। কিন্তু পরাধীন হওয়ার পর বহুদিনের অযত্ন-অবহেলায় সেখানে ধনতন্ত্রের রসে পুষ্ট নানাবিধ আগাছার উদ্ভব হইয়াছে। কচুরিপানা যেমনভাবে ক্রমে ক্রমে দেশের পুকুর খাল বিল সব ছাইয়া ফেলে, এই আগাছাগুলিও তেমনই বাড়িয়া গ্রাম্যজীবনের সহজ স্রোতের কণ্ঠরোধ করিয়া বসিয়াছে। যে-সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া লোকে আগে সুখে ঘরকন্না করিত, আজ সেই কাজে দুমুঠা অন্নও জোটে না। আগাছার মত যে-সকল নূতন বৃত্তি পুরাতনের স্থান দখল করিয়াছে, সেগুলির পরিবর্তে আবার নূতন নূতন বৃত্তির পত্তন করিতে হইবে। ধুতুরার মত শুধু বাহারে ফুলের শোভায় মজিয়া থাকিলে চলিবে না। যে-চাষ করিলে মানুষের জীবন আবার স্বাস্থ্যে সম্পদে স্বাধীনতায় পুষ্টিলাভ করে, তাহার সন্ধান করিতে হইবে, এবং সদাজাগ্রত দৃষ্টি লইয়া নূতন জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

আগাছার পরিচয়

বীরভূম জেলা ধানের দেশ। লোকে পূর্বকালে এদেশে ধান ছাড়া তুলা, সরিষা, আখ এবং প্রয়োজনমত রেড়ী, শণ প্রভৃতি বুনিত। গৃহস্থের চেষ্টা ছিল যেন নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য গাঁ ছাড়িয়া দূরে কোথাও যাইতে না হয়। গাঁয়ের মধ্যে কামার, কুমার, ছুতার, ধোপা, নাপিত, মালীর বাস ছিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রতি বৎসর গৃহস্থের কাছে ধানের একটি বাঁধা অংশ পাইত। কাহারও বা চাকরান জমির বরাদ্দ ছিল। যে-জিনিস এক গ্রামে করা সম্ভব নয়, অথবা সর্বদা খরিদ করার প্রয়োজন নাই, তাহা গৃহস্থেরা শীতকালে ধান কাটার পর বিভিন্ন মেলায় গিয়া খরিদ করিয়া আনিত, কোন মেলায় প্রধানত গরু-বাছুর বিক্রয় হইত, কোথাও বা লাঙল ঘরের দুয়ার জানালা, কোথাও বা কাপড় অথবা বাসনের খ্যাতি ছিল। কখনও কখনও আবার গৃহস্থ কাশী, বৃন্দাবন অথবা শ্রীক্ষেত্রের মত সুদূর তীর্থে গিয়া সেখানকার বাসন, পট প্রভৃতি শখের জিনিস খরিদ করিয়া আনিত এবং সেগুলি পুরুষানুক্রমে ছেলেপিলেরা ব্যবহার করিত।

দেশের মধ্যে চাষেরও তখন সুব্যবস্থা ছিল। গ্রামের মধ্যে অনেকে তাঁত বা অন্যবিধ শিল্প লইয়া থাকিত, চাষী আপন মনে চাষের কাজ করিত। তখন অজয় নদে বান আসিলে ঘোলা জলে মাঠঘাট ভরিয়া যাইত, কানা নদী এবং ছোটখাট কাঁদরগুলির পথে সেই জল সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িত। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়-ধোয়া পলিমাটির সংযোগে মাঠের শক্তি দ্বিগুণ বর্ধিত হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে পুকুরগুলিও সেই জলে ধুইয়া আবার মাছের পোনায় ভরিয়া উঠিত। একটু তদারক বানের জলকে নিয়ন্ত্রণ করিতে

পারিলে গৃহস্থের গোলা ধানে ভরিয়া উঠিত, পুকুরে যথেষ্ট মাছ হইত এবং গৃহস্থের প্রসাদে গ্রামের শিল্পীকুলেরও দেহ এবং মন স্বাস্থ্য ও আনন্দে পূর্ণ থাকিত।

কিন্তু কালক্রমে যেন এই ব্যবস্থার উপরে শনির দৃষ্টি লাগিল। পূর্বে এ দেশের ব্যবসাবাণিজ্য বেশির ভাগই অজয় নদীর পথে নৌকায় চলাচল করিত, আজকালকার মত এত গরুর গাড়ির চলন তখন ছিল না। অজয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে তাঁতী বা গালার কারিগরদের বাস ছিল। তাহাদের হাতের সুন্দর কাজ বিলাতে চালান দিয়া ওলন্দাজ অথবা ইংরেজ ব্যাপারীরা বেশ দু-পয়সা কামাইতেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেশের রাজশক্তি ইংরেজ কোম্পানির হাতে যাওয়ার ফলে পূর্বতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। এখানে তৈয়ারি শিল্পদ্রব্য বেচিয়া যে সামান্য লাভ হইত, শক্তিশালী বণিকদের আর তাহাতে মন ভরিল না। সমগ্র উত্তর-ভারতে বিলাতী মালের কাটতি বাড়াইবার জন্য সরকার তখন হাবড়া, হুগলী, বর্ধমান এবং বীরভূমের চাষীর সুখসুবিধার প্রতি দৃকপাত না করিয়া রেলের লাইন পাতিবার ব্যবস্থা করিলেন। রেলপথে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন গ্রাম হইতে ইষ্টিশান পর্যন্ত পাকা সড়ক বাঁধিয়া দেওয়া হইল। ধানের দর চড়িল, গাঁয়ের লোকে নগদ পয়সার প্রয়োজনে গরুর গাড়ি বা নৌকা বোঝাই করিয়া সেই মাল শহর-বাজারে বেচিয়া বেশ দু-পয়সা কামাইতে লাগিল।

ধান বেচিয়া যে পয়সা হইতে লাগিল, গৃহস্থেরা এবার তাহার সাহায্যে কলের কাপড়, কলের চিনি এবং কলের সরিষার তেল খরিদ করিতে লাগিল। মাটি অথবা পিতল-কাঁসার পরিবর্তে এনামেল করা অথবা এলুমিনিয়মের বাসন ধরিল এবং তাহাদের পায়ে গাঁয়ে তৈরি মোটা চটিজুতার পরিবর্তে চামড়া অথবা ক্যাম্বিসের জুতা স্থান পাইল। ফলে গাঁয়ের গৃহস্থের আপাতত বাবুয়ানার কিছু সুবিধা ঘটিলেও তাহার পাশের ঘরে কলু, তাঁতী, কাঁসারী, স্যাকরা বা মুচীর বৃত্তিনাশ হওয়ার ফলে সর্বসাকুল্যে গ্রামের মধ্যে দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল।

সরকার আমদানি-রপ্তানির সুবিধার জন্য অজয় নদীর উপরে যে পুল বাঁধিয়াছিলেন এবং নদীর সমান্তরাল যে-সকল পাকা সড়ক বাঁধিয়াছিলেন, তাহার তাড়নায় আজকাল বন্যা আসিলে তাহা যেন আর বাগ মানিতে চায় না। বন্যার জল মাঠের পরে মাঠে হানা দিয়া বালিতে বোঝাই করিয়া দেয়, আবার কোনদিকে বা জল আদৌ পৌঁছায় না। কানা নদী ও কাঁদরগুলি কচুরিপানায় ভরিয়া উঠে। মাঠের মধ্যে সেঁচের পুকুরগুলিও মজিয়া পচা ডোবায়, নয়তো শেষে চাষের জমিতে পরিণত হয়। সেঁচের অভাবে রবিখন্দের চাষ কমিয়া আসিল, চাষী একান্তভাবে একটি ফসল বিক্রির মুনাফার উপর নির্ভর করিতে লাগিল। এদিকে তাঁতী, মুচী প্রভৃতি শিল্পীকুলের কাজ যাইতে বসিল। কেহ দিনমজুরি ধরিল, কেহ গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল। অনেকেই চাষের দিকে ভিড় করিতে

লাগিল। গোচারণের ভূমি, জালানি কাঠের জঙ্গল সব কাটিয়া ধানের ক্ষেত হইল। গরুর খাদ্যাভাব ঘটিতে লাগিল। লোকে কাঠের অভাবে গোবর পোড়াইতে আরম্ভ করিল। আনাড়ী চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও সারের একান্ত অভাবের ফলে জমির ফলনও ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতে লাগিল।

এদিকে মানুষের অভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যেও নানা অনাচার দেখা দিল। চুরি-ডাকাতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হাড়ী ডোম বাগদী বাউরী দুলে প্রভৃতি জাতির মধ্যে যাহারা শরীর একটু ভাল রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাদের ভিতর কিছু লোক লাঠিয়াল হইয়া দাঁড়াইল। বামুন-কায়েতেও আগে ভালরকম লাঠি ধরিতে পারিত। নানা কারণে তাহাদের সমবেত শক্তি ক্ষয় হওয়ার ফলে তাহারা ছলে অথবা কৌশলে নিম্নশ্রেণীর বলিষ্ঠ লোককে অধীনে রাখিবার ফন্দী খুঁজিতে লাগিল। সরকার বাহাদুর শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে দেশের গরিব অথচ বলিষ্ঠ নিম্নশ্রেণীর প্রজাকে দশ ধারার মামলায় ফেলিয়া বিপর্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এবং এই কাজে উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত বা ধনীশ্রেণীর লোক সরকার বাহাদুরের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। ফলে গ্রামের অধিবাসীগণের মধ্যে পূর্বে অন্নের ও তৎসহ সহযোগিতা ও প্রেমের যে বন্ধন ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়া সমস্ত সমাজকে শিথিল করিয়া দিল, বাঙালীর জীবনও ক্রমে শক্তিহীন হইয়া পড়িল।

কিন্তু ইহার ফলে কাহারও কি কোথাও সুবিধা হয় নাই? হইয়াছিল। কিন্তু তাহা শুধু ধনী এবং মধ্যবিত্ত লোকের। তাঁহারা ধান-চালের কারবারে নানা দিক হইতে বেশ দু-পয়সা কামাইতে লাগিলেন। ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি ক্রমে ছোটখাট শহরে পরিণত হইল। গাঁয়ের মধ্যে দুলী, তাঁতী এবং হাড়ী-মুচীদের ঘরের সুন্দরী মেয়ে দারিদ্র্যের চাপ আর সহ্য করিতে না পারিয়া শহরের পল্লীতে ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিল। ম্যালেরিয়া বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ে যে দু-চার ঘর ভদ্রলোক তখনও টিকিয়া ছিলেন, তাঁহারা ছেলেমেয়ের লেখাপড়া উপলক্ষ্যে অথবা রোগে চিকিৎসা এবং পথ্যের সুবিধা হইবে ভাবিয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে বাসা বাঁধিলেন। তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া শহরে ইস্কুল বসিল, হরিসভার পত্তন হইল, ডাক্তার মোক্তার লেখক বা নাট্যকারগণের কারবার দিনের পর দিন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতে লাগিল।

যাঁহারা শুধু শহরটুকু দেখিলেন, তাঁহারা খুশি হইলেন বটে; কিন্তু যাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে মরা গ্রামগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন, নূতন অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফলে গ্রামগুলিকে সংহার করিয়াই শহরের শ্রীবৃদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে। কিন্তু এ শ্রী সম্পদের শ্রী নয়, কল্যাণের লক্ষ্মী নয়। লক্ষ্মীর সত্যিকারের আসন ধানের গোলায়, কারিগরের কর্মশালায়। তাহার পরিবর্তে টাকার হাঁড়ির উপরে লক্ষ্মীর আসন রচনা করিতে গিয়া

মানুষ স্বাস্থ্য হারাইতেছে, সম্পদ হারাইতেছে, এবং সকলের চেয়ে বড় কথা, নিজের ও সমাজের জীবনের উপরে সমস্ত কর্তৃত্ব হারাইতে বসিয়াছে। শুধু লোভের বশে, পরিশ্রম-বিমুখতার বশে নিজের কল্যাণের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সর্বনাশ সাধন করিতেছে।

নূতন জীবনের চারা ও তাহা বাঁচানোর চেষ্টা

আজ দেশসুদ্ধ লোক মাটি হইতে রস সংগ্রহ না করিয়া পরগাছার মত ধনতন্ত্রের বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া টিকিয়া আছে। নিজের মরা-বাঁচার উপরে তাহার সকল অধিকার হারাইয়া বসিয়াছে। জগতের বাজারে যদি ধানের দর উঠে, তবে চাষীর ভাগ্যে দুপয়সা জোটে, ছেলেমেয়েরা দুমুঠা খাইতে পায়। কাপড়ের বাজার যদি চড়া হয়, তাহা হইলে পরনের কাপড় কমাইতে হয়, শীতের দিনে কষ্টের আর সীমা থাকে না, কোলের কাছে আগুনের মালসা লইয়া রাত কাটাইতে হয়। সম্বৎসর চাষীর হাতে কাজ থাকে না। সামর্থ্য বা ইচ্ছা থাকিলেও কাজ জোটে না। এমন পরমুখাপেক্ষী জীবনে সুখ কোথায়?

তাই আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় নূতন জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। পরগাছার মত ধনতন্ত্রের বিষবৃক্ষের রস আহরণ না করিয়া মাটির রসে মানুষের সুস্থ কান্তি ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সেই নূতন জীবনের ব্যবস্থায় কেহ আর কাজের অভাবে কষ্ট পাইবে না। সকলে স্বাস্থ্যের অনুকূল খাওয়া পরা ও বাসস্থান লাভ করিবে। সমাজে উঁচু-নীচু ভেদ থাকিবে না। গান্ধীজী মনে করেন, সকলের আয়ও সমান হওয়া উচিত। মুচী কামার কুমার সকলে গাঁয়ের জনসমূহের সেবা করে। ডাক্তার মোক্তার বা শিক্ষকও তাহাই করেন। কাহাকেও বাদ দিয়া সমাজ চলে না। এক পরিবারের মধ্যে যেমন কেহ একরকম কাজ করে, কেহ অন্যরকম, সমাজের মধ্যেও তেমনই সকলে নিজের সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়া ভাই-ভাইয়ের মত বসবাস করিবে। আমি মাষ্টারি করি বলিয়া কামারের চেয়ে আমার রোজগার বেশি হওয়া উচিত নয়। পণ্ডিতকে মানুষে বেশি সম্মান করিতে পারে বটে, হয়তো বা পালাপার্বণে দুইটা কলামুলা বেশি দিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি বেচিয়া পণ্ডিতের পক্ষে অপরের চেয়ে বেশি লওয়া উচিত নয়। প্রকৃতি আমাদের সকলের উপর শরীর খাটাইবার যে-দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাহা এড়াইবার চেষ্টা ভাল নয়। তাহা অধর্মের পথ, অর্থাৎ মরণের পথ। তাহাই ধর্ম, যাহা সমাজের জীবনকে ধরিয়া রাখে, রক্ষা করে। তাই স্বার্থের চিন্তা অধর্ম, নিজের গোষ্ঠীর লাভের চিন্তা অধম। সমগ্রের কল্যাণের চিন্তা ধর্ম।

নূতন মন লইয়া নূতন চেষ্টা করার ফলে আমাদের গ্রামগুলিকে শহরের শোষণে জীর্ণ না হইয়া স্বাবলম্বী পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে হইবে। যেখানে পরস্পরের মধ্যে বৃত্তির

সহযোগিতা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে পুনরায় নূতনভাবে বৃত্তি সৃষ্টি করিতে হইবে। গ্রামগুলি নবজীবনের সোনার কাঠির স্পর্শে আঁস্তাকুড় হইতে স্বাস্থ্যের আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইবে। মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা গ্রামের মধ্যেই গ্রামবাসীর আয়ত্তের ভিতর থাকিবে। যে-জিনিস গ্রামে হয় না, যে কাজ এক গ্রামের দ্বারা সম্ভব নয়, তাহার জন্য ভিন্ন গ্রামের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সকলে ব্যবস্থা করিয়া লইবে। খাল-কাটার জন্য, নদী-সংস্কারের জন্য গ্রামের প্রতিনিধিরা অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধির সঙ্গে এক হইয়া বিলি-ব্যবস্থা করিবে। সেরূপ সহযোগিতায় কেহ শোষিত, কেহ শোষক থাকিবে না। সে সহযোগিতা সমানে সমানে স্বেচ্ছায় গড়িয়া উঠিবে। তাহাতে মঙ্গল হইবে, কল্যাণ হইবে। কিন্তু গ্রামবাসী প্রাণধারণের উপযোগী মোটা ভাত-কাপড় এবং মোটামুটি শিক্ষার ব্যবস্থা সব সময়েই নিজের আয়ত্তের অধীন রাখিবে।

ভবিষ্যৎ জীবনের যে-অঙ্কুরের ছবি উপরে আঁকা হইল, তাহা আমরা গড়িয়া তুলিব কেমন করিয়া, সে বিষয়ে আমাদের সকলকে ভাবিতে হইবে, যথোচিত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

যে ভাই ও বোনের গল্প গোড়ায় করা হইয়াছে, সে ভাই ধুতুরার চারা বাঁচাইবার জন্য মজবুত বেড়া বাঁধিয়াছিল। অমন চেষ্টাকে আমরা খামখেয়াল বলি। ছেলেমানুষ ভাইটি, তাহার চেয়ে বেশি জানিবেই বা কোথা হইতে? যে নূতন জীবনের চারা আমরা ভারতভূমিতে রোপণ করিতে চাই, তাহা যেন সত্যসত্যই ভাল গাছের চারা হয়, নয়তো আগাছা নিড়াইয়া জমি তৈয়ারি করিতে বেড়া বাঁধিতে যে পরিশ্রম হইবে, তাহার সবই পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবার আশঙ্কা আছে।

কেহ কেহ মনে করেন, গড়ার কথার বিষয়ে এখন হইতে অত খুঁটিনাটি ভাবিবার দরকার নাই, কেন না সত্যিকারের গড়া এখন সম্ভব নয়। আসল কাজ হইল বেড়া বাঁধা, আগাছার উচ্ছেদসাধন করা। অর্থাৎ নূতন জীবন গড়িবার ক্ষমতা আগে চাই এবং তাহা লাভের একমাত্র উপায় হইল—প্রথমে রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করা। কারণ সেই রাষ্ট্রশক্তি হাতে আছে বলিয়াই আজিকার অধিকারীগণ ধনতন্ত্রকে জিয়াইয়া রাখিতে পারিয়াছে, সাধারণ মানুষের শোষণমুক্তির চেষ্টাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিয়াছে। অতএব রাষ্ট্রশক্তি শোষিত শ্রেণীর করায়ত্ত করাই প্রথম প্রয়োজন। কথাটি মিথ্যা নয়, কিন্তু কতখানি সত্য, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার।

বাংলায় প্রবাদ আছে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। তাই গাঁয়ে যখনই কোন বৃহৎ কর্ম হয়, তখনই বাছাই-করা কয়েকজন লোকের উপরে সব কাজের ভার আসিয়া পড়ে। সব গাঁয়েই এমন দুই-চারজন লোক থাকেন, যাঁহাদের হাতে গুরু দায়িত্ব দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সবাই মিলিয়া গণ্ডগোল করার চেয়ে তাঁহাদের আদেশ,

মানিয়া যদি বাকি লোকে চলে, তাহা হইলে সব কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়। সমাজের ব্যবস্থাও অতিবৃহৎ যজ্ঞিবাড়ির কাজের মত। মানুষ সমাজের কাজ পরিচালনা করার জন্যই স্বেচ্ছায় পঞ্চায়েত গড়ে। কিন্তু ইতিহাসের কোনও সুদূর যুগে কয়েকজন শক্তিশালী লোকে পঞ্চায়েতের উপরে টেক্কা দিয়া রাষ্ট্র গড়িয়াছিল। যে কাজ সর্বজনের প্রতিনিধিবৃন্দের কাজ, রাষ্ট্র সেই কাজের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিল। সমাজের খাওয়া-পরা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সবই ক্রমে ক্রমে নিজের আয়ত্তাধীন করিল। আমাদের দেশে গ্রাম-পঞ্চায়েত বা কামার-কুমারদের জাতিগত পঞ্চায়েতগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হইলেও তাহাদের কাজ রাষ্ট্র অনেকাংশে সঙ্কুচিত করিয়াছিল। যাঁহারা রাষ্ট্র চালাইতেন, তাঁহাদের এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইতে লাগিল; ঐশ্বর্য মান প্রতিপত্তি সবই তাঁহাদের ভাগ্যে যথেষ্ট জুটিল, এবং এই ব্যবস্থাকে কায়েমী করিবার জন্য তাঁহারা দেশরক্ষার সম্পূর্ণ ভার, অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র, সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া দেশের জনসাধারণকে সেই বিদ্যা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য দেখিয়া অপর দেশের শক্তিশালী লোকে প্রলুব্ধ হইল; ভারতও পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে স্বীয় স্বাধীনতা হারাইয়া বসিল। এদেশের শাসকবৃন্দ শুধু নিজে মারা পড়িলেন না, যে প্রজাবৃন্দকে ঠুঁটো করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারাও মারা পড়িল।

আজ যদি আমরা বাঁচিতে চাই, সত্যকারের স্ব-রাজ লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে সমাজ এবং রাষ্ট্র উভয় পরিচালনার ভার সম্পূর্ণরূপে অপরের হাতে তুলিয়া দিলে চলিবে না। তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করার ভারও ঠিকার চাকরের উপরে দিলে চলিবে না। আলস্যের আকর্ষণে বা ভয়ের বশে কল্যাণের যথার্থ পথ হইতে বিচলিত হইলে চলিবে না। আমরা ভুলিতে চাই না যে, রাজশক্তি বা রাজকর্মচারী দেশের সবটুকু নয়। যাঁহারা রাজ্য চালাইয়া থাকেন, তাঁহারা জনমতের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তি হইলেও অবশ্য বার বার বলিয়া থাকেন, "তোমাদের কোন ভাবনা নাই। আমরা পটু ব্যক্তি, নিপুণ ব্যক্তি, দেশকে রক্ষা করিবার যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিয়াছি। তোমরা আমাদের উপরে বিশ্বাস রাখিও। সময়মত খাজনা দিও। দরকারমত খাটিয়া দিও, আমরা সব চালাইয়া দিব।" কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার করিব না। কাজ হইল আমাদের। সেদিকে আমরা সজাগ দৃষ্টি রাখিব না তো কে রাখিবে? এইরূপ অবহেলার জন্যই তো একদিন আমাদের সর্বনাশ ঘটিয়াছে, পরাধীনতার ভূত ঘাড়ে চাপিয়া সমগ্র দেশকে হতশ্রী শ্মশানভূমিতে পরিণত করিয়াছে। ওই ধারার আর আমরা ভুলিতে চাই না। যে নূতন জীবনতরু ভারতভূমিতে আমরা রোপণ করিতে চাই, খামখেয়ালী ভাইয়ের মত তাহার চারিদিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের

বেড়াটুকু বাঁধিয়াই ক্ষান্ত হইব না, বরং জিদির মত অনলস অম্লান দৃষ্টি লইয়া সর্বদা তাহাকে ঘিরিয়া রাখিব। বেড়া হয়তো বাঁধিতে হইবে, রাষ্ট্র হয়তো বাদ দেওয়া চলিবে না, কিন্তু তাহা যতটুকু না হইলে নয়।

স্বাধীনতার চেয়ে স্ব-রাজ বড়। আজ স্বাধীনতা বলিতে বুঝি নিজেদের জাতির অধীন একটি রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র সমাজের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়। স্ব-রাজ বলিতে বুঝি এমন ব্যবস্থা, যেখানে প্রতি মানুষের স্বীয় জীবনের উপরে অধিকার অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ আছে। সমাজের বৃহৎ কাজ চালানোর জন্ত সে অপর মানুষের সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করে এবং যে সহযোগিতার ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে, তাহা শাসন বা দণ্ডের দ্বারা মানুষকে চালায় না। সুবিধা হইবে—ইহা বুঝিয়াই যেখানে সকলে আনন্দিত চিত্তে নিজেদের হাতে গড়া বিধিনিষেধ মানিয়া চলে। এই স্ব-রাজের ব্যবস্থায় রাষ্ট্রও হয়তো থাকে, কিন্তু আজিকার তথাকথিত "স্বাধীন" রাষ্ট্রের মধ্যে যে অত্যধিক দণ্ডশক্তি রাষ্ট্রপতিদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা থাকিবে না। সমাজের নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব ছোট বড় পঞ্চায়েতের মারফত, চলিবে এবং সেই পঞ্চায়েতগুলি কোনও শ্রেণীবিশেষের সুবিধার জন্ত রচিত না হইয়া সমগ্র কল্যাণ-চেষ্টাই কেবল করিতে থাকিবে। জোর বা দণ্ডের সাহায্যে তাহাদিগকে, মানুষকে গৃহপালিত পশুর মত পরিচালিত করিতে হইবে না। এমন সমাজে কোনও মানুষই প্রকৃতি-প্রদত্ত শারীরিক শ্রম বা শরীরযজ্ঞের দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবে না বলিয়া এখানে শোষিত বা শোষকের স্থান আর থাকিবে না।

গঠনকর্ম ও শান্ত প্রতিরোধ

গান্ধীজী নূতন জীবন গড়ার যে পথ দেশবাসীকে শিখাইতেছেন তাহার নাম গঠনকর্ম, এবং তাহা রক্ষা করিবার যে নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন ও ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত যাহার উন্নতিবিধান করিতেছেন, তাহার নাম শান্ত প্রতিরোধ। শান্ত প্রতিরোধের বিশেষত্ব হইল, ইহার দ্বারা নিরস্ত্র অতিসাধারণ স্ত্রী-পুরুষেও স্বীয় স্বরাজ-ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্ত সংগ্রাম করিতে পারে। ইহার বিষয় পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

উপস্থিত গান্ধীজী আমাদের গঠনকর্মের দিকে একান্তভাবে মনঃসংযোগ করিতে বলিতেছেন। দেশে সমস্তার তো অভাব নাই। অন্ন-বস্ত্রের অনটন, বেকারদশা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব, পরকে বাদ দিয়া নিজে লাভবান হইবার চেষ্টা, অপরকে ছোট করিয়া নিজে বড় ইহা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, সব মিলিয়া যেন জীবনের শস্তভূমিকে একেবারে আগাছায় ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভাল গাছের চারা,

বুঝিলেও যেন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসে। রোগ অবশ্য পুরাতন, তবু হতাশ হইবার কিছু নাই। পরমহংসদেব বলিতেন, ঘরের ভিতরে হাজার বছরের অন্ধকার জমিয়া আছে; কিন্তু যে দিন গৃহলক্ষ্মীর মঙ্গলহাতের প্রদীপ সেখানে জ্বলিয়া উঠে, সেই মুহূর্তেই যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত অন্ধকার নিমেষে ঘুচিয়া যায়। আমাদের দারিদ্র্য ও পরাধীনতার গ্লানি যত দিনের পুরাতনই হৌক না কেন, যে মুহূর্তে আমরা ভাবি, আজ হইতে আমরা স্বাধীন হইব, জীবনের অচল জগন্নাথের রথকে সকলে একসঙ্গে উৎসাহের বশে ঠেলিয়া আবার সরল করিব, সেই ক্ষণেই অন্তরে সঙ্কল্পের সোনার কাঠির স্পর্শে মুখচোখের রঙ আমাদের সোনার দীপ্তিতে ভরিয়া উঠিবে।

ইহার জন্য চাই সাহস, চাই সঙ্কল্প, চাই ব্রতে নিষ্ঠা, চাই পরস্পরের মধ্যে অন্তরের ভালবাসা ও সহযোগিতা। যাহা নাই, তাহা গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রতি বৎসর আমরা মা দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি গড়িয়া তুলি। এবার স্ব-রাজ লাভের জন্য ভবিষ্যৎ সমাজের চিন্ময়ী মূর্তি গড়িয়া তুলিব। আমরা গড়িতেও পারিব, সকলে মিলিয়া মরণের বীর্যের দ্বারা তাহা রক্ষাও করিতে পারিব। কোনও কারণে শুধু রাষ্ট্রের উপরে গড়া বা রক্ষা করার সকল ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইব না।

হিন্দীভাষায় একটি সুন্দর গান আছে। তাহার কয়েক ছত্র এইরূপ—

উঠ জাগো মুসাফির ভোর ভয়ো।
অব রৈণ কঁহা যো শোয়ত হয়।
যো শোয়ত হয় সো খোয়ত হয়।
যো জাগত হয় সো পাওত হয়।

হে যাত্রী, ভোর হইয়াছে। রাত্রি আর কোথায় যে, এখনও শুইয়া আছ? যে ঘুমাইয়া থাকে, তাহার সব খোয়া যায়। যে জাগিয়া থাকে, সে-ই সাধনার ধন লাভ করে। তবু তুমি ঘুমাইয়া থাক কেন? ওঠো, জাগো, ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

কেন

আমি দেখেছিলেম তোমার চোখে ধূসর নীহারিকা
একের পরে অন্য তারার নূতন অভ্যুদয়…
কি বিচিত্র সম্ভাবনার রঙিন আকিঞ্চনে
সন্ধ্যাবেলার লক্ষ মেঘে অস্তরাগের শিখা।

মনের গোপন কক্ষে তোমার শিল্পী আঁকে কি
অসাবধানে উপ্‌চে পড়ে এদিক ওদিক রঙ…
চোখের কোণে ঠোঁটের কোণে হঠাৎ পাওয়া গানে
দক্ষিণা বায় যেমন ক'রে ছন্দ হারায় কবি—

তেমনি তোমায় দেখেছিলেম দেখেছিলেম আমি
দেখেছিলেম বুঝেছিলেম কিছু,…
আড়াল হ'লে অলস মনে মণি-মানিক দামী,
চোখের পাতে মেঘের মত স্বপ্ন হ'ত নীচু…

এমনি ক'রেই যেত না হয় যেত আমার দিন
আধেক পাওয়া আধেক চাওয়া আলোক-ছায়া হেন,
হঠাৎ কেন স্পষ্ট হ'ল রৌদ্র-ছায়ালীন
তুমি বললে কেন ?…

আমি ভেবেছিলেম অনেক কথা আপন মনে মনে
রুদ্ধ ক'রে রেখেছিলেম গোপন কামনায়,
অন্ধকারে অন্তরালে বিজন গৃহমাঝে
চৈত্রীরাতে জোছনা-ঘেরা ফুলের বনে বনে…

সকালবেলা সূর্য্য হাসে মেঘের রাঙা কোলে
হীরার কুচি ছড়ায় যেন ভাঙা জলের ঢেউ—
তটের বুকে আলগা সুরে কত যে গান ওঠে
অবোধ জনে যেমন বকে নেশার মত হ'লে…

তেমনি আমি বলেছিলেম বলেছিলেম কত
বকেছিলেম প্রলাপ মৃদু সুরে,
উৎস যেন খুলেছিলেম মহোৎসব যত
একলা কাছে পেয়েছিলেম যেজন ছিল দূরে,

না হয় যেত এমনি বেলা এমনি যেত চ'লে
ঘুমের মাঝে অর্থহারা স্বপ্নরোমী হেন—
কেন তুমি আস্‌লে কাছে চোখের জলে জলে
সব শুনলে কেন ?

আমি পেয়েছিলেম বাহুর ঘেরে সোহাগ সুনিবিড়
বুকের 'পরে মাথা যখন থুয়েছিলেম সুখে…

কেন

রাতের সাথে চোখের পাতা এল যখন নেমে,
চেয়েছিলেম তোমার কাছে একটি ছোট নীড়।
ঘুমিয়ে থাকে বিদ্যুতেরা ঝড়ের মেঘে মেঘে
হঠাৎ যেন চমকে উঠে ছোবল মারে নভে,
ভীরু শ্যখায় পাখির বাসা কাঁপতে থাকে শুধু
কাঁপে যখন বুকের তলা ঝ'ড়ো বাতাস লেগে।
তেমনি আমি চেয়েছিলেম চেয়েছিলেম ভয়ে
দেখেছিলেম মনের ছায়া মুখে,
আঘাত পেয়ে চমকে ওঠা হঠাৎ পরিচয়ে
নূতন ক'রে ফিরে পেলেম পুরাতনের দুখে।
না হয় যেত জীবন মম দিবস গুনে গুনে
ভাবী কালের মরীচিকার প্রসাদকামী হেন,
কি লাভ হ'ল তোমার কাছে সত্য কথা শুনে
ভুল ভাঙলে কেন ?
আমি ভেবেছিলেম স্রোতের মুখে খড়ের কুটাসম
অধীর হ'য়ে খুঁজেছিলেম বনপথের রেখা
বিবশ দিশা হারায় নিশা আঁধার নিশীথের
শ্রাবণ-মেঘঘটায় আরো হ'ল নিবিড়তম।
পায়ের তলে শবের মতো ভুবন পড়েছিল
মৌন ছিল মনোলোকের মুখের কাকলী···
কখন যেন তরলবায়ু-আঘাত লেগে লেগে
ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোক ধরা দিল।
তখন আমি কেঁদেছিলেম বেঁধেছিলেম বুকে
সেধেছিলেম স্মৃতির সুরগুলি,
কবর-ঘরে বাসর হ'ল অপার উৎসুকে
দেহের দ্বার বন্ধ ক'রে মনের দ্বার খুলি।
না হয় দিনে রাতের ছায়া নামত চুপে চুপে
ভেসে যেতেম ছায়ার দেশে ছায়ার ছবি যেন,
আবার কেন মৃতের বুকে এলে নতুন রূপে
মোহ আনলে কেন ?

শ্রীউমা দেবী

সমাপ্তি

কাল—১৩৫০ সাল ; আষাঢ় মাসের শেষাশেষি

১

সকাল, বেলা আটটা। বিমলা বউ ভিজা কাপড়ে সপসপ শব্দ করিতে করিতে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। কক্ষে জল-ভরা মাটির কলসী। ভিজা কাপড় আঁট হইয়া গায়ের এখানে সেখানে লাগিয়া আছে ; সিক্ত চুলের রাশি ঘাড়ের পাশ দিয়া বুকের উপরে লুটাইতেছে ; কপালে কপোলে চিবুকপ্রান্তে জলবিন্দু মুক্তার মত টলটল করিতেছে।

বিমলা বউ উঠানের মাঝখানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। উঠানের এক-পাশে তাহার মামী-শাশুড়ী মাতঙ্গিনী ও বাবুদের ঝি ক্ষীরোদা মুখামুখি দাঁড়াইয়া কি কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই চুপ করিয়া গেল। বিমলা তাহাদের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল ; তারপর উঠানে পদচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

পাশের ঘরে মাতঙ্গিনীর স্বামী অঘোর টানিয়া টানিয়া কাসিতেছিল। আজীবন কাসরোগে ভুগিয়া দেহ তার জীর্ণ ও শীর্ণ ; ছানি পড়িয়া চক্ষু দুইটি দৃষ্টিহীন ; কানেও ভাল শুনিতে পায় না ; নড়িতে-চড়িতে পারে না ; সারাদিন নিজস্ব দড়ির খাটিয়াটির উপরে বসিয়া অথবা শুইয়া থাকে, আর কাসে।

একপর্ব্ব কাসি শেষ করিয়া ডাক দিল অঘোর, বউমা, অ বউমা, শুনছ ! কেহ কোন জবাব দিল না। আবার কাসি শুরু করিল অঘোর ; টানের গলাতেই ডাকিল, বউমা, অ বউমা ! মাতঙ্গিনী ধারালো গলায় চীৎকার করিয়া কহিল, 'বউমা, বউমা' ব'লে হামলাচ্ছ কেন ? কি চাই বল না ? অঘোর কহিল, গলাটা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, একটু চা— মাতঙ্গিনী ধমকাইয়া কহিল, দুবেলা ভাত জোটে না, চা খাবার সাধ ! কোথায় পাবে চা ? অঘোর কহিল, আছে আছে—বউমার কাছে, বউমা কোথায় গেল বল না ! ও বউমা !

বিমলা কাপড় ছাড়িয়া ভিজা কাপড়খানি বাহিরে আনিয়া নিংড়াইল, তারপর উঠানে একটা দড়ির উপর টাঙাইতে লাগিল। মাতঙ্গিনী হাঁকিয়া কহিল, ও বউমা, শুনছ ?

বিমলা তখন শুনিতে পায় নাই এমনই ভাবে কাপড়টা এদিক-ওদিক টানিয়া ভাল করিয়া মেলিয়া দিতে লাগিল।

মাতঙ্গিনী কহিল, কালা হয়েছ নাকি বউমা ! শুনতে পাচ্ছ না ?

বিমলা কহিল, পাব না কেন ? বলুন না, কি শুনতে হবে ?

বাবুদের বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে যে। কাল না হয় শরীর খারাপ ছিল ব'লে গেলে না—। বিমলা কহিল, আজও যেতে পারব না ব'লে দিন।

ক্ষীরোদা খনখন করিয়া কহিল, আজ না গেলে চলবে কেন? কাল বড়গিন্নীর মহলে ম্লান রকমে চ'লে গেছে। দিন দিন তো তা হয় না। এক-আধজন নয়, ঝি-চাকর নিয়ে এতগুলি লোক। অঘোর হাঁক দিল, ও বউমা, শুনছ?

যাচ্ছি, মামাবাবু।—বলিয়া বিমলা অঘোরের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

অঘোর খাটের উপর উবু হইয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া ছিল। বিমলা কাছে গিয়া উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, কি বলছেন? অঘোর কহিল, একটু চা ক'রে দিতে পার, আছে ঘরে? বিমলা কহিল, আছে, চিনি নেই কিন্তু। অঘোর কহিল, তা হোক, নুন দিয়েই ক'রে দাও একটু।

বিমলা রান্নাঘরে ঢুকিয়া একটা লোহার হাতা হাতে করিয়া বাহিরে আসিল।

ক্ষীরোদা কহিল, যাবে কি না ঠিক ক'রে বলে দাও বাপু, বেলা হয়ে যাচ্ছে, না যাও তো অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। মুখ-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, তবে এ কথা ব'লে দিচ্ছি, আজ না গেলে ও-বাড়িতে আর ঢুকতে হবে না তোমাকে।

ক্ষীরোদা নাপিতের মেয়ে, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, বালবিধবা, অল্প বয়স হইতে বাবুদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করিতেছে সে, কায়মনোবাক্যে বাবুদের সেবা করিয়াছে। এখন সে বড়বাবুর কন্যা গৃহিণীর খাস দাসী। কথার সুরে নিজের পদমর্য্যাদা ফুটাইয়া তুলিল সে।

বিমলা স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া কঠিন মুখে কহিল, ব'লে দিচ্ছি তো, আমি আর কাজ করব না, বলগে বাবু গিন্নীকে, অন্য লোক দেখুন তাঁরা।—বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ক্ষীরোদা স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিমলা তাহার মুখের উপর এমন করিয়া সাফ জবাব দিবে, সে আশা করে নাই। যাহাদের মাথার চুলটি পর্য্যন্ত তাহার মনিবের কাছে বাঁধা পড়িয়াছে, তাহার মনিব খাইতে না দিলে যাহাদিগকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতে হইত, এই বাড়িতে থাকিতে না দিলে যাহাদিগকে গাছতলায় আশ্রয় লইতে হইত, তাহাদের বাড়ির বউ হইয়া বিমলার এত অহঙ্কার! তাহারও রূপ-যৌবন একদিন ছিল, কিন্তু কোনদিন বাবু কি গিন্নীর সামনে মুখ তুলিয়া টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করে নাই। গরিবের আবার তেজ! আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল ক্ষীরোদার। মুখ তোলো হাঁড়ি করিয়া ভারী গলায় কহিল, বেশ, তাই বলিগে। বাঁকা-হাসি হাসিয়া কহিল, বাবুদের আবার লোকের অভাব! যা খরচ করছেন তোমার বউয়ের পেছনে, তার অর্দ্ধেক খরচ করলে কত ভাল লোক আসবে। ও-পাড়ার গাঙ্গুলী-বুড়ী তার নাতনীর জন্যে কতদিন থেকে ঝোলাঝুলি করছে। তবে তোমার বউটির ছিরছাঁদ চেহারা, রাঁধতে বাড়তে জানে,

সহবৎ ভাল, তাই গিন্নীর ওকে পছন্দ। তা যখন যাবেই না, তখন গাঙুলী-বুড়ীর নাতনীকেই ডেকে আনিগে।

মাতঙ্গিনীও মুখরা কম নয়, নাপতিনী মাগীর কথায় ঢঙ দেখিয়া তাহারও গা জলিয়া গেল। তবু মেজাজের রাশ টানিতে হইল তাহাকে। নরম গলায় কহিল, আজকের দিনটা দেখ্ মা ক্ষীরোদা। কি রকম বেহেড মেয়ে দেখলি তো! দমদম ক'রে পা ফেলে সামনে দিয়ে চ'লে গেল! আমাকে গেরাহ্যি করে না মোটেই। ওকে একটু মানসম্রম করে, ওকে দিয়েই বলাব।

ক্ষীরোদা কহিল, আজ রাঁধবে কে তা হ'লে? মাতঙ্গিনী কহিল, আজ না হয় আমিই গিয়ে চালিয়ে দিই। ক্ষীরোদা কহিল, পাগল হয়েছ নাকি? ওই তো তোমার দেহ! নড়তে-চড়তেই চার পহর, এত বড় সংসারের ঝক্কি চালানো কি তোমার কাজ? তা ছাড়া তোমার বউ যদি কাজ না-ই করে, আমাদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো।

ব্যবস্থা কি, তাহা মাতঙ্গিনীর বুঝিতে বাকি নাই। দুই বেলা তাহাদের দুইজনের জন্ম ভাত আসে বাবুদের বাড়ি হইতে, তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে; এই বাড়ি হইতেও তাহাদের চলিয়া যাইতে হইবে। পৃথিবীতে আপনার বলিতে তাহাদের এমন কেহ নাই, থাকিলেও তাহাদের অবস্থা এমন সচ্ছল নহে যে, কেহ এই দুর্দিনে দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন দিয়া দুই দিনের জন্মও সাহায্য করিবে, দুই দিনের জন্মও মাথা গুঁজিয়া থাকিবার জন্ম আশ্রয় দিবে।

তখন চলচ্ছক্তিহীন অন্ধ স্বামীকে লইয়া এই বয়সে সে কি করিবে, কোথায় যাইবে, তাহা এক ভগবান ছাড়া কেহ জানে না। মাতঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, ও মেয়ে-মানুষ নয় ক্ষীরোদা, রাক্ষুসী। নিজেদের ছেলেমেয়ে ছিল না, ভাগনেকেই ছেলের মত মানুষ করেছিলাম। মানুষ হ'ল, দু-পয়সা আনতে শিখলে, অমনই কোথা থেকে রাক্ষুসী এসে গপ ক'রে গিলে খেয়ে দিলে। তাতেও ক্ষিদে মেটে নি রাক্ষুসীর, আমাদের দুজনকে খাবার জন্মে নোলা লসকস করছে ওর।

বিমলা হাতায় করিয়া আগুন লইয়া আসিল। আসিতেই মাতঙ্গিনী কহিল, হ্যাঁ গা বউমা, বাবুদের বাড়ির চাকরি করবে না কেন, বল দেখি? কি হ'ল তোমার? আমরা উপোস দিয়ে ম'রে যাই, এই কি তোমার ইচ্ছে?

বিমলা থামিয়া কহিল, দু মাস তো করলাম, আর আমি পারব না। ধারালো কণ্ঠে মাতঙ্গিনী কহিল, কেন পারবে না শুনি? কার কাছে সাহস পেয়েছ যে, রাজরাণীর মত মেজাজ তোমার?

বিমলা কহিল, আমার শরীর ভাল নেই।

মাতঙ্গিনী শ্লেষের স্বরে কহিল, কেন? কি হয়েছে তোমার? বাবুদের বাড়ির ভাত গিলে গতর তো দিন দিন ফুলছে তোমার, খারাপ তো কিছু দেখছি না।

বিমলা নীরস কণ্ঠে কহিল, খেতে তো আপনিও কসুর করেন না, গতরও আপনার কম নয়, করুনগে আপনি, আমি পারব না।

মাতঙ্গিনী বোমার মত ফাটিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, চুপ কর্ হারামজাদী! মুখের ওপর জবাব দেয়, এত বড় বাড়! আমার বাড়িতে মাথা গুঁজে আছিস, মনে নেই! সাতসকলি সকলকে তো খেয়ে ব'সে আছিস, আমি ঠাঁই না দিলে কোন্ আঘাটায় মরতিস, তার ঠিকানা নেই।

অঘোর চীৎকার করিয়া কহিল, ও বউমা, চা চড়ালে? গলাটা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

মাতঙ্গিনী হাঁক দিয়া কহিল, চা নয়, তোমার পিণ্ডি চড়াবার ব্যবস্থা করছে, অনেক কষ্টে ভাগনেকে মানুষ করেছিলে যে, তার শোধ দেবে না!

অঘোর রাগতকণ্ঠে কহিল, ধুমসীর নিজে কিছু করবার ক্ষ্যামতা নেই, সব কাজে বাগড়া!

ক্ষীরোদার মুখে স্পষ্ট ও বিমলার মুখে অতি ক্ষীণ হাসির আভা খেলিয়া গেল।

মাতঙ্গিনীর দেহটি বেঁটে, খাটো ও মোটা। কালো রঙ। নিতম্বে ও বক্ষে মাংসের স্তূপ। ছোট-ছোট হাত-পা; টেবো-টেবো গাল দুইটি তোবড়াইয়া নাকের গোড়া হইতে ঠোঁটের দুই পাশ দিয়া দুইটি গভীর খাঁজ পড়িয়াছে। মাথায় এক মুঠো চুলে বড়ির মত ঝুঁটি।

একবার ক্ষীরোদার, একবার বিমলার দিকে জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, মুখে আগুন তোমার! আমি ছাড়া এতদিন কে করেছে তোমার? বেশ তো, থাক তোমার রূপসী বউকে নিয়ে, আমি চ'লে যাব ভাইয়ের কাছে।

অঘোর কহিল, ভাই রাজা লবকেষ্ট কিনা! লোকের বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলে। নিজে খেতে পায় কিনা ঠিক নেই, বোনকে খাওয়াবে!

বিমলা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই মাতঙ্গিনী কড়া গলায় কহিল, চ'লে যাচ্ছ যে? জবাব দিয়ে যাও।

বিমলা ভুরু দুইটা কুঁচকাইয়া কহিল, বললাম যে, চাকরি করব না। মাতঙ্গিনী কহিল, তোমার বাবা করবে। বিমলা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, বেশ। বাবাকেই ডেকে আনুনগে, আমি করব না।

মাতঙ্গিনী হাত-মুখ নাড়িয়া কহিল, একশো বার করতে হবে তোমাকে; তোমার স্বামীকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছিলাম আমরা, তার ধার তোমাকে শোধ করতে

হবে। বিমলা নীরসকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, করেছি তো এতদিন। নিজের গয়না-গাঁটি যা ছিল দিয়েছি, স্কুল থেকে যা পেয়েছিলাম দিয়েছি, ছ মাস পরের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করেছি, আর আমি পারব না, এবার রেহাই দিন আমায়।

মাতঙ্গিনী নীরবে কিছুক্ষণ বিমলার দিকে ড্যাবড্যাব করিয়া তাকাইয়া রহিল। তারপর ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া, উপরে নীচে মাথা নাড়িয়া কহিল, ওঃ! বুঝেছি তোমার মতলব। ওই কায়েত ছোঁড়া তোমাকে এই সব বুদ্ধি দিয়েছে। তাই এত আনাগোনা, এত সলা-পরামর্শ! আসুক ছোঁড়া একবার, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব।

বিমলা কহিল, তা দেবেন বইকি, নতুন কাপড় এনে পরিয়েছে যে।

মাতঙ্গিনী কহিল, মরকে ম'রে যাচ্ছ যে! সে কি ওর বাবার ঘর থেকে দিয়েছে? সরকারের কাপড়।

ক্ষীরোদা চোখ-মুখ ঘুরাইয়া কহিল, ঠিক বলেছ খুড়ী। ছেলেটা ভারি বজ্জাত। কাজ-কম্ম নেই, ধম্মের ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে ছোট-লোকদের সঙ্গে কারবার। বাউরী-বাগদীদের ছুঁড়ীগুলোকে—

বাধা দিয়া বিমলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, ক্ষীরোদা, তুমি আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? যা বলবার ব'লে দিয়েছি, বাড়িতে গিয়ে অন্য ব্যবস্থা করতে বলগে। মাতঙ্গিনী কহিল, ওকে আমিই থাকতে বলেছি। তোমাকে না নিয়ে যাবে না ও।

বিমলা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আমি কিছুতেই যাব না, ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে অনেক দূর এগিয়েছি, আর যাবার সাধ্যি নেই আমার।

ওষ্ঠ ও অধর সংযোগে অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি করিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, ভদ্দরনোক! ভদ্দরনোকের মেয়ে হ'লে ও কথা মুখে আনতে না তুমি।

বিমলা বিস্ময়ের স্বরে কহিল, কি এমন কথা মুখে এনেছি আমি?

মাতঙ্গিনী কহিল, ওই যে বললে, ঘর ছেড়ে চ'লে যাবে কায়েত ছোঁড়াটার সঙ্গে।

পরম বিস্ময়ে বিমলা কহিল, ওই কথা বললাম আমি?

বলেছ বইকি। ক্ষীরোদা নিজের কানে শুনেছে।

ক্ষীরোদা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা তুমি বলেছ বউ।

বিমলা উত্তপ্ত স্বরে কহিল, মিথ্যেবাদী তোমরা।

মাতঙ্গিনী চীৎকার করিয়া কহিল, কি! মিথ্যেবাদী আমরা! মুখ সামলে কথা বল বউমা, মুখে কুঠ হয়ে যাবে। ক্ষীরোদা খনখন করিয়া কহিল, ক্ষীরি নাপতিনী মিথ্যে ক্খুনো বলে, স্বয়ং বেম্মা এসে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

মুখ লাল করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিমলা কহিল, কায়েত ছেলেটির নাম

পর্য্যন্ত করি নি আমি, তোমরাই ওর কথা তুলেছ। তবে চ'লেই যাব আমি, এখানে থাকব না, চাকরি যদি করতে হয় তো শহরেই করব।

দুই চোখ বড় করিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, কি বললে? শহরে চাকরি করতে যাবে? শুনছিস ক্ষীরোদা? শোন্ কথা। বলি নি তোকে, ওর পাখা গজিয়েছে, উড়বে ও। উচ্চকণ্ঠে হাত নাড়িয়া কহিল, চাকরি নয়, বেউশ্যেগিরি করতে যাবে তুমি। ছোটনোকের মেয়ে! লজ্জা-শরমের মাথা একেবারে খেয়েছ! বলতে একটুও বাধল না মুখে, মর, মর তুমি। বিমলা রান্নাঘরের দিকে যাইবার উপক্রম করিতেই মাতঙ্গিনী কহিল, খবরদার! রান্নাঘরে ঢুকবে না তুমি, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। বাহিরের দরজার দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, বেরিয়ে যাও এখনই। বিমলা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রোধে অপমানে মুখ সিন্দুরের মত টকটকে লাল হইয়া উঠিল, একবার কি বলিবার চেষ্টা করিল, তারপর কিছুই না বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

মাতঙ্গিনী কহিল, এক পা নড়বে তো ভাইয়ের মাথা খাবে তুমি। বিমলা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মাতঙ্গিনী বলিতে লাগিল, আমার ঘরে বাস ক'রে এত বড় বাড় তোমার! গাঁয়ে মানুষ নেই ভেবেছ? বাবুদের বাড়িতে খবর দিয়ে, কাছারির সামনে দাঁড় করিয়ে, ছোটনোক দিয়ে জুতো মারাব তোমাকে।

বিমলা একদৃষ্টিতে মাতঙ্গিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মাতঙ্গিনী কহিল, ছুঁড়ী তাকাচ্ছে দেখ, যেন কালসাপিনী। ওই চাউনিতে স্বামীকে খেয়েছে, এর পর আমাদের খাবে; সিঁজড়ে কানা ক'রে দোব ওই চোখ।—বলিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী বাড়াইয়া থপথপ করিয়া চলিল বিমলার দিকে।

হঠাৎ হোঁচট খাইয়া হুমড়ি দিয়া পড়িল মাতঙ্গিনী। হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ভাগিনেয়ের নাম ধরিয়া ডাকিয়া কহিল, ওরে সাধন রে, দেখে যা বাপ, তোর কালনাগিনী বউ আমাদের মুখে লাথি মেরে কুলে কালি দিতে যাচ্ছে রে।

বিমলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল, একবার ফিরিয়াও তাকাইল না।

ক্ষীরোদা হাসি চাপিতে চাপিতে মাতঙ্গিনীর কাছে আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া বসাইল।

এমন সময়ে ঠকঠক করিয়া লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে, প্রসারিত বাম করতল কপালের উপর লম্বভাবে রাখিয়া, দৃষ্টিহীন চোখ দুইটা যতদূর সম্ভব প্রসারিত করিয়া, এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে আসিল অঘোর; উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিল, কি হ'ল, কি হ'ল তোমার? দিনরাত ঝগড়া! বউমা কোথায়? বউমা!

মাতঙ্গিনী অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিল, মেরেছে তোমার বউমা। অঘোর কহিল, কি? মেরেছে তোমাকে বউমা? কই সে? ক্ষীরোদাকে বিমলা ভাবিয়া কহিল, সকাল থেকে

দশবার বললাম, চা কর, তা না ক'রে কোঁদল শুরু করেছ! কি মনে করেছ তুমি? শাশুড়ীকে মার! এত বাড় তোমার! মাতঙ্গিনী অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল, কাকে কি বলছ? ও বউমা নয়, বাবুদের ঝি ক্ষীরোদা। অঘোর বিরক্ত হইয়া কহিল, ক্ষীরোদা কিসের জন্যে এসে ব'সে আছে? বউমা কই? ক্ষীরোদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, অঘোরের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চেঁচাইয়া কহিল, বউকে ডাকতে এসেছি, সকালে কাজে যায় নাই যে। অঘোর চোখ দুইটি বার কয়েক মিটমিট করিয়া কহিল, কাজে যায় নি? কেন? কি হয়েছে বউমার? মাতঙ্গিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কহিল, তোমার বউয়ের পাখা গজিয়েছে, উড়বে এবার। ক্ষীরোদা বলিল, 'কাজ করব না' বলছে। মাতঙ্গিনী কহিল, 'ঘর ছেড়ে চ'লে যাব' বলছে। ওই যে কায়েতদের ফটকে আসে, তোমার জন্যে চা আনে, বিড়ি আনে, ওরই সঙ্গে 'পালিয়ে যাব' বলছে। অঘোর উচ্চকণ্ঠে কহিল, কি বলছ? ফটকে চা আনে ব'লে পালিয়ে যাবে? কি হ'ল তার? মাতঙ্গিনী কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, আমার মরণ হয় না কেন বল্ দেখি, ক্ষীরোদা? ক্ষীরোদা কহিল, তোমার বউমা ফটকের সঙ্গে পালিয়ে যাবে।

অঘোর দুই ভ্রূ কুঁচকাইয়া শুনিতেছিল, হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কি! বউমা পালিয়ে যাবে? যাক দেখি, ঠেঙিয়ে পা খোঁড়া ক'রে দোব না! কানা কালা হয়ে গেছি ব'লে ভাবছে, ম'রে গেছি। ডাক তো তাকে, দেখি একবার—

মাতঙ্গিনী কহিল, আমাকে কুকুর-বেরালের চেয়েও অধম মনে করে; না হ'লে প'ড়ে গেলাম, কোথায় পরের মেয়ে এসে ধরলে, আর ও চোখে দেখেও ঠ্যাকার ক'রে চ'লে গেল! হঠাৎ আকাশের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া কহিল, হে চন্দ্র-সুয্যি, তোমরা সব দেখেছ। অহঙ্কারের যেন পতন হয়, দুটি চক্ষের যেন মাথা খায়। যে গতরের গরবে মাটিতে পা পড়ে না, সে গতরে যেন আগুন লাগে।

অঘোরকে ঝাঁকানি দিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, শুনছ, তুমি ডেকে ব'লে দাও না! মাথা নাড়িয়া অঘোর কহিল, দোব বইকি। বউমা! শোন দেখি একবার।

উঠানের এক পাশে রান্নাঘর, ঘর নয় কুঁড়ে, খড়ের চাল; ছোট দরজা, জানালায় বালাই নাই। চাল অনেকদিন ছাওয়া হয় নাই, এখানে সেখানে খড় খসিয়া গিয়া কাঠামো বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই সব ফাঁক দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। বিমলা উনান ধরাইয়াছে নিশ্চয়!

অঘোর হাঁক দিয়া কহিল, বউমা, শুনতে পাচ্ছ না নাকি?

মাতঙ্গিনী কহিল, নবাবের বেটী, গরিবের কথা কানে তুলবে কেন?

ক্ষীরোদা রান্নাঘরের দরজার সামনে গিয়া ডাক দিয়া কহিল, ও বউ, এখানে এস না, তোমার শ্বশুর ডাকছে যে। বিমলা বাহিরে আসিল, ধোঁয়ায় মুখ লাল, চোখে জল।

কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই মাতঙ্গিনী অঘোরের শ্রবণ সীমার মধ্যে কণ্ঠস্বর তুলিয়া কহিল, এসেছে, কি বলবে বলছিলে, বল।

অঘোর ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ, অ্যাঁ! এত ডাকাডাকি করছি, কি মনে করেছ, অ্যাঁ?

বিমলা কহিল, চা করছিলাম। অঘোর একেবারে নিবিয়া গিয়া কহিল, চা করছিলে? হয়েছে চা? যাও দেখি, নিয়ে এস, গলাটা কাঠ হয়ে গেছে।

মাতঙ্গিনী কহিল, অ্যাঁ মর! চায়ের লালসেই গেলেন! কাছে আসিয়া কহিল, চা পরে খেও, আগে যা বলবে বলছিলে বল না!

অঘোর বিরক্তির স্বরে কহিল, জ্বালালে সকাল থেকে এই ছুটোতে! বাঁচতে দেবে না আমাকে, সকাল থেকে এক ঢোঁক চা পড়ল না পেটে! কড়া গলায় বিমলাকে কহিল, বাবুদের বাড়িতে কাজ করতে যাও নি কেন? কাজ না করলে খাবে কি? আমরা খাব কি? অ্যাঁ! যাও, চাটা ক'রে দিয়ে চ'লে যাও।

বিমলা কহিল, আমি যাব না। অঘোর কান পাতিয়া শুনিয়া কহিল, কি বলছ, অ্যাঁ? ভাল ক'রে বল না! ক্ষীরোদা কহিল, বলছে, যাবে না। অঘোর কহিল, আলবাৎ যাবে। যতদিন আমরা বাঁচব, ততদিন যেমন ক'রে হোক আমাদের খাওয়াবার দায় তোমার। তোমার শাশুড়ীকে আজীবন খাইয়েছি, পরিয়েছি, তোমার স্বামীকে মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি; সে বেঁচে থাকলে আমাদের খাওয়া-পরার ভাবনা থাকত না। তাকেই যখন খেয়ে ব'সে আছ, তখন আমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে তুমি ধর্ম্মত বাধ্য। না করলে, তোমাকে নরকে পচতে হবে।

লম্বা বক্তৃতা করিয়া অঘোর হাঁপাইতে লাগিল। বিমলা কহিল, মেয়েমানুষ হয়ে আমি কি ক'রে আপনাদের খাওয়াব? অঘোর কহিল, যা করছ তাই ক'রে, চাকরি ক'রে। এমন চাকরি তুমি কোথায় পাবে? নগদ ছ টাকা ক'রে মাইনে, তার ওপর খাওয়া— তোমার আমার তোমার শাশুড়ীর। তিন-তিনটে লোকের খাওয়াতে আজকালকার বাজারে কত খরচ জান? কারও কান-ভাঙানি না শুনে চ'লে যাও; গাঁয়ের কত মেয়ে ওই চাকরির জন্তে ছুঁপিয়ে আছে, একবার ছাড়লে আর পাবে না।

বিমলা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষীরোদা কহিল, কি গো, জবাব দাও? বিমলা কহিল, দিয়েছি তো, কত বার দোব? মাতঙ্গিনী হাত ও মাথা নাড়িয়া কহিল, ভবী ভোলবার নয়, সেই এক কথা। ফটকে ছোঁড়া ওর মাথা একেবারে খেয়ে দিয়েছে, আদার-বস্তু কিছু নেই। ক্ষীরোদা অঘোরকে কহিল, শুনছেন, 'যাব না' বলছে। অঘোর মুখখানা কুঁচকাইয়া কহিল, কি হয়েছে তোমার বল দেখি? কেন যাবে না? মাতঙ্গিনী ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, কি হয়েছে বল দেখি? পেঁপুল পেকেছে—। বিমলা কহিল, বলেছি তো কতদিন, আমাকে

অপমান করে বাবু; কাল অপমানের— বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিল বিমলা।

মাতঙ্গিনী ধমকের সুরে কহিল, মুখ সামলে কথা ব'লো বউ। ভাল লোকের নামে মিথ্যে অপবাদ দিলে জিব খ'সে যাবে তোমার। স্নেহের সুরে কহিল, অপমান করেছে ওকে! ভূপতি রায় মেয়েমানুষ তো দেখে নি জীবনে, তাই ওর রূপ দেখে বেসামাল হয়ে গেছে!

ক্ষীরোদা গালে হাত দিয়া চোখ-মুখ ঘুরাইয়া কহিল, ওমা! কি কথা! ভাল লোকের নামে মিথ্যে কুচ্ছো! দণ্ডবৎ তোমাকে, কাজ নাই তোমার কাজ ক'রে। বাবুকে বলিগে—

ব্যাকুল স্বরে মাতঙ্গিনী কহিল, যাস না মা ক্ষীরোদা, দাঁড়া।

অঘোর কহিল, কে অপমান করেছে? ভূপতি? ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বিশ্বেস হয় না। এত মেয়েমানুষ ও-বাড়িতে কাজ করে, কেউ কোন দিন টুঁ পর্য্যন্ত করে নি ওর নামে।

ক্ষীরোদা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সত্যি, আমি তো এতদিন কাজ করলাম, কোনদিন একটা বেয়াড়া রকমের চাউনি পর্য্যন্ত দেখি নি বাবুর। মাতঙ্গিনী কহিল, মিথ্যে কথা শুনিস কেন ওর? পেটে পেটে কত বিদ্যে আছে দেখ্ তোরা! সবাই বলে, কেন ঝগড়া হয় দিনরাত? অনৈরণ দেখতে পারি না, তাই হয়। অঘোর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও কেউ বিশ্বেস করবে না গাঁয়ে।

মাতঙ্গিনী কহিল, এসব ফটকে শিখিয়েছে, বুঝলে? এক ফোঁটা ছোঁড়া এই বয়েসে এত ফিচলেমি বিদ্যে!

অঘোর বলিতে লাগিল, আর যদি অপমান করেই তো সহ্য করতে হবে, বড়লোকরা অপমান করেই। তা ছাড়া জমিদার ওরা, আমার বাপ পিতামহ ওদের বাড়িতে চাকরি করেছে চিরদিন; আমি যতদিন চোখ ছিল চাকরি করেছি। আমাদের অপমান করে নি? সহ্য করেছি মুখ বুজে। তোমাকে যদি অপমান করেই, সহ্য করবে, না হ'লে খাবে কি? থাকবে কোথায়? জমি-জায়গা, ঘর-বাড়ি সব বাঁধা ওর কাছে। দম লইয়া কহিল, চায়ের জলটা চড়িয়ে এসেছ বোধ হয়, ফুটছে এতক্ষণ, চাটা ক'রে দিয়ে কাজে যাও।

একজন বিধবা আসিয়া হাজির হইল, বয়স ষাটের উপরে। বাহিরের দরজা হইতেই বক্তৃতা শুরু করিল, কি হ'ল লো তোদের, অনেকক্ষণ থেকে গলা শুনতে পাচ্ছি যে? বিমলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

বিধবার নাম মোক্ষদা, পাশেই তাহার বাড়ি। মাতঙ্গিনী সখেদে কহিল, আমাদের কথা আর ব'লো না ঠাকুরঝি! বিছুটির গাছ লাগিয়ে গেছে সাধন, তারই জ্বালায় জ্ব'লে মরছি আমরা।

মোক্ষদা ক্ষীরোদাকে কহিল, তুই এখানে? কি হ'ল লো? ক্ষীরোদা কহিল, আর ব'লো না পিসী! বউ কাজে যায় নি, ডাকতে এলাম তো বলে, যাব না, বাবু আমাকে অপমান করেছে।

মোক্ষদা জিব কাটিয়া কহিল, ছি ছি! ও কি কথা! ভূপতির মত ছেলে ভূভারতে হয় না। রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যায় তো কারও মুখের দিকে তাকায় পর্য্যন্ত না; সেদিন যাচ্ছিল তো পাঁচবার ডাকতে তবে শুনতে পেলে; বললে, পিসীমা, তুমি ডাকছ? এমন ক'রে পিসীমা ডাকে যে শুনে মনে হয় না যে, নিজের ভাইপো নয়। তা শোন্ একটা কথা।—বলিয়া ক্ষীরোদাকে এক পাশে ডাকিয়া লইয়া যাইতেই মাতঙ্গিনী কহিল, যাস নে ক্ষীরোদা, বউকে সঙ্গে নিয়ে যা'বি।

মোক্ষদা ফিসফিস করিয়া ক্ষীরোদাকে কহিল, এত পাঁচ কথায় দরকার কি? না যায়, না যাবে। লোকের ভাবনা কি? আমার নগা শ্বশুর-বাড়ি থেকে চ'লে এসেছে; সেখানে ভারি কষ্ট দেয় ওকে দিনরাত; খাটে, খেতে পায় না; ওকেই চাকরিটা ক'রে দে মা, তোর হাতে ধ'রে বলছি, মেয়েটা সত্যি ভারি ভাল, মুখে কথাটি নেই। মাতঙ্গিনী দুই চোখ ও কান একাগ্র করিয়া ইহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল, ভিতরে ভিতরে তাহার অস্থিরতার সীমা রহিল না।

বিমলা একটা পিতলের গ্লাসে করিয়া চা আনিয়া অঘোরকে দিল। অঘোর চা খাইতে খাইতে কহিল, এর পর চ'লে যাও ক্ষীরোদার সঙ্গে।

বিমলা কহিল, বাবু যদি নিজে এসে ব'লে যান যে আর অপমান করব না, তো যাব।

মাতঙ্গিনী লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, বাবু তোমার বাবার জমিদারির প্রজা কিনা, তাই তোমার কাছে এসে খত লিখে দিয়ে যাবে।

মোক্ষদা কহিল, ওঃ, কি সাহস! মানীর মান্তি করবি বউ, রূপ যৌবন চিরদিন থাকে না।

ক্ষীরোদা হেলিয়া দুলিয়া বিমলার কাছে আসিয়া কহিল, বাবুর খুব অপমান করেছ বউ। গলবস্ত্র হইয়া দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, এর পর ক্ষ্যামা দাও, বাবুকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই, পায়ের কাছে নাকখৎ দিয়ে ক্ষ্যামা চেয়ে যাবেন এখনই। আবার তেমনই ভাবে চলিয়া মোক্ষদাকে কহিল, চল পিসী, চল।—বলিয়া দুইজনে বাহির হইয়া গেল।

মাতঙ্গিনী গলা কাটাইয়া অঘোরের উদ্দেশ্যে কহিল, শুনছ! চ'লে গেল ক্ষীরোদা, মুখী ঠাকুরঝির মেয়ে নগাকে নিয়ে গেল। এর পর খাবে কি? কাল যদি ঘর থেকে বার

ক'রে দেয়, দাঁড়াবে কোথায়? বিমলার দিকে তাকাইয়া কহিল, হতভাগী, মনের সাধ মিটল তো? বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীকে উপোস করিয়ে মেরে খুব ফুর্ত্তি হবে তোমার— তোমাকে বাড়িতে রেখে কি লাভ আমাদের? নিজের পথ তুমি দেখ এবার।

বিমলা জবাব না দিয়া চলিয়া গেল। অঘোর চা পান শেষ করিয়া গ্লাসটা নামাইয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা বেহেড মেয়ে তো তুমি! এত ক'রে বললাম, কানে গেল না? খাব কি আজ? কাল তো মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছি। আজ ভাত না খেলে ম'রে যাব যে। এখনই ক্ষিদেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছে আমার। ও বউমা, যাও না কাজে, বুড়ো শ্বশুরের মুখের দিকে তাকিয়েও যাও।

বেলা এগারোটা। আষাঢ়ের রৌদ্র ইহার মধ্যেই বেশ কড়া হইয়া উঠিয়াছে। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকদের করুণ প্রার্থনা কানে আসিতেছে—চারটি ভিক্ষে দাও মা, একটু ফ্যান দাও গিন্নীমা। সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীদের তিরস্কার, যা যা, নিজেরাই খেতে পাচ্ছি না, তোদের চাল দেবে। বাবুদের বাড়ি যা।

মাতঙ্গিনী মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, বাপের তুল্য শ্বশুরের কথা কানে তুললে না, এত তেজ! এ তেজ থাকবে না, ভগবান দমন করবেন, দুবেলা দু-মুঠো শুধু ভাত, আর কিছু না, তাও সহ্য হ'ল না গাঁয়ের হতভাগীদের? গরিবের ভাত-ভাতি যারা করলে, ভগবান যেন তাদের ব্যবস্থা করেন, ভাতের গেরাস যেন মুখে তুলতে না হয়। অঘোর মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, চেঁচাস না মিছিমিছি। ঘরে ঘটি-বাটি কিছু আছে তো বাঁধা দিয়ে চাল নিয়ে আয়, পেট জ্ব'লে যাচ্ছে আমার।

বাহিরে দরজায় কাহার ডাক শোনা গেল, বউদিদি! একটি কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সের ছেলে বাড়িতে ঢুকিল; লম্বা কাহিল চেহারা, শ্যামবর্ণ, কৈশোরের কোমল চিক্কণতা এখনও মুখ হইতে মিলাইয়া যায় নাই; আয়ত উজ্জ্বল চোখ, মাথায় রুক্ষ বড় বড় চুল; পরিধানে খদ্দরের কাপড়, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, পা খালি।

বাঘিনীর মত বাহিরে আসিয়া মাতঙ্গিনী হাঁকিয়া কহিল, কে র‍্যা! ফটকে বুঝি! কটু উচ্চকণ্ঠে কহিল, বেরিয়ে যা হতভাগা! খবরদার আর এ বাড়িতে আসবি নে বলছি, এলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব। হতভাগা, ছোটলোক হয়ে বামুনের ঘরের বউকে বার ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা!

ফটিক কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হাসিয়া কহিল, কি হ'ল খুড়ীমা?

ন্যাকা! কি হ'ল খুড়ীমা! ওমা! সাধনের কাছে পড়ত, বাড়ির ছেলের মত আসে ঘরে, কিছু বলতাম না। এইটুকু ছেলে, পেটে পেটে এত বিদ্যে তোর! ও যে তোর বড় বোনের বয়সী রে!

ফটিক গম্ভীর হইয়া কহিল, কি যা-তা বলছেন খুড়ীমা! কাকা কোথায়? তাঁর জন্যে বিড়ি আর চা এনেছি।—বলিয়া পকেট হইতে বাণ্ডিল দুই বিড়ি ও এক প্যাকেট চা বাহির করিল।

হাত নাড়িয়া মাতঙ্গিনী কহিল, নিয়ে যা তোর চা-বিড়ি; ভাতে ধুলো দিয়ে চা-বিড়ি খাওয়ানো! বেরো, হতভাগা, বাড়ি থেকে। এ বাড়িতে আর পা দিস তো, তোকে মা কালীর দিব্যি, যাকে মানিস তার দিব্যি।

ফটিক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

বিমলা নিজের ঘরের মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছিল। দরজায় দাঁড়াইয়া মাতঙ্গিনী কহিল, দিলাম ছোঁড়াকে দূর ক'রে, তোকেও দোব। কেন থাকতে দোব তোকে? তুই কে আমার? যদি আমাদের দরদ করতিস, তোরও করতাম, আমাদের মুখের দিকে যখন তাকালি না, তোর মুখের দিকেও তাকাব না।

অঘোরের কাছে গিয়া মাতঙ্গিনী কাঁদিয়া কহিল, শুনছ! ফটকে ছোঁড়া এসেছিল, দূর ক'রে দিলাম। বলে, চা-বিড়ি এনেছি কাকার জন্যে। কাকা!

অঘোর কহিল, বিড়ি-চা রাখলি না কেন?

মাতঙ্গিনী মাথা নাড়িয়া কহিল, ওর দেওয়া চা-বিড়ি খাবে তুমি? লজ্জা করবে না?

অঘোর গজগজ করিতে লাগিল, যত সব মেয়েমানুষের বুদ্ধি! বিড়ি-চা এনেছিল, ফেরত দিয়ে দিলে! বাঁচতে দেবে না আমাকে। পেটটা খিদের চোঁ-চোঁ করছে, এক কাপ চা খেলেও পেটটা ঠাণ্ডা হ'ত।

বেলা তিনটা। বাগান-বাড়ির বারান্দায় জমিদার ভূপতি রায় একটা চেয়ারে বসিয়া ছিল, সদ্য দিবানিদ্রা সমাপ্ত করিয়াছে, মুখের ভাব থমথমে, চোখ লাল।

বিস্তৃত বাগান, চারিদিকে মেহেদিগাছের ঘন বেড়া। মাঝখানে ছোট একটা দীঘি, নাম রাধা-সাগর, রাধারাণী ভূপতির পিতামহীর নাম। দীঘির চারিটা পাড়ই সমতল, উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে শান-বাঁধানো ঘাট, দক্ষিণ পাড়ে ঘাট হইতে কিছু দূরে চারিদিকে উঁচু দেওয়াল দিয়া ঘেরা গৃহদেবতা বিষ্ণুর মন্দির, পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাড়ে বিস্তর আম লিচু আর নানা ফলের গাছ। উত্তর পাড়ে পাকা একতলা চার-কুঠুরি বাড়ি, সামনে টালির ছাওয়া টানা বারান্দা। একটা কুঠুরিতে কাছারি, আর একটাতে ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস, ভূপতি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট; আর একটাতে হাকিম-হুকিম আসিলে থাকেন; আর একটাতে থাকে স্বয়ং ভূপতি। এই ঘরে দিবা-রাত্র থাকে ভূপতি, এইখানেই স্নানাহার ও দিবা-রাত্রির শয়নের ব্যবস্থা, কোন কোন রাত্রে খেয়াল ও মর্জ্জি হইলে গৃহে গৃহিণীর কক্ষে রাত্রি-যাপন করে।

ভূপতির বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, বেঁটে মোটা দেহ, রঙ ফর্সা, তবে পাড়াগাঁয়ে থাকায়

দরুন তামাটে রঙ ধরিয়াছে; গোল ধরনের মুখ; মাথার চুল মোটা ও পুরু, ঘাড়ের দিকটা কামানো, সামনে লম্বা টেরি। মুখের দাড়ি ও গোঁফ কড়া, দুইই মাঝে মাঝে কামায়। হাতে পায়ে বুকে ও পেটে চুলের আধিক্য। ছোট ছোট চোখের উপরে কেশবহুল ভ্রূ, মোটা নাক, মুখের ভাব রুক্ষ ও কর্কশ। ভূপতির পরিধানে মিহি ধুতি, গা খালি, কাঁধে ভিজা তোয়ালে, পায়ে চটিজুতা। আষাঢ়ের গুমট গরমে ভূপতি অবিরত অজস্র ঘামিতেছে ও ভিজা তোয়ালে দিয়া গা মুছিতেছে।

মাতঙ্গিনী সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিরক্ত-স্বরে ভূপতি কহিল, কে?

মাতঙ্গিনী আরও কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, আমি বাবা—সাধনের মামী।

কি দরকার এখানে?

মাতঙ্গিনী অনুনয়ের সুরে কহিল, আমাদের ওপর রাগ ক'রো না বাবা। বুড়োর অনুতাপের সীমা নেই, সারাদিন নড়বার চড়বার ক্ষ্যামতা নেই, আমিই এলাম তাই। ছেলের মত তুমি, তোমার কাছে আসতে তো লজ্জা নেই।

ভূপতি কহিল, ক্ষীরোদার কাছে সব শুনেছি আমি, অপমান আমার যা হবার হয়েছে; আমার কাছে এলেই তার কি প্রতিকার হবে?

বাবা, আমাদের কোন দোষ নেই। স্বামী-স্ত্রীতে হাজার বার বলেছি, এখনও বলছি, যা, বাবুর পায়ে ধ'রে ক্ষ্যামা চেয়ে কাজ করগে যা। ভারি বেহেড মেয়ে বাবা, কোন মতে শুনছে না।

ভূপতি কড়া গলায় কহিল, থাক্ থাক্, আমাদের আর দরকার নেই। মুখী বামনীর মেয়ে কাজে ঢুকেছে, রান্না-বান্না করে বেশ, বুড়ো-হাবড়াও নয়; ওকে দিয়েই চলবে। তা একটা কথা তোমার কর্ত্তাকে বলগে, বাড়ি থেকে উঠে যাবার ব্যবস্থা করতে। কালই গোমস্তাকে জেলায় পাঠাব নালিশ করতে, সুদে মূলে অনেক টাকা হয়ে গেছে, অনেক দিন অপেক্ষা করেছি, আর পারব না।

মাতঙ্গিনী ভ্যাক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, আমাদের মেরো না বাবা! কদিনই বা বাঁচব আমরা, আমরা ম'লে তো সবই তোমার হবে।

কবে কে মরবে এত হিসেব করতে গেলে জমিদারি চলে না।

মাতঙ্গিনী দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, হেই বাবা ভূপতি! আমাদের ওপর বিরূপ হ'য়ো না বাবা! যেমন দু-মুঠো খেতে দিচ্ছ দাও, আর ওই ছুঁড়ীটাকে শায়েস্তা কর।

ভূপতি মাথা নাড়িয়া কহিল, খেতে-টেতে দিতে পারব না, শায়েস্তা করবারও আমার দরকার নেই।

মাতঙ্গিনী কহিল, না বাবা ভূপতি, ও কাজ ক'রো না বাবা। আমরা ম'রে যাব তা হ'লে।

ভূপতি কহিল, মরবে কেন গো? সরকার লঙ্গরখানা ক'রে দিয়েছে, আমার কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর না ক'রে সেখানে যাও। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমার এক কথা, এক মাসের মধ্যে বাড়ি তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে।

বাবুদের বেড়ের পাশে একটা প'ড়ো জমিতে খড়ের চালাঘর তুলিয়া লঙ্গরখানার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখান হইতে সমবেত ক্ষুধার্ত্ত জনতার কোলাহল কানে আসিতে লাগিল।

ভূপতিই লঙ্গরখানার মালিক। অর্দ্ধেক চাল-ডাল সে নিজের অনুগত ও অনুরক্ত লোকদের বিতরণ করে। তাহার দয়া হইলে এইখানেই সে মাতঙ্গিনীকে চাল ডাল দিতে পারে, না হইলে লঙ্গরখানায় গেলেও কেহ তাহাদের বসিতে দিবে না। তা ছাড়া ভদ্রঘরের মেয়ে-পুরুষ হইয়া লঙ্গরখানায় ছোটলোকদের চোখের সামনে একসঙ্গে খাইতে বসিবে কেমন করিয়া? দুর্ভিক্ষ চিরদিন থাকিবে না, কিন্তু এই কলঙ্কের দাগ আমরণ দপদপ করিতে থাকিবে। এমন করিয়া বাঁচার চেয়ে মরণই ভাল।

ভূপতি গলা ঝাড়িয়া কহিল, তোমাদের বউটির এত তেজ বাড়ল কি করে বলতে পার? মাতঙ্গিনী কহিল, ও এমন ছিল না বাবা! কায়েতদের ফটকেই ওর মাথা ঘুরিয়া দিয়েছে, বলে কিনা—ঘরে থাকব না, শহরে চাকরি করব।

ফটকেকে তো তোমরাই ঘরে ঢুকিয়েছ।

আমরা ঢোকাই নি বাবা, সাধন বেঁচে থাকতেই আমাদের ঘরে আসে, সাধনের কাছে পড়ত কিনা। কি ক'রে জানব বাবা, এমন বদ ছেলে।

গাঁয়ের সবাই জানে, আর তোমরা জান না? কানে তুলো দিয়ে বাস কর নাকি গাঁয়ে? যত গুণ্ডা বদমায়েশদের সঙ্গে ওর ভাব, বাউরী-বাগদীদের মেয়েদের সঙ্গে খারাপ কাণ্ড। থানার দারোগার খাতায় ওর নাম লেখা।

মাতঙ্গিনী গালে হাত দিয়া কহিল, ওমা! কি কথা! জানি না বাবা, কিছুই। আজকে এসেছিল, গাল দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছি, ঘরে আর আসতে মানা ক'রে দিয়েছি।

ভূপতি গম্ভীর মুখে কি ভাবিতে লাগিল।

মাতঙ্গিনী কহিল, আমাদের ভাতে মেরো না বাবা। ও ছুঁড়ীকে তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি; মার-ধর যা ইচ্ছে কর ওকে, আমরা কোন দিন টুঁ করব না।

ভূপতি কি ভাবিতে লাগিল। তাহার ঠোঁটে সূক্ষ্ম ক্রূর হাসি ফুটিল; চোখ দুইটা সাপের চোখের মত চকচক করিয়া উঠিল, দুই ঠোঁট লালসায় ও লোভে ছুরির ফলার মত বাঁকা হইয়া উঠিল।

মাতঙ্গিনী মিনতি করিয়া কহিল, হেই বাবা ভূপতি! লঙ্গরখানায় যেতে পারব না বাবা।

ক্রুর হাসি হাসিয়া ভূপতি কহিল, পারবে না কেন, শুনি? ছোটলোকদের সঙ্গে তোমাদের তফাত কিসের? একবেলার খাবার সংস্থান নেই। ওদের তবু মাথা গোঁজবার এক-একটা কুঁড়ে আছে, তোমাদের তাও নেই। ডিক্রী ক'রে, দখল নিয়ে যেদিন ঘর থেকে দূর ক'রে দোব, দাঁড়াবার জন্তে গাছতলাও থাকবে না তোমাদের। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বাউরী-বাগদীদের মেয়ে-পুরুষের কাছে তবু কাজ পাওয়া যায়, তোমাদের কাছ থেকে তাও পাওয়া যায় না। মিছিমিছি কেন তোমাদের খেতে দোব, শুনি?

মাতঙ্গিনী কহিল, কাজ তুমি করিয়ে নাও বাবা, তোমার হাতেই তো সব ছেড়ে দিচ্ছি।

একটা চাকরকে ডাক দিয়া ভূপতি কহিল, এই! একে আধ সের চাল দিয়ে দে। মাতঙ্গিনীকে কহিল, শুধু তোমাদের দুজনের জন্তে দিলাম। বউটাকে এক মুঠোও খেতে দিও না। ওর রস একটু মরা দরকার, না হ'লে তেজ কমবে না, ওকে ভাল ক'রে বুঝোওগে যাও, যদি কালকের মধ্যে আমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে যায় তো ভাল, না হ'লে কোন কথা শুনব না। আর যদি আসে, ভালভাবে কাজকর্ম্ম করে, তো তোমাদের কোন অভাব রাখব না।

২

মাতঙ্গিনী চীৎকার করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল; বলিতে লাগিল, এমন লোকের নামে কুচ্ছো, জিব তার খ'সে যাবে! কি করলি আমাদের? চাল দিয়েছে, দুটো কাঁচকলা দিয়েছে, সেদ্ধ ক'রে খাব দুজনে। অঘোরকে হাঁকিয়া কহিল, শুনছ! যাবামাত্র চাল দিলে দুজনের, বললে, তোমাদের কি দোষ? তোমাদের কি চিনি না আমি, কেমন লোক তোমরা! নিয়ে যেও চাল রোজ এসে। তবে ঐ মাগীটাকে জব্দ করা দরকার, ভারি তিড়বিড়েনি হয়েছে ওর, শুনে একটি ভাত পর্য্যন্ত দিও না ওকে; ক্যান বরং রাস্তার কুকুরকে ডেকে দেবে, ওকে দিও না। দম লইয়া কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ নামাইয়া কহিল, সত্যি! এমন একটা লোক। মহাদেবের মত চেহারা। তেমনই মন। তার সঙ্গে এমন ব্যাভার! ছিঃ ছিঃ! জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া!

অঘোর বিরক্তির স্বরে কহিল, আর চেঁচাতে হবে না, যা, ভাতে ভাত সেদ্ধ কর্‌গে যা, ক্ষিদের আঁত থাক হয়ে'গেল আমার।

মাতঙ্গিনী হাত নাড়িয়া কহিল, আমার ওপরেই যত তেজ! গেলবার ব্যবস্থা ক'রে আনছি যে! ওই হারামজাদা নেমকহারাম মাগীকে জব্দ করতে পার না? অঘোর কহিল, হবে, হবে, সব ব্যবস্থা হবে, তুই এখন যা তো।

মাতঙ্গিনীর রান্না শেষ হইতে বেলা গড়াইয়া গেল। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে খাইতে

বসিয়াছিল, ক্ষীরোদা আসিয়া দাঁড়াইল, কি গো বামুন-খুড়ী, কি হচ্ছে তোমাদের? তোমাদের বউকে দেখছি নে? মাতঙ্গিনী বুঝিল, ভূপতি চর পাঠাইয়াছে, বউকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য। আপ্যায়নসহকারে কহিল, আয় মা ক্ষীরোদা! ব'স্, বউয়ের কথা বলিস নে মা! সেই যে ঘরে ঢুকেছে, আর বেরোয় নি। দুজনের চাল দিয়েছে ভূপতি, বার বার ক'রে মানা ক'রে দিয়েছে, বউকে যেন এক মুঠোও দেওয়া না হয়। আমি কথা দিয়ে এসেছি, ভাঙবার লোক কি? দেখ্ না মা, হাঁড়ি খালি ক'রে দুজনের পাতায় ঢেলেছি। ক্ষীরোদা এক পা আগাইয়া আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হাঁড়ির দিকে তাকাইতেই মাতঙ্গিনী কহিল, এক মুঠো ফেন-ভাত রেখেছি বুড়োর জন্যে, রাত্রে যদি খেতে চায়, আর বউ তো ভাত খায় না রাত্রে, বিধবা মানুষ।

দেখি, তোমার বউ কি করছে!—বলিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্ষীরোদা বিমলার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া কহিল, কি গো বউ, কি করছ? বিমলা মুখ ঘুরাইয়া লইল। ক্ষীরোদা কহিল, মুখের দিকেও তাকাবে না নাকি গো! এত পাপিষ্ঠা আমি? মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া বিমলা কহিল, তুমি পাপিষ্ঠাই বটে।

ক্ষীরোদা খনখন করিয়া কহিল, বেশ, তাই। তুমি নিজে তো ভাল। দেখা যাবে, অনেক দেখলাম এই বয়েসে, আমার সঙ্গেই একদিন মিতেন পাতাবে তুমি।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বিমলা রান্নাঘর হইতে কলসী লইয়া বাহির হইতেই মাতঙ্গিনী কহিল, এই ভরসন্ধ্যেয় কোথা যাচ্ছ?

বিমলা কহিল, এক কলসী জল নিয়ে আসি।

মাতঙ্গিনী কহিল, সারাদিন গেল আলে-থালে রাতের পিছে বাতি জ্বলে, বিকেল-বেলায় পা মেলে ব'সে না থেকে আনলেই পারতে। বিমলা জবাব না দিয়া বাহিরের দিকে চলিল। মাতঙ্গিনী কহিল, যাচ্ছ, যাও, ফটকে ছোঁড়ার সঙ্গে দেখা হ'লে কথাবার্ত্তা ব'লো না, ভূপতি এমনিই রেগে আছে, কোন কথা কানে গেলে বাকি রাখবে না।

বিমলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি কার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কই বা না কই, তাতে তার কি? সে কি আমার—। মাতঙ্গিনী কহিল, সে চোদ্দ পুরুষ। গাঁয়ের রাজা, রাজা। এমনই যদি তোমাকে মাথা ন্যাড়া ক'রে ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে চড়িয়ে, গাঁ থেকে বার ক'রে দেয় তো গাঁয়ের কারও সাধ্য নেই আটকায়। বিমলা চলিয়া গেল।

গ্রামের পাশেই একটি নদী, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এত ছোট যে, ইহাকে নদী বলা চলে না, এ অঞ্চলে কেহ বলেও না; বলে, যোড়; নাম ডাকিনীর যোড়। গ্রামের বাহিরে দাঁড়াইয়া পশ্চিম দিকে তাকাইলে হিমালয়ের সমান্তরালে যে ছোট-খাটো পাহাড়ের সারি দেখা যায়, উহাদের একটাতে ইহার উৎপত্তি, মাইল দশ মাত্র ইহার গতিপথ;

এ গ্রাম হইতে মাইল কয়েক দূরে বিড়াই নদীর বুকে ইহার আয়ুরেখার সমাপ্তি। সারা বৎসরের মধ্যে কখনও ইহার বুকে একটানা স্রোত বহে না, প্রচুর বর্ষণের পরে পাহাড়ের ঢল নামিয়া গেরুয়া রঙের জলস্রোত দুই কূল ছাপাইয়া ছুটিতে থাকে, ঘণ্টা কয়েকের পরে আবার যে-কে সেই, অভ্রকণা-খচিত শ্বেত বালুবক্ষ। গ্রামের লোক কিন্তু সারা বৎসর ইহারই জল পান করে। ইহার শুষ্ক বালুবক্ষের নীচে একটি শীর্ণ জলধারা আছে, বক্ষ বিদীর্ণ করিলেই ক্ষত স্থান কাচের মত স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

বিমলা নদীর দিকে চলিল। ফটিকের বাড়ির কাছ দিয়া পথ। পথের ধারে একটা ডোবায় কতকগুলা বাউরীদের ছোট-ছোট ছেলে ছিপ দিয়া ব্যাঙ ধরিতেছিল, ফটিক ডোবার ধারে দাঁড়াইয়া তাহাদের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। বিমলাকে দেখিতে পাইয়াই ফটিক কি বলিবার চেষ্টা করিতেই বিমলা চোখের ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল। ঠিক সামনেই জনকয়েক এই পাড়ার মেয়ে নদী হইতে জল লইয়া ফিরিতেছিল। ফটিক মুখ ফিরাইয়া আবার ছেলেদের সঙ্গে গল্প শুরু করিল। মেয়েদের কে মন্তব্য করিল, লেখাপড়া শিখে আলাপ করবার লোক জুটিয়েছে ভাল! আর একজন কহিল, মাথার ওপর বাপ নেই, মা তো ওই হাবা-গোবা মানুষ, রীত তো ওই রকমই হবে!

পাড়া পার হইলেই মাঠ। আল পথ দিয়া কতকটা গেলেই নদী। অনেক মেয়ে জল লইয়া ফিরিতেছিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, এত সন্ধ্যে ক'রে এলে? কেহ জিজ্ঞাসা করিল, অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন গো? জ্বর-টর হয়েছে নাকি? একজন জিজ্ঞাসা করিল, শাশুড়ী এত চেঁচাচ্ছিল কেন সকালে? ঝগড়া-ঝাঁটি হচ্ছিল বুঝি? কখনও মৃদু হাসিয়া, কখনও ঘাড় নাড়িয়া, কখনও চুপ করিয়া থাকিয়া বিমলা তাহাদের পার হইয়া গেল।

ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পশ্চিম-আকাশে অস্তরাগের শেষ আভাটুকু মিলাইয়া গিয়াছে। ফিকা তরল অন্ধকার সারা মাঠের বুকে জমিয়া উঠিতেছে। আকাশে তারা ফুটিতে শুরু করিয়াছে। জলপূর্ণ ভারী কলস কক্ষে লইয়া বিমলা ধীরে ধীরে পা টানিয়া টানিয়া আল-পথে চলিতেছিল; মাঝপথে ফটিকের সঙ্গে দেখা হইল। ফটিক তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; বিমলার সঙ্গ লইয়া কহিল, এত দেরি করলেন? বিমলা জবাব না দিয়া কহিল, তুমি শহর থেকে ফিরলে কখন? ফটিক কহিল, কাল সন্ধ্যেয়। আজ সকালে তো—। বিমলা বাধা দিয়া কহিল, আমার কোন ব্যবস্থা হ'ল? এসেছেন তোমাদের সেই দিদি? ফটিক কহিল, তিনি এখনও আসেন নি বউদি; শরীর নাকি তাঁর আরও খারাপ হয়েছে; দু-চার মাস আসতে পারবেন না বোধ হয়। তবে আমি ব'লে এসেছি ওখানের কর্ম্মীদের; তাঁরা বলেছেন, হাতে এখন তেমন কোন

ব্যবস্থা নেই ; তবে তাঁরা চেষ্টা করবেন। বিমলা থামিয়া দাঁড়াইয়া ফটিকের দিকে তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, তোমাদের কর্ম্মীদের আমি চিনেছি ভাই। ওঁরা মুখে বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু সত্যিকার কোন কাজ করবার ক্ষমতা ওঁদের নেই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, পৃথিবীতে সবাই তেলা মাথায় তেল দিতেই ব্যস্ত ; যাদের সত্যিকার সাহায্য দরকার, তাদের জন্যে কেউ কিছু করে না ; যাক গে, যা আছে অদৃষ্টে হবে।—বলিয়া আবার চলিতে শুরু করিল।

জনশূন্য মাঠ, চারিদিকে অন্ধকারের আবেষ্টনী। অনপচয়িতযৌবনা, সুন্দরী নারীর রক্তাভ মুখ ও রোষদীপ্ত চোখের দিকে তাকাইয়া ফটিকের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, কণ্ঠস্বরের কম্পন যথাসম্ভব স্তিমিত করিয়া কহিল, আরও দিনকতক অপেক্ষা করুন বউদিদি, ওঁরা যখন চেষ্টা করবেন বলেছেন, তখন নিশ্চয় একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। বিমলা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, আর কদিন অপেক্ষা করব ? একটা মানুষ কদিন উপোস ক'রে থাকতে পারে ? ফটিক বিস্ময়ের স্বরে কহিল, উপোস ক'রে আছেন নাকি ? বিমলা শুষ্কস্বরে কহিল, হ্যাঁ, কাল সারা দিন-রাত প্রায় উপোস গেছে, আজও সারাদিন চলেছে। ফটিক কহিল, কেন ? বিমলা কহিল, কি ক'রে যে আমাদের পেট চলে জান তো! বাবুদের বাড়ির কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি। ফটিক থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, সে কি! বিমলাও থামিয়া কহিল, হ্যাঁ, খাটতে আমার আপত্তি নেই, কসুরও করি নি ; কিন্তু অপমান—। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, অপমান সহ্য করব কি ক'রে ? ফটিক বুঝিল, তবু প্রশ্ন করিল, কে অপমান করলে আপনাকে ? বিমলা কহিল, ভূপতি রায়। দিনের পর দিন অপমানের মাত্রা বেড়েই চলেছে ; ছোটলোকদের মেয়েদেব নষ্ট ক'রে ক'রে ওর বুকের পাটা বেড়ে গেছে ; আমাকে নষ্ট করতে চায় ও। ঠাকুরপো, দেহের কষ্ট সহ্য করা যায়, কিন্তু দেহ নষ্ট করবার গ্লানি সহ্য করব কি ক'রে ? দম লইয়া কহিল, তাই ছেড়ে দিলাম। উপোস দিয়ে বরং মরব, তবু ও-ভাবে মরা— মাথা নাড়িয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, পারব না।

ফটিকের বাড়ি পার হইয়া আসিয়াছিল তাহারা। রাস্তাটা এখানে মোড় ঘুরিয়া বিমলাদের বাড়ির সামনে দিয়া গিয়াছে। বিমলা কহিল, আচ্ছা, আসি ভাই।

ক্ষীরোদা বিমলাদের বাড়ির দিক হইতে আসিতেছিল। কাছে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কে গা ? বামুন-বউ বুঝি ? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছ গা ? আরও কাছে আসিয়া কহিল, ওঃ, ফটিক ! আমি ভাবি কে ! ওকে সঙ্গে ক'রেই জল আনতে গিছলে নাকি ? না, এখানেই পাকড়াও করলে ? দুই ওষ্ঠ সহযোগে শ্লেষ-ব্যঞ্জক শব্দ করিয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল, কত রঙ্গই শিখেছ বউ ! আমরাই শুধু আকাট র'য়ে গেলাম।—বলিয়া চলিয়া গেল। বিমলা দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল, বজ্জাত

মাগী! বেশ্যা! ফটিক কহিল, ওর কোন দোষ নাই বউদি, যা করেছে বেঁচে থাকবার জন্যেই করেছে। দুই চোখ বড় করিয়া বিমলা কহিল, ওই রকম ক'রে বেঁচে থাকা! গভীর ঘৃণার সহিত কহিল, ছিঃ! ফটিক কহিল, যেমন ক'রে হোক বেঁচে থাকাই আসল কাজ—বেঁচে থাকা আর বাঁচিয়ে রাখা। ভাল হোক, মন্দ হোক, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে শক্তির সঞ্চয়, কুশলী হাতের কৌশলে এই শক্তি যখন সংহত হয়, সক্রিয় হয়, তখন দেশের চেহারা বদলে যায়। ওদের দেশে তাই জনশক্তির এত মর্য্যাদা, প্রত্যেকটি জনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তাই প্রাণপণ চেষ্টা।

বিমলা শ্লেষের স্বরে কহিল, তাই প্রত্যেক দিন হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে! ফটিক কহিল, দেব-দানবে যুদ্ধ তো সব যুগেই আছে বউদিদি। দানবীয় শক্তির ধ্বংস ক'রে দৈব শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এই লোক-ক্ষয়। কিন্তু এর একদিন শেষ হবে, অকল্যাণের ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে কল্যাণের রাজত্ব। নবযুগের আবির্ভাব হবে সারা পৃথিবীতে, আমাদের দেশেও। সে যুগে প্রত্যেকটি মানুষ সার্থক হবে, ধন্য হবে। যার যতটুকু শক্তি আছে কাজে লাগবে, কিছু ফেলা যাবে না। ওই ক্ষীরোদাই দেখবেন, কত কাজের মানুষ হয়ে উঠবে। আর বেশি দেরি নেই বউদিদি; আবির্ভাবের ক্ষণ আসন্নপ্রায়, চোখে দেখে যাবার জন্যই বেঁচে থাকতে হবে সবাইকে। বিমলা হাসিয়া কহিল, ঠাকুরপো, এ কথাগুলি বুঝি এবার নতুন শিখে এলে, না কোন নতুন বই পড়েছ? ফটিক লজ্জিতমুখে কহিল, এ আমার বিশ্বাস বউদিদি। বিমলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, আমার মত অবস্থায় পড়লে, কেমন ক'রে বিশ্বাস থাকত দেখতাম! আচ্ছা, আসি। চলিবার উপক্রম করিতেই ফটিক কহিল, একটা কথা বউদিদি। আপনাকে বাঁচতে হবে। বিমলা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, কেমন ক'রে শুনি? ভূপতি রায়ের হাতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে? ফটিক কহিল, না বউদিদি, আপনার যেমন অভিরুচি, তেমনই ভাবে। কালই আমি আবার শহরে যাব, যেমন ক'রে হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করবই। যতদিন না ফিরি, ততদিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। বিমলা হাসিয়া কহিল, এ কদিন কি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকব ঠাকুরপো? ফটিক অপ্রতিভভাবে কহিল, না না, সে কি! মাষ্টার মশায় আমাকে নিজের ভাইয়ের মত ভালবাসতেন বউদিদি। আপনি তো জানেন, সে হিসেবে আমার ওপর আপনার দাবি আছে, আমারও দাবি আছে আপনার ওপর। আমাকে সব কথা বলা আপনার উচিত ছিল। ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে জানলে আমি এর আগেই যা হোক একটা ব্যবস্থা করতাম। আমার দেওয়া খাবার খেতে আপনার আপত্তি হ'বে না আশা করি, হ'লেও শুনব না। আজ রাত্রে আমি খাবার দিয়ে আসব। কাল মাকে ব'লে, আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত দিন-কয়েকের চাল ডাল পাঠাবার ব্যবস্থা করব। বিমলা গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিল, তোমার মা দেবেন কেন?

ফটিক কহিল, মাকে আপনি চেনেন না; দিদি হিংসুটে ঝগড়াটে বটে, কিন্তু মা আমার লোক ভাল; বুঝিয়ে বললেই রাজি হবেন। আর যদি নাই হন তো আমার সোনার আংটি আর বোতাম বিক্রি ক'রে সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাব। বিমলা কিছুক্ষণ ফটিকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমি চলি, ঠাকুরপো। ফটিক কহিল, আপনাদের বাইরের দরজাটা যেন খোলা থাকে বউদিদি। বিমলা জবাব না দিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি এগারোটা। পাড়াগাঁয়ে দুপুর-রাত্রি। নিজের ঘরটিতে চুপ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া ছিল বিমলা। সারাদিনের উপবাসে শরীরটা ঝিমঝিম করিতেছে। ঘর অন্ধকার; কেরোসিন গ্রামে দুর্লভ; কোনমতে দু-এক পয়সার সংগ্রহ করিতে হয়, এবং নেহাত প্রয়োজন না হইলে লম্প জ্বালা হয় না। ঘরের ভিতরে গুমোট গরম, মশকের গুঞ্জনে মুখরিত।

বাহিরের দরজায় শিকলটা টুকটুক করিয়া নড়িয়া উঠিল। বিমলা সতর্ক পায়ে বাহিরে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ফটিক দাঁড়াইয়া ছিল, হাতে পাতার ঠোঙা। বিমলা কহিল, এস। ফটিক উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ফটিক কহিল, আলোটা জ্বালুন; আপনি খান, আমি দেখে যাই।—বলিয়া বিমলার হাতে খাবারের ঠোঙাটি দিল। বিমলা কহিল, খাব এখন, কিন্তু এমন ক'রে কতদিন চলবে, একটা কোন ব্যবস্থা না করলে—

ফটিক কহিল, বলেছি তো, কাল যাব, একটা কিছু ব্যবস্থা না ক'রে ফিরব না। সংশয়জড়িত মৃদুকণ্ঠে বিমলা কহিল, তাড়াতাড়ি কি ব্যবস্থা হবে, এতদিনেও যখন কিছু হ'ল না! ফটিক কহিল, তাঁদের তো সব কথা বলা হয় নি; সব জানতে পারলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবেন। আপনি তাঁদের জানেন না বউদিদি; খুব ভাল লোক তাঁরা; জনমজুরদের জন্যে কত করেন তাঁরা! বিমলা বাধা দিয়া কহিল, আমি তো আর জানমজুর নই। ভদ্রঘরের মেয়ে, আমাদের দিকে তাকাবার কেউ নেই, আর বলা-কওয়া ক'রে যদি দয়া টানতেই পার তাঁদের তো কি ব্যবস্থা করবেন, শুনি? ফটিক ঢোক গিলিয়া দ্বিধাকম্পিত স্বরে কহিল, দিদিমণি না আসা পর্য্যন্ত একটা সঠিক ব্যবস্থা হবে না বটে, তবে—। বিমলা কহিল, কি তবে?

মানে, থাকবার ব্যবস্থা করা যাবে।

কোথায়?

মানে, ওঁদের তো অনেকের নিজের বাড়ি রয়েছে শহরে, কারও বাড়িতে—

বিমলা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, পাগল! আমাকে থাকতে দেবে কেন? তা কি দেয়?

এবার দৃঢ়কণ্ঠে ফটিক কহিল, যদি না দেয় তো, একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে আসব, সেখানে থাকবেন আপনি। বিমলা কহিল, একা থাকব নাকি?

ঝিয়ের ব্যবস্থা করব, ওঁরাও দেখাশুনো করবেন। আমিও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসব। বিমলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, খরচ আসবে কোথা থেকে? ফটিক কহিল, সে আমি ব্যবস্থা করব।

অন্ধকার রাত্রি, আকাশে অগণ্য তারা, ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে, কিছু দূরে একটা গাছের ডালে একটা রাত্রিচর পাখী মিহি ও মিষ্টি সুরে একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে। ফটিক বিমলার মুখের দিকে চাহিল, রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুলে ঘেরা সুন্দর মুখখানি বাসী ফুলের মত মলিন শুষ্ক; সারা মুখের উপর উদ্বেগের গাঢ় ছায়া; চোখ দুইটি বেদনা সংশয় ও নিঃসহায়তার নিরাশায় ম্লান; সারা সংসারের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণায় অধরোষ্ঠ দৃঢ়নিবদ্ধ। ফটিকের মনের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত অনুভূতি জাগিয়া উঠিল। সে ভুলিয়া গেল, তাহার বয়স কুড়ি, বিমলার পঁচিশ; শুধু এই কথাই মনে হইল যে, সে পুরুষ, বিমলা নারী, নির্য্যাতিতা নিঃসহায়া, একান্তভাবে তাহারই উপর নির্ভরশীলা। যে পুরুষ যুগ যুগ ধরিয়া নারীকে বিপদ হইতে বুক দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছে, অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া নারীর জন্য আহার্য্য ও পরিধেয় সংগ্রহ করিয়াছে, নারীর জন্য বাসা বাঁধিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, সেই পুরুষের সেই নব-জাগ্রত চেতনা তাহার হৃদয়কে সবল শক্তিমান, মনকে দ্বিধাহীন ও সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিল; অধিকন্তু এই অভিভাবকহীনা নারীর ভাবী অভিভাবকত্ব ও অবশ্যম্ভাবী অবাধ ও অকুণ্ঠ সাহচর্য্যের মাধুর্য্যে তাহার অন্তরাকাশে একটি রস-ঘন বাষ্প-মণ্ডলের সৃষ্টি করিল, এবং তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে আবেশের মৃদু বিদ্যুৎ-বিকাশ হইতে লাগিল।

ফটিক দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আপনি কিছু ভাববেন না বউদিদি, আমার ওপর নির্ভর করুন, আপনাকে আপনার যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ।

বিমলা কহিল, তোমার মা, তোমার দিদি যদি বাধা দেয়, ভূপতি রায় অত্যাচার করে, তবে?

ফটিক ভারী গলায় কহিল, সে ভাবনা আমার, যা আমি আমার কর্ত্তব্য ব'লে স্থির করেছি—

গাঁয়ের চৌকিদার দরজার বাহিরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ইয়াদের দরজাটা খোলা কেনে গো! অ্যা! ও মুখুজ্জে মশায়, মুখুজ্জে মশায়!

চৌকিদার দরজায় ঢুকিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই বিমলা ভীত, সন্ত্রস্ত চাপা গলায় কহিল, চ'লে এস, চ'লে এস আমার ঘরে।

বিহ্বল ও বিভ্রান্ত ফটিককে একরকম ঠেলিয়া ঘরে ঢুকাইয়া লইয়া বিমলা দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

চৌকিদার উঠানে আসিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। ও মুখুজ্জে মশায়! যা কালা মানুষ! ও গিন্নীমা, শুনছেন! মাতঙ্গিনী হাঁকিয়া কহিল, কে র‍্যা? চৌকিদার কহিল, আমি রঙ্গলাল, বার-দরজাটা হাঁ ক'রে খোলা ছিল যে! একবার বেরিয়ে আসুন দেখি। মাতঙ্গিনী অঘোরকে উঠাইতে লাগিল, ওগো! শুনছ! একবারটা ওঠ না! রঙ্গলাল ডাকাডাকি করছে যে! বাইরের দরজাটা খোলা। অঘোর নিদ্রাজড়িত স্বরে প্রবল বিরক্তির সহিত কহিল, খোলা তো আমি কি করব? বন্ধ ক'রে দিগে যা। মাতঙ্গিনী কহিল, ও বাবা রঙ্গলাল! আর কেউ উঠনে নেই তো? দেখ দিকি ভাল ক'রে। রঙ্গলাল কহিল, উঠনে তো কাউকে দেখছি না বাবু, তবে ওই ঘরটায় কে সেঁধোল মনে হচ্ছে। মাতঙ্গিনী লম্প জ্বালিয়া বাহিরে আসিল, সভয়ে কহিল, কি বলছিস? ওই ঘরটাতে? ওটা যে বউয়ের ঘর রে, ওখানে কে সেঁধোবে আবার! তবে কি বউ বেরিয়েছিল! আয় তো দেখি। মাতঙ্গিনী বিমলার ঘরের দরজার সামনে আসিয়া হাঁক দিল, ও বউমা, বউমা! কোন সাড়া নাই। রঙ্গলালের দিকে তাকাইয়া মাতঙ্গিনী কহিল, ঘুমুচ্ছে, ও কিছু না। বার-দরজা বউমা বন্ধ করতে ভুলে গেছল বোধ হয়। রঙ্গলাল কহিল, তা কি জানি বাবু, মনে হ'ল, আবছা আবছা কে যেন ঘরে ঢুকে গেল। তা এক কাজ করুন, আপনি শিকলটা দিয়ে দেন, পাড়ার সবাইকে ডেকে আনছি আমি।

মাতঙ্গিনী শিকল তুলিয়া দিল। রঙ্গলাল বাহির হইয়া গিয়া পাড়ায় হাঁকাহাকি শুরু করিল। ও মুখুজ্জে মশায়! শুনছেন! একবার উঠুন তো! অঘোর মুখুজ্জের ঘরে একটা লোক ঢুকেছে, ও চক্রবর্ত্তী মশায়!

এদিকে দরজার কাছে মুখ আনিয়া চাপা গলায় ডাক দিতে লাগিল মাতঙ্গিনী, বউমা, ও বউমা, শুনছ!

বিমলা অনেক পরে জবাব দিল, কি বলছেন?

মাতঙ্গিনী কহিল, দরজাটা খোল দেখি?

কেন?

বাইরের দরজা খোলা ছিল, রঙ্গলাল চৌকিদার বলছে; তোমার ঘরে লোক ঢুকতে দেখেছে।

বিমলা কহিল, বাজে কথা! আপনি শোনগে।

মাতঙ্গিনী কহিল, দরজাটা একবার খোলই না।

বিমলা বিরক্তির স্বরে কহিল, আমি উঠতে পারছি না, আপনি বাইরের দরজাটা বন্ধ ক'রে শোনগে যান।

মাতঙ্গিনী বলিতে লাগিল, ও বউ, ভাল কথা বলছি শোন, রঙ্গলাল লোক ডাকতে গেছে। যদি সত্যি কেউ ঘরে থাকে তো এই সময়ে বার ক'রে দাও, সবাই এসে পড়লে

কাল আর গাঁয়ে মুখ দেখানো যাবে না। তোমার হাতে কেউ জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করবে না। শুনছ, ও বউমা, ভাল কথা বলছি, শোন।

দরজা খুলিয়া দিল বিমলা। মাতঙ্গিনী ঘরে ঢুকিয়া ডিবার আলোকে ফটিককে দেখিয়া বিস্ময়ের স্বরে কহিল, ছোঁড়া, তুই! তোর এই কাণ্ড! রাত-দুপুরে বামুনের বিধবার ঘরে ঢুকেছিস? সর্ব্বাঙ্গে কুঠ হবে যে রে ছোঁড়া! রক্ত উঠে মরবি যে! মর্, মর্ তুই। আর হ্যাঁ বউমা! এই মুখে এত সতীপনা কর, আর এই উঠতি-বয়েসের ছোঁড়াটাকে নিয়ে এই কাণ্ড! লজ্জা করে না তোমার! বামুনের ঘরের বিধবা তুমি, বাড়িতে ব'সে বেশ্যাবৃত্তি! ছিঃ ছিঃ, মুখেই শুধু তোমার তেজ! ভেতরে ভেতরে নরককুণ্ড!

লজ্জায় ভয়ে ফটিকের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শুষ্ককণ্ঠে কহিল, বউদিদির জন্যে খাবার এনেছিলাম।

কই দেখি।—বলিয়া ঠোঙাটা বিমলার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া মাতঙ্গিনী কহিল, ঘরে খিল দিয়ে খাবার খাওয়াচ্ছিলি! হারামজাদা, বজ্জাত! কায়েতের বাচ্চা হয়ে খাবার খাইয়ে বামুনের মেয়ের সর্ব্বনাশ করছিস! হাত বাড়াইয়া কহিল, বেরো ঘর থেকে, যদি কোনদিন আর এখানে পা দিস তো তোকে মা-কালীর দিব্যি, তোর মায়ের দিব্যি। দম লইয়া কহিল, তোর যে দিদির বয়সী রে ছোঁড়া! এত কষ্ট ক'রে এতদূর না এসে ঘরে ডবকা ছুঁড়ী বিধবা বোনটার কাছে রাত কাটালেই পারিস। ডানপিঠে বজ্জাত! বেরো, বেরো, কাল যাব তোর মায়ের কাছে, যেয়ে তোর ছেরাদ্দ বেঁটে আসব। খাবারের ঠোঙাটা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, নিয়ে যা তোর খাবার, তোর মা-বোনকে খাওয়াগে যা, ছোটলোকের কুকুর, আর এ দরজায় দেখি তো চেলাকাঠ দিয়ে পা খোঁড়া ক'রে দোব।

ফটিক নতমস্তকে বাহির হইয়া গেল।

বিমলা পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল, মুখ জবাফুলের মত টকটকে লাল, চোখ দুইটা যেন জ্বলিতেছে।

মাতঙ্গিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, যা ভেবেছিলাম তাই! বামুনের বিধবা হয়ে একটা কায়েত ছোঁড়ার সঙ্গে এই কাণ্ড! ওদিকে ভূপতি রায়—মনিব, গাঁয়ের রাজা, কি না কি বলেছে, তার জন্যে এত গরগরানি!

বিমলা ধীর ও স্পষ্টভাবে কহিল, ও আমাকে খাবার দিতে এসেছিল।

মাতঙ্গিনী ব্যঙ্গ-বিকৃত কণ্ঠে কহিল, খাবার দিতে এসেছিল! কেন রাত-দুপুরে খাবার দিতে আসে? কে তোমার ও? বিমলা কহিল, আমার ভাইয়ের চেয়ে বেশি, আপনাদের মত তো ও পাষাণ নয়, নেমকহারাম নয়। দুই হাত নাড়িয়া মাতঙ্গিনী

কহিল, ভাই! সব বুঝি গো বুঝি। ঘাসে মুখ দিয়ে চরি না আমি; তোমাকে বুঝতে আমার বাকি নেই।

রাস্তায় অনেক লোকের কণ্ঠস্বর কানে আসিল। মাতঙ্গিনী কহিল, বক্তিমে থামিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে খিল দাও, বার থেকে শেকল তুলে দিচ্ছি আমি, এক ডাকে সাড়া দিও না। বাহিরে আসিয়া দরজা টানিয়া বন্ধ করিবার উপক্রম করিয়াই থামিয়া কহিল, আজকের মত তোমার মুখ রাখছি আমি, কিন্তু কালই যেয়ে বাবুর হাতে-পায়ে ধ'রে কাজে ভর্ত্তি হ'য়ো; না হ'লে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দোব, আর ভূপতিকে ব'লে কুলোর বাতাস দিয়ে গাঁ থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করব।

দরজাটা বন্ধ করিয়া শিকল তুলিয়া দিয়া মাতঙ্গিনী উঠানে আসিল। উঠানের এক ধারে খাবারের ঠোঙাটা পড়িয়া ছিল, সেইটা কুড়াইয়া লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

রঙ্গলালের চীৎকার শোনা গেল, ওদিকে কে যাচ্ছ হে? দাঁড়াও না, আবার যায়! উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বোধ হয় দ্রুতপদে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। রঙ্গলাল সক্ষোভে কহিল, বার ক'রে দিলেক গিন্নী? দেখলেন, সড় আছে ভেতরে ভেতরে, তবে আর যেয়ে কি হবেক?

সকলে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। মাতঙ্গিনী নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইলেন, রঙ্গলাল তাহাকে কহিল, বার ক'রে দিলেন? মাতঙ্গিনী একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। দুই চোখ চাড়াইয়া কহিল, উ কি কথা রে! কাকে বার ক'রে দিলাম? সেই থেকে গাছের মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছি আর ঠকঠক ক'রে কাঁপছি—

পাড়ার দুই-চারিজন প্রৌঢ়, জন দুই প্রৌঢ়া বিধবা ও জনকয়েক ছোকরা আসিয়াছিল। পুরুষদের—কি যুবা কি প্রৌঢ়—সকলেরই শরীর জীর্ণ-শীর্ণ, রাত-দুপুরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসার মত উৎসাহ নাই, সামর্থ্যও নাই, নেহাত অত্যন্ত কৌতুকজনক একটা ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে বলিয়া আসিয়াছে। মহেন্দ্র মুখুজ্জে কহিল, চল চল, দরজাটা খোলা যাক।

মাতঙ্গিনী সর্ব্বসমক্ষে শিকল খুলিয়া ডাক দিল, ও বউমা! বিমলার সাড়া মিলিল না। সকলে মিলিয়া হাঁকাহাকি-ডাকাডাকি করিতেই বিমলা দরজা খুলিয়া দিল।

সকলে হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরখানি ছোট, একেবারে খালি। এক পাশে মেঝের উপরে বিমলার শয্যা, ছেঁড়া মাদুর ও মলিন বালিশ। এক কোণে একটা দড়িতে বিমলার আধময়লা কাপড় ও গামছা ঝুলিতেছে; নীচেই একটা তোরঙ্গ, আর এক কোণ ঘেঁষিয়া মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া বিমলা নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে।

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। দু-একজন মুখ টিপিয়া হাসিলও।

মাতঙ্গিনী অনুযোগের স্বরে কহিল, কই রে লোক? মিথ্যে সবাইকে উঠিয়ে এনে কষ্ট দিলি রঙ্গলাল।

রঙ্গলাল মুখ ও হাত নাড়িয়া কহিল, মিথ্যে কি রকম? আমি নিজের চোখে লোক ঢুকতে দেখেছি এই ঘরে, তা ছাড়া এনাদেরও তো দেখিয়েছি, একটা লোক এই দিক থেকে ছুটে চ'লে গেল।

মাতঙ্গিনী কহিল, রাস্তা দিয়ে কে কোথায় গেল তাতে আমাদের কি?

আপনাদের বাইরের দরজা খোলা ছিল, তা তো আপনি দেখেছেন?

তা দেখেছি বটে, তবে দরজা বন্ধ করতে ভুল হয়ে যায় কোন কোন দিন; তা ব'লে—

মহেন্দ্র মুখুজ্জে কহিল, দেখ বউঠান, এ বড় গোলমেলে কথা! দরজা তোমার খোলা ছিল, একটা লোককে এদিক থেকে পালিয়ে যেতে আমরা দেখেছি; গড়ন-পিটনে কায়েতদের ফটকের মতই মনে হ'ল; ফটকে তো হামেশা তোমাদের বাড়িতে আসে; তোমাদের বউয়ের সঙ্গে নাকি খুব ভাব ওর; ওরই পরামর্শে নাকি তোমার বউ বাবুদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছে, ওর সঙ্গে নাকি—

মাতঙ্গিনী বাধা দিয়া কহিল, সব মিথ্যে কথা। ফটকে সাধনের কাছে পড়ত কিনা, তাই বউকে দিদির মত ভক্তি-ছেদ্দা করে, আসে যায়, গপ্পসপ্প করে, হামেশা নয়, মাঝে মাঝে; তা ব'লে রাত-দুপুরে আসবে নাকি? বাবুদের বাড়ির কাজ তো বউ ছাড়ে নি; শরীরে অসুখ ছিল, তাই যায় নি; কাল না হয় পরশু থেকে যাবে।

একজন কহিল, ওসব কথা-কাটাকাটি ছেড়ে দেন মহেন্দ্রকাকা। পাড়ায় ব'সে যদি এসব কাজ চলে তো ভারি ফ্যাসাদের কথা।

মাতঙ্গিনী চোখ-মুখ ঘুরাইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, কি কাজ র‍্যা?

ঘরে লোক বসানো, গাঁয়ের ছোঁড়াগুলোর মাথা খাওয়া।

মাতঙ্গিনী উঁচু পর্দায় গলা উঠাইয়া কহিল, মুখ সামলে কথা বল্ বলছি এককড়ি। ভাল লোকের মেয়ের নামে দোষ দিলে জিব খ'সে যাবে তোর। পর্দা নামাইয়া ধারালো গলায় কহিল, তা ছাড়া অত তড়পানো সাজে না তোর—অনেক বিত্তান্ত জানা আছে আমার।

এককড়ি রণে ভঙ্গ দিল। রঙ্গলালকে কহিল, কেন মিছিমিছি আমাদের জাগালি বল্ দেখি?—সকলের মুখেই রঙ্গলালের প্রতি বিরক্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সত্যই সকলের কাঁচা ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া অন্যায় করিয়াছে রঙ্গলাল।

রঙ্গলাল আমতা-আমতা করিয়া কহিল, আমি নিজের চোখে দেখলাম গো। কি জানি বাবু! কার যে মাহিত্মি, কে জানে!

মাতঙ্গিনী রঙ্গলালের দিকে জলন্ত চোখে চাহিয়া সরোষে কহিল, কি বলতে চাস তুই, মুখপোড়া ডোম? যাব কাল ভূপতির কাছে, তোর বিহিত ক'রে আসব।

সকলে একে একে চলিয়া গেল।

৩

পরদিন এই কথাটা সারা পাড়ায় প্রচারিত হইয়া গেল যে, অঘোর মুখুজ্জের ভাগিনেয়-বধূর ঘরে কাল রাত্রে লোক ঢুকিয়াছিল; লোকটা খুব সম্ভব কায়স্থদের ফটিক। হাতে-নাতে তাহাকে ধরিতে পারা যায় নাই বটে, তবু রঙ্গলাল যখন নিজের চোখে দেখিয়াছে তখন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, সন্দেহ থাকিলেও কেহ সন্দেহ করিতে প্রস্তুত নয়। চণ্ডীমণ্ডপে পুরুষদের মধ্যে, পুকুরঘাটে মেয়েদের মধ্যে এই আলোচনা জোর চলিতে লাগিল। রঙ্গলাল অনেকদিনের পুরাতন চৌকিদার, বহুদিন ধরিয়া সে এই পাড়ায় পাহারা দিয়াছে; দুর্য্যোগময় অন্ধকার রাত্রেও সে পথে পথে, দ্বারে দ্বারে গৃহস্থদের সতর্ক করিয়া ফিরিয়াছে; নিস্তব্ধ নিশীথে, গাঢ় অন্ধকারের অন্তরালে, গ্রামের কত লোকের কত কীর্ত্তি তাহার চোখে পড়িয়াছে। কতবার, তাহার কথা লোকে প্রথমে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু পরে তাহাই আবার নির্ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বহু উদাহরণ পাড়ার প্রবীণেরা উত্থাপিত করিলেন।

কথাটা পাক খাইতে খাইতে যখন ফটিকের মা ও দিদির কানে পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় নয়টা। তাহারা নূতন পুকুরে স্নান করিতেছিল; ও-ঘাট হইতে মোক্ষদা হাঁকিয়া কহিল, হ্যাগা কায়েত-গিন্নী, ছেলেটিকে ধম্মের ষাঁড় করেছ নাকি? যার তার গোয়ালে ঢুকছে যে! কায়েত-গিন্নী কৃতাঞ্জলীপুটে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিল, মোক্ষদার কথা শুনিয়া থামিল। মেয়ে কাছেই ছিল, কহিল, শুনছ মা! কি বলছে, খোকা নাকি ধম্মের ষাঁড়, যার তার বাড়িতে ঢুকছে! সূর্য্য-প্রণাম আপাতত স্থগিত রহিল। কায়েত-গিন্নী হাত নাড়িয়া কহিল, তেমন ছেলে আমি গর্ভে ধরি নি; আমার ছেলের মত ছেলে গাঁয়ে কটা আছে? এমন ছেলের নামে যারা কুচ্ছো রটায়, তাদের ইহকালও নেই, পরকালও নেই।

ফটিকের দিদি খনখন করিয়া কহিল, গোয়ালের গাই সাবধান ক'রে রাখলেই পারে সব। মোক্ষদা কহিল, আমি কি একা বলছি, গাঁ সুদ্ধ লোকের মুখে ওই কথা, অঘোর মুখুজ্জের বউয়ের ঘরে ঢুকেছিল তোমার ছেলে, কাল রাতের বেলায়। ফটিকের দিদির জবাবে মোক্ষদার পার্শ্ববর্তিনী একটি মেয়ে কহিল, তুইও সাবধানে থাকিস লো! পরের ঘরে ঢুকতে না পেলে, তোরই ঘরে ঢুকবে শেষে। ফটিকের দিদি তিড়বিড় করিয়া উঠিয়া কলহকটু-কণ্ঠে কহিল, তোর ভাইরা বুঝি ঢোকে? তাই ও কথা বলতে মুখে বাধল না তোর?

তার চিন্তা নেই।—বলিয়া কাল রাত্রে তুলিয়া রাখা রুটি আর গুড় মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, নেমে এসে খাও।

ক্ষীরোদা আসিয়া ডাক দিল, বামুন-খুড়ী রইছ নাকি গো! আপ্যায়নের সুরে মাতঙ্গিনী কহিল, আয় মা ক্ষীরোদা, আয়।—বলিয়া একেবারে দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষীরোদা দরজার সামনে আসিয়া কহিল, বামুনকাকাকে দেখেছি নে? মাতঙ্গিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল, ঘরেই তো রয়েছে। সকাল থেকে ক্ষিদে ক্ষিদে করছিল, তাই চারটি দিলাম খেতে। বুড়িয়ে ক্ষিদে চার গুণ বেড়েছে মা; ওর জন্তেই আমার মরণ। ক্ষীরোদা কহিল, বুড়ো বয়সে এটিই তো থাকে খুড়ী। না হ'লে এত ভাবনা কিসের।—বলিয়া মুখ বাড়াইয়া অঘোরকে রুটি খাইতে দেখিয়া কহিল, রুটি কোথায় পেলে গো? মাতঙ্গিনী আমতা আমতা করিয়া কহিল, ঘরে দুটি ময়দা প'ড়ে ছিল, তাই দিলাম ক'রে দুখানা বুড়োকে। মুখ মুচকাইয়া ক্ষীরোদা কহিল, তাই! তোমাদের অবস্থা তো ভাল গো! ঘরে ময়দা রয়েছে, গুড় রয়েছে। তাই তোমার বউটির এত তেজ! বউ কোথায়?

ঝঙ্কার দিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, বলিস না মা! ওকে নিয়েই আমি গেলাম। লজ্জায় ঘর বন্ধ ক'রে ব'সে আছে সকাল থেকে। তোর যখন কোন দোষ নেই, কিসের লজ্জা তোর? আমি ভগবানের দিব্যি বলছি ক্ষীরোদা! বউ বেহেড একগুঁয়ে বটে, কিন্তু ছিনাল নয়।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া ক্ষীরোদা কহিল, তা বটে। মাতঙ্গিনী চোখ দুইটি ছোট করিয়া কহিল, হাসলি যে? মুখ চোখ ঘুরাইয়া ক্ষীরোদা কহিল, কি জানি বাপু! কত লোক কত রকম বলছে! বাবু তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে; সকাল থেকে রেগে আগুন হয়ে আছে বাবু। নিজের রাজত্বতে এই সব অনাচার! ফটককে ডেকে পাঠিয়েছিল; ছোঁড়াটা তো তোমার বউয়ের চেয়েও বেহেড, বাবুর মুখের ওপর কি কথা বলেছিল তো বাবু ফকরে ডোমকে দিয়ে এমন মার দিইয়েছে যে, গরুর মার। হাড়-গোড় ভেঙে গেছে ছোঁড়ার, হালিম খাওয়াতে হবে। বাপ দু মাস ধান বেঁধে রেখে গেছে কিনা, তাই ছোঁড়ার তড়বড়ানি। প্রজা হয়ে রাজার ওপর চোখ রাঙায়! ঘরের চাল কেটে গাঁ থেকে যদি তুলে দেয় বাবু, তো কোথায় যাবে তার ঠিক নেই।

মাতঙ্গিনী ভয়ে ভয়ে কহিল, হ্যাঁ মা! ফটকের কি দোষ? ক্ষীরোদা বলিল, ফটকেই তো ঘরে ছিল, সবাই বলছে। মাতঙ্গিনী কহিল, মিথ্যে কথা, বিষ্ণুর ফুল ছুঁয়ে বলব আমি বাবুর সামনে। সবাই দেখেছে, ঘরে কেউ ছিল না। ক্ষীরোদা নীরস স্বরে কহিল, তা কি জানি বাপু। চল একবার বাবুর কাছে।

অঘোর খাওয়া-দাওয়া সারিয়া একটি বিড়ি ধরাইয়াছিল। মাতঙ্গিনী কহিল,

শুনছ, বাবু কি জন্তে ডেকে পাঠিয়েছে, যাও না! অঘোর কহিল, কেন? মাতঙ্গিনী কহিল, কি ক'রে জানব? চল না, ধীরে ধীরে নিয়ে যাই। হাত নাড়িয়া অঘোর কহিল, আমি কানা কালা মানুষ, আমি যেয়ে কি করব? তুই যা। মাতঙ্গিনী নাকী সুরে কহিল, দেখ্ দিকি মা! আমার হয়েছে জ্বালা! মেয়েমানুষ হয়ে আমি কত দিক সামলাই?

বাগান-বাড়ির বারান্দায় একটা খাটিয়ায় বসিয়া ছিল ভূপতি। আশেপাশে মোসাহেবের দল, পাড়ার ও অন্যান্য পাড়ার মধ্যবয়সী লোক সব, জন কয়েক অল্পবয়স্কা ঝি ও মালী। বাগানে পাকা ও আধপাকা বিস্তর আম পাড়া হইয়াছে। বাড়ির বিভিন্ন মহলের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন মহলের ঝিরা ঝুড়িতে ভূপতির আদেশমত আম তুলিতেছে। মোসাহেবের দল সতৃষ্ণ নয়নে পাকা আম ও কাঁচা বয়সের ঝিদের দিকে তাকাইয়া আছে।

বড়গিন্নীর (ভূপতির মা) মহলের ঝি আম লইয়া চলিয়া গেল; গিন্নীর (ভূপতির স্ত্রী) আম লইয়া গেল ক্ষীরোদার সহকারিণী, তাহার নিজের ছোট বোন নীরদা; ভূপতির ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী ছোটগিন্নীর মহলের আম লইয়া গেল তাঁহার খাস-ঝি, আর একটি মেয়ে; ঝি-চাকরদের আমও চলিয়া গেল। বাকি রহিল মোসাহেবরা; তাহাদের মালী বাকি আমগুলি ভাগ করিয়া দিতে লাগিল।

এমন সময়ে ক্ষীরোদার সঙ্গে মাতঙ্গিনী আসিল। ভূপতি একবার তাহার দিকে তাকাইয়া আবার আম্র-বণ্টনের দিকে মনোনিবেশ করিল।

মোসাহেবের দল তখন আমগুলার উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য মালীর ও তস্য মনিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

ভূপতি কহিল, আজ এই নিয়েই যাও হে সব, কাল আবার হবে; একদিনেই ফুরিয়ে গেল নাকি? সকলে দেঁতো হাসি হাসিয়া কহিল, তা বটে। নিজ নিজ অংশের আম কোঁচড়ে পুরিয়া কহিল, সাত পুরুষ ধ'রে আম খেয়ে আসছি আমরা, আমাদেরও একটা স্বত্ব জন্মে গেছে যে! ছেলে-মেয়েগুলোও তা জানে, বোল হতে না হতেই জিবে জল ঝরতে শুরু করে তাদের। ভূপতি কহিল, কবে পাও না হে তোমরা, অ্যাঁ? সকলে তোষামোদের স্বরে কহিল, সে কথা বটে; কবে পাই না আমরা? একজন আবদারের সুরে কহিল, কাল কিন্তু মিছরিদানা গাছের আম পেড়ো বনমালী। (মালীর নাম বনমালী।) নাম সার্থক, ছোট ছোট আম, কিন্তু মিছরির চেয়ে মিষ্টি। আর একজন

কহিল, সত্যি, গিন্নী কাল বলছিল বটে। ওর আবার এ সময়টা ভাল-মন্দ খেতে ইচ্ছে হচ্ছে কিনা। বলছিল, মিছরিদানা গাছের আম খেতে ইচ্ছে করছে, বাবুকে ব'লো গিয়ে। ভূপতি গম্ভীর হইয়া কহিল, আচ্ছা, এখন এস তোমরা, আমার একটু কাজ আছে।

সকলে মাতঙ্গিনীর দিকে তাকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত চলিয়া গেল।

ভূপতি কড়া গলায় মাতঙ্গিনীকে কহিল, তোমাকে ভালমানুষ ব'লে জানতাম, এখন দেখছি, বজ্জাতি বুদ্ধি তোমার কম নয়। মাতঙ্গিনী কহিল, কেন বাবা? কি করলাম আমি? ক্ষীরোদা পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। ভূপতি কহিল, ক্ষীরোদা, তুই যা, আম পাঠিয়ে দিয়েছি, গুনে-গেঁথে রাখ্‌গে যা। ক্ষীরোদা চলিয়া গেলে ভূপতি কহিল, কাল রাত্রে ফটকে তোমার বউয়ের ঘরে ঢুকেছিল? মাতঙ্গিনী কহিল, মিথ্যে কথা। ভূপতি ধমকাইয়া কহিল, মিথ্যে কথা! রঙ্গলাল নিজের চোখে দেখেছে। মিথ্যে কথা? মাতঙ্গিনী কহিল, রঙ্গলাল কি দেখতে কি দেখেছে! ভূপতি জোর দিয়া কহিল, ঠিক দেখেছে; তুমিই শেকল খুলে ফটকেকে বার ক'রে দিয়েছ।

ঠিক সামনে, রাধা-সায়রের অপর পাড়ে, বিষ্ণুমন্দিরের পিত্তলনির্ম্মিত চূড়া সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিতেছিল; সেই দিকে চাহিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, মন্দিরের দিকে মুখ ক'রে বলছি বাবা, সব মিথ্যে।

ভূপতি গুম হইয়া বসিয়া রহিল। সকালে এত মার খাইয়াও ফটিক ওই একই কথাই বলিয়াছে, সব মিথ্যা। তবে কি রঙ্গলালই ভুল করিয়াছে? ক্ষীরোদা তো বলিয়াছে যে, কাল সন্ধ্যায় বিমলা ও ফটিককে অন্ধকারে কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়াছে। তবে? ভূপতি কহিল, তবে যে ফটকে বললে, সে ঢুকেছিল, তুমি শেকল খুলে বার ক'রে দিয়েছ তাকে? মাতঙ্গিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বার কয়েক ঢোক গিলিল। ভূপতি কহিল, বুড়ী হয়ে মরতে যাচ্ছ, এখনও পরকালের ভয় নেই? বিষ্ণুমন্দিরের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে কথা! মাতঙ্গিনী কহিল, ফটিক মিথ্যে কথা বলেছে বাবা। আমি কাউকে বার ক'রে দিই নি। মাতঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর নকল করিয়া ভূপতি কহিল, আমি কাউকে বার ক'রে দিই নি! কণ্ঠস্বর কঠোর করিয়া কহিল, দিয়েছ কি না দিয়েছ, দেখছি আমি। বনমালীকে ডাক দিয়া কহিল, ফকরেকে ডাক তো। ফকরে অর্থাৎ ফকির ডোম, কাছারির পাইক।

বহুপুরুষ ধরিয়া এই গ্রামে কয়েক ঘর তেঁতুলে-ডোম জমিদারের আশ্রয়ে বাস করিতেছে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষরা বরাবর জমিদারের সরকারে পাইক-বরকন্দাজের কাজ করিয়াছে; ডাকাতি করিয়া জমিদারের ধন-বৃদ্ধি করিয়াছে; জমিদারির রক্ষণ ও বর্দ্ধনের

জন্য দাঙ্গাহাঙ্গামা ও খুন-জখম করিয়াছে ; উৎসবে ও পর্ব্বে লাঠি খেলিয়া ও ব্যায়ামের বিচিত্র কসরৎ দেখাইয়া জমিদার ও তাঁহার আহূত কুটুম্ব ও বন্ধুদের মনোরঞ্জন করিয়াছে, আর মেয়েরা যৌবনকালে দেহ দান করিয়া জমিদার-নন্দনদের আনন্দ দান করিয়াছে। জমিদারের অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অবস্থা হীন হইয়াছে—শারীরিক আর্থিক দুইই। শরীর-চর্চ্চা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, পুরুষেরা অনেকেই জন-মজুরের কাজ করিতেছে, দুই-চারিজন যাহাদের দেহে শক্তি-সামর্থ্য আছে, তাহারাই জমিদারের সরকারে কাজ করিতেছে।

রঙ্গলাল ও ফকির দুইজনেই তেঁতুলে-ডোম, রঙ্গলাল চৌকিদার, ফকির কাছারির পাইক।

ফকির আসিয়া হাজির হইল, বেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, মিশমিশে কালো রঙ। সারা মুখে বসন্তের দাগ, একটা চোখ কানা, কপালের এক পাশে আড়াআড়ি একটা কাটার দাগ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ; থ্যাবড়া নাকের নীচে খোঁচা খোঁচা গোঁফ। মাতঙ্গিনীর দিকে তাকাইয়া অপরিচ্ছন্ন ফাঁক ফাঁক দাঁত বাহির করিয়া হাসিল।

ভূপতি কহিল, এই মাগীকে নিয়ে যা তো। ফটকেকে যেমন করেছিলি না, তেমনই একটু ঠাণ্ডা ক'রে দে।

ফকিরের যমদূতের মত চেহারা দেখিয়া মাতঙ্গিনীর বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। ফকির কুতকুতে চোখ দুইটা চাড়াইয়া কহিল, কি গো, যাবে নাকি ?—বলিয়া দুই পা আগাইতেই মাতঙ্গিনী ভূপতির পায়ের কাছে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, ওই বাবা ভূপতি! ওকে আসতে মানা কর, বামুনের মেয়েকে ডোমের হাতে অপমান করিও না বাবা।

ভূপতি কটুকণ্ঠে কহিল, ভারি খিঁচ কাটছ যে, একটু সোজা করা দরকার তোমাকে।

মাতঙ্গিনী মিনতি করিয়া কহিল, না বাবা, ওকে যেতে বল, যা বলবার আমি বলছি। ভূপতি ফকিরকে চোখের ইঙ্গিতে কহিল, যা তুই।

মাতঙ্গিনী উবু হইয়া বসিয়া কতকটা সামলাইয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, ফটকে এসেছিল বাবা, তবে কোন বদ মতলবে নয়। বাঁকা হাসিয়া ধারালো কণ্ঠে ভূপতি কহিল, সাধু মতলবটা কি শুনি ? চণ্ডীপাঠ ক'রে শুনিয়ে গেল বুঝি ?

না বাবা, ফটকে বাইরে কি করে জানি না, বউকে নিজের দিদির মত ভক্তি-ছেদ্দা করে, সাধনের কাছে পড়েছিল কিনা—

ভূপতি রাগে হিংসায় মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ভক্তি-ছেদ্দা করে! তাই রাত-দুপুরে ঘরের মধ্যে খিল দিয়ে ভক্তি দেখাচ্ছিল! কঠোর কণ্ঠে কহিল, কত ক'রে দিন পাচ্ছ বল দেখি ? বিড়ি-চা নাকি বুড়োকে খাওয়ায়, ধুতি-শাড়ি নাকি কিনে দিয়েছে

তোমাদের, বিনা পয়সায় তোমাদের চাল দেওয়াবারও চেষ্টা করেছিল—আমার জন্যে পারে নি। তা—। চোখ দুইটা কুঁচকাইয়া ছোট করিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা টাকা বাজাইবার মুদ্রা করিয়া কহিল, নগদ কিছু ক'রে দিচ্ছে নাকি? মাতঙ্গিনী কহিল, ওসব কথা ব'লো না বাবা। কাল সারাদিন বউকে কিছু খেতে দিই নি, তুমি মানা করেছ ব'লে; তাই খাবার দিতে এসেছিল।

তির্য্যক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ব্যঙ্গের সুরে কহিল, খবরটা দিয়েছিল কে? মাতঙ্গিনী কহিল, জানি না বাবা। গর্জ্জন করিয়া ভূপতি কহিল, জান না? রোজ সন্ধ্যেবেলায় জল আনবার ছল ক'রে ফটকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাঠিয়ে দাও। মাতাঙ্গিনী আকাশ হইতে পড়িল; দুই চোখ বড় করিয়া বিস্ময়ের স্বরে কহিল, ও কি কথা বাবা! ভূপতি কহিল, ও কি কথা বাবা! ক্ষীরোদা নিজের চোখে দেখেছে কাল সন্ধ্যেবেলায় তোমার বউ আর ফটকেকে কথা বলতে। মাতঙ্গিনী নাকী সুরে কহিল, কাল নিজে থেকে গিছল বাবা, আমি মানা করেছিলাম, আমার মানা শোনে না আজকাল। ভূপতি কহিল, শুনবে কেন? পয়সার লোভে ব্যবসা শুরু করিয়েছ, বুক বেড়ে গেছে ওর; এর পর শহরে গিয়ে কালাও ক'রে ব্যবসা ফাঁদতে চায়, আমার কাছে ছিল, দু-মুঠো খেতে পাচ্ছিলে। লোভের তো সীমা নেই তোমাদের; বোঁটা সুদ্ধ গিলতে চাইলে। বোকা মজাটা। মুখে লাথি মেরে চ'লে যাবে ফটকেটার সঙ্গে। আর ফটকে ভাবছে, ওর কাছেই থাকবে চিরকাল। ওকেও লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়ে নতুন লোক জোটাবে সেখানে। মাতঙ্গিনী হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, হেই বাবা ভূপতি, এর বিহিত কর বাবা। ভূপতি বাঁকা হাসি হাসিয়া কহিল, বিহিত করব বইকি। আমি জমিদার ভূপতি রায়, চুপ ক'রে সহ্য করব নাকি? তোমাদের গাঁ থেকে তাড়াব, ফটকেকে টিট ক'রে দোব, আর ওই মাগীকে ছোটলোক দিয়ে বেইজ্জত করিয়ে নাক কান কেটে গাঁ থেকে বিদেয় করব।

ফটিকের মা আসিয়া হাজির হইল। কাঁদিয়া চোখ দুইটা ফুলিয়া গিয়াছে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ বাবা ভূপতি, এমন ক'রে মেরেতে হয় বাবা? কি অপরাধ করেছে আমার ছেলে?

ভূপতি হাঁকিয়া কহিল, যাও, যাও। ছেলের জন্যে আর বলতে হবে না। কি করেছে জিজ্ঞেসা কর একে।—বলিয়া মাতঙ্গিনীকে দেখাইয়া দিল। ফটিকের মা কলহের সুরে মাতঙ্গিনীকে কহিল, কি করেছে গা? তখন তো বললে, সব মিছে কথা। মাতঙ্গিনীও কলহের সুরে কহিল, আমার কাছে জেনে কি হবে, নিজের ছেলেকেই জিজ্ঞেসা করগে।

ভূপতি কহিল, এর বিধবা বউয়ের ঘরে ঢুকেছিল কাল। এই অপরাধের শাস্তি ওর

কিছু হয় নি। ঘর জালিয়ে উত্যক্ত ক'রে, তোমাদের চোখের সামনে তোমার বিধবা মেয়েটাকে ছোটলোক দিয়ে বেইজ্জত করলে, তবে ওর শাস্তি হয়। ফটিকের মা কহিল, আমার ছেলে নির্দোষী বাবা। ওই বউটাই হয়তো ছলা-কলা ক'রে ওর মন ভুলিয়েছে, তবু আমার ছেলে কোন মন্দ কাজ করবে—আমার বিশ্বাস হয় না। ভূপতি অগ্নি-দৃষ্টিতে তাকাইয়া পরুষকণ্ঠে তীব্র শ্লেষের সুরে কহিল, খুব ভাল ছেলে তোমার। বাউরী-বাগদীপাড়ায় কীর্তি আমার জানতে বাকি নেই। সব চুপ ক'রে দেখে এসেছি এতদিন। বাড় বেড়েই চলেছে দিন দিন। ভুরু দুইটা নাচাইয়া কহিল, বেশি না ব'কে বাড়ি চ'লে যাও, ছেলেকে সামলে রাখগে, না হ'লে বিপদে প'ড়ে যাবে একদিন। ফটিকের মা কহিল, তা ব'লে এমন মার বাবা—, লোকে গরু-ছাগলকে এমন মার মারে না। উঠতে পারছে না, জ্বর এসে গেছে। ভূপতি রাগিয়া উঠিয়া কহিল, ফ্যাচফ্যাচ ক'রো না, যাও, আমার প্রজা-পাঠক খেপাচ্ছে, ছোটলোকগুলোকে নাচাচ্ছে, পাড়ার বউ-ঝি নষ্ট করছে, ওকে মারবে না তো কোলে ক'রে আদর করবে? তা ছাড়া এখনই হয়েছে কি ওর? সব কথা শুনি আগে, তারপর গাঁ থেকে তাড়াব তোমাদের।

ফটিকের মা ভয়ে ভয়ে কিছুক্ষণ ভূপতির মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

ফটিকের মা যাইতেই ভূপতি মাতঙ্গিনীকে কহিল, তুমি আর ব'সে আছ কেন গো? স'রে পড় না। মাতঙ্গিনী কহিল, বাবা, তুমি গাঁয়ের রাজা, দুষ্টের তুমি দমন করবে বইকি বাবা। ফটকেটা বজ্জাত, ওকে শাস্তি দাও যা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু আমরা বুড়োবুড়ী কি দোষ করেছি? ভূপতি কহিল, শেকল খুলে ফটকেকে বার ক'রে দিয়েছিল কে? তুমি, না গাঁয়ের আর কেউ? মাতঙ্গিনী ঢোক গিলিয়া কহিল, আমিই বাবা। গাঁয়ে একটা কেলেঙ্কারি ঘ'টে গেলে পাছে তোমার বাড়ির চাকরিটি না থাকে, তাই করেছি বাবা, নইলে অন্য কোন মতলব ছিল না। কেলেঙ্কারির কিছু বাকি আছে নাকি? যা হবার তা হয়েছে, রঙ্গলালের কথা গাঁয়ের কেউ অবিশ্বাস করে নি। আর চাকরি? তোমার বউকে তো রাখা আর চলবে না, ওর হাতে খাবে কে? মাতঙ্গিনী ক্রন্দন-জড়িত স্বরে কহিল, তবে কি করব বাবা? ভূপতি ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল, তোমাদের আর ভাবনা কি গো! বউকে নিয়ে শহরে যাবে, সেখানে দোকান ক'রে বসিয়ে দেবে। তোমাদেরই ভাত খায় কে? মাতঙ্গিনী কহিল, ও কথা ব'লো না বাবা। চিরদিন তোমাদের আশ্রয়েই আছি, এখান থেকে এক পা নড়ব না আমরা; আমাদের মারতে হয় মার, রাখতে হয় রাখ; বউটাকেও তোমারই হাতে সঁপে দিচ্ছি। ওকে যা শাস্তি ইচ্ছে হয় দিয়ে তোমার কাছেই রাখ বাবা। রাঁধুনীর চাকরি না হয়, ঝিয়ের কাজ দাও। তোমার শাসনে থাকলে ও ঠিক থাকবে, না হ'লে ব'য়ে যাবে। ভূপতি গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল, বউকে সন্ধ্যের পর পাঠিয়ে দিও। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানি

কি ব্যাপার! যদি তেমন বুঝি, আর ভালভাবে থাকবে বলে, তো রাখব আমার বাড়িতে; ক্ষীরোদারা যেমন আছে, তেমনই থাকবে। মাতঙ্গিনী কহিল, আমাদের কি হবে বাবা?

ভূপতি ভারী গলায় কহিল, তোমাদেরও ব্যবস্থা হবে, আচ্ছা, যাও এখন।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চটিজুতায় পা গলাইল। মাতঙ্গিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিল, বাবা, আজকের চাল—। ভূপতি চলিতে উপক্রম করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চাল কিসের? চাল-টাল নেই, যাও। মাতঙ্গিনী হাতজোড় করিয়া কহিল, দেই বাবা! দাও চারটি, না হ'লে বুড়োটা ম'রে যাবে। ভূপতি কহিল, ম'রে যায় তো আমার কি? কিসের জন্যে খাওয়াব তোমাদের? কি লাভ আমার? মাতঙ্গিনী মুখের ভাব যথাসম্ভব করুণ করিয়া যুক্তহস্তে ভূপতির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। মাতঙ্গিনীর মুখের উপর জলন্ত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ভূপতি কহিল, জ্বালাতন! ওরে বনমালী, লঙ্গরখানার চালের থেকে দে তো আধ সের চাল।

মাতঙ্গিনী কহিতে লাগিল, বেঁচে থাক বাবা। বাড়-বাড়ন্ত হোক তোমার। বউকে সন্ধ্যের পরেই পাঠিয়ে দোব, ফটকেই ওর মাথা খারাপ করেছে বাবা! নইলে ওর কি সাহস! তুমি চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখালেই, যা বলবে তাই করবে ও।

বনমালী আসিয়া মাতঙ্গিনীর আঁচলে চাল ঢালিয়া দিল। মাতঙ্গিনী কহিল, বাবা, গোটা দুই আম— বুড়োটার ভারি নোলা বেড়েছে বাবা! কদিনই বা বাঁচবে, ভাল-মন্দ তো কিছুই খেতে পায় না।

ভূপতি বনমালীকে কহিল, দে ওকে দুটো আম। মাতঙ্গিনী কহিল, বউকে কি চারটি ভাত খেতে দোব আজ? ভূপতি কহিল, কাল তো ফটকে খাইয়ে গেছে বলছ, আজ আবার কেন? মাতঙ্গিনী কহিল, সে খাবার আমি ফেলে দিয়েছিলাম বাবা। বউ কিছুই খায় নি। ভূপতি কহিল, তাই নাকি? তা হোক, দিও না খেতে; একটু রস মরুক ওর। সন্ধ্যের পরে পাঠিয়ে দিও, যদি মতি-গতি ভাল দেখি, আমিই খাবার ব্যবস্থা ক'রে দোব। আর দেখ, যদি না আসতে চায় তো ব'লে দিও, ফকরে ডোম গিয়ে চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে আসবে। আর এমন শাস্তি দোব যে, জীবনে ভুলবে না কোনদিন।

৫

মাতঙ্গিনী যখন বাড়ি ফিরিল, তখন বেলা প্রায় একটা। উঠানে কড়া রোদ; শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় বিমলা বসিয়া ছিল। দুই দিনের উপবাসে মুখখানা শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বড় বড় চোখ আরও বড় দেখাইতেছে; চোখের কোণে সুস্পষ্ট কালো দাগ; মাথার চুল এলোমেলো; উবু হইয়া হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া বসিয়া ছিল; কাপড়ের আঁচলখানা পাশে মেঝের উপর লুটাইতেছে।

মাতঙ্গিনী কহিল, ফটকে সব স্বীকার করেছে; আমাকেও করতে হ'ল, তবু যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে এসেছি তোমাকে। তবে তোমার মুখ থেকে সব কথা বাবু নিজের কানে শুনতে চায়; সন্ধ্যের পর যেতে বলেছে তোমাকে; হাতে পায়ে ধ'রে বুঝিয়ে ব'লো বাবুকে; কান্নাকাটিও ক'রো যতটা পার। যদি মন নরম করতে পার বাবুর তো ওই বাড়িতেই আবার চাকরি পাবে, না পার তো অপমান ক'রে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেবে। একটু চুপ করিয়া কহিল, পইপই ক'রে বলছি, যেও ঠিক, না হ'লে বাবু বলেছে ফকরে ডোমকে দিয়ে ঘাড়ে ধ'রে নিয়ে যাবে, আর যা ইচ্ছে তাই অপমান করবে। বিমলা চুপ করিয়া রহিল। মাতঙ্গিনী কহিল, আর ঢং ক'রে ব'সে থাকলে কেন? যাও, চান ক'রে এসগে। আজও অদেষ্টে খাওয়া নেই তোমার। বাবু মানা করেছে, বলেছে, আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, খেতে দেবার যোগ্যি হয় তো আমিই খেতে দোব।

মাতঙ্গিনী নিজের মনেই গজগজ করিতে লাগিল, আমি জানি বেহেড হোক, ঝগড়াটে হোক, ভাল মেয়ে, স্বামীর সঙ্গে চার-পাঁচ বছর ঘর করেছে। এমন স্বামী! এদিকে তলে তলে এতদূর এগিয়েছে, কে জানে বাপু! রাতে নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমোই, ভাবি, বউ আমার ঠিক আছে, রেতে যে ঘরে লোক ঢোকাচ্ছে কি ক'রে জানব আমি? বিমলার দিকে তাকাইয়া কহিল, হ্যাঁগা, কতদিন থেকে আসছে বলতে পার? বিমলা ভগ্ন-কটি সর্পিনীর মত তীব্র দৃষ্টিতে একবার মাতঙ্গিনীর দিকে তাকাইয়া আবার চোখ নামাইয়া লইল। মাতঙ্গিনী শ্লেষের সুরে কহিল, লজ্জাশীলার লজ্জা করছে! ভাইয়ের বয়সী ছেলেটার সঙ্গে নষ্টামী করবার সময়ে লজ্জা ক'রে নি?

আরও কিছুক্ষণ পরে মাতঙ্গিনী বিমলাকে কহিল, যাও না চান করতে, ব'সে রইলে কেন? এখন ঘাটে কেউ নেই। আর থাকলেই বা করবে কি? কেউ কিছু বলে, মুখ নামিয়ে চুপ ক'রে থেকো।

বিমলা উঠিয়া জলের কলসীটা লইতে যাইবামাত্র মাতঙ্গিনী হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। থাক্ থাক্, ওটা আর ছুঁয়ো না, জল রয়েছে ওতে, ভাত রান্না করতে হবে, জল দরকার হয় আমি আনব এখন, তুমি ওই ছোট কলসীটা নিয়ে গিয়ে নিজের জল আনগে।—বলিয়া রান্নাঘর হইতে একটা ছোট মাটির কলসী বাহির করিয়া দিল। বিমলা মুখ লাল করিয়া নীরবে কলসীটা তুলিয়া লইল।

বাড়ি ফিরিয়া রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বিমলা মাতঙ্গিনীকে কহিল, দুটো পয়সা দিতে পারেন?

মাতঙ্গিনী উনানের সামনে পা মেলিয়া বসিয়া এতক্ষণ কাল রাত্রে ফটিকের আনা রুটির দু-একখানা যা পড়িয়া ছিল, খাইতেছিল; বিমলার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইতেই বাকি রুটিখানা মুখে পুরিয়া যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা

করিতেছিল; বিমলা দরজার সামনে আসিতেই ঢকঢক করিয়া জল গিলিয়া রুটির দলাটাকে কণ্ঠনালীর মধ্যে পার করিয়া দিয়া বিমলার প্রশ্নের জবাবে কহিল, পয়সা কোথায় পাবে? মাসে তো দুটি টাকা, তাতেই নুন, তেল, কাঠ, কেরোসিন, আরও কত কি! আমি ব'লে তাই চালাই।

বিমলা সতৃষ্ণ নয়নে ফুটন্ত ভাতের দিকে তাকাইয়া ছিল; ফেনের সোঁদা গন্ধ নাকে আসিতেই পেটের ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিল তাহার। মাতঙ্গিনী কহিল, অমন ক'রে তাকিও না বউ, ও ভাত হজম হবে না আমাদের; এর থেকে এক মুঠোও দেওয়া চলবে না তোমাকে, ভূপতি মানা করেছে; বলেছে, ফেন পর্য্যন্ত যেন না দেওয়া হয়।

বিমলা অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল, উনোনটা একবার ছেড়ে দিন তা হ'লে। মাতঙ্গিনী বিস্ময়ের স্বরে কহিল, উনোন নিয়ে কি করবে তুমি? চাল-ডাল বুঝি ফটকে কাল দিয়ে গেছে? বিমলা কহিল, একটু চা ক'রে নোব। মাতঙ্গিনী কহিল, চা কোথায় পেলে?

তোরঙ্গের এক কোনায় চায়টি প'ড়ে ছিল। মাতঙ্গিনী চোখ দুইটা গোল করিয়া, মুখ ঘুরাইয়া কহিল, তুমি মেয়েমানুষ, না পাষাণ বউ? দয়া-মায়া ছেদ্দা-ভক্তির পাট কি একেবারেই চুকিয়ে দিয়েছ? বাপের তুল্যি শ্বশুর তোমার, একটু চায়ের জন্যে সারা সকালটা কাটা ছাগলের মত কাতরালে; পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে যে শুনতে পাও নি, তা নয়; বুক ধ'রে বার ক'রে দিতে পারলে না? নিজেরটাই এত বুঝেছ বউ এই বয়েসে? বিমলার বলিতে ইচ্ছা হইল, নিজেরটা বুঝি বলিয়াই তো এই দুর্দ্দশা। কিন্তু তাহা না বলিয়া কহিল, ভাতটা হয়ে গেলে উনোনটা ছেড়ে দেবেন তা হ'লে।

মাতঙ্গিনী মাথাটা সজোরে নাড়িয়া কহিল, না না, উনোন ছুঁতে দিতে পারব না তোমাকে। বিমলা শুষ্ককণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, কি করেছি আমি যে, আমাকে এত ঘেন্না? মাতঙ্গিনী খনখন করিয়া কহিল, কি করেছ তা খুব ভাল ক'রেই জান বউ। এত অভাবেও এতটুকু অনাচার করি নি আমরা, তোমার সঙ্গে ছোঁয়া-লেপা ক'রে কি জাত-জন্ম খোয়াব?

বিমলা করুণকণ্ঠে কহিল, তা হ'লে তো আমার মরাই ভাল। মাতঙ্গিনী অশ্রদ্ধার হাসি হাসিয়া কহিল, মরতে তুমি পারবে না বউ, পারলে কাল রাতেই মরতে, আজ আর ও মুখ কাউকে দেখাতে না। মরা কি এত সোজা বউ! খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, মরবারই বা দরকার কি তোমার? বাবুর কাছে যাও, হাতে-পায়ে ধ'রে মাপ চাওগে; কাজ পাবে, খেতে-পরতে পাবে, সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে। এই বয়েসে ম'রে কি হবে তোমার?

বিমলা কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিল, চায়ের পাতা কয়টা চিবাইয়া

ঢকঢক করিয়া কতকটা জল গিলিয়া, দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া, খালি মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। মাতঙ্গিনীর কথাগুলা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে আসিতে লাগিল। মরতে তুমি পারবে না, পারলে কাল রাতেই মরতে, মরা কি এত সোজা বউ!

সত্য! সে মরিল না কেন? কাল রাত্রে যখন সকলে চলিয়া গেল, মাতঙ্গিনী শেষবার তাহাকে গালাগালি করিয়া ঘরে খিল আঁটিয়া শুইতে গেল, তখন ইচ্ছা করিলে সে অনায়াসে মরিতে পারিত। নিঃসাড় রাত্রি, পাড়ার কেহ জাগিয়া ছিল না; রঙ্গলালও পাহারা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল; সে যদি তখন নূতন পুকুরের জলে গলায় কলসী বাঁধিয়া ডুবিয়া মরিত, কে বাধা দিত? আজ এতক্ষণ সে জলের উপর ভাসিয়া উঠিত; সারা গ্রামের লোক পুকুরের পাড়ে আসিয়া জড় হইত; ভূপতি রায় জেলে ডাকাইয়া তাহার দেহ পাড়ে তোলাইত। যে দেহকে ভোগ করিবার জন্ম ভূপতি পশুর মত নিষ্ঠুর নির্ব্বিচার লালসায় লেলিহান হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই বিকৃত, বীভৎস আকৃতি দেখিয়া সে ঘৃণায় পিছাইয়া যাইত। পাড়ার মেয়ে-পুরুষ কুৎসার কালিতে তাহার জীবন-মরণ, ইহকাল-পরকাল কালো করিয়া তুলিত। মাতঙ্গিনী বিনাইয়া বিনাইয়া তাহার জীবিত ও মৃত আত্মীয়-স্বজনকে গালাগালি করিত, এবং পরলোকে তাহার আত্মার প্রতি যৎপরোনাস্তি শাস্তির ব্যবস্থা করিবার জন্ম ভগবানের কাছে উচ্চকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিত। কিন্তু কেহ বলিত না যে, সে নিরপরাধ, তাহার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ম সে তাহার সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়াছে, এবং শেষ সম্বল দেহটাকে লাঞ্ছিত করিতে না পারিয়া, মরণকে বরণ করিয়াছে। সৎকারের ব্যবস্থা করিবার কথা উঠিলে পাছে তাহার দেহ ছুঁইতে হয়, এই ভয়ে পাড়ার সকলে সরিয়া পড়িত; শেষে গ্রামের ছোটলোকেরা আসিয়া তাহার দেহটাকে ডাকিনীর গর্ত্তে লইয়া গিয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া আসিত।

কিন্তু সে মরে নাই। মরণের কথা তাহার মনেও আসে নাই। কারণ গ্রামের লোক তাহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া ভাবিলেও সে তো নিজে জানিত, সে নিষ্পাপ; পাড়ার যে কোন সতীলক্ষ্মীর চেয়েও সচ্চরিত্রা। তা ছাড়া গ্রামের লোকের নিন্দায় তাহার কি যায় আসে? সে তো এ গ্রামে বেশি দিন থাকিবে না। ফটিক তাহাকে এখান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে। কাল যখন ফটিক ভয়ে লজ্জায় মুখ কালো করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন ক্ষণিকের জন্ম তাহার মন নিরাশার কালো মেঘে ছাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই মেঘ সরিয়া গিয়া আশার আলোক ফুটিয়া উঠিল। মনে পড়িল সেই ফটিকের কথা, আমার ওপরে নির্ভর করুন বউদি, আপনাকে আপনার যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তবে আমার অন্ত কাজ। মনে পড়িল, তাহার পুরুষোচিত দৃঢ় দৃপ্ত ভঙ্গী; মনে পড়িল, তাহার চোখে ও মুখে নিঃসংশয়ী আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি, যে

দীপ্তি ও ভঙ্গী দেখিয়া বিমলার মনে নির্ভরতা জাগিয়াছিল; ফটিকের হাতে নিজের ভার নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া মানুষের সমাজে নূতন করিয়া জীবন-যাত্রা শুরু করিবার নিশ্চিত আশা জাগিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, ফটিক আর তাহার চেয়ে বয়সে পাঁচ বৎসরের ছোট, নেহাত গোবেচারা, নম্র, নিরীহ, সংসারানভিজ্ঞ, মুখচোরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে নয়; সে পুরুষ, তাহার চেয়ে অনেক বড়, তাহার বড় ভাই; সে তাহাকে আশ্রয় দিবে, আশ্বাস দিবে, বিপদের মুখে বুক দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে, এই অপমান ও লাঞ্ছনাময় জীবন হইতে তাহাকে লইয়া গিয়া আনন্দে দীপ্ত, তৃপ্তিতে স্নিগ্ধ, সংসারের শুভকর্ম্মে ব্যাপৃত, সকলের প্রশংসা-দৃষ্টিতে অভিষিক্ত, ভাবী চরিতার্থতার আশায় রঞ্জিত জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

কিন্তু আজ? সব আশা মিলাইয়া গিয়াছে। যে আঁধার তাহার জীবনে ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহা আরও গাঢ়, আরও কালো হইয়া উঠিয়াছে; আলোর ক্ষীণমাত্র রেখাটি পর্য্যন্ত আর নাই। অপমান ও লোকনিন্দার ভারে ভারাক্রান্ত বলদের মত মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছে ফটিক, আর উঠিবার শক্তি নাই তাহার। তাহার নবজাত পৌরুষ অকাল-প্রসূত শিশুর মত জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মরিয়াছে,—ঘরের কোণে, মায়ের আঁচলের তলে আশ্রয় লইয়াছে ফটিক। কে কোথায় হতভাগিনী মেয়ে মৃত্যু অথবা নারীদেহের চরম লাঞ্ছনা, এই দুই পরিণামের মধ্যে দুলিতেছে, তাহার জন্ত মাথা ঘামাইবার উৎসাহ হইবে না তাহার। মাতঙ্গিনী বলিয়াছে, ফটিক সব স্বীকার করিয়াছে। কি স্বীকার করিয়াছে সে? সকলে মিলিয়া তাহার চরিত্রে যে কলঙ্কের কালি পোঁচের পর পোঁচ লেপিতে শুরু করিয়াছে, ফটিক কি তাহার উপর আর এক পোঁচ লেপিয়া দিয়াছে? ফটিককে সে যতটা দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না; তবু উৎপীড়কের উৎপীড়নের চাপে দুর্ব্বল ও ভীরুপ্রকৃতির মানুষ কি না করিতে পারে? অথবা হয়তো সে যাহা নিছক সত্য, তাহাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও তাহাকে শ্রদ্ধা করা যায় না। বিমলা শুনিয়াছে, তাহাদের দেশের ছেলেরা, যাহারা একদা মরণ ও মারণ-যজ্ঞে মাতিয়াছিল, শাসনতন্ত্রের নিষ্পেষণে নিদারুণ যন্ত্রণা হাসিমুখে সহ্য করিত, তিল তিল করিয়া মরিত, তবু যাহা অপ্রকাশ্য তাহা প্রকাশ করিত না। হৃদয়ের দৃঢ়তা যাহার সামান্য আঘাতেই চূর্ণ হইয়া যায়, দেশ ও জাতিকে পরাধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিবার মত দুরূহ কাজে সে কোন্ সাহসে যোগ দেয়?

কিংবা হয়তো ফটিক কিছুই স্বীকার করে নাই, নীরবে সকল লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করিয়াছে; মাতঙ্গিনী নিজে স্বীকার করিয়া আসিয়া মিথ্যা তাহার ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছে। কিন্তু যাহাই হউক, ফটিক যে তাহাকে সাহায্য করিবার আর চেষ্টা করিবে, সে আশা দুরাশা। ইচ্ছা থাকিলেও তাহার মা ও দিদি তাহাকে বাধা দিবে।

জগতে এমন কোন্ স্ত্রীলোক আছে, যে আর একজন নিঃসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোকের জন্ম নিজের একমাত্র সন্তানকে, ভাইকে বিপদের মুখে পাঠাইয়া দিতে পারে?

অতএব, এখন তাহাকে হয় অনাহারে তিল তিল করিয়া মরিতে হইবে, না হয় আত্মহত্যা করিতে হইবে, অথবা চরম দুর্গতির মধ্যে তলাইয়া যাইতে হইবে। মাতঙ্গিনীর কথা মনে পড়িল, মরা কি এত সোজা বউ! এমন সত্য কথা মাতঙ্গিনী বোধ হয় জীবনে আর বলে নাই। মরার চেয়ে দুরূহ কাজ আর কি আছে? এইজন্ম জীবনপণ শ্রেষ্ঠ পণ, জীবনবলি শ্রেষ্ঠ বলি। যুদ্ধে যাহারা প্রাণ দেয়, তাহারা কি নিজে হইতে দেয়? কড়া মদ খাওয়াইয়া, মদের চেয়ে মাদক বক্তৃতা শুনাইয়া তাহাদের মাতাল করিতে হয়, তবেই তাহারা পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে। খবরের কাগজে লিখিয়াছে, দলে দলে মেয়ে, পুরুষ, ছেলে-মেয়ে গ্রাম ছাড়িয়া শহরের দিকে ছুটিতেছে। মরণকে এড়াইবার জন্যই তো এই অভিযান! শহরে গেলেই যে তাহারা বাঁচিতে পারিবে তা নয়, যেমন করিয়া হোক বাঁচিতে হইবে—এই সংস্কারের তাড়নায় তাহারা ছুটিতেছে। এই গ্রামে একজন কুষ্ঠরোগী প্রত্যহ ভিক্ষা করিতে আসে, হাতে-পায়ে একটাও আঙুল নাই, সর্ব্বাঙ্গ গলিয়া গিয়াছে, তবু পায়ে ন্যাকড়া জড়াইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দুপুরের তপ্ত রোদে সারা গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। রোগ ও দারিদ্র্যের নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও সে তো বাঁচিতে চায়। তাহার বাপের বাড়িতে তাহার এক ঠাকুরমা, আশি বৎসরের বুড়ী, ছেলে-বউ নাতি-নাতনী সব তাহার চোখের সামনে মারা গিয়াছে, তবু বাঁচিবার জন্ম কবিরাজের ওষুধ খায়।

তবে ক্ষীরোদার মত বাঁচা! দেহের বিনিময়ে দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন! আজন্মের সংস্কার ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠে।

পেটের ভিতরটা জ্বালা করিতে শুরু করিয়াছে, বিমলার, খাদ্যের অভাবে পাকস্থলীটা শূলবিদ্ধ সর্পের মত মুচড়াইতেছে, তীব্র জারকরস আকণ্ঠ ফেনাইয়া উঠিয়া বুকের ভিতরটা পোড়াইয়া দিতেছে। এখন এক মুঠা ভাত পাইলে বিমলা বর্ত্তিয়া যাইত। এক মুঠা ভাত, আর কিছু না, তাও দুর্লভ হইয়া উঠিল বিমলার জীবনে! এত দুর্গতি তাহার কপালে লেখা আছে কে জানিত! বড়লোকের মেয়ে নয় সে, কাকার সংসারে মানুষ, তবু ভাতের অভাব কোনদিন তাহাদের ছিল না। স্বামীর সংসারেও সাচ্ছল্য ছিল না; স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের কোন উপকরণ ছিল না, কিন্তু অন্নের অভাব ছিল না। দ্বারে ভিখারী আসিলে মুষ্টি ভরিয়া ভিক্ষা দিয়াছে চিরদিন। ক্ষুধার্ত্ত আসিলে নিজে না খাইয়া থালা ভরিয়া ভাত-তরকারি সাজাইয়া দিয়াছে তাহাকে। ভাতের এত মূল্য কে জানিত? ভাতের জন্ম প্রাণ দিতে হইবে, মান-সম্ভ্রম দিতে হইবে, কে ভাবিয়াছিল কোনদিন! জীবন-ব্যাপারে খাওয়াটা যে এত প্রয়োজনীয়, কোনদিন ভাবে নাই

বিমলা। কোনদিন চাহিয়া খায় নাই সে। ছোটবেলায় খেলায় মত্ত থাকিত, কাকীমা টানিয়া আনিয়া খাইতে বসাইতেন, এক মুঠা কম খাইলে রাগ করিতেন, মারধর পর্য্যন্ত করিতেন। স্বামীর সংসারেও খাওয়াতে তাহার ভারি লজ্জা ছিল। স্বামীর সামনে কোনদিন খায় নাই সে। কতদিন স্বামী পীড়াপীড়ি করিয়াছে, অভিমান করিয়াছে, কিছুতেই রাজি হয় নাই সে। তবু তাহার খাওয়ার প্রতি স্বামীর সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। খাইতে বসিবার আগে রান্নাঘরে গিয়া দেখিত, সব জিনিস সে নিজের জন্য রাখিয়াছে কি না! এখানে থাকিলে, ভাল জিনিস নিজে না খাইয়া তাহার জন্য পাতে ফেলিয়া রাখিত। একদিন কি একটা কারণে অভিমান করিয়া সারাদিন খায় নাই সে। সেদিন সারাদিন স্বামীর কি তোষামোদ, কত সাধ্য-সাধনা! স্বামীকে অনেক ভোগাইয়া, নাকাল করিয়া তবে খাইতে বসিয়াছিল সে। এত স্নেহ, এত ভালবাসা, সব চুকাইয়া দিয়া অসময়ে কোথায় চলিয়া গেল? যদি একটিবার আসিয়া দেখিয়া যাইত, আজ তাহার প্রাণের চেয়েও প্রিয়তমার কত দুর্দ্দশা! কত লাঞ্ছনা! মুখ ফুটিয়া খাইতে চাহিলেও খাইতে পায় না, পায় অপমান, তিরস্কার, কুৎসিত গালাগালি।

দুই চোখ হইতে জল গড়াইতেছিল বিমলার। আঁচল দিয়া মুছিল। মুখের ভিতরটা শুকাইয়া চটচট করিতেছিল; উঠিয়া কলসী হইতে জল গড়াইয়া কতকটা খাইল। ঘরে গুমট গরম, গামছা ভিজাইয়া গায়ে দিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

মাতঙ্গিনী ও অঘোরের হাঁকডাক শোনা যাইতেছে; রান্না হইয়া গিয়াছে বোধ হয়; ইহার পর তাহারা খাইতে বসিবে, মোটা লাল চালের ভাত, আর বোধ হয় গোটা কয়েক কচুসিদ্ধ। ফেনটা বোধ হয় রাত্রির জন্য রাখিয়া দিবে। কতদিন ভাত খায় নাই বিমলা। মিহি চালের কামিনীফুলের মত ধবধবে সাদা ভাত! ভাত সম্বন্ধে ভারি শৌখিনতা ছিল বিমলার; চাল কিছুতে পছন্দ হইত না, স্বামী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজারের সেরা চাল আনিত তাহার জন্য। বাবুদের বাড়ির মোটা চালের লাল লাল ভাত খাইতে কষ্ট হইত বিমলার। আজ সেই ভাতই অমৃত বলিয়া মনে হইতেছে। এখন যদি কেউ সেই ভাত তাহার সামনে ছড়াইয়া দিত, কুকুরের মত চাটিয়া চাটিয়া ভাতগুলা সব খাইয়া ফেলিত সে। ক্ষুধার্ত্ত মানুষ ও পশুতে কি কোন তফাত আছে? ক্ষুধার আগুন যখন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, মানুষের মনুষ্যত্ব পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়া অন্তরের পশুত্ব বিকট মূর্ত্তি লইয়া বাহির হইয়া পড়ে; পৃথিবীতে কোন কাজ, যত হীন হোক, জঘন্য হোক, অসাধ্য থাকে না।

মাথাটা ঝিমঝিম করিতেছে বিমলার। গভীর ক্লান্তি ও অবসাদে সারাদেহটা অসাড় হইয়া আসিতেছে। মন তন্দ্রাতুর হইয়া উঠিতেছে; মস্তিষ্কের মধ্যে কত রকমের এলো-মেলো চিন্তা, অতীত দিনের কত ছোটখাটো ঘটনার স্মৃতি ভিড় করিতেছে।

তাহার স্বামীর একবার অসুখ করিয়াছিল; অনেকদিন ভুগিয়া সারিয়া উঠিল। ডাক্তার ভাত দিতে দেরি করিতে লাগিলে, স্বামী ভাত খাইবার জন্য ছেলেমানুষের মত আবদার করিত। বিমলার ভারি ভাল লাগিত, স্বামীর অনন্যনির্ভর, অসহায় অবস্থায় বুকের ভিতরটা স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া উঠিত। কত রকমের কথা বলিয়া ভুলাইত তাহাকে। যেদিন ভাত দেওয়া হইল, সেদিন স্বামীর কি আনন্দ! কোন্ ভোরে উঠিয়া তাহাকে রান্নাঘরে পাঠাইবার জন্য কি তাড়া! টলিয়া টলিয়া এখানে ওখানে সংসারের খুঁটিনাটি কাজ করিবার কি চেষ্টা! বিমলা ধমক দিতেই স্বামী মুখ কি রকম কাঁচুমাচু করিয়া রান্নাঘরে আসিয়া তাহার পাশটিতে বসিয়া পড়িল। যখন খাইতে বসিল, একমুঠা বহু পুরাতন চালের পোরের ভাত, একটুখানি ফিকে ছোট মাছের ঝোল। স্বামীর মুখে সে কি অপরিসীম তৃপ্তি! পোলাও কালিয়া খাইতে বসিয়াও কাহারও মুখে অতখানি তৃপ্তি দেখে নাই বিমলা। সেই তৃপ্ত মুখখানি আজ স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল বিমলার।

আর একটা ঘটনার কথা অনেকদিন পরে আজ হঠাৎ মনে পড়িল। তাহাদের গ্রামের জমিদারের বাড়িতে জমিদারের নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে তাহাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। অনেক বেলা হইয়া গেল, কেহ ডাকিতে আসিল না। কাকীমা বলিতে লাগিলেন, বড়লোকের বাড়ির কাণ্ড, অনেক দেরি হবে, তোরা বাড়িতে যে যা পারিস চারটি খেয়ে নে। তাহার ভাই-বোনরা, সেও খাইতে রাজি হইল না। বড়লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ, কত ভাল ভাল খাবারের আয়োজন হইয়াছে, তাহারা বাজে যা-তা খাইয়া ক্ষুধা নষ্ট করিবে কেন? বেলা তিনটায় খাইতে বসিয়াছিল, খাওয়া শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। কত রকমের তরকারি, কত রকমের মিষ্টি, দই, পায়স, রাবড়ি! সকলের শেষে রসগোল্লা যাচাই করিয়াছিল। সমস্ত ব্যাপারটা আজ এমন স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল, যেন মাত্র আগের দিন ঘটিয়াছে।

আরও কত রকমের চিন্তা! শেষে এক সময়ে বিমলা ঘুমাইয়া পড়িল।

বিকালের দিকে সারা আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া গিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ-চমক ও মেঘের গর্জ্জন শুরু হইল। তারপর ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি নামিল; সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দান্ত ঝড় পশ্চিমদিগ্বলয়বর্ত্তী পাহাড়গুলা হইতে ছুটিয়া আসিয়া, সারা গ্রামটাতে ও চারিদিকের মাঠে ও প্রান্তরে মাতামাতি করিতে লাগিল।

বিমলা স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহাকে যেন একটা ছোট অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। মেঝের উপর পড়িয়া আছে সে, হাত-পা বাঁধা, বুকের উপরে একটা প্রকাণ্ড ভারী পাথর। একটু দূরে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া মাতঙ্গিনী একটা মস্ত বড় যাঁতা ঘুরাইয়া ডাল ভাঙিতেছে। ভারী পাথরটা বিমলার বুকে চাপিয়া চাপিয়া বসিতেছে, যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে সে, কিন্তু যাঁতার শব্দে তাহার চীৎকারের শব্দ শোনা

যাইতেছে না মোটেই। সে আরও জোরে চীৎকার করিতেছে, আরও জোরে ডাতা ঘুরাইতেছে মাতঙ্গিনী। বিমলার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে, এখনই মরিয়া যাইবে সে।

ঘুম ভাঙিয়া গেল বিমলার; সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, কপাল হইতে ঘাম ঝরিতেছে; উঠিয়া বসিল বিমলা। বুকের ভিতরটা সত্যই কেমন করিতেছে, নিশ্বাস লইতে ভারি কষ্ট হইতেছে; তবে কি তাহার মৃত্যু হইবে? অনাহারে মৃত্যুর এই কি আগমনপদ্ধতি? পেটের ভিতরটা পোড়া ঘায়ের মত জ্বলিতেছে। কিছু না খাইলে আর বাঁচিবে না।

বিমলা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া, দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে ঝড় ও বৃষ্টির মাতামাতি চ'লয়াছে। ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে বৃষ্টিধারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া কুয়াশার সৃষ্টি করিতেছে। বৃষ্টির ছাট তীরের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল বিমলার, ঝড়ের ঝাপটা ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল। বিমলা টলিতে টলিতে রান্নাঘরের দিকে চলিল। দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের কোণে রাখা ভাতের হাঁড়িটার কাছে গিয়া, হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকাইয়া ভাত আছে কি না দেখিতে লাগিল। হাঁড়িটা একেবারে খালি; শুকনা ফেন হাঁড়ির গায়ে লাগিয়া আছে, তলায় দুই-চারিটা ভাত পড়িয়া আছে। বিমলা খুঁটিয়া খুঁটিয়া এক টুকরা ফেনের ছিলকা ও গোটা কয়েক ভাত বাহির করিয়া মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল। ফেনটা খুঁজিতে লাগিল বিমলা; তন্নতন্ন করিয়া সারা ঘর খুঁজিল। কোথাও পাইল না। এ ঘরে রাখে নাই মাতঙ্গিনী, নিশ্চয়ই শোবার ঘরে ঢুকাইয়াছে। রাগে ক্ষোভে বিমলার মুখ পাথরের মত কঠিন, আগুনের মত রাঙা হইয়া উঠিল, চোখ দুইটা ধকধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত ফুঁসিয়া উঠিল, রাক্ষুসী! পা দিয়া সজোরে ঠেলিয়া দিল হাঁড়িটাকে। হাঁড়িটা গড়াইতে গড়াইতে দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া ভাঙিয়া গেল।

তারপর, উত্তপ্ত-আরক্ত লৌহখণ্ড বাতাসের স্পর্শে যেমন ক্রমশ শীতল হইয়া আসে, বিমলাও তেমনই শান্ত হইয়া আসিল। মুখের কাঠিন্য মিলাইয়া গিয়া স্বাভাবিক কোমলতা ফিরিয়া আসিল; চোখের দৃষ্টি আবার স্নিগ্ধ শান্ত হইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে দুই চোখ হইতে অশ্রুধারা ঝরিতে শুরু করিল; বিমলা মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া আচলে মুখ ঢাকিয়া ছোট মেয়ের মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে বিমলা নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয় আবার কতকটা জল গিলিল। তারপর খোলা দরজার সামনে বসিয়া পড়িল।

মেঘের অন্তরালে দিনান্তের পালা চুকিয়া রাত্রির সূচনা হইয়া গেল। অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল। ঝড় ও বৃষ্টি দুই কমিয়া আসিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল ও মেঘ ডাকিতে লাগিল বটে, কিন্তু দুইয়েরই আর তত তীব্রতা রহিল

না। প্রকৃতি যেন ঘণ্টা-কয়েকব্যাপী তাণ্ডবনৃত্যে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া দুলিয়া দুলিয়া ঢিমা তালে নাচিতে শুরু করিল। এখন শুধু, বৃষ্টির একটানা ঝিমঝিম শব্দ, ভেকদের ঐক্যতান, ঘরের চাল হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ, মাঝে মাঝে দূরবর্ত্তী মেঘের দীর্ঘায়িত গুরুগুরু ধ্বনি, আর সকল শব্দ ছাপাইয়া একটা একটানা উচ্ছ্বসিত উদাত্ত হা-হা শব্দ, সদ্যজাগ্রতা ডাকিনীর অট্টহাসির।

ডাকিনীতে বান আসিয়াছে, গেরুয়া রঙের জলস্রোত দুই কূল ছাপাইয়া উন্মত্ত কলরবে চারিদিক মুখরিত করিয়া উদ্দাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। বিমলার মনে হইল, ডাকিনীতে ঝাঁপ দিয়া সব শেষ করিয়া দিলেই তো হয়? পাশের ঘরে মাতঙ্গিনী ও অঘোর দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে, গাঢ় অন্ধকার, এই দুর্য্যোগে পথে ঘাটে লোকজন নাই, মরিতে যাইবার এই তো সুযোগ। কিন্তু এই ক্ষুধা লইয়া মরা? আর কবে ক্ষুধা মিটিবে? কে মিটাইবে? সন্তানহীনা সে, মৃত্যুর পরে বৎসরে একটা দিন পিণ্ড পাইবারও আশা নাই তাহার। পরলোকেও ক্ষুধার জ্বালায় হা-হা করিয়া ফিরিতে হইবে তাহাকে।

ক্ষুধার আগুন যেন খড়ের আগুন, জল দিলেই নিবিয়া আসে, আবার ধিকিধিকি জ্বলিয়া উঠে। বিমলার পেটের ভিতরটা কিছুক্ষণ শান্ত ছিল, আবার জ্বালা করিতে লাগিল। এ জ্বালা না মিটাইয়া মরিতে পারিবে না বিমলা। তবে মরণ যদি অলক্ষ্যে আসিয়া তাহাকে অধিকার করে, সে কিছু বুঝিবে না, কিছু জানিবে না, দেখিতে দেখিতে শান্ত স্নিগ্ধ ঘুমে চোখ দুইটি চিরদিনের মত বুজিয়া আসিবে, হৃদয় স্তব্ধ হইয়া যাইবে, সারা দেহ নিথর হিম হইয়া উঠিবে, বিমলার বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা নাই মরিতে। কিন্তু চেষ্টা করিয়া, আয়োজন করিয়া মরিতে দেহের বা মনের শক্তি নাই বিমলার।

বাঁচিতেও শক্তি নাই। আজ এই দুর্য্যোগের রাত্রে বাবুগঞ্জে পলাইয়া যাইতে পারিলে সে হয়তো বাঁচিয়া যাইতে পারিত। সেখানে অনেক লোক আছেন—যাঁহারা ভদ্র শিক্ষিত ভাল; তাহা ছাড়া ফটিকের বন্ধুরাও থাকেন সেখানে। তাহার দুর্দ্দশার কথা শুনিলে হয়তো তাঁহাদের দয়া হইত, তাহার জন্য আহার ও আশ্রয় দুইয়েরই ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কিন্তু বাবুগঞ্জ কত দূরে, কোন্ পথে, বিমলা জানে না। জানিলেও এই দুর্ব্বল দেহ লইয়া সে আজ যাইতে পারিত না।

ক্ষুধার জ্বালা তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে, সারা দেহ ও আত্মা খাদ্যের জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছে। খাদ্য চাই, আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব সহিতেছে না বিমলার। খাদ্যের জন্য দেহ কলঙ্কিত করিতেও দ্বিধা করিবে না সে। দেহ বড়, না প্রাণ বড়? প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মানুষ দেহকে কত ভাবে নির্য্যাতিত করে! ছুরি দিয়া কাটে ও ছাঁটে; সূচ দিয়া বিদ্ধ করে, অ্যাসিড দিয়া দগ্ধ করে। দেহের রক্ষণের জন্যই দেহের নির্য্যাতন। যে প্রাণের অভাবে দেহ পচিবে, গলিবে, কৃমি-কীটে ভরিয়া উঠিবে, পশু-পক্ষীর নখে ও দাঁতে

ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবে, সেই প্রাণকে ধরিয়া রাখিবার জন্ত দেহকে যদি সাময়িকভাবে লাঞ্ছিত করিতেই হয়, তো তাহাতে অন্যায় কোথায়? সাময়িক ভাবেই তো! কটিক বলিয়াছে, নবযুগ আসিল বলিয়া, যে যুগে প্রত্যেকটি মানুষ ধন্ত হইবে, সার্থক হইবে। এ তো কটিকের নিজের কথা নয়, সে যাহাদের কাছে শিখে, যাহাদের বই পড়ে, তাহাদের কথা। সেই যুগে ক্ষীরোদার মত পাপিষ্ঠারা যদি সার্থক হইবার সুযোগ পায়, সেই বা পাইবে না কেন?

ক্ষীরোদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কোথায় গো বামুন-খুড়ী! মাতঙ্গিনীর দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে ক্ষীরোদা কহিল, সন্ধ্যে-রেতেই ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি গো তোমরা? মাতঙ্গিনী হড়াস করিয়া দরজা খুলিল। ক্ষীরোদা কহিল, তোমাদের যাবার কথা ছিল যে বাবুর কাছে, গেলে না? মাতঙ্গিনী কহিল, কি ক'রে যাই মা! যা দুর্যোগ! বুড়োকে একা ফেলে এখন আমার যাওয়াও চলে না। তোর সঙ্গেই বউকে পাঠিয়ে দিইগে, চল্। একটু থামিয়া কহিল, যেতে চাইবে কি না কে জানে! ভারি একগুঁয়ে মেয়ে কিনা, ভাঙবে তবু মচকাবে না। তুইও একটু বলিস মা বুঝিয়ে।

বিমলা উঠিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল, যাচ্ছি। মাথাটা খোলা, আঁচল কাদায় লুটাইতেছে।

ক্ষীরোদা ও মাতঙ্গিনী দুইজনেই অবাক হইয়া গেল। মিনিট কয়েক চুপ করিয়া রহিল তাহারা, তারপর মাতঙ্গিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, যাক, সুবুদ্ধি হয়েছে তা হ'লে! এই যখন মনে ছিল, মিছিমিছি কষ্ট পেলে। ক্ষীরোদাকে কহিল, তা হ'লে যা মা ক্ষীরোদা, নিয়ে যা। ভূপতিকে ব'লে ক'য়ে দিস, যেন লাঞ্ছনা গঞ্জনা বেশি না করে। দু-তিন দিন খায় নি বউ, যেয়েই কিছু খেতে-টেতে দিস মা। আর তুইই ফিরে দিয়ে যাস মা। বিমলাকে কহিল, আর দেখ বউ, তুমিও হাতে পায়ে ধ'রো; পার তো কান্নাকাটিও ক'রো, বাবু ভাল লোক, দয়া-মায়া আছে। মন যদি ভেজাতে পার তো মাপ করবে তোমাকে। একটু থামিয়া কহিল, ভালই করেছ বউ, কত সুখে থাকবে, দেখো। গাঁয়ে যা দুর্নাম রটেছে, তা কোথায় মিলিয়ে যাবে, কেউ টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করবে না আর। ভূপতি রায় হাতে মাথা কাটলেও কারও কিছু বলবার সাধ্য নেই গাঁয়ে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জোর দিয়া কহিল, তাই তো বলেছিলাম বউ, নৌকো বাঁধতে যদি হয় তো বড় গাছেই বেঁধো, ভাঙবে না, মচকাবে না; ছোট গাছ যেমন তেমন ঢেউয়ের ধাক্কায় তলিয়ে যাবে। ওই যে কটকের এত ফটফটানি কোথায় রইল? মারের চোটে মায়ের কোলে যেয়ে লুকিয়েছে। জীবনে আর তোমার ত্রি-সীমায় ঘেঁসবে না, দেখো। হঠাৎ কণ্ঠস্বর স্নেহে সপসপে করিয়া কহিল, মাথায় একবার চিরুনিটা

বুলোলে না কেন বউমা ? কাপড়খানা বদলালেই পারতে। বিমলা তীব্র কটাক্ষ করিয়াই মুখখানা ফিরাইয়া লইল।

মাতঙ্গিনী কহিল, যাও তা হ'লে, তবে একটা কথা ব'লে দিই বউমা, ভূপতি যা বলুক যা করুক, মুখ বুজে সহ্য করবে, অবাধ্য হ'য়ো না। ভূপতি যদি দয়া করে, তো তোমার দুঃখ ঘুচবে, আমাদেরও ঘুচবে।

তিক্ত ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিমলা কহিল, আপনাদের দুঃখ ঘুচবে কেন ? মাতঙ্গিনী চোখ বড় করিয়া কহিল, আমাদের দুঃখ ঘুচবে না, বল কি বউমা ? হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভূপতির মত ছেলে আমাদের—। রাগে বিমলার মুখখানা টকটকে রাঙা হইয়া উঠিল, তাহার ইচ্ছা হইল, কুৎসিত গালি দেয় মাতঙ্গিনীকে, নখ দিয়া নির্লজ্জার মুখখানা ছিঁড়িয়া দেয়। দাঁতে দাঁত চাপিয়া, তীব্র দৃষ্টিতে মাতঙ্গিনীর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর চাপা গলায় ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, তোমাদের দুঃখ ঘুচবে না। এমনই ক'রেই আমাকে যদি বাঁচতে হয়, তা হ'লে তোমরা যাতে তিল তিল ক'রে মর, তার ব্যবস্থা করব আমি। মাতঙ্গিনী গালে হাত দিয়া মিনিট কয়েক বিমলার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল; তারপর খনখন করিয়া বলিয়া উঠিল, শুনলি মা ক্ষীরোদা, বউয়ের কথা ? যার জন্মে চুরি করি, সেই বলে চোর! আমরা মরছি ওর ভালর জন্যে, আর ও চাচ্ছে আমাদের মারতে! হঠাৎ ক্ষীরোদার হাত দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া ভ্যাক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, তুই আছিস মা, আমাদের মেয়ের বাড়া তুই; কালসাপিনী যা বলছে তাই করবে; তুই আমাদের দেখিস মা। ভূপতিকে ব'লে আমাদের একটা ব্যবস্থা ক'রে দিস।

ক্ষীরোদা ও বিমলা ভূপতি রায়ের বাগান-বাড়ির দিকে চলিল। রাস্তায় জল জমিয়াছে; পায়ের পাতা ডুবিয়া গেল। ছপছপ শব্দ করিতে করিতে চলিল দুইজনে। গাঢ় অন্ধকার; মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমকে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। রাস্তায় লোকজন নাই; এ রাস্তায় সন্ধ্যার পরে লোক-চলাচল সচরাচর কম। রাস্তার দুই ধারে নালা দিয়া কলকল শব্দে জল ছুটিয়াছে; জলের উপরে, মাটির উপরে, গাছ ও ঝোপ-ঝাপের পাতার উপরে একটানা ঝিমঝিম শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছে; মাঝে মাঝে জলতরঙ্গের বাজনার মত শব্দ হইতেছে টুং-টাং; থাকিয়া থাকিয়া হু-হু শব্দে পূর্ব্বদিক হইতে দমকা বাদলা হাওয়া ছুটিয়া আসিয়া গাছের ডালপাতা নাড়া দিয়া ঝরঝর শব্দে জল ঝরাইতেছে; এবং সারা পল্লীর আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া ক্ষুধার্ত্ত ডাকিনী হা-হা শব্দে অবিরাম গর্জ্জন করিতেছে।

বিমলার মাথার মধ্যেও একটানা ঝমঝম শব্দ, যেন করতাল বাজিতেছে। শরীর আর তাহার চলিতে চাহিতেছে না, পা টানিয়া টানিয়া অতি কষ্টে চলিতেছে সে।

বিমলার মাথায় ঘোমটা নাই; খোঁপা খুলিয়া চুলগুলা পিঠে ও কাঁধে লুটাইতেছে দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ; কি দেখিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, কোন কিছুরই যেন বোধ হইতেছে না বিমলার; দম দেওয়া পুতুলের মত নির্লিপ্ত, নিরুদ্দেশ্য, নির্ব্বিকার ভাব।

ক্ষীরোদার মাথায় ছাতা ছিল, কহিল, ভিজছ কেন গো, আমার কাছে এস না। বিমলা জবাব দিল না। ক্ষীরোদাই কাছে সরিয়া আসিয়া বিমলাকে ছাতার নীচে লইল, বিমলা আপত্তি করিল না। ক্ষীরোদা কহিল, কাপড়খানা ভিজে গেল যে তোমার! বিমলা নীরব। ক্ষীরোদা জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, বাবুর ধুতি পরবে এখন যেয়ে, বাবুর সঙ্গে একদেহ একপ্রাণ হবে তো এবার, তুমিই হবে বাড়ির গিন্নী, সংসারে সর্ব্বেসর্ব্বা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ধুতি কেন, কালো কস্তা-পেড়ে শাড়ি পরাবে বাবু তোমাকে—অনেকদিনের সাধ বাবুর, তোমার ধবধবে ফর্সা রঙে কেমন মানাবে, দেখো। এক টুকরা হাসিয়া কহিল, আমার কথা ফলল তো! বলেছিলাম, আমার মিতেন হবে তুমি—হতেই তো হ'ল শেষে। বিমলা কোন কথারই জবাব দিল না। আরও কিছুক্ষণ পরে ক্ষীরোদা কহিল, ডাকিনীতে বান এসেছে, সাপিনীর মত গজরাচ্ছে পোড়ারমুখী। ডাকিনীর বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মরতে ইচ্ছে করে, পারি না; প্রাণের এমনই মায়া! না হ'লে আমার মত হতভাগীর আবার বাঁচতে হয়! ক্ষীরোদার কণ্ঠস্বর কান্নার চেয়ে করুণ।

৬

বৈঠকখানায় চওড়া তক্তাপোশের উপর ঢালা ফরাশে তাকিয়া ঠেস দিয়া ভূপতি ঝিমাইতেছে, সামনে একটা মদের বোতল, একটা কাচের গেলাস। পাশেই একটা টেবিলের উপর একটা থালায় লুচি তরকারি—একটা বড় বাটিতে মাংসের কালিয়া, একটা রেকাবিতে মিষ্টান্ন। ভূপতির রাত্রের খাবার। লোকজন আশেপাশে কেহ নাই। এই দুর্য্যোগে মোসাহেবরা অনেকে আসে নাই; দুই-একজন যাহারা আসিয়াছিল, ভূপতি তাহাদের ভাগাইয়া দিয়াছে। বিমলার সহিত আজ বোঝাপড়া হইবে তাহার। রূপসী যুবতী বিমলা। গ্রামের অনেক মেয়েমানুষের সহিত কারবার করিয়াছে ভূপতি, ভদ্রগৃহস্থের বধূও বাদ যায় নাই, কিন্তু বিমলার মত এতখানি তেজ কাহারও মধ্যে দেখে নাই। সেদিন তাহারই গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইবামাত্র ক্রুদ্ধা সাপিনীর মত দুই চক্ষে আগুন জ্বালিয়া সে ফুঁসিয়া উঠিয়াছিল, আপনি কি মানুষ, না পশু! রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিয়াছিল ভূপতির। নেশাও ধরিয়াছিল। তারপর বিমলা যতই তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে, ততই তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য তাহার বাসনা দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। তবু ধবধবে সাদা কাপড়ে কালি লাগাইতে হইলে মন যেমন স্বতই সঙ্কুচিত

ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়, বিমলাকে পাইবার জন্ম তাহার অনুক্ষণ চেষ্টাও তেমনই একটি সঙ্কোচ ও দ্বিধার দ্বারা এতদিন বাধাগ্রস্ত হইতেছিল। কাল রাত্রে ফটিকের সঙ্গে বিমলার গোপন সম্পর্ক সর্ব্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইবার পর তাহার মনে লেশমাত্র সঙ্কোচ ও দ্বিধা নাই। আজ যদি বিমলা আসিতে না চায়, ভূপতি জোর করিয়া তাহাকে আনাইবে।

ক্ষীরোদা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, বামুন-বউ এসেছে। ভূপতি লাল চোখ দুইটা মেলিয়া কহিল, কি বলছিস? ক্ষীরোদা হাসিয়া কহিল, বউ এসেছে, বিমলা-বউ। বলিয়া চোখ দিয়া ইশারা করিবার চেষ্টা করিল। ভূপতি গ্রাহ্য না করিয়া কহিল, কই? ভেতরে আসতে বল। ক্ষীরোদা কহিল, এস গো। বিমলা দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি খাড়া হইয়া বসিয়া আদেশের স্বরে কহিল, ভেতরে এস। ক্ষীরোদা বিমলাকে ধরিয়া ভিতরে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। বিমলা নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। ভূপতি ব্যঙ্গের সুরে কহিল, কি, এখন এলে যে? লোক ফিরিয়ে দিলে না? তেজ কমেছে তা হ'লে? ক্ষীরোদা কহিল, নিজের থেকেই এসেছে, তিন দিন কিছু খায় নি। ভূপতি মুখ টিপিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, জানি। ক্ষিদের জ্বালায় বাঘিনী বশ হয়, মেয়েমানুষ হবে না? তা এখনই যদি এলে, এত লেজে না খেলে আগে এলেই পারতে?

বিমলা মুখ তুলিয়া কহিল, আমাকে কিছু খেতে দিন। ভূপতি কহিল, দোব বইকি। চোখের ইঙ্গিতে টেবিলের উপরে খাবারের থালাটাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ওই সব খাবার তোমায় দোব, কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের দিনে খাবার তো অত সস্তায় পাওয়া যায় না; মোটা দাম চাই।—বলিয়া কুৎসিত হাসি হাসিতেই চোখ দুইটা ছোট হইল, চোখের কোণ কুঁচকাইল এবং ঠোঁটের দুই প্রান্ত ঝুলিয়া পড়িল।

প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে বিমলার মুখটা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিল; নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া চোখে জল আসিল; অনিবার্য্য অধোগতি হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্ম শেষ চেষ্টায়, করুণ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আপনি জমিদার, আমার বাবার মত, এমন ক'রে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করবেন না।

ভূপতি হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, তোমার বাবার মত আমি! কত বয়স বল দেখি আমার? তোমার স্বামীর বয়সী, তার চেয়ে দেখতেও খারাপ নয়, ক্ষীরদাকেই জিজ্ঞেসা কর না!—বলিয়া ক্ষীরোদার দিকে কটাক্ষ করিতেই ক্ষীরোদা মুচকি হাসিয়া মুখ ফিরাইল। পরক্ষণেই ভূপতি গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কটুকণ্ঠে কহিল, তোমার আবার ধর্ম্ম আছে নাকি যে নষ্ট হবে। ফটকের সঙ্গে রাতের পর রাত কাটিয়ে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হয় নি, আর আমার সঙ্গে—। বিমলা বাধা দিয়া কহিল, মিথ্যে কথা। ভূপতি কহিল, মিথ্যে নয়, সত্যি। তোমার শাশুড়ী এই কথা ব'লে গেছে, রঙ্গলাল নিজের চোখে দেখেছে,

কটকেও স্বীকার করেছে। ক্ষীরোদার দিকে তাকাইয়া কহিল, তুইও তো কাল ওকে আর ফটকেকে অন্ধকারে কথা বলতে দেখেছিস, না? ক্ষীরোদা উপরে ও নীচে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ। তো। কি গো বউ, দেখি নি? এটাও কি মিথ্যে কথা? বিমলা একবার ক্ষীরোদার দিকে তাকাইয়া মুখ নামাইয়া লইল।

ভূপতি কহিল, ওসব কথা যাক। কটকে যে আমার চোখের সামনে তোমাকে ভোগ করবে, আমার হাত থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে পালাবে, তা আমি কিছুতেই সহ্য করব না। শাস্তি তাকে দিয়েছি, আরও দোব, যদি সামলে না থাকে। অশ্রদ্ধার হাসি হাসিয়া কহিল, আমাকে ছেড়ে তুমি ফটকের ওপর নির্ভর করলে? কি আছে ওর? বিঘে কয়েক জমি আর ধান। আমার কাছে অনেক দেনা ওদের, নালিশ করলেই সব কিছুতে টান পড়বে, ভিটে পর্য্যন্ত বাদ যাবে না; নিজেই খেতে পাবে না, তোমাকে খাওয়াবে কি? ওসব কুবুদ্ধি ছাড়, আমার কাছে থাকলে সারাজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে, কোনদিন কোন অভাব থাকবে না। বিশ্বেস না হয়, ক্ষীরোদাকে জিজ্ঞেসা কর।

বিমলা নির্ব্বাক নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল; সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল তাহার; তাহা দেখিয়া ক্ষীরোদা কহিল, বউয়ের কাপড়খানা ভিজে সপসপে হয়ে গেছে, একখান ধুতি আপনার দেন ওকে।

ভূপতি কহিল, দোব, তুই এখন যা। ক্ষীরোদা চলিয়া গেল।

ভূপতি কহিতে লাগিল, আজ তো নিজে হতেই এসেছ শুনছি। খুব খিদে পেয়েছে বুঝি? ক দিন খাও নি? তিন দিন? ইচ্ছে ক'রে নিজে কষ্ট পেলে তুমি, আমি কি করব? এখানে এসে ব'স, যত ইচ্ছে খাও, তোমার জন্যেই আনিয়ে রেখেছি। বিমলা তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। ভূপতি কহিল, কি গো, আসছ না যে? বুকে জড়িয়ে তুলে আনতে হবে নাকি? লোভে, লালসায় ও বিমলার অবাধ্যতায় জন্ম রাগে হিংস্র পশুর মত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, এখানে যখন পা দিয়েছ, তখন আর নিস্তার নেই তোমার। জোর ক'রে তোমার গায়ে হাত দোব, কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তারপর তোমাকে ভোগ ক'রে লাথি মেরে দূর ক'রে দোব। দম লইয়া কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ কোমল করিয়া কহিল, আর যদি ভাল মানুষের মেয়ের মত আমার কথা শোন, যা বলি তাই কর, যা চাইবে তাই পাবে; কোন অভাব থাকবে না তোমার। তারপর লুচির থালাটা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া, তক্তাপোশের উপর রাখিয়া আদেশের স্বরে কহিল, এখানে এসে ব'সে খাও, এস।

বিমলা মুখ তুলিয়া একবার ভূপতির মুখের দিকে তাকাইল, তারপর তাকাইল থালা-ভরা খাদ্যের দিকে। ক্ষুধানল দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সেই অনলে দ্বিধা ও

সঙ্কোচ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, রহিল শুধু চিত্তের আদিমতম বৃত্তি, বাঁচিবার স্পৃহা, তাহারই তাড়নায় সে এক পা এক পা করিয়া আগাইয়া গেল।

৭

রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়া তাকাইয়া বিমলা আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কোথায় আসিয়াছে সে? এ কাহার ঘর? কাহার আসবাবপত্র? কাহার শয্যা? তাহার অঙ্গে এ কাহার কাপড়? চোখ ফিরাইয়া ভূপতিকে দেখিয়া লোকে শয্যায় সাপ দেখিলে যেমন ভাবে উঠিয়া বসে, তেমনই ভাবে উঠিয়া বসিয়া খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। স্রস্ত বসন সামলাইয়া কিছুক্ষণ ভূপতির দিকে তাকাইল। ভূপতি ঘুমাইতেছিল, দেহটা প্রায় উলঙ্গ, মুখটা খোলা, নীচের ঠোঁটটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দুই কষ হইতে লালা গড়াইতেছে, নাকটা ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধ সাপের মত গর্জ্জন করিতেছে। বিমলার সারা দেহ ঘিনঘিন করিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা হইতে সমস্ত ব্যাপার মনে পড়িল বিমলার। মনে পড়িল, ক্ষুধার জ্বালায় সে ভূপতির ঘরে আসিয়াছিল। ভূপতি জোর করিয়া তাহাকে মদ খাওয়াইয়াছে, হয়তো মাংসও খাওয়াইয়াছে; তাহার দেহকে লাঞ্ছিত করিয়াছে। তাহার এতদিন ধরিয়া তিল তিল করিয়া গড়া জীবনকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। কিছুই বাকি নাই তাহার—আত্মীয় নাই, আশ্রয় নাই, পথের কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য নিরাশ্রয় সে।

তীব্র বিবমিষা বিমলার পাকস্থলিটাকে পাকাইয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল; সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বারান্দার ধারেই বমি করিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে সামলাইয়া বিমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই চোখ হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছিল। দরজার পাশে তাহার ভিজা কাপড়টা পড়িয়া ছিল, ভূপতির কাপড়টা ছাড়িয়া দিয়া সে সেইটি পরিল। তারপর ধীরে ধীরে পুকুরের বাঁধা ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল।

সূচিভেদ্য অন্ধকার; আকাশে মেঘের ঘটা; সিরসির করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে; আবার বৃষ্টি নামিবে বোধ হয়। বিমলা ঘাটের রানার উপরে প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে এই প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল, বাঁচিবার জন্য এ কি করিয়া বসিলাম? এমনই করিয়া বাঁচা কি সত্যকার বাঁচা? মানুষের কাছে ঘৃণ্য, সমাজে অপাঙক্তেয়, ধর্ম্ম হইতে পতিত, সুস্থ সহজ জীবন হইতে চিরদিনের মত ভ্রষ্ট। কি হইবে এমন জীবন লইয়া? ইহার চেয়ে মরণ ঢের ভাল।

সুদীর্ঘ বঙ্কিম রেখায় মেঘের বুক চিরিয়া সহসা বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল। সেই আলোকে বিমলার চক্ষুর সম্মুখে পুকুর, বাগান, পুকুরের ওপারে বিষ্ণুমন্দিরের বেড় ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই তড়িতালোকে বিমলার মনশ্চক্ষুর সামনে

একটা মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহার নিজেরই পূজারিণী-মূর্ত্তি। শুদ্ধ-স্নাত দেহ, পরিধানে টকটকে লালপাড়ের সাদা গরদের শাড়ি; পিঠের উপরে লুটানো ভিজা চুলের রাশির উপরে স্বল্প অবগুণ্ঠন, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা; ভক্তি-নম্র মুখখানিতে শান্ত পবিত্রতা। পূজা করিবার অধিকার হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়াছে বিমলা; দেবতা-মন্দিরের দ্বার চিরদিনের জন্য তাহার কাছে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

বিমলার সারা দেহে অসহ্য অস্বস্তি, মনের মধ্যে অপরিসীম যন্ত্রণা, সারা মনে যেন একসঙ্গে সহস্র সহস্র হুল ফুটিতেছে। এই যন্ত্রণার কি শেষ হইবে কোনদিন, না, আমরণ চলিবে? ফটিকের নবযুগ কবে আসিবে, কেমন করিয়া আসিবে কে জানে, কিন্তু অনুক্ষণ মনের মধ্যে এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সহিয়া বিমলা আর বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না।

৮

রাত্রি তিনটার সময়ে মাতঙ্গিনী আসিয়া হাঁকাহাঁকি শুরু করিল, ভূপতি! ও বাবা ভূপতি! বারান্দার এক প্রান্তে রঙ্গলাল ঘুমাইতেছিল, হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল তাহার। উঠিয়া বসিয়া স্বাভাবিক ভারী কর্কশ গলায় হাঁক দিয়া কহিল, কে গা? কে? মাতঙ্গিনী কাছে আসিতে আসিতে কহিল, কে রে? রঙ্গলাল? হ্যাঁ বাবা, আমার বউ কই? রঙ্গলাল কহিল, কি জানি আজ্ঞে! রেতে আর নাই বা খোঁজ করলেন, সকাল না হতে হতেই বাড়িতেই পাবেন; এখন ঘর যান। মাতঙ্গিনী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল, ঘর যাব কি রে? বউ কোথায়? রঙ্গলাল বার কয়েক চোখ মিটমিট করিয়া কহিল, আপনি সব জেনে শুনে চেঁচামেচি করছেন কেনে বলুন দেখি? ঘর যান এখন। মাতঙ্গিনী কহিল, সে কি কথা রে? কোন্ সন্ধ্যে-রেতে এসেছে বউ, আমি কত রাত পর্য্যন্ত জেগে ব'সে, ভাবি, এই আসে, এই আসে; শেষে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি; খানিক আগে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, বাইরের দরজা খোলা, বউ আসে নি। ভূপতিকে একবারটি ওঠা বাবা, অনেক তোষামোদের পর রঙ্গলাল ভূপতির ঘরের দরজার সামনে গিয়ে ভূপতিকে ডাক দিল। অনেক ডাকের পর ভূপতির শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কে রে? রঙ্গলাল? রঙ্গলাল কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, বামুন-গিন্নী ওর বউকে খুঁজতে এসেছে, বলছে বউ বাড়িতে নেই। ভূপতি কহিল, বাড়িতে নেই তো আমি কি করব? ব'লে দে, এখানে নেই, অন্য জায়গায় খোঁজ করতে বল্‌গে যা। মাতঙ্গিনী কান্নার সুরে বলিয়া উঠিল, এখানেই যে এসেছিল বাবা! ভূপতি ধমকাইয়া কহিল, এসেছিল তো কি হবে, এখান থেকে অনেকক্ষণ গেছে। যাও এখান থেকে। মাতঙ্গিনী ভয়ে ভয়ে কহিল, বাড়িতে নেই বাবা, কোথায় গেল তা হ'লে? ভূপতি রঙ্গলালকে কহিল, তুই যা তো ওর সঙ্গে, বাড়িতে আছে কি না দেখ্‌গে যা, না থাকে ফটকের ওখানে দেখবি।

কিছুক্ষণ পরেই রঙ্গলাল ফিরিয়া আসিয়া ভূপতিকে ডাকিয়া কহিল, বাবু, ভারি বিপদ, বউ গলায় দড়ি দিয়েছে।

ভূপতি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া ভীত কণ্ঠে কহিল, সে কি রে?

রঙ্গলাল কহিল, এজ্ঞে হ্যাঁ, দেখবেন আসুন।

রঙ্গলালের পাছু পাছু গিয়া ভূপতি দেখিল, ঘাটের পাশেই একটা বেঁটে আমগাছের ডাল হইতে বিমলার দেহ ঝুলিতেছে। ভূপতির পরিতে দেওয়া ধুতিটাই গলায় বাঁধিয়া মরিয়াছে বিমলা।

মাতঙ্গিনী একটানা মিহি সুরে কাঁদিতেছিল, ওরে বাবা! আমার এ কি হ'ল রে! ভূপতিকে দেখিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভূপতি ধমক দিয়া কহিল, চুপ। টুঁ শব্দটি করবে তো ভাল হবে না বলছি। গলা টিপে মেরে শাশুড়ী-বউকে একসঙ্গে পুঁতে দেওয়াব। মাতঙ্গিনী চুপ করিয়া গেল। ভূপতি রঙ্গলালকে কহিল, ফকরে আর মানকেকে ডাক্। রঙ্গলাল, ফকির ও মানিক এই তিনজন ভূপতির বিশ্বস্ত ভৃত্য, অনেক কুকর্মের সাক্ষী তাহারা; অনেক গোপন কাহিনী তাহারা জানে; কিন্তু কোনদিন কোন কথা প্রকাশ করে নাই।

রঙ্গলাল, মানিক ও ফকির আসিল। বিমলার মৃতদেহটা গাছ হইতে খুলিয়া মাটিতে নামাইল। ভূপতি কহিল, ডাকিনীতে ফেলে দিয়ে আয়গে যা। মানিক ও ফকির মৃতদেহটাকে কাঁধে লইল, রঙ্গলাল সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সকলে যাইতেই মাতঙ্গিনী আবার কাঁদিয়া উঠিল, ও বউমা, কোথায় গেলে গো? আমাদের কি হবে গো? ভূপতি ধমক দিয়া কহিল, চুপ কর, তোমাদের কোন ভাবনা নেই। মাতঙ্গিনী কান্না থামাইয়া কান্নার সুরে কহিল, আর কি আমাদের খেতে দেবে বাবা? যা দিতে হয়, আজই দাও। ভূপতি কহিল, কি চাই তোমার? মাতঙ্গিনী কহিল, বাড়ির দলিল ফিরে দাও, বউয়ের বন্ধকী গয়নাগুলো দাও, আর কিছু টাকাও দাও বাবা। না হ'লে আমাদের চলবে কি ক'রে? ভূপতি কহিল, আচ্ছা, এস।—বলিয়া বৈঠকখানার দিকে চলিল।

মাতঙ্গিনী বারান্দায় বসিয়া ছিল। ভূপতি আসিয়া দলিল ও গহনার পুঁটুলিটা তাহার সামনে ফেলিয়া দিল। মাতঙ্গিনী দলিলটি তুলিয়া লইয়া ভূপতি দলিলের মাথাটি ছিঁড়িয়া দিয়াছে কি না পরীক্ষা করিল। তারপর কহিল, এক কলম' লিখে দিলে না বাবা? ভূপতি বিরক্তির স্বরে কহিল, দিয়েছি। দলিল ও গহনার পুঁটুলিটা কোঁচড়ে পুরিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, কিছু টাকা দিলে না? ভূপতি রাগত কণ্ঠে কহিল, মাগী জ্বালিয়ে মারলে!—বলিয়া টাকা আনিবার জন্ত ঘরে ঢুকিল। মাতঙ্গিনী কহিল, খুচরো টাকা আর রেজকী দেবে বাবা, না হ'লে কোথায় ভাঙাব, পাড়াগাঁ!

কতকগুলা টাকা, রেজকি ও পয়সা আনিয়া মাতঙ্গিনীর সামনে ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল ভূপতি। মাতঙ্গিনী কুড়াইয়া লইয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, কাল থেকে বিনে পয়সায় চাল-ডালের ব্যবস্থা ক'রে দিও; বুড়ো-বুড়ীর জন্তে তুখানা কাপড় কিনে দিও বাবা। আর ফটকেকে মানা ক'রে দিও; যেন আমার কাছে গিয়ে আমাকে না উসকোয়, ভারি বজ্জাত ছোঁড়াটা।

ভূপতি কড়া গলায় কহিল, ফটকের জন্তে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না; তুমি নিজে ঠিক থেকো কিন্তু। যদি টুঁ শব্দটি কর, তো মেরে এমনই ক'রে ডাকিনীতে ভাসিয়ে দোব তোমাকে। মাতঙ্গিনী কহিল, সে কথা আর আমাকে বলতে হবে না বাবা। কালই রটিয়ে দোব, বউ ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, তুমি কিন্তু আমাদের ভুলে থেকো না বাবা। ফ্যাঁচ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, এমন বউ আমার জন্মের মত ঘুচিয়ে দিলে বাবা! সারা জীবন ধ'রে খেতে পরতে দিলেও তা শোধ হবে না।—বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ভূপতি রাগে দাঁতে দাঁত পিষিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, শয়তানী! শতমুখী প্রতিধ্বনি চারিদিক হইতে প্রত্যুত্তর দিল।

যেমন করিয়া হোক বাঁচিয়া থাকা জীবধর্ম্ম। কিন্তু ইহাতে মানুষ তৃপ্তি পায় না। শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া সে বাঁচিতে চায়। এইজন্যই মাঝে মাঝে মানুষের জীবন সমস্যা-সঙ্কুল হইয়া উঠে। সমস্যার সমাধান করিয়াই মানুষ মনুষ্যত্ব লাভের পথে অগ্রসর হয়। বিমলার জীবনেও সমস্যা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু জীবন শেষ করিয়া দিয়া বিমলা সকল সমস্যার সমাপ্তি করিয়াছে।

শ্রীঅমলা দেবী

নবমঞ্জরী

ছেয়েছে আমারে বিপুল বরষা, বহু গুরুগর্জ্জন,
তারি ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ-বিভা কালো ভুরু-তর্জ্জন
লাভের অঙ্কে লেখা আছে আজো
তোমরা বৃথাই রণসাজে সাজো
অন্তর মাঝে আজিও বিরাজো—
জীবনের অর্জ্জন।
আমি যে কৃপণ—সাধ্য নাহি তো কিছু করি বর্জ্জন।

আলো-ঝলমল সুনীল আকাশে বর্ণের আলিপনা
রাগে ও বিরাগে প্রেমে ও ঘৃণায় এঁকেছিলে কয় জনা।
খেলিবার ঘুঁটি আমারি এ মন
তোষণ করেছে সবে কিছুখন;
বিচিত্র রূপে ভরেছে জীবন
বিচিত্র আরাধনা।
রঙছুট কেহ নও তো আজিও, একা আমি বহুমনা।

দিয়েছ অনেক সামান্য নিয়ে, তোমাদের ইতিকথা
বাল্মীকি ব্যাস লিখিতে পারে নি তোমার দাস্তে তথা
বঙ্কিম রবি শরৎচন্দ্র
তোমাদের স্তবে চির-অতন্দ্র,
বঞ্চিত যারা খুলেছে রন্ধ্র
তাহাদের বাচালতা।
স্বপ্নহরের সমাধি-শিলায় লভিয়াছে নীরবতা।

তোমরা নিত্য যোগায়েছ স্নেহ সৃষ্টির আলবালে,
দীপশিখা হাতে দেখায়েছ পথ যুগে যুগে কালে কালে।
তোমাদেরি প্রেমে আদিম মানব
মানুষ হয়েছে হয় নি দানব—
যুগসঞ্চিত তোমাদের স্তব
স্পন্দিছে নভোভালে।
যা কিছু প্রকাশ তোমরা রয়েছ তাহারি অন্তরালে।

পুরাতন-মূল-শাখা-প্রশাখায় কোটি নবমঞ্জরী,
বার বার মোর হয়েছে প্রভাত সুনিবিড় শর্ব্বরী।
মোর প্রবাহের প্রত্যেক বাঁকে
তোমরাই আছ ভরা ঘট কাঁখে—
লক্ষ্য তোমরা—মোরা তারি ফাঁকে
তরী পণ্যেও ভরি।
তোমরাই আদি, তোমরাই শেষ, তোমাদের নতি করি।

মিল

ওয়াভেল-প্ল্যানে পাঁঠা ও মোরগে প্রণয় হবে
প্রাচীর-পত্রে নজর রাখিয়ো কোথায় কবে।
মসজিদে বলি, মন্দিরে জবেহ
হবে শুনিতেছি এই উৎসবে
করিছে ঘোষণা মহা কলরবে
নেতারা সবে।
পাঁঠা ও মোরগ এই তো প্রথম মিলিবে ভবে।

দিল্লী সিমলা বোম্বে পুনায় বার্ত্তা ছুটে
পথে ঘাটে হের গলাগলি করে মজুর-মুটে।
কারাগারে ওই শৃঙ্খল টুটে
হাসিছে গোবর, পুড়িতেছে ঘুঁটে
উল্লাসভরে মরে মাথা কুটে
গজে ও উটে।
কেউ ভাল বলে, কেউ হেঁকে বলে, কি বিদ্ঘুটে।

লণ্ডন হতে এলেন পুরুত বিমান-যোগে
শুরু হইয়াছে লেহ-চাটাচাটি বাঘে ও ঘোগে।
কোন্ উপচার লাগিবে এ ভোগে
সল্লা করিছে পাঁঠা ও মোরগে
ঘটে যোগাযোগ নমাজে ও যোগে
শোকে ও রোগে।
শুধু খুশি নয় যারা খুশি থাকে বাদ-বিয়োগে।

তাজ্জব হবে দেখিলে বিরাট কাণ্ডখানা
টেবিলে পংক্তি, ভুঁয়ে পাত পেড়ে খেতেছে খানা।
সামাজিকতার নাই কোনো মানা
মিলিত হয়েছে খঞ্জ ও কানা
নানা ওস্তাদ কৌশলে নানা
দিতেছে হানা।
ঘুলিয়ে উঠল পচা পুকুরের শ্যাওলা পানা!

খুঁজিয়া খুঁজিয়া করিতেছি জড়ো তাই তো মিল
যেতে দাও দাদা, কবে হ'ল পাস রোলট বিল।
কবে এ ভাগাড়ে উড়েছিল চিল
মনে তো রাখে না আছে যার দিল
লাল হইতেছে এই হালফিল
সারা নিখিল।
চুলাচুলি আর গলাগলি হবে সব বাতিল।

জড়-পিণ্ড

(হরেকৃষ্ণ মহাপাত্রকে)

হা হরেকৃষ্ণ, ইষ্ট তোমার কেবা,
যদি দেশ নয়, দেশ-বিদ্বেষ সে কি ?
জড়বাদী হয়ে করিছ আকাশ-সেবা,
যে মাটিতে বাস ভেবেছ কি তারে মেকী ?
দেশান্তরের প্রান্তরে তব আন্তর্জাতীয়তা
যতই বাড়ুক, ভুলাতে পেরেছে স্বজাতির স্বকীয়তা ?
ভুলেছ, মানুষ বুদ্ধির বলে আকাশেও ওঠে পড়ে ধূলিতলে
যন্ত্রের স্বরে বাঁধিয়া দিলেও কভু
মানসধর্ম্মী মানুষ হয় না ঢেঁকি।
যন্ত্রে মানুষে যে প্রেম তফাত করে
তোমার হিসাবে তাঁই দেখে হ'ল মেকী !

হে পর-ভোলানো, হয়ে ঘর-জ্বালানিয়া
বিশ্বের প্রতি টান তোমাদের ভালো,
পদতলে মাটি-আশ্রয় বাদ দিয়া
আকাশ-কুসুম শিরে অজস্র ঢালো।
মূল ও কাণ্ড শাখা-প্রশাখার পরিণতি লভে ফুলে
অসীম বারিধি পাড়ি দিতে হ'লে ভিড়িতে হবেই কূলে ;
আমি ভালো জানি জানো এ সকলি তবু প্রতিদিন আপনারে ছলি
নয়া বিশ্বের নাগরিকতার লোভে
নিজ গৃহচালে অবাধে আগুন জ্বালো।

হে পর-ভোলানো, হায় ঘর-জ্বালানিয়া
পরকীয়া-প্রীতি, এ রীতি তোমার ভালো।

এ কি দুর্দ্দশা, লাখো লালসার লোভে
হিংসা-কুটিল পাতাল-পন্থা ধরি,
কেহ কি পেরেছে লোলুপ মনঃক্ষোভে
বঞ্চিতে চির বঞ্চনা-শর্ব্বরী!
ধর্ম্ম কেহ কি রাখিতে পেরেছে ধর্ম্মঘটের জোরে?
গলাবাজি ক'রে পেরেছে মিলাতে চোরে ও মুনাফাখোরে,
যারা খুঁজে মরে অধিকার যশ তারা আগে হবে আপনার বশ
পরবশে যারা ভোগসন্ধানী শুধু
তারা দেহে বাঁচে, দেহেতেই যায় মরি,
জড়কেই যারা নর-নিয়ন্ত্রা কহে,
কভু পোহাবে না তাহাদের শর্ব্বরী।

ইনি

উঃ! আমি যে কি ঝঞ্ঝাটে আছি তা আপনাদের কি ব'লব? আপনাদের সঙ্গে আলাপ আছে কিনা জানি না, মশাই, আমার সঙ্গে আছে, যেহেতু আমার সঙ্গে এঁর কোন একসময় পরিচয় ছিল। এ যুগে পরিচয় থাকাটা যে এত ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার, এ যদি আগে জানতুম মশাই, তা হ'লে কোন্ ইয়ে মনে করুন, আলাপ করতে যেত।

এঁর জ্বালায় রাস্তায় চলবার উপায় নেই, বাড়িতে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবার জো নেই, ট্রামে ওঠবার উপায় নেই, কারণ ইনি কখন কোথা থেকে কি ভাবে যে আলাপ জমাবেন তার কোন তাল আজ পর্য্যন্ত খুঁজে পাই নি। ইনি যদি ট্রাম বা বাসের সামনের সিটে বসেন এবং আমি শেষপ্রান্তে মুখ ঘুরিয়ে ব'সে থাকি, তা হ'লে তিনি স্বস্থান থেকে ঘাড় ফিরিয়ে ঠিক আমাকে খুঁজে বার ক'রে নাম ধ'রে ডেকে চীৎকার শুরু করবেন। কি খবর? কোথায় যাচ্ছেন? অমুক জায়গায় নাকি? অমুক যে আপনাকে কাগজে খুব একহাত নিচ্ছে, বেটার গায়ের জ্বালা খুব বেশি, না? আপনি সেই জায়গায় এখনও চাকরি করছেন তো? সবসুদ্ধ ছেলেপুলে কটি হ'ল? ইস্কুলে দিয়েছেন? মেয়েটির বিয়ের কিছু করলেন নাকি? আপনার আপিসের ইনক্রিমেন্ট্ নিয়ে যে বেটা সাহেব গোলমাল করেছিল, সেটা এখনও আছে নাকি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমস্ত আরোহীদের দৃষ্টি আমার দিকে। আমি এবং আমার পরিচিত তিনি যে কেউ-কেটা ব্যক্তি নয়, সেটা তিনি খুব ভালভাবে সকলকে জানিয়ে এতখানি বাহাদুরি করতে লাগলেন যাতে মনে হ'ল যে, এর পরের ষ্টপেজে নেমে পড়ি গাড়ি থেকে। দেখলুম, যথেষ্ট পরিমাণে অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেও এবং ততোধিক তাচ্ছিল্য দেখালেও এঁর কাছ থেকে ছাড়ান পাবার উপায় নেই, কারণ তিনি নির্ব্বিকার। বাধ্য হয়ে পথিমধ্যে নেমে পড়তে হ'ল।

কিন্তু নিস্তার পাবার জো কি? নেমন্তন্ন রাখতে গিয়েছি, সেখানে হঠাৎ এঁর সঙ্গে আমার দেখা, আর রক্ষে আছে? পরিচিত অপরিচিত সকলকে ডেকে সকলের সঙ্গে ইনি আমার আলাপ করিয়ে দেবেনই। এঁর পরিচয়ের ঠেলায় বাধ্য হয়ে আজকে শরীরটা খারাপ ব'লে হয় নেমন্তন্ন-বাড়ি থেকে চ'লে আসতে হয়, নয় পাতে ব'সে পড়লে বেগুনভাজা খেতে খেতে গলায় বিষম লাগে।

এঁর ধারণা, আমি ইচ্ছে করলে প্রায়ই এঁকে দশ-পনেরো টাকা ধার দিয়ে আর কখনও না চাইতে পারি। এঁর যাবতীয় পরিচিতদের ইচ্ছে করলেই উপকার করা বা চাকরি যোগাড় ক'রে দেওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত সহজ। ইনি যত্রতত্র আমার সঙ্গে যে কোন অবস্থায় রসিকতা করতে পারেন, এঁর কাছে আমার সময়ের মূল্য নেই, এঁর যখন খুশি তখনই এঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতে পারে, এঁর কাছে কোন কিছু করার অক্ষমতা বোঝাতে যাওয়া 'এড়ানোর নামান্তর', সাহায্য না করতে পারা 'পেজোমি'—টাকা ধার না দেওয়া 'চালাকি', এবং সময়ের অভাব জানানো 'চালিয়াতি'।

এঁর সঙ্গে সুখ-দুঃখের কোন সম্বন্ধ আমার কোনকালে নেই, শুধু মাত্র মৌখিক আলাপ, তাও 'কোন্ দূর শতাব্দীর কোন্ এক অখ্যাত দিবসে।' মাঝে মাঝে এঁর দেখা পাই মাত্র এঁরই নিজের প্রয়োজনে, 'চিরদিন যে পাই না' তা আমার স্বর্গগত পিতৃপুরুষদের বহু পুণ্যফলে। এঁর হাত থেকে মুক্তি পাই যে কি রকমে, তা আজও ঠিক ক'রে উঠতে পারি না। বিধাতা আমার বরাতে এই অনাবশ্যক বল্লাটটিকে জুটিয়ে দিলেন যে কোন্ পাপে, তা তিনিই জানেন।

ইনি যা করবেন আমাকে তা সমর্থন করতে হবে, এঁর আবদার অসম্ভব হ'লেও আমাকে তা মেটাতে হবে, এঁর মেয়ে গান কেমন শিখেছে তা শোনবার জন্যে দু ঘণ্টা ঠায় ব'সে যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এঁর ছেলের প্রতিভা ভবিষ্যতে বাংলা দেশ সামলাতে পারবে কি না তাই নিয়ে গবেষণা করতে হবে, ইনি যা লিখবেন এবং যেখানে সেখানে যখন তখন পড়তে আরম্ভ করলে তা আমায় ধৈর্য্য ধ'রে শুনতে হবে এবং অত্যন্ত খুশি হয়ে 'ভাল' বলতে হবে, ইনি আমায় যেখানে নিয়ে যাবেন সেইখানে আমায় ঠিক সেই সময় যেতে হবে, ইনি সিগারেট খেলে সেটা যোগাবার ভার আমার, একসঙ্গে

উভয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকলে তার সমস্ত বিল পরিশোধ করার ভার দেবেন ইনি আমাকে, ট্রামে একসঙ্গে উঠলে দুজনের টিকিট কেনবার দায়িত্ব থাকবে আমার ওপর, ইনি ভুলেও নিজের ব্যাগ বার করবেন না।

আমি যা পৃথিবীতে সুবিধে পাব তার অংশ দিতে হবে আমাকে, ইনি আমার এমন সুখ্যাতি করবেন যার জন্যে আমাকে লজ্জিত হতে হবে সকলের কাছে এবং টিটকিরি সহ্য করতে হবে একশো লোকের। আমার কে কে শ্রাদ্ধ করেছে এবং কে কি আমার বিরুদ্ধে বলেছে তা সমস্ত তিনি চুপটি ক'রে শুনে এসে আমার গোচরীভূত করবেন সকলের আগে। আমি বিন্দুমাত্র এঁর মনোমত কোন কার্য্য না করতে পারলে ইনি আমার আড়ালে আমার সম্বন্ধে খুব ভাল ভাল উক্তি ক'রে বেড়াবেন।

এঁর বাড়ির ট্যাঙ্কে গঙ্গাজল আসছে না কেন তার জন্যে আমাকে ছুটতে হবে কর্পোরেশনের কর্ত্তাদের কাছে, পাড়ার লোকের সঙ্গে দাঙ্গা করলে আমায় যেতে হবে থানায়, ইনি নাটক লিখলে সেই নাটকের অভিনয় করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে, ফুটবল খেলার চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট না পেলে তার প্রাপ্তির বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে আমাকে, এবং এই সমস্ত দাবি না মেটাতে পারলে ইনি আমার শ্রাদ্ধ করবেন সর্ব্বাগ্রে। অথচ আশ্চর্য্য, ইনি আমার কোন উপকার করতে কোন দিন এগিয়ে আসবেন না এবং সামর্থ্য থাকলেও আমার কোন কার্য্য ঘাড়ে নেবার পূর্ব্বেই বা পরেই ইনি অসুস্থ হতে শুরু করবেন। এঁকে নিয়ে আমি করি কি?

আপনাদের কারুর সঙ্গে কি এঁর পরিচয় নেই?—থাকলে বুঝতেন পৃথিবীতে ঝঞ্ঝাট কাকে বলে!*

শ্রীবিরূপাক্ষ

কান্না

বেলা সাড়ে এগারোটা।

কেরানীর সংসার; স্বামী স্ত্রী আর একটি মেয়ে। দশটায় খেয়ে স্বামী আপিস যান; ট্রাম-স্ট্রাইক হয়েছে ব'লে স্বামীকে আজ কদিন থেকে বেরুতে হচ্ছে নটায়। বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে আসে কোম্পানির লরি; সেখানে গিয়ে উঠতে হবে। আজ থেকে বাসও বন্ধ হয়েছে।

সকালবেলায় স্বামীই এনেছিলেন খবরটা। একমুখ হেসে বললেন, যাক বাবা, বাসও বন্ধ।

---

* বিরূপাক্ষবাবুর ঝঞ্ঝাটের অনেক সংবাদ তাঁর ডায়েরি থেকে আমরা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মারফৎ পেয়েছি, তার থেকেই কিছু এইখানে প্রকাশ করা হ'ল।

অমিয়া ভেবেই পেলে না—এতে হাসির কি আছে! সে সবিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে বললে, তাতে হাসির কি আছে?

হরেন্দ্র হেসেই বললে, টং টং টং টং ক'রে হাঁটুক সব।

কিন্তু তাতে আনন্দটা কিসের?

আনন্দটা যে কিসের, সে কথা বলতে পারলে না হরেন্দ্র। বললে, সবাই হাসছে। আর্মড পুলিসের কনেষ্টবলগুলো দাঁড়িয়ে আছে, তারাও হাসছে। একটু চুপ ক'রে থেকে হরেন্দ্র বললে, তুমি গেলে তুমিও হাসবে—ঠিক হাসি পাবে।

তারপর আবার বললে, ইলিশ ভারি সস্তা। টাকা-টাকা ইলিশ। হাসতে লাগল হরেন্দ্র। এটা অবশ্য খুশি হবার কথা। সুতরাং হরেন্দ্র হাসতে পারে।

নাও, নাও, ইলিশ ভাজ। তেল সামান্য একটু দিয়ে ছেড়ে দাও। কলকল ক'রে তেল বার হবে। স্নানটা সেরে নিই আমি।

ইলিশমাছভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে হরেন্দ্র বেরিয়েছে লরি ধরবার জন্য। বার হবার সময় কিন্তু মুখ তার ভারী হয়ে উঠেছিল। গেঞ্জি গায়ে দিতে দিতেই সে আরম্ভ করলে গাল দিতে। ট্রাম-কর্তৃপক্ষকে গাল দিলে, ট্রাম-কর্মচারীদের গাল দিলে, সরকারকে গাল দিলে, নিজের কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে গাল দিলে। পরিশেষে হাত দুটি তুলে দেবতা প্রণাম করবার সময় বললে, হে ভগবান, ফাদার লঙের ভবিষ্যদ্বাণী সফল ক'রে দাও প্রভু। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।

এবার হাসি এল অমিয়ার।

স্বামী চ'লে গেলেন। মেয়ে সুধা গেল ইস্কুলে—পাড়াতেই ইস্কুল, বিনা বেতনের ইস্কুল। বিনা বেতনের ইস্কুল ব'লে চোখ-রাঙানিটা কিছু বেশি, একটু দেরি হ'লেই দিদিমণিরা হুমকি দেয়, এমন দেরি ক'রে এলে আসবে না ইস্কুলে, নাম কেটে দেব।

দশটাতেই ছুটল সুধা।

একজনের খাবার প'ড়ে থাকলে শুকিয়ে অখাদ্য হয়ে উঠবে অল্পক্ষণের মধ্যেই। সাড়ে দশটায় অমিয়া নিজে খেয়ে নিলে। বসল সেলাই নিয়ে। নতুন কাপড়ের জামা, শেমিজ কি বিছানার ওয়াড় চাদর সেলাই নয়; সূচের সেই সনাতন গুণপনার কাজ, ছেঁড়া বাস জোড়া দেয় সেলাই করিয়া। সামনে একজন ছোটখাটো ব্যবসায়ীর বাড়ি। তিনি অবশ্য এখন আর 'ছোটখাটো'টি নন, মিলিটারি সাপ্লাইয়ে সরবরাহ চালিয়ে বড় হয়েছেন। এ বাসাটা পুরানো আমলের। কলকাতায় বাড়ি এখন দুষ্প্রাপ্য, তাই এখানেই রয়েছেন এখনও। বাড়ির বারান্দায় সারি সারি তাঁতের শাড়ি শুকুচ্ছে। কয়েকখানা কোরা নতুন। আজই ভিজিয়ে কেচে রোদে দেওয়া হয়েছে। মাড়ের গন্ধ আসছে

এখান পর্য্যন্ত। রঙিন নতুন কস্তাপাড় রোদ লেগে ঝকমক করছে। সেলাই ফেলে উঠল সে। নিজেদের বারান্দায় রেলিঙে কিছুক্ষণ দাঁড়াল।

ও-বাড়ির বড় ছেলে বেরিয়ে এল বারান্দায়। দামী সুটের সর্ব্বত্র কাদার দাগ। বীভৎস ব্যাপার বললেই হয়। পা-জামা গেঞ্জি হাতে ক'রে বাথরুমের দিকে চলেছে। ন্যুইসেন্স, ন্যুইসেন্স। বজ্জাৎ বেটাদের হুইপ করা উচিত।

ছেলের মা বেরিয়ে এলেন পিছনে পিছনে। পড়লি কি ক'রে?

কি ক'রে আবার? রিক্‌শা উল্টে। বেটাদের জেলে দেওয়া উচিত।

কাদের কথা বলছ দাদা?—বেরিয়ে এল মেজ ভাই।

ওদের সবাইকে। ট্রাম-ষ্ট্রাইকার, বাস-ষ্ট্রাইকার সবাইকে। এত বড় শহর, লক্ষ লক্ষ লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে ওদের ষ্ট্রাইক হচ্ছে। আর এই রিক্‌শাওয়ালারা—এদের খুন করা উচিত। বেটার ঠিক হয়েছে। ছুটছে যেন মরি-বাঁচি ক'রে। একটা ভাড়া ফেললেই আর একটা ভাড়া তো! লাগালে ধাক্কা একটা লরির সঙ্গে। আমি আগেই লাফিয়ে পড়েছিলাম। বেটা খেয়েছে বেশ একখানি ধাক্কা। হাসপাতালে নিয়ে গেছে। লাফিয়ে পড়তে, আমিও পড়ে গেলাম।

মনটা খুশিতে এবং কৌতুকে ভ'রে উঠল অমিয়ার। হাসি গোপন করবার জন্যই সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। কয়েক মুহূর্ত্ত হেসে হঠাৎ তার বাইরে বেরুবার ইচ্ছা হ'ল। ঘরে ব'সে থেকে কি করবে? তা ছাড়া খানিকটা ছিটেরও দরকার আছে। আর ছোটখাটো অনেক জিনিস চাই। ফর্দ্দ করতে গেলে একখানা একসারসাইজ বুক ভ'রে যাবে। হেঁটে কলেজ ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে আসা খুব কঠিন নয়। সে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে কাপড় বদলে নিলে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু দ্বিধা হ'ল। কলেজী মেয়ের মত সাজ হয়েছে, কাঁধের উপর কাপড় কুঁচিয়ে ব্রোচ আঁটাটাই যেন বেশি লজ্জা দিচ্ছে তাকে। কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল সে। থাক, বেরিয়ে কাজ নেই। আরও কয়েক মুহূর্ত্ত পর সে ভ্রূ কুঁচকে ঘাড় উঁচু ক'রে দাঁড়াল। খোঁপাটা খুলে ফেললে, মাথাটা আঁচড়ে বেণীটা ঘাড়ের উপর আধুনিক কায়দায় বেঁধে নিলে; পাউডারের কৌটোটা খুললে, পাউডার নাই—পাফটা নিয়ে মুখে খানিকটা ঘ'ষে নিলে; আয়নায় আর একবার দেখলে নিজেকে; একটু হাসি এল তার মুখে। কে বলবে যে, সে কলেজের ছাত্রী নয়? তার সঙ্গিনীরা আজও তাকে দেখে ঈর্ষা ক'রে বলে, বেশ আছিস ভাই তুই! একেবারে সেই খুকীটি। ছাত্রীজীবনের হাতব্যাগটা বার ক'রে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

বড় রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত যেতে যেতেই তার উৎসাহটা ক'মে এল। সেই পুরাতন পৃথিবী। মানুষেরা যেমন চলত তেমনই চলছে। বরং যেন স্তিমিত হয়ে গিয়েছে।

ভিড় কম। ওই মিলিটারী কণ্ট্রাকটারের ছেলের কর্দমাক্ত চেহারার মত একটা কৌতুকপ্রদ হাস্তকরও কিছু দেখা যায় না।

মোড়ে পুলিস পাহারা। অতি সতর্ক সরকার, অদ্ভুত দূরদৃষ্টি! এদের রাজ্যে তবু কেমন ক'রে চোরা-বাজার চলে কে জানে? যদি ধর্মঘটীরা হাঙ্গামা করে। কোমরে পিস্তল নিয়ে সার্জেন্ট সাহেব ব'সে আছে চেয়ারে। মোটা বেতের চার হাত লাঠি নিয়ে আর্ম্‌ড কনষ্টেবলরা ব'সে আছে বেঞ্চে। ধর্মঘটীরা হাঙ্গামা না করায় বেচারারা নিতান্তই বেমানান হয়ে পড়েছে দৃশ্যপটে। ঝিমুচ্ছে ব'সে ব'সে। একজন কনষ্টেবল একখানা বই নিয়ে ছবি দেখছে। একজন অলসভাবে বাঁ হাতের তালুর উপর ডান হাতের আঙুল চালাচ্ছে, যেন হাতখানা ঝাড়ছে অবিরাম মানসিক-ব্যাধিগ্রস্তের মত। জনকয়েক ব'সে ব'সে ঢুলছে। একটা লোক পলতায় বড়া ভাজছে ফুটপাথের উপর। মধ্যে মধ্যে দু-চারটে বড়া খাচ্ছে কেউ কেউ। নিতান্তই দুর্ভোগ বেচারাদের, দুপুরবেলার কর্মহীন কেরানীর বউয়ের মতই, বরং আরো খানিকটা খারাপ। কেরানীর বউয়েরা ইচ্ছে হ'লে মাদুর বিছিয়ে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে ঘুমুতে পারে, এ বেচারাদের ব'সে ঘুমুতে হয়; একটা ঠেস দেবার আশ্রয়ও নাই। মনটা এতক্ষণে আবার বেশ খুশি হয়ে উঠল।

একজন স্যুটপরা বাবু একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে রিক্‌শাওয়ালাদের সঙ্গে দর ক'রে বেড়াচ্ছিল। সম্ভবত দরে বনল না। একজন রিক্‌শাওয়ালা বেশ চেঁচিয়েই বললে, আরে যাও যাও; পাৎলুন পিহিনকে সাহাব বন্‌ গিয়া।

লোকটা একবার ফিরে তাকাল, যাকে সাধুভাষায় বলে, রোষকষায়িত নেত্রে। রিক্‌শাওয়ালাটা হেসে বললে, ঝাঁকা মোটিয়া লেও সাহাব, ঝাঁকা লে লেও একঠো।

স্যুটকেসটা নিয়ে লোকটা হনহন ক'রে চলতে লাগল। অমিয়া এতক্ষণে মজা পেয়েছে। সে চলল তার পিছন পিছন। খানিকদূর গিয়ে সাহেব স্যুটকেসটা নামালে, রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছলে। অমিয়াও দাঁড়াল। রুমালটা মুখে ঢাকা দিয়ে সে নিস্পৃহের মত চেয়ে রইল অন্য দিকে।

ফড়েপুকুরের মোড়ে হাঁ ক'রে অকারণে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল বাবু। আপিসের বাবু এরা নয়। এরা সব আপিসের বাবুদের চেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি। বাস নাই, ট্রাম নাই, বের হওয়ারও প্রয়োজন আছে, এসে অভ্যাসমত ফুটপাথে বাদামগাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। একজন অকস্মাৎ ব'লে উঠল, দূর শালা! চল, বাড়ি চল। চল হে।

যাকে কথাটা বললে, সে উদাসভাবে উত্তর দিলে, দেখি খানিকটা।

সকলেই ফিরে তাকালে বক্তার দিকে। সকলের মনের কথাই সে বলেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, সেও ফিরল না। বললে, দেখ তবে আর দশ মিনিট।

চিত্রার শুধু 'থার্ডক্লাস ফুল' বোর্ড টাঙানো। মিনার, শ্রীর কোন ক্লাসই ফুল নয়; উত্তরাতে ইণ্টারক্লাস পর্য্যন্ত উঠেছে। যারা টিকিট নিয়ে বেশি দামে বিক্রি করে, তারা হাঁ ক'রে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। একটা লুঙ্গি-পরা ছোকরা কানের কাছে এসে ব'লে গেল, থার্ডক্লাস বারো আনা—শুধু বারো আনা।

এবার প্রচুর খুশিতে ভ'রে উঠল অমিয়ার মন। দীর্ঘজীবী হোক ট্রাম-ধর্ম্মঘট। ভারি খুশি হয়েছে সে।

আরে, অমিয়া যে!

কে? ও মা। তোমরা কোথা থেকে গো? অ্যাঁ!

আকাশ থেকে গো।

অমিয়ার ছাত্রীজীবনের বন্ধু তুজন—দীপিকা আর রমলা। তুজনেই কুমারী, কলেজে মাষ্টার। বেশ আছে ওরা।

রমলা বললে, ট্রাম বাস ষ্ট্রাইক। কলেজে মেয়েরা আসে নি। আমাদের ছুটি। কিন্তু তুমি? তুমি কোথায় এই ভরা তুপুরে, একাকিনী, পথ 'পরে?

হেসে অমিয়া বললে, একটু ছিট কিনব ভাই।

তা নিজে? নিজে কেন? তোমার তো বিশেষভাবে বহন করবার লোক আছে। আমাদের মত তো অভাগিনী নও।

অভাগিনী! হাসলে অমিয়া। পরের সুখ আর নিজের পরমায়ু—এ তুটো মানুষ কখনও কম ক'রে দেখে না।

তুই কিন্তু ভাই আছিস বেশ! সিঁথির সিঁতুর না থাকলে বিশ বছরের কম-বয়সী ক'নের জন্যে বিজ্ঞাপন দেয় যারা, তাদের সঙ্গে দিব্যি ইণ্টারভিয়ু দিয়ে আসতে পারিস।

দীপিকা বললে, কি রকম সেজেছে দেখ, ব্রোচ দিয়ে কাপড় এঁটে! একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, ট্রাম বাস বন্ধ। এই রণসাজে সেজে আজ পথে বেরিয়েছিস কি পথিকগুলোকে হোঁচট খাওয়াবার জন্যে?

অমিয়ার মাথার ভিতরটা কেমন ঝিমঝিম ক'রে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, চলি ভাই, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। কলেজ ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত যাব।

রমলা বললে, চল্, আমরাও যাই। আমাদের অনেকদিন থেকে কটা জিনিষ কিনি-কিনি ক'রে কেনা হচ্ছে না, দীপিকারও।

দীপিকা বললে, আস্তে চলতে হবে কিন্তু ভাই। অমিয়ার মত তন্বী নই আমি। মা গো, কি সুখে যে মোটা হচ্ছি কে জানে!

কিনলে ওরা অনেক জিনিস। টুকি-টাকি হরেক রকম। বাজার করার যেন নেশা চেপে গিয়েছে। জিনিস অগ্নিমূল্য, কিন্তু সে অগ্নি-প্রুফ দস্তানা হাতে প'রে ওরা জিনিস ধরছে হাতে—নোটের দস্তানা। স্নো, পাউডার, ফাউন্টেনপেনের কালি। দীপিকা কিনলে একটা ব্রোচ। জুয়েলারির দোকান থেকে বেরিয়েই একটা বিস্কুট-লজেন্স-চায়ের দোকান; রমলা বললে, দাঁড়া।

চকোলেট কিনলে সে। বললে, খা।

অমিয়ার অনেকখানি অবসাদ কেটে গিয়েছে। সে-ই সব পছন্দ ক'রে দিলে। একটা চকোলেট মুখে পুরলে।

কলেজ ষ্ট্রীট হ্যারিসন রোডের জংশনের আগে পথের উপর কাঁচের চুড়ি, নকল পাথরের মালা দেওয়ালের গায়ে সাজিয়ে ব'সেছে ফেরিওয়ালারা।

দাঁড়া ভাই। বেশ তো এগুলো।

সত্যিই বড় চমৎকার জিনিস। সুন্দর!

রমলা বললে, এর চেয়েও অনেক সুন্দর জিনিস রয়েছে বড় কাপড়ের দোকানগুলোয়। চল্ না ওধারে।

ব্যাফ্‌ল ওয়ালগুলো ভাঙতে শুরু করেছে। ইটের রাশি মাড়িয়ে এসে উঠল ওরা। সত্যিই এগুলো আরও সুন্দর। মন খুশি হয়ে ওঠে।

ভিতরে ঢুকল। ওরা দুজনে কয়েকটা জিনিসই কিনলে। অমিয়াও একটা মালা কিনলে। চার টাকা বারো আনা। পাঁচ টাকার একটা নোট বার ক'রে দিলে।

রমলা বললে, কাপড় কিনব একখানা। অমিয়ার এই কাপড়খানার মত। সে হাত দিলে কাপড়টায়। চমৎকার জিনিস রে!

অমিয়া সন্তর্পণে কাপড়ের আঁচলটা টেনে নিলে।

রমলা বিস্মিত হয়ে অমিয়ার মুখের দিকে তাকালে। অমিয়া মুখ ফেরালে। দোকানের আয়নায় কিন্তু তার নজরে পড়ল, রমলা দীপিকার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। দুজনের ঠোঁট বেঁকেছে, বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছে।

দেখি, এই রকম কাপড়।

ওইখানে। ওই টেবিলে যান। কাপড় দেখাও হে!

এক থাক কাপড় এনে ফেলে দিলে। তাঁতের কাপড়। মাদ্রাজী রঙিন শাড়ি।

অমিয়া এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর সে একবার নেড়ে দেখলে। জমি মন্দ নয়। পাড়টা ভাল নয়। ওই পাড়টা, ওটা বেশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নিবিষ্ট চিত্তে কাপড়গুলো দেখতে লাগল।

হঠাৎ—অত্যন্ত হঠাৎ একটা শব্দ উঠল। দীপিকা, রমলা মুখ ফিরিয়ে খুক-খুক ক'রে

হেসে উঠল। অমিয়াও মুখ ফিরিয়ে দেখতে গেল, কিন্তু সে চমকে উঠল মধ্যপথে। কি হয়েছে দেখতে গিয়ে, মধ্যপথে কাঠের থামে আঁটা আয়নায় নিজের মুখ তার চোখে পড়ল। সে চমকে উঠল। এ কে? সে? এ কি মুখের চেহারা হয়েছে তার? এ কি দৃষ্টি তার চোখে? বিষণ্ণ, লুব্ধ, দীনতায়, হীনতায় ভরা এ কি দৃষ্টি তার চোখে! সে শিউরে উঠল। বুকের ভিতরটা তার কেমন ক'রে উঠল।

দীপিকা, রমলা তখনও হাসছে; দোকানের লোকেরাও মুচকে মুচকে হাসছে। একজন ভুঁড়িওয়ালা লোক পা পিছলে প'ড়ে গিয়েছে দোকানের মেঝেতে। চিত হয়ে পড়েছে। গড়িয়ে উপুড় হয়ে উঠছে লোকটা।

অমিয়া হঠাৎ বললে, দেখে নিন আপনাদের কাপড়গুলো।

দোকানের লোকটি আশ্চর্য্য হয়ে গেল। অমিয়া যেন কতকটা নিজেকে ঝাড়া দিয়ে দেখিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল, আমি চললাম ভাই।

আরে! দাঁড়া, একসঙ্গে—

ততক্ষণে অমিয়া বেরিয়ে এসেছে দোকান থেকে। হনহন ক'রে সে উত্তর মুখে হাঁটতে লাগল। কোন দিকে চাইলে না। পাছে কোন দোকানের আয়নায় নিজের ছবি দেখতে পায়।

বাড়ি এসে সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। হাঁপাচ্ছে সে। অনেকক্ষণ পর নিজেকে সংযত ক'রে কাপড় বদলালে। পরনের শাড়িখানি সন্তর্পণে পাট করতে বসল। যে অংশটা কুঁচকে সে ব্রোচে আবদ্ধ রেখেছিল, সে অংশটা ছেঁড়া, সেলাই-নিপুণা অমিয়া তাকে অত্যন্ত কৌশল এবং নিপুণতার সঙ্গে সেলাই করেছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে, সঙ্গে সঙ্গে চোখে এল জল। পরক্ষণেই সে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলে, নিজেকে সংযত করলে, ছি! ছি!

সুধা ফিরে এল, তাকে নিয়ে সে আদর করতে বসল।

সে কি হাসি! সুধাকে কাতুকুতু দিয়ে হাসাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সেও হাসছিল।

কি ব্যাপার? এত হাসি? স্বামী ফিরে এলেন। হাতে একখানা চিঠি। চিঠি সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য নাই অমিয়ার।

ভাইরা উদাসীন। দোষ নাই তাদের। দুই ভাই, ছয় বোন তারা। সে পঞ্চম বোন। তাই তার আর একটা নাম আন্না। বুড়ো মা আছেন; তিনি পরশু চিঠি দিয়েছেন, ভাল আছেন।

অমিয়া বললে, হাসব না তো কাঁদব নাকি? কিসের দুঃখে কাঁদব?

মুখ হাত ধুয়ে জল খেয়ে স্বামী বললেন, তোমার দাদা চিঠি দিয়েছেন।

দাদা ? চিঠি দিয়েছেন ?

হ্যাঁ। মায়ের বড় অসুখ। ডাক্তারে বলছে, অসুখ কঠিন ।

অমিয়া চিঠিখানা প'ড়ে একটু চুপ ক'রে রইল।

স্বামী বললেন, বয়স হয়েছে।

বয়স আর কি হয়েছে ? আরও অনেক বেশি বাঁচে মানুষ।

হ্যাঁ। তা বাঁচে।

তবে হ্যাঁ। গেলেই খালাস এখন।

স্বামী একটু হেসে বললেন, না বাপু। বেঁচে উঠুন। গেলে তিনি খালাস, কিন্তু আমাদের বিপদ। অন্তত দু শো, আড়াই শো টাকা। একটু হেসে বললেন, শুনি তুমি তাঁর খুব আদরের মেয়ে, চিঠি লিখে বারণ কর—মা, এখন ম'রো না বাপু!

কি—কি—কি বললে তুমি ?

কি বললাম ?

তোমার দু শো আড়াই শো টাকার জন্যে মা আমার মরতে পাবেন না ? এই রূঢ় পৃথিবী, এই নিষ্ঠুর পৃথিবী, এই ক্রূর পৃথিবী এ থেকে পরিত্রাণ পাবার তাঁর অধিকার নাই ? ঝর-ঝর ঝর-ঝর ক'রে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে অমিয়া। অবিশ্রান্ত কান্না। কিন্তু সে-কান্নায় সে যেন অপরিমেয় শান্তি পাচ্ছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

'শনিবারের চিঠি' অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। আগামী এক বৎসর সাবালকত্ব মক্স করিয়া সে যথারীতি আইনসঙ্গত অধিকারাদি অর্জন করিবে। আশা হইতেছে, সরকার-নির্ধারিত ল্যাঙট-কৌপীনাদির কণ্ট্রোল-মুক্ত হইয়া সে অনতিবিলম্বে ভদ্র প্রমাণসই বেশ ধারণ করিতে পারিবে। এতদিন বহু কষ্টে লজ্জা নিবারণ প্র্যাক্‌টিস করিতে করিতেই সে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছে। নাবালক অবস্থায় সকল ভুলত্রুটি চাপল্য ও অসংযমের জন্য মার্জনাভিক্ষাও করিতেছে সে।

এই নাবালক অবস্থায় যে সকল অভিভাবক-স্থানীয় ব্যক্তি খবরদারি করিয়া ও উপদেশ দিয়া ইহাকে সৎপথে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন; যে সকল বন্ধু সাহচর্য ও

ভালবাসা দিয়া ইহার প্রাণরস সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন, যাঁহারা শত্রুরূপে অথবা মিত্ররূপে ইহার সেবা করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের সকলেই বর্ত্তমান নাই। কেহ কেহ ইহলোকের মায়া কাটাইয়াছেন, কেহ কেহ ডায়ালেক্‌টিক্‌সের মহিমায় সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন; পুরাতন বন্ধু কেহ কেহ মুখ ফিরাইয়াছেন, নূতন বন্ধু আসিয়া জুটিয়াছেন—আজ তাঁহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। সকলের আশীর্বাদে ও স্নেহে, প্রণয়ে ও প্রীতিতে, অভিশাপে ও বিরুদ্ধতায় তাহার যাত্রা শুভ ও সার্থক হউক।

—

গোপালদা আসিয়াছিলেন। আমাদের বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়াই কথাবার্তা হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন, এ এক কি ফ্যাসাদেই আমাকে ফেলেছ ভায়া! মনের খেদে যে কথাগুলো তোমাকে বলেছিলাম, গতবারে তোমার কাগজে সেগুলো ছাপিয়ে দিয়ে তুমি তো খালাস—এদিকে আমার যে প্রাণান্ত। দলে দলে স্কুল-কলেজের ছোকরারা এসে আমাকে ছেঁকে ধরছে, বলছে, খুবই সমীচীন কথা বলেছেন আপনি, কিন্তু আমরা করি কি? কাজ দিন, কাজের নির্দেশ দিন, প্রোগ্রাম দিন আমাদের। গোড়ায় গোড়ায় সবাইকে বলেছি, সিরাজগঞ্জে যাও, বন্যাত্রাণ কর। বার বার ওই এক কথা বলতে নিজেরই লজ্জা করছে। অথচ তোমাদের গান্ধীজীর চোদ্দ দফার কথা বলতেও মন সরছে না। বাংলা দেশের মাছ-মাংস-খোর ছেলেদের ধাত জানি তো আমি। তবু যা হোক, শরৎ বোস ফিরে এসেছেন। তাঁকে দেখিয়ে দিয়ে কতকটা রেহাই পাচ্ছি; কিন্তু নিজের বিবেক ব'লেও তো একটা পদার্থ আছে! একটা কিছু বলা দরকার। তা ছাড়া মেয়েরাও আসতে আরম্ভ করেছেন। তোমার বউদিকে তো জান। ভারি জেলাস—গৃহবিবাদ ঘটবার উপক্রম হয়েছে। তাই ভাবছি—

পাড়ার তিনকড়ি প্রমুখ ছেলেদের দল দর্শন দিল। কি ব্যাপার! চাঁদার খাতা এবং পূর্ব্ববৎসরের সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ছাপা হিসাবের বহি (পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আমার নাম ছাপা হইয়াছে মলাটে) আমার নাকের সামনে ধরিয়া হাত পাতিল তিনকড়ি। আমি দলটিকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিবার জন্য ব্যাগ বাহির করিতেছিলাম, গোপালদা অত্যন্ত বিষণ্ণ ভারী'গলায় খুব ক্লান্তভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, থামো।

সকলেই তটস্থ হইয়া উঠিলাম। গোপালদা ততক্ষণে তাকিয়া ছাড়িয়া আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়াছেন। তাঁহার চোখে বহুদিনবিলুপ্ত সেই পুরাতন অস্বাভাবিক দীপ্তি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। দুলিতে দুলিতে যেন বহুদূরে অবস্থিত কোন্ স্বপ্নলোকের পরপার হইতে তিনি কথা বলিতে লাগিলেন। এই দৃষ্টি এবং বাচন-ভঙ্গীকে আমি বড় ভয় করি। কেমন একটা হিপ্‌নটিজমের আবেশ আসে। মনে হয়, যেন গোপালদা কোন্

অদৃশ্যলোকের প্রত্যাদেশে কথা কহিতেছেন, তাঁহার ইহলৌকিক সত্তাকে আবৃত করিয়া যেন আর একটা রহস্যময় সত্তার আবির্ভাব হয়। অকারণেই অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। কথক এবং শ্রোতার মাঝখানে যেন বহু যুগের এবং দেশের ব্যবধান সৃষ্ট হয়; বাস্তব পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে সে বড় অস্বস্তিকর অবাস্তব অবস্থা; প্রতিবাদ করিবার সাহস হয় না, না শুনিয়া উপায় নাই, শুনিলে স্থির থাকা কঠিন। গোপালদা বলিলেন, না না, চাঁদা দিও না। এই সার্বজনীন পূজার শতধা-বিচ্ছিন্ন উত্তেজনায় তোমাদের জাতির প্রাণে এই ঘোরতর অবসাদ এসেছে। সিনেমা আর ফুটবলের সঙ্গে এই সার্বজনীন সরস্বতী আর দুর্গাপূজোর নামে মাতামাতি ক'রে ছেলে-মেয়েরা ভাবছে, খুবই কাজ করছে; কিন্তু আসলে এতে হচ্ছে শক্তিক্ষয়, বেড়ে উঠছে বিভেদ, বাড়ছে ইতরামি। দেখ, আমি ধার্মিক নই, বর্তমান লৌকিক ধর্মে এতটুকু বিশ্বাস নেই আমার; কিন্তু আমি এটুকু জানি যে, মানুষের মন এমন ধাতুতে গড়া যে হাজার বছরের জড় ও বাস্তব বিজ্ঞানের শিক্ষার পরেও এই ধর্মের নামেই তার সব চাইতে বেশি উন্মাদনা। মিলন এবং বিচ্ছেদ, শান্তি এবং রক্তপাত এই ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে যত হয়েছে, এমন আর কিছুতে হয় নি। কোটি কোটি নিরীহ মানুষের প্রাণ বলি হয়ে গেছে এই ধর্মের যূপে, মনুষ্যেতর জীবের হিসেব রাখা তো অসম্ভব। মানুষ অঘটনও কি কম ঘটিয়েছে এই ধর্মের নামে! অসম্ভবকে সম্ভব করেছে বারম্বার। আজকের পৃথিবীতে সম্প্রদায় হিসেবে যারা জড়-শক্তিতে সবচাইতে শক্তিশালী, তারাও এক হয়েছে শুধু এই ধর্মের নামে, ন্যায়-অন্যায়, পাপপুণ্য, হিংসা-অহিংসা হত্যা-রক্ষা তারা অবাধে ক'রে চলেছে এই ধর্মের দোহাই দিয়ে। ছলে বলে কৌশলে, অভক্ষ্য খাইয়ে, বলাৎকার ক'রে, অন্য সম্প্রদায়কে আত্মস্থ ক'রে, নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধির জিদ এত শিক্ষা এত সংস্কার-মুক্তির পরেও আজ অটুট আছে ব'লে সমস্ত পৃথিবীতে অদম্য হয়ে উঠেছে এরা। তাদেরও পরে অর্থনৈতিক নতুন বুদ্ধকে আশ্রয় ক'রে এই পৃথিবী থেকে পাপ ও অত্যাচার দূর করবার জন্যে সেদিন যারা দলবদ্ধ হয়েছিল, তাদের দিকেও চেয়ে দেখ। এই জড়-প্রধান মতবাদকে ধর্মের মহিমা দিয়ে তবেই তারা পেরেছে অবাধ পার্জের সাহায্যে নিজেদের সংশয়মুক্ত রাখতে। আর তোমাদের দেশে এরা করছে কি? নাম—সার্বজনীন পূজা, অথচ পাড়ায় পাড়ায় বীভৎস প্রতিযোগিতা। ব্যক্তিগত বা পরিবারগত ভাবে লাখো পূজা হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই। নিজের আয় অনুযায়ী সাধ্যমত ধর্মপালন করার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু আহ্বান করছি সকলকে, চাঁদা নিচ্ছি সকলের কাছে, অথচ গ'ড়ে তুলছি এমন একটা জিনিস, যা নিয়ে মাথা-কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়, মুখ-দেখাদেখি নেই বিবেকানন্দ রোডের উত্তরে আর দক্ষিণে। এটা কেমনতর ব্যাপার বল দেখি! হিন্দু নাম আমাদের, তা কেউ অস্বীকার করতে পারব না। আগে কি ছিল জানি না, আজ ধর্মই

এই নামের ভিত্তি—আমরা কেন লাগাতে পারব না সেই ধর্মের অনুষ্ঠানকে আমাদের মিলনের কাজে ? সমগ্র দেশে মিলন শুধু একটি কারণে আবশ্যক। দেশের স্বাধীনতা। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ, যতদিন হিন্দুরা এক এবং শক্তিশালী না হচ্ছে ততদিন থাকবেই। এই এক হবার মহাসুযোগ আমরা বৎসরে বৎসরে দু-দুবার ক'রে হারাচ্ছি। মরছি চাঁদা দিয়ে, প্রতিমা গ'ড়ে, ঢাকঢোল পিটিয়ে, আলো জালিয়ে এবং মাঝ থেকে কেউ কেউ ছেলেমেয়ে হারিয়ে, ভাসানের দিন উদ্দাম বীভৎস নৃত্যের প্রতিযোগিতা ক'রে। রাস্তায় মেয়েদের কলেজ-হোষ্টেলের সামনে অথবা বারান্দায় মেয়েদের দেখে কি কাণ্ডটাই করে এরা, তা তো দেখেছি। লজ্জা হয়, ঘেন্না হয়। ম'রে যেতে ইচ্ছে করে। ঢের হয়েছে, সার্বজনীন পূজো আর নয়, চাঁদা দিও না তুমি।

গোপালদা থামিলেন। তাঁহার মুখ-চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। কপালে ঘাম দেখা দিয়াছিল। আমার মুখে কথা ফুটিল না, মনিব্যাগটি আস্তে আস্তে দেরাজে রাখিয়া দিলাম। আমার কাজ তিনকড়ির মনঃপূত হইল না। সে উত্তেজিতভাবে গোপালদাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, তা হ'লে আপনি বলতে চান, মায়ের পূজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে ?

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের গ্রামবাসীদের একজনের ভূমিকার মহড়া দিতেছিল তিনকড়ি। সেই সুর কানে আসিল। গোপালদা তাহাকে কোন জবাব দিলেন না। আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যদি দেখতাম, বছরে বছরে সার্বজনীন পূজোর সংখ্যা ক'মে আসছে, দশটা পাড়া মিলে দশটা প্রতিমার জায়গায় একটা প্রতিমার পূজো হচ্ছে, তা হ'লে খুশি হতাম। বুঝতাম, এই পথেই মিলন হচ্ছে আমাদের, শক্তি সঞ্চয় করছে আমাদের ভবিষ্যৎবংশীয়েরা। অন্য সব পথে বাধা আছে, এ পথে বাধাও পেত না তারা। দেখ, বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনলে না তোমরা। তাঁর বন্দেমাতরম্ আর 'আনন্দমঠ' নিয়ে হল্লাই শুধু করলে। সত্যি বটে, তিনি শুধু বাংলা দেশের কথা ভেবেছিলেন—ভারতবর্ষের কথা নয়। কিন্তু এ কথা আমি আজও বিশ্বাস করি যে, বাংলা দেশের সমস্যার সমাধান হ'লে ভারতবর্ষেরও সমস্যা ঘুচবে। বাংলা দেশই ভারতের প্লেগ-স্পট। বঙ্কিমচন্দ্রও নিশ্চয়ই সে কথা ভেবেছিলেন। দুর্গাপ্রতিমা আর দেশকে তিনি এক ক'রে কল্পনা করেছিলেন। দেশমাতৃকাকে তিনি ধর্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর সেই দর্শন, সেই দূরদৃষ্টি তোমাদের কাছে বিফল হয়ে গেল। ভেবে দেখ দেখি, বঙ্কিমচন্দ্রের এই রূপককে আশ্রয় ক'রে সমস্ত বাঙালী জাতি যদি ওই নির্দিষ্ট কটি দিনে দেশমাতার পূজো করত ! লাখো ভাবে লাখো মতলবে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যদি এক হয়ে ত্বং হি দুর্গা ব'লে দেশকে অনুভব করত বুকের মধ্যে !

গোপালদা আবার স্তব্ধ হইলেন। আমার চোখে তাঁহার কেমন রূপান্তর ঘটিতে লাগিল। মনে হইল, বন্দেমাতরম্-মন্ত্রের ঋষি স্বয়ং কথা কহিতেছেন, কোন্ বিস্মৃত যুগের গভীর অতলতা হইতে, কিন্তু বজ্রগম্ভীর স্বর, ভাষাও পরিবর্তিত।

● ● ●

শুনিলাম—

দেখ, আমি মনে মনে সেই দিনের প্রতীক্ষায় আছি, যে দিন পবিত্র ঈদ উপলক্ষে মুসলমানেরা যে ভাবে নামাজ পড়িবার জন্ত গড়ের মাঠে সমবেত হয়, কলিকাতার সমগ্র হিন্দু অধিবাসীও সেইরূপ সমগ্র গড়ের মাঠ আকীর্ণ করিয়া এক বিশাল বিরাট দুর্গাপ্রতিমার সম্মুখে সমবেত হইবে। সেই হইবে সার্বজনীন পূজা। চারিদিন ধরিয়া উৎসব চলিবে। আগমন এবং নির্গমনের সকল পথ ধরিয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী দেবীর সম্মুখে আত্মনিবেদন করিতে আসিবে। দেবী আর কেহ নহেন—দেশমাতৃকা। শরৎচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ, নলিনীরঞ্জন, বীরেন্দ্রনাথ, তুষারকান্তি, সুরেশচন্দ্র, সতীশ দাসগুপ্ত, মাখনলাল সেন, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ কলিকাতার সকল নেতা-উপনেতারা আসিয়া সহস্র মাইক্রোফোন-যোগে পূজামণ্ডপে মায়ের পায়ে আত্মনিবেদনের পন্থা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে নিবেদন করিতেছেন; বাগবাজার, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, কুমারটুলি, গৌরীবেড়ে, ভবানীপুর, কালীঘাট, উল্টাডিঙি, বেলেঘাটায় কোন দলাদলি নাই; ছাত্র ফেডারেশন মির্জাপুর ও ভবানী দত্ত লেন, ছাত্র সংসদ, ছাত্র কংগ্রেস—সকল পক্ষেরই ছাত্রছাত্রীরা ভলান্টিয়ারি করিয়া জনতার শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেছেন। সমবেত কণ্ঠের বন্দেমাতরম্-ধ্বনিতে কলিকাতার আকাশ বাতাস গমগম করিতেছে—একবার কল্পনা করিয়া দেখ, কি অপূর্ব সেই দৃশ্য! সমগ্র বাংলা দেশে প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য স্থানে এই একটিমাত্র করিয়া সার্বজনীন পূজা হইবে। ধনী-দরিদ্রে উচ্চ-নীচে বর্ণসম্প্রদায় ও অন্ত্যজে কোনও ভেদাভেদ থাকিবে না। নেতারা সম্মিলিত হইয়া পূর্বেই স্থির করিবেন—এক মন্ত্র এক ধ্যান সর্বত্র উচ্চারিত হইবে।

চারিদিনব্যাপী সর্বদল সর্বজাতি সম্মেলনের পর বিসর্জন। কলিকাতার কথাই কল্পনা করিয়া দেখ। সহস্র লোকের স্কন্ধে প্রতিমা। শরৎচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি নেতারা সার বাঁধিয়া আগে আগে চলিতেছেন, বন্দেমাতরম্ গান গাহিতে গাহিতে সকলে ধীরে ধীরে গঙ্গার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সাহিত্যিক, কেরানী, শিল্পী, মজুর, রাজরাণী, ভিখারিণী শ্রেণীবদ্ধভাবে মাইলের পর মাইল ব্যাপী শোভাযাত্রা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় দেশমাতার বন্দনাগান উচ্চারণ করিতে করিতে প্রতিমা-নিরঞ্জনে যাইতেছেন—প্রতিমা দেশমাতার মৃণ্ময়ী মূর্তি! কলিকাতা জুড়িয়া স্তোত্রগান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

এ মন্দির মানুষের দেহ। দোহাই তোমাদের, পাড়ায় পাড়ায় আর দলাদলি করিয়া দেশমাতাকে লাঞ্ছিত করিও না। সার্বজনীন পূজার নামে বুলবুলির লড়াইয়ের প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দাও। এক হও।

গোপালদা স্তব্ধ হইলেন। তাঁহার মূর্তি দেখিয়া তিনকড়ি আর সেখানে থাকিতে সাহসী হইল না, স্বদলবলে প্রস্থান করিল। ঘর খালি পাইয়া গৃহিণী চা লইয়া হাজির হইলেন। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, তাঁহার চোখেও জল।

নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি এক কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া কবির স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করিবেন :

(১) বিশ্বভারতীর আর্থিক সঙ্গতি পুষ্ট করিতে হইবে।

(২) জোড়াসাঁকোতে অবস্থিত কবির জন্ম-মৃত্যুর স্থান এবং পৈতৃক বাসভবনকে একটি সংস্কৃতি-অনুশীলনের কেন্দ্ররূপে পরিণত করিতে হইবে।

(৩) যে কোন জাতীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা অথবা মৌলিক গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পুরস্কার দিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য সকল সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণীয় : সম্পাদক নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। অথবা ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।

শারদীয়া

আবিল জলের স্রোত বাঁধ-ভাঙা প্রবল বর্ষায়,
বন্যাও বলিতে পার, ছুটেছিল প্লাবি দুই কূল—
পল্লীপ্রান্তে দু-চারিটি মেঠো ঘর মত্ত স্রোতোধারায়
হয়তো ভাঙিয়াছিল ; জলধারা করি পথ ভুল

মাঠে মাঠে প্রবেশিয়া ভাসায়েছে হয়তো ফসল,
স্রোতের প্রচণ্ড টানে স্থানচ্যুত বন্যা বালুরাশি
শস্য-সম্ভাবনাটুকু ক'রে গেছে হয়তো নিষ্ফল—
পথভ্রান্ত আত্মহারা যৌবনেরে তবু ভালবাসি।

পারাপার একাকার, কোথাও বা আবর্ত্ত পঙ্কিল,
শান্ত জনপদবধূ প্রগল্‌ভা নাগরী যেন নাচে—
নিশ্চিহ্ন রজতরেখা থইথই প্রবাহে সলিল—
সঙ্কোচ খসিয়া পড়ে দিশাহারা কামনার আঁচে।
বাড়ায়ে ব্যাকুল বাহু মেদিনীরে ধরিতে বাসনা,
পরিসরহীন বক্ষে উদ্বেলিত ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী—
সঙ্কুচিত শিবদেহে নৃত্য যেন করে শবাসনা;
দিগম্বরী কালীরূপা—যৌবনেরে আমি ভালবাসি।

সে বন্যা নামিয়া গেছে, তীরে তীরে শুভ্র কাশফুল,
আকাশ নির্মেঘ নীল, রৌদ্রকরে সোনার বরণ—
শিশিরার্দ্র ঘাসে ঘাসে শিউলি এ, কোথায় বকুল?
ছায়াপথে চেয়ে চেয়ে অকারণে ভিজে যায় মন।
শুধু স্মৃতি—বহু দূরে হানিয়াছি কামনা-পরশ,
বালুকায় হাহাকার কিম্বা পূর্ণ ফসলের হাসি—
শীর্ণা নদী ব'হে চলে এক পথে গতি নিরলস।
সাগর-সন্ধানী তবু যৌবনেরে আজো ভালবাসি।

বর্ষা আর আসিবে না, ফিরিবে না প্রদীপ্ত যৌবন,
শারদীয়া পূজা হবে সার্থক যে হৈমন্তী ফসলে—
প্রাচুর্য্যের বিহ্বলতা ভুলিতেছে নিঃস্ব রিক্ত মন,
ধারাস্নান-জলবিন্দু মুছে যায় শীতার্ত্ত আঁচলে।
বর্ষার করালী কালী শরতের দুর্গা হাস্যময়ী,
সংসারের চালচিত্রে সুকল্যাণী, নহে সর্ব্বনাশী।
সবার আশ্রিত আমি, আর আমি নহি সর্ব্বজয়ী,
প্রমত্ত ক্ষুধিত ক্রুদ্ধ যৌবনেরে তবু ভালবাসি।

সাড়ে আট লাখ

তুমি কি শুনেছ কবি, তোমার নামে
আমরা ফেলেছি তুলে সাড়ে আট লাখ ?
খবরটা র'টে গেছে ডাহিনে বামে
তোমার স্মরণে হ'ল সিসেম কি ফাঁক ?
এক নয়, দুই নয়, সাড়ে আট লাখ !
যা ছিল উজাড় ক'রে দিয়েছি সবি,
দ্বিতীয় তাজমহল গড়িব কবি,—
রবি-মঞ্জিল ; দেখি পাষাণ-ছবি
ভাবী বাংলার বুকে, তাহার কি জাঁক !
একগাছি টিকি যেন মোহন ঠামে
গজিয়ে উঠল ভেদি মসৃণ টাক—
পুরা চার বছরের সাড়ে আট লাখ।

আমরা পাগল থাকি কাব্যে তব
পঁচিশে বোশেখ আর বাইশে শ্রাবণ
মোদের কাঁদনে হয় পাষাণ দ্রব—
রজনীগন্ধা মরে সাড়ে সাত মণ—
পঁচিশে বোশেখ আর বাইশে শ্রাবণ।
ঘিরিয়া ঘিরিয়া শুধু ও দুটি দিবস
লক্ষ সভায় মোরা হই যে বিবশ
সামান্য কেরানী কি, কি তাহার boss
'চয়নিকা' খুলে পড়ে, "হে মোর মরণ"।
কি তার গমক ঠাট—কি আর কব,
এরেই আমরা বলি শ্রীরবি-স্মরণ !
—পঁচিশে বোশেখ আর বাইশে শ্রাবণ।

সারা ভারতের বুকে চমক হানি
তোমার স্মরণে ট্যাঁক করিয়া খালি
মুক্ত করিয়া কোটি বুক্তপাণি
গড়েছি এ ভাণ্ডার জাত বাঙালী—
তোমারে স্মরিয়া ট্যাঁক করিয়া খালি।

করিব তোমার স্মৃতি চিরস্থায়ী—
"স্তন্যপায়ী" মোরা "অন্নপায়ী"
সহায় যদি বা হন দুর্গামাঈ
পারিব স্মৃতিতে তব মাখাতে কালি
তুমি জানো, মোরা আর কিছু না জানি
বাড়া ভাতে জানি দিতে আগুন জ্বালি
প্রয়োজন হ'লে ট্যাঁক করিয়া খালি।

নাই যদি পারিলাম তোমারে নিয়ে
পরস্পরের গায়ে ছুঁড়িতে ঢেলা
আবেদন নিবেদন রোদন দিয়ে
মিথ্যাই ফেঁদেছি এ স্মৃতির খেলা
না যদি ছুঁড়িতে পারি কাদার ঢেলা—
এই সাড়ে আট লাখ হোক'অক্ষয়
তুমি তো মহান নিজে, তোমার কি ভয়?
সাড়ে আট লাখে কবি লাখো মজা হয়,
কিছু কি হবে না হায়, তোমার বেলা?
অনুযোগে তুমিই তো বলিবে গিয়ে,
মোরে তোমাদের কেন এ অবহেলা—
হয়েছে কি নিঃশেষ কাদার ঢেলা?

অমল হোম

দিন আর রাত্রি

দিনের জাগরণে
তোমার কল্যাণমন্ত্র জপ ক'র মনে মনে।
জপ করি তোমার নাম,
জ'পে জ'পে অবশ হতে চাই।

মীনকেতনের তোরণ পেরিয়ে
অর্ধনারীশ্বরের মন্দিরে আমাদের সাধনা:
প্রিয়নামের প্রেমমন্ত্র সে সাধনার জপমালা।

জীবনারণ্যের শাখায় শাখায়
মৃত্যুর মত্ত ঝড়।
কুলায়ে কুলায়ে প্রলয়ের রুদ্রপিনাক।

আমার পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়েছি তোমাকে:
নির্বিঘ্নিত হোক তোমার নির্ভরতা,
নিরঙ্কুশ হোক তোমার আত্ম-নিবেদন।

তুমি আর আমি
আমি আর তুমি—
দুটি মানুষের নিভৃত বিজন পৃথিবী।
বাঁধন প'রে বাঁধন খোলার সাধনা আমাদের,
চিরমুক্তির পণে চিরকালের রাখীবন্ধন।
তাই তো আমার কণ্ঠে তোমার মুক্তির গান,
তাই তো তোমার নভোবিহারের জয়ধ্বনি।

ওগো স্বেচ্ছাবন্দিনী মনোরমা,
আমার অনুরাগের ইন্দ্রধনুতে
রঞ্জিত হোক তোমার বিহঙ্গ-তনু।
তার পরে রইল তোমার নীল আকাশ
আর তোমার পাখায় আলোকের বিদ্যুৎগতি,
আর তোমার কণ্ঠে আকাশের অশ্রুত সংগীত।
আমার ধ্যানগম্ভীর দিনগুলি
তোমার আত্মোপলব্ধির প্রতিশ্রুতিতে
চিরজাগ্রত।

ধীরে ধীরে দিনের আলো যায় মিলিয়ে।
মিলনের দৌত্য নিয়ে আসে গোধূলি ;
আসে রাত্রি।

রাত্রি ক্রমে গভীর হতে থাকে।
দিনের চেতনা মূর্ছিত হয় নিশীথিনীর বুকে।
তোমার আলুলায়িত কুন্তলের কৃষ্ণ
আবেশ নিয়ে
নিষ্প্রদীপ ঘরে আসে মিলনশিহরিত রাত্রি,
তোমার কেশপাশের সুরভিতে
আমোদিত হয়ে ওঠে ঘুমের দেশ।
প্রসাধনের স্নিগ্ধ গন্ধে
নিশ্বাসের বাতাস হয় মাতাল।

আঙুলে আঙুলে দেহমিলনের প্রথম সলজ্জ
কানাকানি।
ওষ্ঠাধরে কি সত্যই সুধা আছে ?
বুকের যুগল-শিখরে
পুষ্পধনুর নিক্ষিপ্ত বাণশীর্ষের বিদ্যুৎ ?

চীর-চন্দন আর চন্দ্রহারের ব্যবধান
নদীগিরির অন্তরালের মতই দুর্বিষহ।
আবরণ আর আভরণ দিই খুলে।
সুনিবিড় অষ্টাঙ্গ-আলিঙ্গনে গ্রহণ করি
নগ্নশুচি দেহকান্তিকে :
রতির হাতে গাঁথা
সুরভিত একগাছি কুন্দমালতীর মালা।
সৃষ্টির প্রথম মানুষ
আর প্রথম মানুষীর লজ্জালেশহীন মিলন
ভেসে আসে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের
পরমাণুপ্রবাহে।

মিলন নয়,
মিশ্রণ ;
দুটি দেহ নয়
দুটি অংশ,
এক হয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে
অখণ্ড সত্তায়।

তুমি আর আমি
তলিয়ে যাই নিঃশেষে,
ভেসে ওঠে একটি অনুভব :
সৃষ্টির অনাদি লগ্নলীন
আনন্দিত বিধাতার হ্লাদিনী-পুলক।

আমার দিন আর আমার রাত্রি,
আমার জাগরণ আর আমার স্বপ্ন—
জানি না কে আমার বেশি আপনার !

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫২

গঠনকর্মের মূল উদ্দেশ্য কি

উৎসাহের জোয়ার-ভাটা

গড়ার কাজে উৎসাহ চাই—এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু আলস্য যেন আমাদের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়া আছে। আমাদের বাল্যকালে সংসারে খাওয়া-দাওয়ার যে সচ্ছলতা ছিল, আজ আর তাহা নাই। আজ অনেকের ঘরে টাকার সচ্ছলতা হইয়াছে বটে, কিন্তু খাওয়া-পরার জিনিসের সাচ্ছল্য ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর হইতেই যেন ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। টাকার দাম কম বেশি হওয়ার ফলে কখনও মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী কষ্ট পায়, কখনও বা চাষীদের কষ্ট হয়; কিন্তু মোটের উপর দেশের মধ্যে দারিদ্র্যের মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৩৯ সাল হইতে সমগ্র পৃথিবীর উপরে যে ভয়াবহ দুর্দিনের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার ফলে শুধু যে যুদ্ধের চোটেই মানুষ মারা গিয়াছে তাহা নয়, অনাহারে এবং রোগভোগ করিয়াও লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে। কতদিনে যে এই অবস্থার অবসান হইবে, সে কথা কেহই আজ ভরসা করিয়া বলিতে পারে না।

১৯২০ সালে যখন প্রথম ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, তখনই গান্ধী মহারাজ ব্যাপকভাবে চরকা-চালানোর কথা বলিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, দেশের লোক অন্তত বস্ত্রের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইয়া উঠুক। বিলাতী বর্জনের দ্বারা ইংরেজ জাতিকে জব্দ করার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, মানুষে যেমন নিজের নিজের বাড়িতে ভাত রাঁধিয়া খায়, তেমনই ভাবে যদি সুতা কাটিয়া গ্রামের তাঁতিকে দিয়া বুনাইয়া নিজের কাপড়ের বন্দোবস্তটুকু করিয়া লয়, তাহা হইলে বৎসর বৎসর বিদেশে আমরা কাপড় খরিদ করিবার জন্য যে ৬০ কোটি টাকা পাঠাই, তাহা দেশের মধ্যে থাকিয়া যাইবে এবং জনসাধারণ কাজের অভাবে দারিদ্র্য ভোগ না করিয়া খানিকটা লাভবান হইবে। তিনি আরও মনে করিয়াছিলেন, যদি ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামে চরকা স্থায়ী আসন লাভ করে, তাহা হইলে মানুষের উৎসাহ বাড়িবে এবং ক্রমে ক্রমে তাহারা কাপড় ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য যাবতীয় জিনিসপত্র গ্রামের মধ্যে অথবা কাছাকাছি গড়িয়া লইবার বন্দোবস্ত করিবে। ফলে সকলের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি ঘটিবে এবং স্বাবলম্বনের শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু গান্ধীজী ঠিক যেমনটি চাহিয়াছিলেন, তেমনটি ঘটে নাই। প্রতিবার আন্দোলনের সময়ে কিছুদিনের জন্য জনসাধারণের মনে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়।

যে সকল কর্মী রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন, তাঁহাদিগকে নানাবিধ নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। অবশিষ্ট সকলে সহানুভূতি দেখাইবার জন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া কেহ চরকা ধরেন, কেহ সিগারেটের পরিবর্তে বিড়ির অভ্যাস করেন, দেশে বিদেশী জিনিসের বিক্রয় কমিয়া যায়, সকলের মধ্যে বিলাসিতাবর্জনের একটি শুভ আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসে, তখন আবার পুরানো অভ্যাসগুলি একে একে ফিরিয়া আসে, মানুষ সস্তার কাপড় খোঁজে, নিজে ব্যবস্থা করিয়া সুতা কাটিয়া কাপড় করার কথা ভুলিয়া যায়। কর্মীরা চেষ্টা করিলেও তখন চরকা সম্বন্ধে উৎসাহ জাগাইতে পারেন না। কেবল যাহারা নিতান্ত গরিব, তাহাদের মধ্যে দিনে দুই-এক আনা রোজগারের আশায় চরকা টিকিয়া থাকে। কিন্তু সেই গরিবেরা পয়সার জন্তই সুতা কাটে, নিজেদের পরনের জন্ত নয়। সেই কাপড়ও শহর-বাজারেই বিক্রয় হয়। যাঁহাদের মনে স্বদেশী ব্রতে নিষ্ঠা অবিচল থাকে, তাঁহারা বেশি দাম দিয়াও খদ্দর কেনেন, ফলে কয়েকজন গরিব দিনান্তে দুইমুঠা অন্নের আস্বাদ পায়। কিন্তু গান্ধীজী ঠিক এমন ধারা খদ্দর বা এরূপ গঠনকর্ম চান নাই। তিনি কি চান, সেই কথাটি বুঝাইবার জন্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি ইতিহাস দিয়া আরম্ভ করিব।

খাদি-সংঘের ইতিহাস

১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুর শহরে খাদি-সংঘ নামে একটি ক্ষুদ্র দোকান খোলা হয়। প্রথমে এখানে কলিকাতা হইতে আনা কিছু চরকা এবং খাদি বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই অবস্থাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে খাদি-সংঘের সহিত যুক্ত হই। অল্পদিনের মধ্যে খাদি-সংঘের কর্মীরা খাদি উৎপাদনের সংকল্প গ্রহণ করিলেন। দেশে তখন বিরাট সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিতেছে, অর্থের অভাব হইল না। অল্প চেষ্টায় শহরে সাত শত টাকার চাঁদা উঠিল এবং সেই টাকার সাহায্যে বোলপুরেই চরকা এবং টাকু তৈয়ারি, সুতা কাটা, বোনা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইল। এক তুলার গাঁট খরিদ করা ছাড়া বাহিরের উপর আর নির্ভর করিতে হয় নাই।

আন্দোলনের প্রথম ঝোঁক কাটিয়া যাওয়ার পর খাদি সম্বন্ধে একে একে নানাবিধ প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—খাদি পড়তায় পোষায় কি না, এই সময়ে আরও লাভজনক কাজ করিলে দোষ কি, ইত্যাদি। সংঘের কর্মীরা সকলকে বুঝাইতেন, অধিক লাভের কাজ পাওয়া গেলে সেই কাজ করাই ভাল। কিন্তু না পাইলে অবসর সময়টুকু অপচয় না করিয়া যদি সামান্ত শারীরিক পরিশ্রমে পরনের কাপড়খানা পাওয়া যায়, সেটা কি

কম লাভের কথা? যাঁহারা চরকা ছাড়েন নাই, তাঁহারা ইহা স্বীকার করিবেন এবং কয়েকজন উৎসাহী দোকানী দোকানে বসিয়াই দ্বিতীয় বৎসর দুর্গাপূজার পূর্বে তিনবার মাসের মধ্যে ৩ খানা হইতে ছোট বড় ১৩ খানা পর্যন্ত কাপড়ের মত সুতা কাটিয়া লইয়াছিলেন। ফলে বোলপুর শহরে গৃহস্থদের অন্তত এটুকু ধারণা হইয়াছিল যে, নিজেদের পরনের কাপড়ের মত সুতা যে কোন গৃহস্থ অনায়াসে কাটিয়া লইতে পারে। কেবল চেষ্টা থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, খাদি বিক্রয় করিবার জন্য কোন বাজার খুঁজিতে হয় না, সর্বত্র ইহা বিক্রয় করা সম্ভব। বিক্রয় না হইলেও অন্তত নিজে ব্যবহার করা চলে।

খাদি-সংঘের পক্ষ হইতে কয়েকটি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা হইত। যতগুলি চরকা চলিত, কর্মীরা প্রতিদিন নিজের নিজের এলাকায় ঘুরিয়া সেগুলিকে চালু রাখিতেন। মালদড়ি ঠিক রাখা, টাকুর টাল ভাঙিয়া দেওয়া, সুতা গোটানোর সম্বন্ধে সাবধানতার বিষয়ে সব সময়েই তাঁহারা দৃষ্টি রাখিতেন। সুতা বোনানোরও সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ফলে খাদি-সংঘের কাজ বেশ ভালভাবেই চলিতে লাগিল।

দুই বৎসর চলার পর দেশে আবার ধরপাকড় শুরু হইল। তখন কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন কারারুদ্ধ হইলেন এবং খাদির কাজও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। জেলে থাকাকালীন আমার মনে গান্ধীজীর খাদি সম্বন্ধে উপদেশগুলি বিশেষভাবে আলোড়নের সৃষ্টি করে। কোনও গ্রামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা অনেকের পক্ষে খুব কষ্টকর হয়। হয়তো প্রথমে সর্বত্র বাহিরের অর্থবল অথবা বুদ্ধিবলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কাজকে চালু রাখার জন্য স্থানীয় লোকেরা যদি সর্বদা বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকে তাহা হইলে তো চলে না। নিজের কাজকে সত্যসত্যই নিজের করিয়া চালাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে মুক্তি পাইবার পর যখন বোলপুরে ফিরিয়া গেলাম, তখন প্রথম হইতেই চেষ্টা হইল, নিজে বিশেষ কিছু না করিয়া স্থানীয় কর্মীদের চেষ্টাকেই জাগ্রত করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোথাও না কোথাও গলদ থাকার ফলে মনের মত সাফল্য লাভ করিতে পারিলাম না। আমি উপস্থিত থাকিলে কর্মীদের মধ্যে যে কর্মতৎপরতা দেখা যাইত, অপর সময়ে তাহা টিকিত না। ফলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হইতে লাগিল, কাজও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। হয়তো বাহিরের লোকবলের দ্বারা কাজটিকে পূর্বের মত বজায় রাখা চলিত, কিন্তু সে তো রোগ সারিবার লক্ষণ নয়, ঔষধের জোরে রোগীকে জীয়াইয়া রাখিবার মত ব্যবস্থা।

ঠিক কোন্ উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে আলস্য ও পরনির্ভরশীলতাকে স্থায়ীভাবে দূর করা যায় জানি না, কিন্তু এ কথা বুঝি যে, এই তমোভাবকে দূর করিতে না পারিলে মানুষের চরিত্রের বর্তমান অবস্থার উপর কোনও স্থায়ী কল্যাণের সৌধ রচনা করা আদৌ সম্ভব নয়।

গঠনকর্মের মূল উদ্দেশ্য

গান্ধীজীকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল, মানুষের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে, তমোভাব দূর করিবার জন্য রাজসিক শক্তির আশ্রয় লওয়া চলে কি না? মানুষ কি একেবারে সাত্ত্বিক হইতে পারিবে? খাদি এবং কুটিরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলে গাঁয়ের লোকের খানিক আর্থিক উন্নতি সম্ভব। যদি তাহারা এই কাজকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে এবং নিজে চালাইতে থাকে, তাহা হইলে গ্রামের কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে যেরূপ দৃঢ় নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহার উপযুক্ত উৎসাহ তো দুর্লভ। তাই খাদির কাজের পরিবর্তে আমরা যদি মানুষকে খণ্ড খণ্ড সংগ্রামে উৎসাহিত করি এবং সেই সুযোগে উত্তরোত্তর সংঘবদ্ধ করিয়া তুলি, তাহাতে দোষ কি? জমিদার মহাজন অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রজার নিকট হইতে যে মুনাফা আদায় করেন, প্রজা তাহার তুলনায় যৎসামান্য লাভবান হয়। এগুলির হার কমানোর চেষ্টায় মানুষকে সহজে সংঘবদ্ধ করা যায় এবং উৎসাহের সঙ্গে তাহারা সংগ্রামও করিতে পারে। খাদি উৎপাদন বা কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠানে আর্থিক লাভ আছে বটে, কিন্তু অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষের যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়, খাদির কাজে তাহা তো সম্ভব নয়। অতএব গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হইল, খাদির মারফত আত্মশক্তি জাগানো অপেক্ষা খণ্ড-যুদ্ধের সাহায্যে সেই চেষ্টা করা কি ভাল নয়?

উত্তরে গান্ধীজী যাহা বলেন, সেটি আমাদের সকলের প্রণিধানের যোগ্য। তাঁহার কথা হইল, অহিংস বিপ্লবের জন্য যে জাতীয় শক্তির প্রয়োজন, গঠনকর্মের বিবিধ কাজের ভিতর দিয়াই তাহা আমরা সম্যক্‌ভাবে সৃষ্টি করিতে পারি। খণ্ডযুদ্ধে মানুষের উৎসাহ আশু দেখা দেয় সত্য, কিন্তু এরূপ উৎসাহের উপরে আমরা অত্যধিক নির্ভর করিতে পারি না। সচরাচর মানুষের অত্যাচার নিরোধের চেষ্টা দমকা আসে, দমকা যায়। সেইজন্য তাহারা অপরের উপর রাষ্ট্রচালনার ভার দিয়া রাখে। সাধারণ মানুষের অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইলে শেষে অতিষ্ঠ হইয়া বিপ্লব বাধায়। আবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে না ঘটিতে ঝিমাইয়া পড়ে। এই মনোভাব যতদিন থাকিবে, ততদিন প্রকৃত স্ব-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। স্বরাজের সৌধ শুধু অবিচল জাগ্রত মনোভাবের উপরেই গড়িয়া তোলা সম্ভব।

গ্রামকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টায়, যাবতীয় সামাজিক বৈষম্য ও দুর্নীতিকে আইনের পরিবর্তে জনশিক্ষার দ্বারা স্থায়ীভাবে দূরীভূত করার চেষ্টায় আমরা সেই স্বাবলম্বী মনোবৃত্তির সৃষ্টি করি। স্বাবলম্বী স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক-ভেদবৈষম্যবিহীন গ্রামগুলি আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজের অঙ্কুর। বর্তমান অত্যাচার নিবারণের জন্য গ্রামের মানুষকে

দলবদ্ধ কারবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া আমরা খাদির কথা বলি না। খাদির লক্ষ্য তদপেক্ষা মহৎ। পনেরো দফা গঠনকর্মের দ্বারা আমরা যে সমাজের আদর্শ গড়িতে চাই, সেখানে সকলে আলস্য পরিহার করিব, বুদ্ধি বিক্রয় করিয়া কেহ রোজগার করিবে না, সকলেই কায়িক শ্রমের দায়িত্ব স্বীকার করিবে, ধনী নির্ধন কেহ থাকিবে না। সকলে স্ব স্ব ক্ষমতাকে সর্বজনের কল্যাণের নিমিত্ত সাধ্যমত প্রয়োগ করিবে। তখন সকলের অধিকার সমান হইবে, অর্থাৎ অপরের কোন ক্ষতিসাধন না করিয়া সকলে স্বীয় অন্তরের বৃত্তিগুলিকে বিকশিত করিবার মত সুযোগ লাভ করিবে।

গান্ধীজী আরও বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যদি আমরা নানাবিধ খণ্ড-সংগ্রামে লিপ্ত হই, তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষময় জনসাধারণের মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইবে। আমাদের গঠনকর্মচেষ্টার মধ্যে একটি লক্ষ্য স্থির থাকা প্রয়োজন, আমরা ভবিষ্যতের যে সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাই, তাহার প্রতি দৃষ্টি যেন অচঞ্চল থাকে, আমাদের সকল কর্ম যেন তাহারই অনুকূল হয়। গড়ার কাজ যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে, তবে তাহার বিরোধী শক্তিগুলি আমাদের উদাসীনতা এবং এবং সহযোগের অভাবে আপনাই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। পৃথকভাবে বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রামের হয়তো প্রয়োজনই হইবে না।

অতএব ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজ সংগঠন করিতেছি, তাহার ভিত্তিস্বরূপ মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধনে সহায়তা করিতেছি, এই বুদ্ধি লইয়া কর্মীগণকে অগ্রসর হইতে হইবে।

কর্মীদের প্রতি নির্দেশ

গঠনকর্মের এই উদ্দেশ্যকে স্বীকার করিলে কর্মীদের দায়িত্ব অতিশয় বৃদ্ধি পায়। যেখানে কোনও কর্মী সংগঠনের চেষ্টা করেন, সেখানে তাঁহাকে প্রথমে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয় সত্য। এরূপ চেষ্টার ফলে সচরাচর তাঁহার কতকগুলি ঐশ্বর্যলাভ হয়; লোকে তাঁহার কথা মানে, তাঁহার যশঃপ্রাপ্তি হয়, হয়তো বা গুরুতর দায়িত্ব অর্পণ করিয়া লোকে তাঁহার সম্মান করে। কিন্তু যদি এই বিভূতির দ্বারা তিনি আবদ্ধ হন, তবে মূল বস্তু হইতে তাঁহার দৃষ্টি সরিয়া যায়, মানুষের আত্মশক্তিকে জাগানোর চেষ্টাও ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসে। পরমহংসদেব যোগসাধনের সম্বন্ধে বলিতেন, যোগী কিছুকাল সাধনার পর অণিমা লঘিমা প্রভৃতি যাবতীয় সিদ্ধির অধিকার লাভ করেন। কিন্তু যদি এই ঐশ্বর্যের লোভ নষ্ট করিয়া আরও অগ্রসর হইবার মত সাহস তাঁহার না থাকে, তবে যোগীর পক্ষে পতন অনিবার্য।

দেশসেবার সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে। ইহাও তো একপ্রকার সাধনা। আমরা

শুধু নিজের সিদ্ধি চাই না, জগতের সর্বজন দুঃখের সাগর অতিক্রম করিতে সমর্থ হউক, ইহাই আমাদের চরম লক্ষ্য। কিন্তু সে পথে পরের উপর নির্ভর করিয়া চলে না। স্ব-রাজের উপযোগী আত্মশক্তির বিকাশ সাধন করিতে গিয়া যদি আমরা ঐশ্বর্যের মধ্যে নিজে আবদ্ধ হই, তবে জনগণের আত্মশক্তি জাগিবে কেমন করিয়া? যে প্রতিষ্ঠান আমাদের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে, অবশেষে লোকে যেন আমাদিগকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া আমাদের ভুলিয়া গিয়া নিজেরা নিজের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে চালাইতে পারে। তবেই আমাদের কাজ পরিপূর্ণ হইবে। আমরা স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তিসামর্থ্য দিয়া গঠনকর্মে সহায়তা করিব সত্য, কিন্তু শেষে যেন আমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাই। বাড়ি তৈয়ারির সময়ে ভারা বাঁধিতে হয়, কিন্তু তৈয়ারি শেষ হইলে ভারার চিহ্নমাত্র থাকে না।

জলের নিজের কোনও আস্বাদ নাই, কিন্তু তাহাতে যখন মিছরির সংযোগ করা যায়, তখন জল সুমিষ্ট হয়। যতক্ষণ মিছরির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, জল হইতে তাহাকে আলাদা করিয়া দেখা যায়, ততক্ষণ সে জলে গলে নাই। আমরাও গঠনকর্মের মধ্যে যদি জনসাধারণ হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলি, বাহিরের টাকার উপরে, বাহিরের বাজারের উপরে, বাহিরের লোকবলের উপরে নির্ভর করি, অথবা জনগণের মধ্যে থাকিয়াও পদগৌরব লাভের দ্বারা তাহাদের ঊর্ধ্বে আসন রচনা করি, তাহা হইলে মিছরির দানার মত আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকিবে। জনসাধারণের জীবনকে আমরা গলিয়া গিয়া সমৃদ্ধ করিতে পারিব না। একটি বাউল গানে আছে—

> প্রেমে জল হয়ে যাও গ'লে।
> কঠিনে মেশে না সে।
> মেশে সে তরল হ'লে।

ইহাই যেন আমাদের গঠনকর্মের মূলমন্ত্র হয়, তবেই হয়তো জগতের দরিদ্র বঞ্চিত মানুষ কোনদিন সত্যসত্যই মুক্তির আস্বাদলাভে সমর্থ হইবে।

একটি প্রশ্ন

পাঠক হয়তো বলিবেন, আচ্ছা, কি উদ্দেশ্য লইয়া গঠনকর্মে অগ্রসর হইব, তা না হয় বুঝিলাম। কিন্তু আমরা যাহা চাই, তাহা কি সব সময়ে পাওয়া যায়? নানারকম বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার কোনটি ভিতরের, কোনটি বা বাহিরের। একে একে এগু'লর মীমাংসা হওয়া দরকার। আজ প্রথমে একটি প্রশ্ন করি।

সে প্রশ্ন হইল এই যে, ১৩৫০ সালে বাংলা দেশে যখন মন্বন্তর চলিয়াছিল, মানুষ যখন ৩০।৪০ টাকা দিয়াও এক মণ চাল কিনিতে পারে নাই, বাজারে যখন একখানিও পরনের কাপড় ছিল না, তখন সরকার দিকে মন দেওয়া হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু আবার

যখন জিনিসপত্র সস্তা হইবে, তখন কি মানুষে চরকার পাট তুলিয়া দিবে না? আমরা যদি বা জিদের বশে তখনও চরকার দ্বারা বস্ত্রের সংস্থান করি, চাষের সাহায্যে খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া লই, অন্যান্য দেশে কত অল্প পরিশ্রমে কলকব্জার সাহায্যে মানুষ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা তখন কি বিচলিত হইব না? সে অবস্থায় চরকার প্রতি আমাদের অনুরাগ কখনও টিকিতে পারে?

ইহার উত্তরে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, গান্ধীজী যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সংগঠনের কথা বলেন, তাহার অর্থ এ নয় যে, মানুষ বহির্জগতের দিকে ফিরিয়া তাকাইবে না, কেবল কলুর বলদের মত চোখে ঠুলি বাঁধিয়া মোটাভাত-কাপড়ের ঘানির চারিদিকে চিরকাল অন্ধের মত ঘুরিয়া মরিবে। আজ জগতে নানাবিধ কলকারখানা চলিতেছে, জিনিসপত্র গড়িতে আগের যুগ অপেক্ষা মানুষ অল্প পরিশ্রম করে, ইহা সবই সত্য। কিন্তু কলকারখানার মারফত একটি অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। আগে মানুষের খাওয়া-পরা ব্যাপারটি অনেকাংশে তাহার আয়ত্তের অধীন ছিল। কেহ প্রজার উপর অত্যাচার করিলেও দেশসুদ্ধ লোককে অন্নবস্ত্রের অভাবে মরণের দুয়ার পর্যন্ত ঠেলিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না। কিন্তু যন্ত্রযুগের ব্যবস্থাই এমন যে, দেশের সমস্ত লোকের খাওয়া এবং পরার, এক কথায় বাঁচিয়া থাকার, কলকাঠি শহর-বাজারের বাসিন্দা জনকয়েক শক্তিশালী মানুষের হাতে সমর্পিত হইয়াছে। যাহারা ধনবলে বা বুদ্ধিবলে বলীয়ান, যাহাদের নিকট অস্ত্রবল থাকায় সমগ্র শাসনভারও করায়ত্ত হইয়াছে, তাহাদের হাতে এখন দেশের জীবনকাঠি মরণকাঠি দুই-ই ন্যস্ত রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে, সৎলোক হইলে, তাহারা অপরকে যন্ত্রযুগের সুবিধার কিয়ৎপরিমাণ প্রসাদ দিতে পারে। কিন্তু নিজেরা বিপন্ন বোধ করিলে প্রয়োজনমত সমস্ত দেশের মানুষকে কলের পুতুলের মত কখনও উঠায়, কখনও বসায়, কখনও যুদ্ধ করায়, এবং যখন যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ কথা বলাইতেও পারে।

এ অবস্থা যে শুধু ভারতবর্ষ, চীন বা আফ্রিকার অধিবাসীদেরই তাহা নহে। ইংলণ্ড-আমেরিকার মত ধনী দেশেও গরিবের অধিকার একই রকম। নামেই তাহাদের ভোট আছে, পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে, কিন্তু নিজের জীবনের উপরে, খাওয়া-পরার উপরে অধিকার আমাদের দেশেও জনসাধারণের নাই, ইংলণ্ড-আমেরিকাতেও নাই।

যদি এই অবস্থা হইতে বাঁচার জন্য আমাদিগকে আপাতত মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থাটুকু নিজের চেষ্টার দ্বারা গড়িয়া তুলিতে হয় এবং যদি সেই ব্যবস্থা সত্যই আমাদের আয়ত্তের অধীন থাকে, তাহা হইলে কি কম কথা? পরাধীন অবস্থায় কোনও দিন সুখে কোনও দিন দুঃখে কাটে। কিন্তু শক্তিশালীর প্রসাদভিক্ষু হওয়ার চেয়ে স্বাধীনভাবে, কিছু বেশি পরিশ্রম করিয়া বাঁচিয়া থাকাও কি ভাল নয়? স্বাধীনতা কি অমূল্য সম্পদ

উত্তরে পাঠক হয়তো বলিবেন, তাহার প্রয়োজন কি? ধনোৎপাদনের যাবতীয় সরঞ্জাম জনকয়েক মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া আছে বলিয়াই আজ এত দুঃখ, এত দুর্দশা। সেই সরঞ্জামগুলি যদি সর্বজনের অধিকারে আসে, পঞ্চায়তের অধীনে মাহিনা-করা কর্মচারীর দ্বারা পরিচালন করা হয়, তাহা হইলে আমরা যন্ত্রযুগের সুখভোগ করিতে পারিব, অথচ বর্তমানের অসুবিধাগুলি ভোগ করিতে হইবে না।

গান্ধীজী ইহার উত্তরে বলিবেন: ঠিক কথা। আমিও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুকে সর্বসাধারণের সম্পত্তি করিতে চাই। কিন্তু সেগুলিকে ব্যক্তির অধিকারমুক্ত করিয়া সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করার পথ, আমার পক্ষে স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রের শক্তির সাহায্যে এই বিপ্লবসাধন করার চেয়ে জনসাধারণের অহিংস-অসহযোগের দ্বারা আনীত বিপ্লবের মারফত আমি এই পরিবর্তন ঘটাইতে চাই। ধনোৎপাদনের উপাদানও অবশেষে রাষ্ট্রের অধিকারে থাকার চেয়ে আমি পঞ্চায়েতের অধিকারে রাখার পক্ষপাতী।

রাষ্ট্র এবং পঞ্চায়েতের মূলে যে প্রভেদ আমি দেখিতে পাই, তাহা বলিতেছি। পঞ্চায়েতের হাতে মানুষ শুভবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া ক্ষমতা সঁপিয়া দেয়, শাসন করার অস্ত্র তাহার যৎসামান্য থাকে, মানুষকে রাজি করাইয়াই পঞ্চায়েত বেশির ভাগ কাজ আদায় করে। কিন্তু রাষ্ট্রের পীড়নের ক্ষমতা অসীম। যাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তাঁহারা নিপীড়ন করিয়া বা শাসনের ভয় দেখাইয়াই কাজ হাসিল করিয়া লন। এই নিপীড়নেই আমার বিশেষ আপত্তি। মানুষকে বাঁচিতে হইলে সমাজ গড়িতে হয়, প্রতিষ্ঠান গড়িতে হয়। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠান এমন হওয়া প্রয়োজন, যাহা নিপীড়নের উপরে নির্ভর করে না। তেমন প্রতিষ্ঠানের হাতে ধনোৎপাদনের ব্যবস্থাকে সঁপিয়া দিলে তো ভালই হয়। মানুষের খাওয়া-পরার সরঞ্জামের উপর কোন ব্যক্তির মালিকানা স্বত্ব থাকা উচিত নয়, প্রকৃতির জলবায়ুতে যেমন সকলের সমান অধিকার থাকা উচিত, এ বিষয়েও তেমনই।

পঞ্চায়েতের হাতে যদি মালিকানা স্বত্ব তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই সব সমস্যা মিটিয়া যাইবে, ইহা কেহ বলে না। এইজন্য আমি চাই, জনসাধারণ যেন সকল অবস্থাতেই কেন্দ্রীয় কর্মচারীগণকে শাসনে সংযমে রাখিতে পারে। স্বাধীনতার মূল অর্থ আমি ইহাই বুঝিয়াছি যে, সেখানে মানুষ সমাজের কাজ নির্বাচিত প্রতিনিধির সাহায্যে চালায় বটে, কিন্তু ক্ষমতার অপপ্রয়োগকে সংযত করার শক্তি সর্বদা নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখে। যদি মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা মানুষ কোন সময়েই পরের হাতে তুলিয়া না দেয়, তা হইলে এইটি সম্ভব হয়। তাহার পর সুখস্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির জন্য কলকব্জা যতটুকু সত্যসত্যই প্রয়োজন, তাহা কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতের অধীনেও দিতে আপত্তি নাই। জগতের

কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যদি কেন্দ্রগত কোন ব্যবস্থা করেন, তাহাতেও আপত্তি নাই। বস্তুত জগতের চিন্তাশীল লোকমাত্রেই ভবিষ্যতের জন্য এমনই এক আদর্শের বিষয় চিন্তা করেন, যেখানে প্রতি দেশ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছে। কেন্দ্রীকরণকেই আমি ভয় পাই না, তবে সে কেন্দ্রীকরণ: স্বেচ্ছায়, সমানে সমানে, মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারা শাসিত হইবে। যে কেন্দ্রীকরণ অসমান শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নিপীড়নের সাহায্যে গড়িয়া উঠে, তাহার চেয়ে ভয়াবহ বস্তু আর কিছু নাই। বিকেন্দ্রীকরণের রস দিয়াই তাহাকে জীর্ণ করিয়া মঙ্গলজনক পদার্থে পরিণত করা সম্ভব।

পাঠকের নিকট গান্ধীজীর যুক্তি তাঁহার নিজের ভাষায় দিলাম না বটে, কিন্তু যুক্তিগুলি সবই গান্ধীজীর বিভিন্ন সময়ে লেখা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

পাঠকের প্রথম প্রশ্নের উত্তর তাহা হইলে মোটের উপর ইহাই দাঁড়াইল যে, যদিও সচরাচর মানুষ অল্প আয়াসের পথ খোঁজে, মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা যদিও বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধতায় নিজের করায়ত্ত করা যথেষ্ট আয়াসসাধ্য, তবু সত্যকারের স্বরাজ সাধনার জন্য মানুষকে এ চেষ্টা করিতেই হইবে। স্বাধীনতা বস্তুটি যেমন দুর্লভ, তাহার মূল্যও তেমনই বেশি। হঠাৎ দুইদিনের ঝোঁকে হয়তো একদল লোককে শক্তির আসন হইতে তাড়াইয়া আর একদল পছন্দসই লোককে সেখানে বসানো যায়, কিন্তু মানুষ যদি তাহাদের হাতে মরণবাঁচনের সব ভার তুলিয়া দেয়, সুতরাং তাহাদিগকে সংযত করিবার ক্ষমতা খোয়াইয়া বসে, তবে কেন্দ্রীয় শক্তির অপপ্রয়োগ ঘটিতে বিলম্ব হইবে না,—অসংযত শক্তির মাদকতায় ভাল মানুষও মন্দে পরিণত হয়। সেই কারণে আর্থিক শক্তিই হোক অথবা রাষ্ট্রীয় শক্তিই হোক, যথাসম্ভব ছড়াইয়া রাখাই ভাল। বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান যুক্তিই তাহাই, অতএব স্বরাজসাধনার সহিত ইহার একান্তভাবে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রহিয়াছে।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

ব্যাঙের আধুলি

অগ্নি কবে নিবে গেছে, এবে শুধু ছাই-ভস্ম সার,
ভক্তি ও শ্রদ্ধায় লোকে ভাবে, বুঝি জ্বলিছে অঙ্গার
কিছু নাই কিছু নাই, বাঁচাইয়া রাখে যে সংস্কার—
ব্যাঙের আধুলি নিয়ে চলিতেছে নিখিল সংসার।

ত্রয়ী

চাঁদসদাগর

মনসারে কোন্ ভয় শিবব্রতী চাঁদসদাগর ?
হেঁতালের লাঠি তব হাতে থাক্ সুদৃঢ় অক্ষয় ;
মনে যার অধিষ্ঠান করিয়াছে আপনি শঙ্কর,
তুচ্ছ সে করিতে পারে সামাজিক শাসনের ভয়।
লক্ষ বাণিজ্যের তরী ডুবে যাবে অলক্ষ্য অতলে,
ভাগ্যের কুটিলচক্রে ভেঙে যাবে রাজ্য আর ঘর,
সর্বস্ব খোয়াবে তুমি পূজালোভী হীনের কৌশলে—
কি তাহাতে আসে যায়, তুমি বীর, আপন-ঈশ্বর।
ধনী তুমি নহ শুধু রাজ্য আর ঐশ্বর্যের বলে,
রাজ সিংহাসনে তুমি শ্মশান-শিবের অনুচর,
স্থানভ্রষ্ট তুমি নহ মূঢ় জনতার কোলাহলে,
ভিখারী দেবতা তব, ইষ্ট তব মহাভয়ঙ্কর।
মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনায় নিজে তুমি হ'লে মৃত্যুঞ্জয়,
তোমার স্মরণে নিত্য চিত্ত মোর মানিছে বিস্ময়।

বেহুলা

আকাশ মৃত্তিকা মাঝে তুমি সতী প্রেমের বন্ধন,
আপনার বক্ষপুটে সঞ্জীবিত রাখিছ সংসার,
স্বর্ণসৌধে শুয়ে যারা মানুষে দিয়েছে বিসর্জন
তাদের মুক্তির লাগি তোমাদের নিত্য অভিসার।
মৃত্যু ও বেদনা মাঝে বিরহের অনন্ত পাথারে
ভাসিতে কর না ভয় ; তোমার প্রাণের আকিঞ্চন
তোমারে লইয়া গেছে স্বশরীরে মর্ত্যলোকপারে,
মরণে করিয়া জয় হ'লে মর্ত্যবাসীর শরণ।
সামান্যা রমণী তুমি, অসামান্য প্রেম-অধিকারে
পতির গলিত দেহে কারলে জীবন-সঞ্চারণ,
ধূলিধূসরিত পথে নামাইয়া রাজার কুমারে,
পূত প্রেম-মহিমায় দিলে তারে নবীন জীবন।
মুহূর্ত-মরণে মরি খুঁজে পেল অনন্তের দ্বার,
তোমারি কারণে আজ লখিন্দরে করি নমস্কার।

লখিন্দর

চোখ মেলে চাও বন্ধু, ভেঙে এস সুবর্ণ-পিঞ্জর,
শুনিছ না রাজপথে জনতার অশান্ত ক্রন্দন,
নর্ত্তকী বেহুলা-ক্রোড়ে মৃত ও গলিত লখিন্দর,
আর কতকাল পরে ফিরে পাবে জীবন-স্পন্দন।
দংশিয়াছে কালসর্প ঐশ্বর্যের সূক্ষ্ম ছিদ্র ধরি,
রুধিতে পারে নি মৃত্যু মহাদর্পী চাঁদসদাগর,
জনতার জলস্রোতে ভেসে ভেসে ভেলার উপরি,
প্রিয়-প্রেম-সাধনায় ফিরে পেলে দেবতার বর।
এখনো সময় আছে, অচিরে ডুবিবে ধনন্তরী,
মানুষেরই মাঝে আছে তোমাদের পরম ঈশ্বর,
তাঁহারে খুঁজিয়া লহ লখিন্দর, লৌহগৃহে মরি,
প্রেয়সীর হাত ধরি নেমে এস পথের উপর।
ভেঙে ফেল ঘৃণ্য ধন-ঐশ্বর্যের পাষাণ-বন্ধন,
বেহুলা বাঁচায় যারে, জেনো তার নাহিক মরণ।

সপ্তর্ষি

গ

কাজল বড় ভাল মেয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে কেন্দ্র ক'রে যা ঘটল, তার জন্য দায়ী কেবল তার রূপ নয়, সে রূপের টীকাকার শিল্পী রজতও। রজতের মনে হ'ল, কাজলের চোখ শুধু কালো নয়, তার দৃষ্টিও ভাষা-ভরা। মনে হ'ল, ওর দেহ শুধু মাংস-মেদ-মহিমার সাবলীল প্রকাশই নয়, সে দেহের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে লেখা আছে আমন্ত্রণও। কাজল নিজে কিন্তু এ বিষয়ে সচেতন নয়। তার উৎসুখ চোখের দৃষ্টি যখন নীরব ভাষায় রজতকে বললে, এতদিন পরে তুমি এলে!—তখন জ্ঞাতসারে তার মনে এ রকম কোন ভাব জাগে নি। গৌরকান্তি প্রশস্তললাট রজতকে দেখে তার ভাল লেগেছিল অবশ্য, কিন্তু আর কিছু নয়। তার পীবর স্তনযুগল, কম্পিত করপল্লব, সুঠাম শ্রোণী, সন্নত দৃষ্টি, লজ্জারুণ কপোল, রক্তিম বিম্বাধর যখন নীরব ভাষায় আহ্বান করছিল রজতের পারুষ্যকে তখন অজ্ঞাতসারে কিন্তু সে সঙ্কুচিত হচ্ছিল মনে মনে। ভাষার দ্বারা তো নয়ই,

চিন্তাতেও সে রজতকে প্রণয়ী হিসাবে প্রশ্রয় দেয় নি। রজত কিন্তু মুগ্ধ হচ্ছিল। তার শিল্পী মন কাজলের কালো চোখের দৃষ্টিতে নিত্য নূতন ভাষা আবিষ্কার করছিল ক্ষণে ক্ষণে। কখনও মনে হচ্ছিল, সে দৃষ্টি যেন বলছে—ছি, ছি, কি ভীতু ভালমানুষ তুমি! আবার কখনও বলছে, ভয় কি তোমার? সে যখন মুখ ফিরিয়ে বাতায়ন-পথে চেয়ে থাকত রজতের মনে হ'ত, সে দৃষ্টি থেকে যেন অভিমান ক্ষরিত হচ্ছে; ক্ষণপরেই মৃদু হেসে যখন চাইত তার দিকে, মনে হ'ত, কালো-চোখের তারা থেকে উপচে-পড়া আলোর ঝলক যেন ব'লে গেল কানে কানে, ইস্, ভারি ব'য়ে গেছে আমার! আবদার অনুযোগ বিস্ময় প্রশ্ন অনুরাগ অভিমানের এমন ভাষাময় স্বচ্ছ প্রকাশ আর কারও চোখের দৃষ্টিতে রজত দেখে নি। এই দূর বিদেশে দুর্ব্বল দেহে হতাশ চিত্তে সে যখন লুটিয়ে পড়েছিল পথের ধূলায়, তখন, কি আশ্চর্য, যে রহস্যময়ী তাকে এমন ভাবে সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তুলেছে সে কুৎসিত নয়! তার দৃষ্টির অন্তরালে শিল্পী-কাম্য রহস্য লুকিয়ে আছে! যে আদর্শের জন্য সে জীবনপাত করেছে, বিশ্বাসঘাতকতার আগুনে তা যখন পুড়ে গেল দাউদাউ ক'রে, আত্মপ্রকাশ ক'রে পুলিসের কবলে পড়বার জন্যেই সে যখন প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছিল, তখন এ কি অপরূপ মধুর জগতে উত্তীর্ণ ক'রে দিলেন তাকে বিধাতা? যুবতী নারীর এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ইতিপূর্ব্বে সে আর আসে নি কখনও। যে জীবন সে এতকাল যাপন করেছে, তাতে আদি-রসের কোন স্থান ছিল না।...এখন হঠাৎ যেন অনুভব করলে, বঞ্চিত হয়ে ছিলাম এতদিন। সে কেবল লক্ষ্যই করছিল, কোন প্রশ্ন করে নি। প্রশ্ন করবার সঙ্গত বিষয় একটা অন্তত ছিল। অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করতে পারত, বাড়িতে এক ঝি ছাড়া অন্য লোক নেই কেন, আর সবাই কোথায় গেল? দু-চার জন যারা খোঁজ নিতে আসে, তারা পাড়া-পড়শী, আসে আর চ'লে যায়' কিন্তু কিছুই জানবার সাহস হচ্ছিল না তার, মনে হচ্ছিল জানতে পারলেই স্বপ্ন ভেঙে যাবে বোধ হয়।...

সুস্থ হয়ে উঠল যখন, তখন কাজলই একদিন প্রশ্ন করল তাকে।

আপনার বাড়ি কোথায়?

কলকাতা।

এই কথায় কাজলের চোখের দৃষ্টিতে যে আলো ঝলমল ক'রে উঠল, রজতের মনে হ'ল তার অর্থ—তাই এমন!

আপনার নাম কি ?

রজত। শ্রীরজত-শুভ্র মুখোপাধ্যায়।

কাজলের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল আনন্দ। রজতের মনে হ'ল, সে দৃষ্টি যেন ব'লে উঠল, বেশ নামটি তো !

এখানে এসেছিলেন কেন ?

তা বলব না।

কাজলের দৃষ্টির স্বচ্ছতায় নামল অভিমানের ছায়া।

রজত কোন প্রশ্নই করল না।

কেবল বললে, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। এইবার যাব ভাবছি।

চোখের দৃষ্টিতে সকরুণ মিনতি যে এমন মূর্ত্ত-হয়ে উঠতে পারে, তা রজতের কল্পনাতীত ছিল। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল সে।

কাজল মুখে বললে, এর মধ্যেই যাবেন কেন ? আর একটু সেরে উঠুন, তারপর যাবেন। এখনও তো দুর্ব্বল আছেন।

রজত থেকে গেল। 'আপনি' 'তুমি'তে পর্য্যবসিত হ'ল ক্রমশ এবং কয়েকদিন পরে যে কাণ্ড সে ক'রে বসল তা ভদ্র ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তার নিজের কাছে এর একটা সঙ্গত জবাবদিহি ছিল অবশ্য এবং এক কাজল ছাড়া আর কারও কাছে জবাবদিহি করতে সে প্রস্তুতও ছিল না। তার ভরসা ছিল, কাজল তাকে ক্ষমা করবে। প্রথমে কাজল বাধা দিয়েছিল একটু, কিন্তু সেটা খুব প্রবল ব'লে মনে হয় নি রজতের। ঘটনাটা ঘ'টে যাবার পরও কাজলের যে দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিল, তা,রজতের মনে হ'ল, ঘৃণার নয় আনন্দের। কাজল মুখে কিন্তু বললে, এ কি করলেন আপনি ?

তুমি সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ডাকছিলে আমাকে, সাড়া না দিয়ে পারলাম না।

আমি ডাকছিলাম ?

দৃপ্ত কণ্ঠে তর্জ্জন ক'রে উঠল সে। যে চোখ দুটি হাসছিল ব'লে রজতের মনে হয়েছিল, তাতে দপ ক'রে যেন আগুন জ্ব'লে উঠল।

রাগ ক'রো না। আমি তোমাকে চাই, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তোমার জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিতেও প্রস্তুত আছি আমি।

আমি কে কোন্ জাত কিছুই জানেন না, দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছেন ?

আছি।

আমি যদি বিবাহিত হই ?

তোমার মাথায় সিঁদুর তো নেই !

সব জাত সিঁদুর পরে না।

তা হ'লেও ছিনিয়ে নিয়ে যাব, তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

আর আপত্তি থাকে যদি ?

তা হ'লে জোর করব না, আর যা করেছি তার জন্যে যদি শাস্তি দিতে চাও, নিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত।

মৃত্যুদণ্ড চাইলেও দেব কি ক'রে! আপনার গায়ে যা অসুরের মত জোর!

তার ব্যাগটা ঘরের কোণেই রাখা ছিল। উঠে গিয়ে রজত তার থেকে রিভল্‌ভারটা বার ক'রে এনে বললে, এই নাও, লোডেড আছে।

বিস্ময় ফুটে উঠল কাজলের চোখে। মুখে বললে, খুব হয়েছে, রেখে দিন।

দু দিন পরেই কাজলের বাবা ফিরে এসে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর মাতৃহারা মেয়েটিকে ঝিয়ের জিম্মায় রেখে তারই পাত্রের সন্ধানে বঙ্গদেশে গিয়েছিলেন ছুটি নিয়ে। পাত্র যোগাড় হয় নি, কারণ গরিব লোক ছিলেন তিনি। আত্মীয়স্বজনও বিশেষ কেউ ছিল না। কাজলই তাঁর একমাত্র সন্তান। নিজেই মানুষ করেছিলেন মা-হারা মেয়েকে। বিয়ে না দিয়ে মেয়েকে বড় বয়স পর্য্যন্ত ঘরে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, এই অপরাধে পাড়ার লোকেরাও কেউ বিশেষ সদয় ছিলেন না তাঁর উপর। তাই তাঁর অবর্ত্তমানে কাজল যখন একটা অজ্ঞাতকুলশীল অজ্ঞান যুবককে ঘরে টেনে তুললে, তখন পাড়ার লোক তাকে মানা তো করলেই না, ভবিষ্যৎ সান্ধ্য-আড্ডার খোরাক-সংগ্রহমানসে ভাবে ভঙ্গীতে উৎসাহই দিতে লাগল বরং।

প্রায় বছর দেড়েক অজ্ঞাতবাসের পর কাজলকে নিয়ে সে যখন কলকাতায় ফিরল, তখন মহাত্মা গান্ধী আবার উপবাস শুরু করেছেন অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যাপার নিয়ে। মালবীয়জীর অনুরোধে হিন্দুনেতারা হৈ-হৈ করছেন তাঁকে ঘিরে পুণা জেলে। সত্যাগ্রহের উত্তেজনা মিইয়ে গেছে, সমস্ত উত্তেজনা মহাত্মাজীকে ঘিরে। গভর্মেণ্ট কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শুরু করেছেন, দেশের ঘাড়ে নূতন কনষ্টিট্যুশন চাপাবার জন্যে, নরম-মেজাজের নেতাদের নিয়ে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকও বসবে নাকি

আবার! বাংলা দেশের পুলিস নব নব অর্ডিনেন্সের বলে বলীয়ান হয়ে ডগলাস এবং এলিসন হত্যার প্রতিশোধ তুলছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, চব্বিশপরগণার ঘরে ঘরে। বিপ্লবীদের কেউ জেলে, কেউ ফাঁসি গেছে, কেউ অ্যাপ্রুভার হয়েছে।

রজত কাজলকে নিয়ে একটা হোটেলে এসে উঠল। বাড়িতে স্থান পাবে কি না সন্দেহ ছিল। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল একটা চাকরির। হাতে একটি পয়সা ছিল না। কিন্তু চেষ্টা করলেই চাকরি পাওয়া যায় না। দিনের পর দিন সে ঘুরে বেড়াতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়, কাজলকে হোটেলের ঘরে একা বসিয়ে রেখে। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে পার্কে এসে বিশ্রাম করত। তেষ্টা পেলে জল খেত রাস্তার কল থেকে। হঠাৎ একদিন শঙ্খশুভ্রের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল রাস্তায়। শঙ্খ দেখতে পায় নি, রজতই ডাকলে তাকে। ডেকেই কিন্তু মনে হ'ল, ভুল করেছি।

কালো-রঙ, খোঁচা-খোঁচা-গোঁফ-দাড়ি, উস্‌কো-খুস্‌কো-চুল এই লোকটাই যে রজত, তা পরিচয় না দিলে শঙ্খ চিনতেই পারত না।

সমস্ত শুনে বললে, কি হয়েছে তাতে? বাড়ি চল্‌।

বাবা যদি তাড়িয়ে দেন?

রজতের ভীত কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে গেল শঙ্খ। সেই রজত কি হয়ে গেছে!

আচ্ছা, আমি বলব বাবাকে। তোর ঠিকানাটা কি?

সহসা সাবেক রজত আত্মপ্রকাশ করল যেন।

ঠিকানা দিচ্ছি। আমার জন্যে অনুরোধ করতে হবে না কাউকে।

গর্জ্জন ক'রে উঠল যেন।

শঙ্খ বললে, অনুরোধ করব না। খবরটা দেব খালি।

ঠিকানা নিয়ে শঙ্খ চ'লে গেল। রজত চেয়ে রইল নিখুঁত সাহেবিস্যুট-পরা শঙ্খর দিকে। তারই দাদা!

শঙ্খ খবরটা তনিমাকেই বলেছিল প্রথমে। বাবাকে বলতে তারও সাহস হয় নি। সব শুনে তনিমা খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল, তারপর মুচকি হাসল একটু।

সমস্ত ব্যাপারটা তুমি যদি আমার হাতে ছেড়ে দাও, তা হ'লে আমি সব ঠিক ক'রে দিতে পারি। তুমি কিন্তু কাউকে একটি কথা বলতে পারবে না।

বেশ।

তনিমা বাসন্তীকে গিয়ে বললে, মা, আমার এক বন্ধুর মুখে আজ শুনলাম ঠাকুরপো নাকি পছন্দ ক'রে বিয়ে করেছে কাজল ব'লে এক মেয়েকে।

উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল বাসন্তী।

কোথায়?

তা সে ঠিক জানে না। খবর নিতে বলেছি।

কে বন্ধু তোমার?

আপনি চেনেন না তাদের। চট্টগ্রাম বাড়ি। ঠাকুরপোর সঙ্গে খুব আলাপ। আমি যখন সকালবেলায় বেরিয়েছিলাম, তখন দেখা হ'ল তার সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায়।

বাসন্তী খবর দিলেন শশাঙ্ক-শুভ্রকে। শশাঙ্ক মুখে যদিও বললেন—মরুকগে, মনে মনে কিন্তু তিনিও কম উৎসুক হলেন না।

দু দিন তনিমা চুপ ক'রে রইল।

তৃতীয় দিন বাসন্তী আবার জিজ্ঞেস করলেন, রজতের কোনও খবর পেলে?

এখনও পাই নি।

ঘণ্টা দুই পরে শশাঙ্ক আবার প্রশ্ন করলেন এবং সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

তুমি ভাল ক'রে খোঁজ কর আজই। গাড়িটা নিয়ে যাও না হয় তাদের বাড়ি।

তনিমা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং ফিরে এসে বললে, শুনলাম, কাল তারা কলকাতায় আসছে। এসে বউবাজারের একটা হোটেলে উঠবে।

হোটেলে?—প্রশ্ন করলেন শশাঙ্ক-শুভ্র।

তাই তো শুনলাম।

ঠিকানা এনেছ?

এনেছি।

সইয়ে সইয়ে খবরটা বলাতে ফল হয়েছিল। তনিমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল শঙ্খ।

তারপর দিন যখন চেনা 'মিনার্ভা'-গাড়িখানা হংস-শুভ্র, শশাঙ্ক-শুভ্র, বাসন্তী এবং তনিমাকে নিয়ে বউবাজারের গলিতে সেই হোটেলের সামনে 'হর্ন' দিয়ে

দাঁড়াল, তখন রজতের যেন মাথা কাটা গেল। দয়াপরবশ হয়ে অনুগ্রহ করতে এসেছেন সবাই! আর, কি লজ্জা!

সামনাসামনি হতেই সে ব'লে উঠল, কেন এসেছ তোমরা? আমি যাব না।

যাবি না কেন?—বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলের অবস্থা দেখে চোখ ফেটে জল আসছিল তাঁর।

যে সর্ব্বনাশকে আমি স্বেচ্ছায় জীবনের সাথী করেছি, তার সঙ্গে তোমাদের জড়াব কেন?

প্রদীপ্ত হয়ে উঠল হংস-শুভ্রের চোখ ছুটো।

তোমার মত লোকের সঙ্গে বাস করবার ইচ্ছে আমাদেরও নেই। তোমার পূর্ব্বপুরুষ তোমার জন্যে যে সম্পত্তি রেখে গেছেন, তার ভার ব'য়ে বেড়াবার দায়িত্বও আমরা নিতে রাজি নই। এই নাও।

বিশ হাজার টাকার চেকখানা তিনি লিখেই এনেছিলেন।

এই টাকাটা তোমার অংশে জমা আছে। তোমার বাকী সম্পত্তির হিসেব তুমি গিয়ে বুঝে নিও একদিন—ওর হাঙ্গামা পোয়াতে আমি পারব না। আমি চললুম।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর রজতের চোখে পড়ল, মা কাঁদছেন, বাবা অস্বাভাবিক রকম চুপ ক'রে আছেন।

তনিমা বললে, আজকের মত চল অন্তত ঠাকুরপো।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রজত বললে, বেশ, চল।

তারপর কাজলের দিকে ফিরে বললে, মাকে, বাবাকে, বউদিকে প্রণাম কর। দাদু সত্যিই চ'লে গেলেন নাকি?

বেরিয়ে গিয়ে দেখে এল, তিনি সত্যিই চ'লে গেছেন। গাড়িটা তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষা করছে।

কাজল কলকাতায় এসে থেকে অসম্ভব রকম নীরব হয়ে গিয়েছিল, তার দৃষ্টির সে মুখরতাও আর ছিল না যেন। দৃষ্টিতে মূর্ত্ত হয়ে ছিল খালি ভয়। তার জীবনে ঝঞ্ঝার মত এসে এই লোকটি কোন্ অনিশ্চিত পরিণামের দিকে যে তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, তার কোনও আভাসই সে পাচ্ছিল না। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ব'লেই নীরব হয়ে ছিল। বিয়ের আগে রজতের সমস্ত

ইতিহাস শুনেছিল সে। শ্বশুরকে সব কথা না বললেও তার কাছে রজত কিছুই গোপন রাখে নি। রজতের শেষ কথাগুলো সব সময়েই যেন কানে বাজত তার—আমার মত খামখেয়ালী লোকের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন জড়াবার আগে একটা কথা জেনে রাখা ভাল। নীরবে যদি আমার অনুসরণ করতে না পার, দুঃখ পাবে। অনুসরণ করলেও যে দুঃখ ছাড়া আর কিছু পাবে, তার ভরসা নেই। কিন্তু বাদ-প্রতিবাদ করলে সে দুঃখ আরও গ্লানিকর হয়ে উঠবে। আমি তোমাকে পেলে কৃতার্থ হয়ে যাব, কিন্তু তোমার দিকটা তুমি ভেবে দেখ ভাল ক'রে।

নারীমাত্রেই পুরুষের মধ্যে যে বীরকে পূজা করতে চায়, যে আত্মভোলা সর্ব্বশক্তিমানকে বাঁধতে চায় মায়ার বন্ধনে, রজতের মধ্যে সেই দুর্জ্জয়কে প্রত্যক্ষ ক'রে কাজল মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার সেদিনকার দুষ্কৃতিটাকেও আর দুষ্কৃতি ব'লে মনে হচ্ছিল না তার। বরং এই দুরন্ত পুরুষ যে তার তুচ্ছ দেহটার মোহে ক্ষণিকের জন্যও অভিভূত হয়েছিল, এজন্য একটা সূক্ষ্ম গর্ব্বই জাগছিল তার মনে। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের সেই লাইনটা—"যে পথিক পথের ভুলে, এল মোর প্রাণের কূলে, পাছে তার ভুল ভেঙে যায়—"

মৃদুকণ্ঠে সে উত্তর দিয়েছিল, আমি কোন প্রতিবাদ করব না।

তাই কোন প্রতিবাদ সে করে নি, কেবল অনুসরণ করছিল।

দেখতে দেখতে কয়েক বছর কেটে গেল।

দুই না তিন, তাও রজতের খেয়াল রইল না। আলাদা একটা বাড়িতে কাজলকে নিয়ে তন্ময় হয়ে রইল সে। তার কত পোজের যে ছবি আঁকলে, তার আর ইয়ত্তা নেই। উচ্ছ্বসিত বাসন্তী এসে একদিন খবর দিয়ে গেল, শম্ভুর ছেলে হয়েছে। দেখতে যাবার জন্যে পেড়াপিড়ি করল। অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু হয়ে ওঠে নি আজও। কিছুই মনে থাকে না, কিছুই ভাল লাগে না আর। এমন কি কাজলও ফুরিয়ে গেছ যেন। আবার দেশের কাজে নামলে কেমন হয়? মনটা আবার উন্মুখ হয়ে উঠল।...পিওন চিঠি দিয়ে গেল দুখানা। দুটোই অপ্রত্যাশিত। একটা হীরকের, আর একটা সোম-শুভ্রের অ্যাটর্নির। হীরকের দীর্ঘ চিঠি। ধীরে সুস্থে পরে পড়া যাবে। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অ্যাটর্নির চিঠিটা পড়তে লাগল রজত। সোম-শুভ্রের নির্দ্দেশ অনুসারে

তিনি সোম-শুভ্রের উইলের কপি পাঠিয়েছেন। শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক, শঙ্খ, রজত, হীরক, শক্তি, মুক্তা, নবনী, পরমানন্দ প্রত্যেককে তিনি নগদ এক লাখ টাকা ক'রে দিয়েছেন। এক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা করেছেন শিক্ষিতা অবিবাহিতা দরিদ্র হিন্দু কুমারীদের সৎপথে থেকে অর্থোপার্জ্জনে সহায়তা করবার জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর শিব-শুভ্রের বংশের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠতম জীবিত থাকবেন, তিনিই ভবিষ্যতে এ বিষয়ে উপযুক্ত পাত্রী নির্ব্বাচন করবেন। এই এক লাখ টাকার সুদ প্রতি বছরে একজন ক'রে পাবেন। এ বছরে পাবেন ইলা দেবী। আর এক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকবে তাঁর বৈজ্ঞানিক-কল্পনা নামক পুস্তিকার মুদ্রণ ও প্রচারের জন্য। বাকী আঠারো লক্ষ টাকা তিনি সমানভাবে দান ক'রে গেছেন তাঁর স্থাপিত স্কুল ও হাসপাতালে। তাঁর বিহারের জমি তিনি দান করেছেন তাঁর জনমজুরদের। দীর্ঘ তালিকা রয়েছে তাদের নামের। সোম-শুভ্রের পরিচয় পেয়ে রজত বিস্মিত হ'ল এবং মুগ্ধও হ'ল।...

আবার মনে হ'ল, এই এক লাখ টাকা নিয়ে দেশের কাজে নামলে কেমন হয়! কিন্তু তখনই মনে হ'ল, করবার কি আছে! সুভাষ বোস চিকিৎসার জন্যে ইউরোপে, বিটলভাই প্যাটেল, যতীন সেনগুপ্ত মারা গেছেন। জ্যাকসনকে মারতে গিয়ে বীণা দাস ধরা পড়েছে। সত্যাগ্রহের শিখা নির্ব্বাপিত। তবু ইচ্ছে করতে লাগল, দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আবার নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে। কিন্তু কাকে নিয়ে কি করবে! পুরানো দল ভেঙে গেছে, নূতন দলের কাউকে চেনে না সে। ইন্দু-শুভ্রা সম্পর্ক ত্যাগ করেছে, একটা কথা পর্য্যন্ত বলে না আজকাল। পুলিস পর্য্যন্ত স্পর্শ করল না তাকে। মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে ভাবে, কেন করল না? হংস-শুভ্র গোপনে গোপনে যে তার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা সে জানত না। হঠাৎ আবার মনে হ'ল, কাজল ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু কাজলের দায়িত্ব তো ফুরোয় নি।

কই, কোথায় আছ তুমি?

এই যে।—পাশের ঘর থেকে কাজল উত্তর দিলে।

তোমার সেই বেদেনীর পোশাকটা প'রে এস তো, আর একটা ছবি আঁকি।

একটু পরেই কাজল হাসিমুখে এসে 'পোজ' দিয়ে দাঁড়াল।...

'পোজ' দিয়ে দাঁড়িয়েই রইল অনেকক্ষণ।

রজত তার দিকে ফিরেও চাইল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতহস্তে তুলি

চালিয়ে ছবি আঁকছিল একটা। হঠাৎ কাজলের নজরে পড়ল, তার ছবি নয়; বিরাট একখানা ছোরা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে ক্যান্‌ভাসের উপর, ছোরাটা বিদ্ধ করেছে প্রকাণ্ড একটা হৃদ্‌পিণ্ডকে, ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটছে।...

ক্রমশ

"বনফুল"

বস্ত্রং দেহি

বুড়ো এককড়ির বয়স হয়েছে প্রায় ষাট। বছর দুয়েক ধ'রে চোখে তার ছানি পড়েছে, দেখতে পায় না বললেই চলে। শ্বশুরের চোখের দৃষ্টিকে দুর্ব্বল ক'রে দিয়ে লজ্জাহারী ভগবান যে হরিমতীর নগ্নতায় লজ্জা রক্ষা করেছেন, তা এককড়ির ছেলে তিনকড়ি মানে, তিনকড়ির বউ হরিমতীও মানে। নগ্ন নয় তো কি? যে শাড়ি দুটো প'রে হরিমতী দিন কাটাচ্ছে আজকাল, তা প'রে বাইরে বেরোনো তো দূরের কথা, বাড়ির ভিতরে ওই প্রায়ান্ধ শ্বশুরের সামনে চলাফেরা করতেও বাধে হরিমতীর। তবু তো তারা ভদ্রলোক নয়, তারা ছোটলোক—চাষী।

সন্ধ্যা না হ'লে বাড়ির বাইরে যায় না হরিমতী। জল আনা, বাসন মাজা, কাপড় ধোয়া সবই অন্ধকারে সারতে হয় তাকে। ছোটলোক, চাষীর বউ বটে হরিমতী, কিন্তু ইজ্জৎ-রক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা ও লজ্জা তার ভদ্রঘরের বউদের চেয়ে এক তিলও কম নয়। হয়তো বেশিই, কারণ হরিমতী বরাবরই একটা বিষয়ে গর্ব্ব পোষণ করে। তার বাপ মাইনর পর্য্যন্ত লেখাপড়া করেছিল, যা তার স্বামী তিনকড়ির বাপ ওই এককড়ির সাধ্যে কুলোয় নি।

তবু চলছিল কোনমতে। লজ্জার মাথা খেয়েও। কিন্তু মুশকিল হ'ল, যখন একজন অনাহূত অতিথি এসে হাজির হ'ল তার অপ্রীতিকর আত্মীয়তার দাবি নিয়ে! এককালে অতিথিরা দেবতা ব'লে পূজা পেত, কিন্তু সেকাল একাল নয়। কালচক্রের আবর্ত্তনে সেকাল তলিয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন হ'লে পিতা পুত্রকে অস্বীকার করে, স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, মা সন্তানকে বিক্রি করে। তাও না হয় সহ্য করা গেল, অমন করতেই হয়। নিদারুণ অভাবে দিন কাটলেও মোটা চালের ভাতের সঙ্গে একটা শাক আর একটা তরকারির অভাব হবে না। উঠোনের পাশে লাউগাছটাতে লাউ ফলেছে, এক কোণে ডাঁটাগাছগুলো ঘন হয়ে হাওয়ায় দুলছে।

এসেছে নন্দনগাছি থেকে দূরসম্পর্কের এক ভাই। তিনকড়ির মাসতুতো বোনের পিসতুতো ভাই নন্দলাল। কি একটা কাজে, বিকেলেই চ'লে যাবে। সঙ্গে তার এক ছোকরা, জাতে ভিল।

তা আসুক। একদিনের অতিথি ওরা। ব্যবস্থা একটা হবেই। একটু দুধও চেয়ে আনা যাবে তারিণী মণ্ডলের বাড়ি থেকে। কিন্তু মুশকিল বাধল পরিবেশনের সময়।

কথা ছিল যে, তিনকড়ির এগারো বছরের মা-হারা বোন প্রতিমা ওরফে পুঁটী পরিবেশন করবে। কিন্তু যখন আসন পাতা হ'ল, তখন খিড়কির দোর দিয়ে কলসী কাঁখে মেয়েটা বেরিয়ে গেল, জল আনবার অছিলা ক'রে। ওরও লজ্জা করে। হরিমতী ব্যগ্রকণ্ঠে কয়েকবার ডেকেছিল তাকে, কিন্তু মেয়েটা ফিরল না। অগত্যা যা এড়াবার জল্পনা কল্পনা অনেকক্ষণ ধ'রে করছিল হরিমতী, তাই অর্থাৎ পরিবেশন তাকেই করতে হ'ল।

খেতে খেতে উশখুশ করে তিনকড়ি। বউয়ের দিকে তাকিয়ে গলা দিয়ে ভাত আর নামতে চায় না তার। বহুদিনের পুরোনো, ময়লা ছেঁড়া তালি-দেওয়া আর জায়গায় জায়গায় গেঁট-দেওয়া একটা শাড়িকে অতিকষ্টে সারা দেহে জড়িয়েছে সে। এই শাড়িটার ইতিহাস মনে আছে তিনকড়ির। যুদ্ধ লাগার আগে, তার মরা ছেলে খোকনের জন্মাবার আগে, হরিমতীর সপ্তামৃতের সময় দু টাকা এক আনায় একজোড়া কিনে এনেছিল সে। একটা অনেকদিন আগেই গেছে, ওইটেই একটু যত্নে তোলা ছিল ভাল ব'লে, গেল বছর থেকে একাদিক্রমে প'রে প'রে ওই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। অমন সযত্নে শাড়িটাকে সারাদেহে জড়িয়েছে হরিমতী, তবু লজ্জা রক্ষা হয় না। বাহুর কাঁধের ও বুকের পাশের অনেক অংশই অনাবৃত রয়েছে। পাতলা, সারবিহীন শাড়ির অন্তরালে দেহের যেটুকু আছে, তাও আবছাভাবে দেখা যায় একটু নজর দিলেই। একটা শেমিজ পরলে হয়তো ও লজ্জা ঢাকত, কিন্তু একটা সাধারণ মোটা শাড়ি পাওয়াটাই যেখানে চরম ও পরম সৌভাগ্যের কথা, সেখানে শেমিজের মত বাহুল্যের বিষয়ে নিষ্ফল কামনা করবার মত সময় নেই তাদের।

তিনকড়ি উশখুশ করে আরও একটা কারণে। সবাই তারা মুখ নীচু ক'রেই খাচ্ছে, কিন্তু নন্দলালের সঙ্গী ছোকরাটির চোখ দুটো বড় চঞ্চল, বড় লোভী। বারংবার ছোকরা আড়নয়নে হরিমতীর সর্বাঙ্গ লেহন করছে খেতে খেতে। হরিমতী রূপসী নয়, তবে কুশ্রীও নয়। শ্রী একটা আছে তার যৌবনদৃপ্ত সবল দেহে। আরও সবল, আরও স্বাস্থ্যবতী ছিল সে আগে। কিন্তু গত দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করার সুবিপুল চেষ্টায় দেহে একটু জীর্ণতা এসেছে, একটু ভাঙন লেগেছে। আরও কারণ আছে। সেই পঞ্চাশের অন্নহীন, খাদ্যহীন প্রাণধারণের উপযোগী ঘাসপাতারও অভাবের দিনে, নিদারুণ ক্ষুৎকাতরতার মধ্যে, একরকম অনাহারেই হরিমতীর বুকের একটা পাঁজর খ'সে গিয়েছে। তার একমাত্র সন্তান, তার পাঁচ বছরের খোকনমণি মারা গিয়েছে। কিন্তু মৃত্যু যেমন একটা দুর্লংঘ্য নিয়ম, বেঁচে থাকাও তেমনই একটা নিয়ম। তাই

হরিমতী বেঁচে আছে। আর বয়স তার খুব বেশি নয়, বাইশ। তাই যৌবনের রেশ এখনও লেগে আছে হরিমতীর দেহে। নন্দলালের সঙ্গী ছোকরা তাকাবে বইকি! নগ্নতা ঢাকার লজ্জায় হরিমতীর দেহ যেন আরও দর্শনীয় হয়ে ওঠে ছোকরার কাছে।

হরিমতীও টের পায় ব্যাপারটা। শেষবার যখন সে পরিবেশন করতে এল, তখন সে শ্বশুরের ছেঁড়া গামছাটা গায়ে জড়িয়ে এসেছে। তিনকড়ি তাকাল তার দিকে। মনে হ'ল যে. হরিমতীর চোখের কোণে যেন জল টলমল করছে।

ঠিক তাই।

খায় নি হরিমতী। অপেক্ষা করছিল তিনকড়ির জন্য। নন্দলাল আর তার সঙ্গীটি কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেই, বুড়ো এককড়ি বাইরের ঘরে চোখ বুজতেই তিনকড়ি যখন ভিতরে গেল, হরিমতী তখন সামনে এসে দাঁড়াল। যে চোখের জলকে সে এতক্ষণ পর্য্যন্ত নানা বাঁধ রচনা ক'রে আটকে রেখেছিল, এবার সেই বাঁধগুলো সে ভেঙে ফেললে।

হরিমতীর হাত ধরলে তিনকড়ি। তার চোখের গরম জলের ধারাকে ডান হাতের তালু দিয়ে মুছবার একবার চেষ্টা ক'রে সে প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে বউ?

হরিমতী চুপ ক'রে শুধু ঠোঁটটা মাঝে মাঝে কামড়াতে লাগল।

তিনকড়ির হঠাৎ বিরক্তি বোধ হয়। শ্রাবণ মাস। ক্ষেতে এখন অনেক কাজ। নেহাৎ অতিথিরা এসেছে, নইলে সে আজ সকাল থেকেই সারাদিন ক্ষেতে থাকত। সারা বছরের আশা প্রাণ রয়েছে সেখানে। বিশ্রাম করবার, মেয়েলোকের মান আর সোহাগ মেটানোর সময় নেই তার। দেনার দায়ে মহাজনের কাছে তার প্রতিটি চুল বাঁধা পড়েছে, হাতে গোটা কয়েক টাকা মাত্র রয়েছে, কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সংসার চালাতে আরও ধার করতে হবে তাকে। এখন কি কান্না টান্না ভাল লাগে?

কি হয়েছে ছাই বল না বাবু?

হরিমতী ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত ফোঁস ক'রে উঠল। ছেলেটা মারা যাবার পর থেকেই তার মাথার ঠিক নেই। শান্ত লোকটা মাঝে মাঝে ভয় পাইয়ে দেয় তিনকড়িকে।

কি হয়েছে বুঝতে পারছ না, দেখতে পাচ্ছ না?—সে পাল্টা প্রশ্ন করলে।

কি, কি হয়েছে? না বললে বুঝব ক্যামনে, আমি কি অন্তরযামী নাকি?

তোমার ভাইয়ের সঙ্গী অলপ্পেয়েটা ক্যামন ড্যাবড্যাব ক'রে গিলছিল আমায়, তা দেখ নি?

দেখেছি। মাথা নীচু করলে তিনকড়ি।

তবে বিহিত কর, এর চেয়ে ন্যাংটো হয়ে থাকা যে ভাল।

কি বিহিত করব? বুঝেও বুঝতে চায় না তিনকড়ি। আর বুঝেই বা কি করবে সে?

শাড়ি—শাড়ি! দুই হাত স্বামীর সামনে প্রসারিত ক'রে হরিমতী বললে, শাড়ি, একটা শাড়ি দ্যাও। কবে থেকে বলছি, খেয়াল নেই তোমার? সেই গেল পূজোয় একখানা শাড়ি দিয়েছিলে, একখান জ্যালজেলে শাড়ি, তাতে কি চিরকাল যাবে? কতবার বলি নি তোমায়? আজ নয় কাল দেব, কাল নয় পরশু দেব, আজ দাম বেড়েছে, কাল দাম কমলে দেব—এও সব ব'লে ব'লে শুধু ফাঁকি দিয়েছ আমায়, আমায় ন্যাংটো ক'রে ফেলেছ তুমি। এবার? এবার যে না হ'লেই নয়, একখান শাড়ি আন যে ক'রে পার।

হরিমতীর কথার চোটে তিনকড়ির মাথা গুলিয়ে গেল, একটা অকারণ অসহিষ্ণুতায় তার মাথা গরম হয়ে উঠল, তাই বুঝেও যুক্তির ধার দিয়ে না গিয়ে সে হরিমতীরই একটা উক্তি নিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

চোখ লাল ক'রে সে প্রশ্ন করলে, আমি তোমায় ন্যাংটো ক'রে রেখেছি?

রেখেছই তো, পুরুষমানুষ তুমি, একটা শাড়ি আনতে পার না?

না পেলে আনব কোত্থেকে?—তিনকড়ি গর্জ্জন ক'রে উঠল এবার।

যেখান থেকে পার আন, আমার চাই-ই। ইস, কি মুরোদ রে আমার সোয়ামীর, ওই যে বলে না—

ঠাস ক'রে একটা চড় মারল তিনকড়ি হরিমতীর গালে। আর বেশি কথা সে সহ্য করতে পারছে না।

মারলে! আমায় মারলে! হরিমতীর সব তেজ এক মুহূর্ত্তে যেন জল-ঢালা আগুনের মত হুস ক'রে নিবে গেল, শুধু চোখ দিয়ে গলগল ক'রে জল পড়তে লাগল।

হ্যাঁ, মারলাম। দাঁতে দাঁত চেপে তোরঙ্গটা খুলতে বসল তিনকড়ি।

পাশের ঘর থেকে বুড়ো এককড়ির কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কি হ'ল রে তোদের, অ্যাঁ?

কিচ্ছু না, তুমি ঘুমোও।—তিনকড়ি ধমকে বললে।

আচ্ছা বাবা। বুড়োর কণ্ঠে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের করুণ বিলাপের রেশ যেন লেগে আছে।

তোরঙ্গ খুলে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা পুঁটলি বার করলে তিনকড়ি। গোটা সাতেক টাকা আছে, ট্যাঁকে গুঁজল তা। তারপরে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরুল।

কিন্তু বেরিয়েই আর একটা কাণ্ড ক'রে বসল তিনকড়ি।

পুঁটী কলসী কাঁখে উঠোনে এসে দাঁড়াল। কোমর থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত একটা পুরোনো গামছা ছাড়া দেহে তার আর কিছুই নেই।

তাকে দেখেই তিনকড়ির হঠাৎ থেমে-যাওয়া রাগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কি দরকার ছিল ছুঁড়ীর জল আনতে যাওয়ার? খালি ফাঁকি, খালি কাজ এড়িয়ে চলা।

পুঁটী!

অ্যাঁ?

ইদিকে আয়।

কলসীটা রান্নাঘরের দাওয়ায় নামিয়ে রেখে পুঁটী কাছে এল। এই গম্ভীর কণ্ঠের আহ্বানের হেতুনির্ণয় সে করতে পারছিল না।

কাছে আসতেই পুঁটীর বাঁ গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ এঁকে দিলে তিনকড়ি।

কোথায় গিয়েছিলি হারামজাদী, তোর বউদি না মানা করেছিল, অ্যাঁ? জল আনতে যাওয়া হয়েছিল মিছিমিছি, কেন গিয়েছিলি, অ্যাঁ? কেন?

এই অপ্রত্যাশিত চড়ে পুঁটী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। অভিমানে, বেদনায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। উত্তর দিতে পারল না সে, শুধু পশুর মত দুটো বড় বড় নির্দোষ চোখে তার জল উপচে এল।

জবাব দিল হরিমতী। রাগে কাঁপছিল সে।

না হয় গিয়েই ছিল, তুমি মোড়লি করছ কেন?

করব না কেন?

না, পার না করতে। যদি পারবেই তবে তাকিয়ে দেখ ওর বুকের দিকে।

তিনকড়ি তাকাল। পুঁটী সেই চাহনি দেখে দ্রুতপদে রান্নাঘরে চ'লে গেল।

কিন্তু সেই এক ঝলক চাহনিতেই যে দৃশ্য দেখল তিনকড়ি, যে কথা বুঝতে পারল সে, তাতে তার মুখে আর কথা জোগাল না। সে ভুলে গিয়েছিল যে, পুঁটীর বয়স এগারো হয়েছে। সে ভুলে গিয়েছিল যে, বাঙালীদের ঘরে এগারো বছরেই নারীদেহে অনেক পরিবর্তন হয়। সে শুধু জানে যে, পুঁটী তার ছোট বোন, এখনও ছোট। কিন্তু তিনকড়ি জানে না যে, তার ভাইয়ের দৃষ্টি ছাড়াও অন্য দৃষ্টি আছে, যা বহু পোশাকের আবরণকে পর্যন্ত ভেদ করে সুতীক্ষ্ণ শায়কের মত, নিরাবরণ হ'লে তো কথাই নেই। সে দৃষ্টির কাছে কম বয়সটা কোনও খাতির পায় না।

হরিমতী চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, ও আর কচি নেই, ও এখন মেয়েলোক হতে চলেছে। নতুন বয়েস, ওর লজ্জা যে আমার চেয়েও বেশি, তা বুঝি জানতে না গো?

জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছিটকে বেরিয়ে গেল তিনকড়ি।

হনহন ক'রে অনেকখানি এগিয়ে গেছে তিনকড়ি। কেন, কোন্‌দিকে, তা ভাববারও অবকাশ হয় নি। মাথাটা তার গরম হয়ে গেছে। তার মাথাটা যদি মাটির হ'ত, তবে

তার মস্তিষ্কের উত্তপ্ততা-প্রাবল্যে মাটির উপরকার উত্তাপসৃষ্ট অতি সূক্ষ্ম ধোঁয়ার মত, ধোঁয়া হয়তো তার মাথার উপর থেকেও কাঁপতে কাঁপতে উপরে উঠত; কিন্তু মাথাটা তার মাটির নয়, এই যা রক্ষে।

কাঁচা সড়কের উপর দিয়ে নিবারণ দত্তের ছেলে মণীশ আসছিল। ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যুবক, পাঁচ বছর জেল খেটেছে স্বদেশীতে। বছর তিনেক হ'ল গ্রামে ফিরে এসেছে ছাড়া পেয়ে। এখনও স্বদেশীর কাজ করে। খদ্দরের ধুতি মালকোচা দিয়ে পরা, হাফশার্ট গায়ে, কাবুলী জুতো পায়ে। বুকের উপর দিয়ে বেল্টে আঁটা একটা ব্যাগ কোমরের পাশে ঝুলছে, তাতে নানারকমের বই কাগজপত্র থাকে। প্রায়ই তাদের ডেকে আসর জমায়, নানা কথা বলে, তাদের ভালর কথা, স্বদেশীর কথা। গেল দুর্ভিক্ষ আর মড়কের সময় এত খেটেছে যে বলবার নয়, তা শুধু মনে রাখবার। কাপড়ের ব্যাপার নিয়েও সে এবং তার দলের লোকেরা আন্দোলন চালাচ্ছে, তিনকড়ি জানে সে কথা।

ও মণীশবাবু!—অন্ধকারে যেন আলো খুঁজে পেল তিনকড়ি।

কি খবর ভাই? মণীশ হেসে দাঁড়াল।

তিনকড়ি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, একটা দরকার আছে।

বল। কিন্তু তার আগে এই গাছের ছায়ায় এস। অনেক দূর থেকে আসছি কিনা, সেই তোমাদের, কি যেন বলে, হাঁ, নিমডাঙা থেকে।

বটগাছের ছায়ায় দাঁড়াল দুজনে।

কি দরকার, বল?

শাড়ির অভাবে যে আর চলছে না।

মণীশ হাসলে, সে জানি ভাই। সেইজন্যেই তো চারদিকে ঘোরাফেরা করছি। কাল একটা মিছিল বেরুবে, আশপাশের সব গাঁয়ের গরিবেরা দল বেঁধে ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরে যাবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে আবেদন জানাতে। তোমাকেও যেতে হবে কিন্তু।

তিনকড়ি নিজের বক্তব্য জানাবার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, সে তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললে, যাব, যাব, কিন্তু আমার যে এখুনি দরকার মণীশবাবু।

মণীশ নিরুত্তরে তাকাল তিনকড়ির দিকে।

তোমরা স্বদেশী করছ, আর এটুকু পার না?—হতাশায় নিস্তেজ করুণ হয়ে উঠল তিনকড়ির কণ্ঠস্বর।

স্বদেশী! মণীশ হাসল, মৃদুকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, তা করছি বটে, কিন্তু স্বদেশ এখনও স্বদেশ হয় নি তিনকড়ি।

সে যাকগে বাবু, আমার একটা উপকার করুন। করতেই হবে আপনাকে, বিশ্বাস না হয় তো পুঁটিকে আর বউকে একবার দেখে আসুন।

মণীশ বাধা দিল, থাক্, দুঃখ আর লজ্জাকে আর বাড়াতে চাই না ভাই। কিন্তু ব্যাপার কি বল তো, তুমি কি ফকির মিঞার কাছে যাও নি ?

ফকির মিঞা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আর ফুড কমিটির সেক্রেটারি। কাপড়ের পারমিট সেই দেয়।

গিয়েছি অনেকবার, গিয়ে গিয়ে পায়ের চামড়া ক'য়ে গেছে, কিন্তু পাই নি।

আচ্ছা, তবে এস আমার সঙ্গে, দেখি কি হয় !

চলতে চলতে তিনকড়ি ভাবে যে, একটা হিল্লে এবার হবেই। কারণ সে জানে যে, গ্রামের আর সকলের মত ফকির মিঞাও মণীশকে খুব খাতির করে।

কিন্তু হ'ল না।

ফকির মিঞা মাথা নেড়ে মণীশকে বললে, পারমিট দেবার উপায় নেই, কারণ কাপড় নেই ভাই।

কিছুতেই কি হয় না ?—মণীশ হেসে প্রশ্ন করলে।

ফকির মিঞা গড়গড়ার নলে একটা টান দিয়ে বললে, কি ক'রে হবে ? শুনলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা। গ্রামের ৮১৩টি পরিবারের চাহিদা মেটাতে ধুতি-শাড়িতে মিলে মোট কাপড় এসেছে মাত্র পঁয়ষটিখানা। বল, কাকে রেখে কাকে দিই ?

কাকে কাকে দিয়েছেন ?

যারা প্রথমে এসেছিল।

এবং যাদের মুরুব্বি ছিল, প্রভাব ছিল, নয় কি ?—মৃদু হেসে মোলায়েমভাবে বললে মণীশ।

ফকির মিঞার মুখমণ্ডলে একটু লালচে আভা খেলে গেল। মেহেদীরঙের হাল্কা ছোপ-লাগানো দাড়িটা একটু চুমড়ে সে বললে, দেখ মণীশ, তোমাকে সত্যি খাতির করি, তাই কথাটাতে রাগলাম না, কিন্তু কথাটা যে সত্যি তাতে সন্দেহ নেই। তাই ঠিক করেছি যে, পরের বারে লোকের দুঃস্থতা ও প্রয়োজন দেখেই কাপড় দেব, গরিবদের কথাই আগে ভাবব। এবার হয়ে উঠল না, কি রকম অসগায় অবস্থা হয়, তা তো জান না।

মণীশ হাসলে, বুঝি সবই। পরের বারে যা করার সদিচ্ছা করেছেন, সেটা যেন বজায় থাকে। সে যাক, আপাতত একটা পারমিট দিন আমায়, কাপড় থাক্ আর নাই থাক্। তিনকড়িকে আমি কথা দিয়েছি, আমার কথাটা রাখতে দিন। তা ছাড়া, তিনকড়ির পরিবারের লজ্জা রক্ষা হওয়া সত্যি দুষ্কর হয়েছে।

ফকির মিঞা একবার মণীশের দিকে, একবার তিনকড়ির দিকে তাকাল। তিনকড়ি বিবর্ণমুখে বিনীতভাবে অপেক্ষা করছে।

ফকির মিঞা বললে, তোমার কথা রাখব মণীশ। ব'স, পারমিট লিখে দিচ্ছি।

মণীশ বাড়ি গেল।

পারমিট নিয়ে আশায় আশঙ্কায় দুরুদুরু বুক নিয়ে ছগনলালের দোকানে গিয়ে হাজির হ'ল তিনকড়ি।

ছগনলাল মাড়ওয়ারী এই গ্রামে এসেছে দূর রাজপুতানার মরুভূমি পার হয়ে। ভারতবর্ষের সেই দূরপ্রান্তে ব'সেও সে বাংলা দেশের এক অখ্যাত পল্লীর কাপড়ের চাহিদার কথা জানতে পেরেছিল এবং সেই চাহিদা মেটাবার জন্য প্রায় পনেরো বছর আগে একটা লোটা ও এক গাঁট কাপড় কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিল। এখানকার আর আশপাশের গ্রামে প্রতি হাটবারে পুরো চার বছর কাপড় ঘাড়ে ক'রে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেছে সে। তারপর ধীরে ধীরে স্ফাতোদর গজাননের আশীর্বাদে মা লক্ষ্মীর কৃপালাভের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে এই গ্রামের বাজারের মুখে দোতলা বাড়ি হাঁকিয়ে বসেছে সে—যেমন ক'রে ইংরেজ বণিকেরা এক জাহাজ পণ্যদ্রব্য নেয়ে ব্যবসা করতে এসে ধীরে ধীরে সমুদ্রের ধারে ধারে কেল্লা গ'ড়ে তুলেছিল।

সেই ছগনলাল মধ্যাহ্নের অবকাশে ভুঁড়ির বাঁধন একটু আলগা ক'রে পাশবালিশে ভর দিয়ে গতকল্যকার হিসেবের খাতা দেখাশোনা করছিল।

বিনীতকণ্ঠে তিনকড়ি ডাকলে, শেঠজী!

শেঠজী মুখ তুললে, বললে, কি বুলছ হে?

ভক্ত যেমন ভগবানের চরণে পুষ্প-অর্ঘ্য দান করে, তেমনিভাবে পারমিটটাকে তুলে ধরলে তিনকড়ি।

কি চাই?—শেঠ আবার প্রশ্ন করল।

কাপড়, মানে শাড় একখানা—এই পারমিট।

কাপড় নেই।

এই যে পারমিট, ফকির মিঞা দিয়াছে।

ছগনলাল বিরক্তিতে উঠে বসল, মিঞা পারমিট দিইয়েছে তো হইয়েছে কি? কাপড় না থাকলে আমদানি করব কোথা থেকে আমি? যাও, আবার সামনের মাসে এসো।

একখানা না হ'লে কিছুতেই চলবে না শেঠজী—একটা দিন।

তুমি কি পাগল হলে গো, অ্যাঁ? নেই, একটাও নেই, দেখছ না আলমারিগুলান যে সব একদম খালি?

দেখছি তো—তবু একটা দিন, বড় উপকার হবে।

তবে কি আমি লেংটা হয়ে আমারটা দিব?

তিনকড়ি চুপ করল। কথা খুঁজে পায় না সে, শুধু চারদিকে তাকায়।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যে, কতকগুলো রঙিন শাড়ি দড়িতে ঝুলছে।

ওগুলো—ওগুলো কি তাঁতের নাকি?

হাঁ।

দাম?

সবচেয়ে কম দাম বারো টাকা চার আনা।

ওর চেয়ে কমে কি হয় না?

ছগনলাল চ'টে উঠল, যাও যাও, বাড়ি যাও জী—এটা তুমার তরি-তরকারির দুকান না—যাও।

শাড়ি কেনা আর হ'ল না।

কিছুদূর গিয়ে পথের ধারে, একটা শিমুলগাছের তলায় বসল তিনকড়ি। মাথা তার আবার গরম হয়ে উঠে। রোদ্দুরের তেজও বেড়েছে অসম্ভব রকমের।

সেইখানে ব'সে নিরুপায় আক্রোশে, মূল্যহীন পারমিটটাকে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলল সে। অতি দুঃখেও হাসি পেল তিনকড়ির। হাসাটা তার পক্ষে মোটেই অন্যায় নয়, কারণ রাস্তা দিয়ে যে বাজারের দিকে আসছিল, তাকে দেখে সকলেরই হাসি চাপা অসম্ভব হবে। তবে বিশেষত্ব এই যে, সেই হাসি—হাসি বলতে যা বোঝায় তা নয়—তা কান্নারই একটা হাস্য সংস্করণ বেদনাবিকৃত হাসি।

আসছিল গ্রামের পুরোহিত মহেশ ভটচাজ্জ। গলায় মোটা, ময়লা পৈতেটা ঠিকই আছে, মাথার শিখাটাও ব্রাহ্মণ্যগর্বের তাড়নায় মৃদুমন্দ দুলছিল। কিন্তু তার পরনে একটা লুঙ্গি। অভাব মানুষকে যে কত সহজে নীতি ও রীতিকে ভাঙতে বাধ্য করে, এ তারই নিদর্শন।

ভটচাজ মশায়, পেন্নাম।—তিনকড়ি এগিয়ে গেল।

কল্যাণ হোক বাবা। কি খবর তিনু, ভাল তো?

ভাল আর কই বাবাঠাকুর! কিন্তু একি হয়েছে ভটচাজ মশাই—লুঙ্গি?

ভটচাজ্জি মাথা নেড়ে হাসল, বিষাদক্লিষ্ট কণ্ঠ তার আবেগে কেঁপে উঠল, বউয়ের ছেঁড়া শাড়িটা পরার ইচ্ছেই হয়েছিল, কিন্তু বউ বললে, খবরদার মানিকের চেয়েও দামী আমার শাড়ি, ও তোমার জন্যে নয়। অগত্যা এই লজ্জা রক্ষা করতে হবে তো? তাও দাম কম নাকি? মানিক মিঞাকে 'দাদা, বাবা' ব'লে সাড়ে চার টাকায় এটা কিনেছি;

আমার এতে কোন দুঃখ নেই তিনু—যে নারায়ণ পঙ্গুকে দিয়ে পর্ব্বত লঙ্ঘান, মূককে বাচাল করেন, তিনিই ব্রাহ্মণকে বিধর্ম্মী সাজাচ্ছেন।

তিনকড়ি প্রশ্ন করলে, কেন, পূজোপার্বণে কিছু পান না?

ছাই—মানে কলা। ডান হাতের বুড়ো আঙুলটাকে নাচাল মহেশ ভটচাজ্জি, যাতে শাড়ি কাপড়ের দরকার হয়, এমন পূজো পার্বণ কজন করে আজকাল? করলেও আট আনা, এক টাকা ধ'রে দিয়ে বলে, হেঁ হেঁ, কাপড়ের জন্ত নিন পুরুতমশাই।

তিনকড়ি অতি দুঃখেও আবার হাসল।

ভটচাজ্জির সঙ্গে তিনকড়ি চলল কথা বলতে বলতে।

গাঁয়ের একজন মোড়ল—কলিমুদ্দিন সরকার আসছিল বগলের মধ্যে কি একটা গামছামুড়ি দিয়ে চেপে।

কি হে মোড়ল, কোত্থেকে?—ভটচাজ্জি প্রশ্ন করলে।

বাজার থেকে।—হেসে ফেললে কলিমুদ্দিন।

লুঙ্গি পরা দেখে হাসছ? তা হাস। কিন্তু তোমার বগলে কি হে—বড় সযত্নে নিয়ে যাচ্ছ, অ্যাঁ? ভটচাজ্জির চোখ দুটো একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

কলিমুদ্দিন একটু ইতস্তত ক'রে বললে, কাউকে বলবেন না?

না হে, না।

এক জোড়া ধুতি আনলাম মাড়ওয়ারীর কাছ থেকে।

দেখি দেখি!—সাগ্রহে একসঙ্গে ব'লে উঠল ভটচাজ্জি আর তিনকড়ি।

মিলের এক জোড়া মোটা সাধারণ ধুতি।

পারমিটে পেলে নাকি?—ভটচাজ্জি শুধোল।

হুঃ! কলিমুদ্দিন মুখ বিকৃত করলে, পারমিট পকেটেই আছে। এ ব্ল্যাক-মার্কেট। তাও চেনা জানা ব'লে, টাকা দিলেও তো পাওয়া যায় না!

কত নিলে?

পনেরো টাকা। চেয়েছিল কুড়ি।

শালা চোর কোথাকার! ম্লান হয়ে এল ভটচাজ্জির মুখ।

আর মিলের শাড়ির কথা শুনবেন? পঁচিশ ত্রিশ, তাঁতেরও ওই এক দর।

তিনকড়ি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। টাকা থাকলে সব পাওয়া যায়, নিরুপায় অবস্থাতেও উপায় হয়। যার টাকা নেই, তার অনাহার আর নগ্নতাই বিধিলিপি। অন্তত আজকালকার দিনে।

টাকার যোগাড় করতে হবে।

কিন্তু টাকা চাইলেই কি পাওয়া যায় ?

মহাজন রামকান্ত দাস মাথা নাড়ল, দশ টাকা চাইছ, কিন্তু আর কি আছে তোমার বন্ধক রাখার মত ? বকেয়া যা আছে, তার হিসেব মনে আছে তো ? কবে দেবে ?

মনে আছে। পঁচাত্তর টাকা ছ আনা। সুদ ছাড়া।

আরও অনেকের কাছে গেল তিনকড়ি। সবাই রামকান্তের মতই মাথা নেড়ে জানাল, না।

অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা দিয়েই মানুষ জীবন-দর্শন গড়ে। তিনকড়ির জীবন-দর্শনে তাই আশা নেই, আছে নিরাশা, সুখ নেই, আছে দুঃখ। তাই তার দর্শন বিয়োগান্ত, মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের স্তবকে মোড়া।

মণীশ শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, এর জন্যই তো কাল মিছিল বেরোবে। আর কিছুদিন ধৈর্য্য ধর ভাই, বিহিত একটা হবেই।

এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে বাকী দিনটা কাটিয়ে দিল তিনকড়ি। সারাটা দিন নিষ্ফল হয়ে গেল। ক্ষেতে কাজ ছিল, পণ্ড হ'ল। কালও দুপুর পর্য্যন্ত যেতে পারবে না, মিছিলে যোগ দেবে সে। স্বদেশী ছেলেদের কথাই ঠিক। একা তিনকড়ি আর তার মত অন্যান্য তিনকড়িরা কিছুই করতে পারে না। দরিদ্র আর নির্য্যাতিতের বল একতায়, সম্মিলিত শক্তিতে। হয়তো ফল ফলবে না, দলে যোগ দিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচালেই হয়তো তিনকড়ির বউয়ের জন্য একটা শাড়ি জুটবে না। তবু কাজ হবে না কি ? সবাই তো জানবে, সবাই তো শুনবে যে, নগ্নতার লজ্জায় তারা, তাদের ঝি-বউয়েরা দিনরাত চোখের জল ফেলছে।

বাড়ি ফিরতে লজ্জা হয় তিনকড়ির। সন্ধ্যে হয়ে গেলে অপরাধীর মত, চোরের মত পা টিপে টিপে সে বাড়ি ঢুকল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তিনকড়ি। নন্দলালেরা বিকেলে চ'লে গিয়েছে।

খানিক বাদেই হরিমতী ঘরে এল।

মাথা তোলবার শক্তি নেই তিনকড়ির।

হরিমতী তাকাল তার দিকে, একটু হেসে, স্নেহাতুরকণ্ঠে বললে, পেলে না, না ? না পেলে, এই ছেঁড়া শাড়িটাকে ভালভাবে পরলে বছরখানিক চ'লে যাবে, নিশ্চয়ই যাবে।

মন্থরগতিতে আবার সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রিবেলায় লজ্জা দুঃখ আরও বেড়ে গেল তিনকড়ির।

দরজা বন্ধ ক'রে, পিদিমটা নিবিয়ে দিয়ে হরিমতী বললে, অন্যদিকে মুখ ফেরাও তো।

কেন ?

দরকার আছে।

অন্ধকারে নগ্ন হয়ে দাঁড়াল হরিমতী। শাড়িটাকে অতি সন্তর্পণে, অতি যত্নে বাঁশের আলনাতে ঝুলিয়ে দিয়ে, শ্বশুরের ছেঁড়া গামছাটা দিয়ে কোমর বুক কোনরকমে ঢেকে বিছানায় এল সে।

হরিমতীর গায়ে হাত পড়তেই তিনকড়ি বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল, কি হ'ল ?

হরিমতী গম্ভীরভাবে বললে, ওই ছেঁড়া কাপড়টা প'রে গুলে পরে ওর অবস্থা যে কি হবে, তাও কি বুঝতে পারছ না ?

তিনকড়ি ঘেমে উঠল।

ভোর হতেই তিনকড়ি গিয়ে হাজির হ'ল ইস্কুলের মাঠে। সেখানেই সকলের জড় হবার কথা ছিল।

মণীশ এসেছে সেখানে, আর এসেছে গাঁয়ের প্রায় দেড়শো লোক। কয়েকজন বুড়ী আর কয়েকজন ছোট মেয়েও আছে তাদের মধ্যে। বাগদী, জেলে, তিলি, গরিব চাষী প্রায় সবাই আছে—হিন্দু মুসলমান দুইই। কাপড়ের অভাব আর অন্নের অভাব তো ধর্মের জন্য হয় নি।

আরও মিনিট দশেক বাদে তারা রওনা হ'ল। যাবার আগে মণীশ এবং গাঁয়ের আর একটি ছেলে তাদের কয়েকজনের হাতে বাঁশের টুকরোতে লাগানো পিসবোর্ড দিলে। নানা কথা লেখা ছিল সেগুলোর উপর ইংরেজী আর বাংলাতে—কাপড় চাই, মজুতদার নিপাত যাক, নগ্নতার লজ্জা নিবারণ কর, চোরাবাজার ধ্বংস কর, এমনই নানা কথা।

তারা বেরোল।

মাঝে মাঝে তারা চেঁচায়, কাপড় চাই।

একজন হাঁক দেয়, মজুতদার—

সবাই সে হাঁকের পরিপূরণ করে, নিপাত যাক।

বাজারের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তিনকড়ি তাকাল ছগনলালের দোকানের দিকে। দোকান তখনও খোলে নি, কিন্তু অন্যান্য তামাসাপ্রিয় দর্শকদের সঙ্গে ছগনলালও এসে দাঁড়িয়েছে তার দোকানের বারান্দায়। তার ঠোঁটের কোণে অবজ্ঞার মৃদু হাসি। নবীন সূর্য্যের রঙিন আলোয় তার গলার মোটা সোনার হারটা চিকচিক করে, চোখে নেশা ধরায়।

যেতে যেতে আরও দু-তিন গাঁয়ের লোকদের নিয়ে আরও চার-পাঁচজন যুবক এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে। সব মিলে প্রায় শ পাঁচেক লোক হ'ল।

শহরে পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগল। তখন আটটা বেজে গেছে।

দলবল নিয়ে মণীশ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোর সামনে হাজির হ'ল।

ফটকের সামনে একজন পুলিস ও একজন দারোয়ান ছিল।

মণীশ বললে, চেঁচাও ভাইসব।

আর কিছু বলার আগেই তিনকড়ি হাঁক দিল, কাপড় চাই—

সবাই যোগ দিল।

কাপড় চাই।

মুনাফাখোর নিপাত যাক।

চোরা কারবার বন্ধ কর।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, বিহিত কর।

কাপড় চাই।

পুলিস আর দরোয়ানটা গর্জ্জন ক'রে কি যেন বললে। কিন্তু ছোট্ট নদীর কল্লোলধ্বনি যেমন সমুদ্রগর্জ্জনের তলায় চাপা প'ড়ে যায়, তেমনই তাদের সেই ক্ষীণকণ্ঠগর্জ্জনও জনতার 'কাপড় চাই' দাবির মধ্যে মিশে হারিয়ে গেল।

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কার্টার তখন স্ত্রীকন্যা পরিবেষ্টিত হয়ে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বাইরের বিক্ষুব্ধ জনকোলাহলের ঢেউ ভেসে এল।

মিসেস কার্টার বললেন, ও কি, ডিয়ার? দেখছি আমি।

কার্টার বললেন, দি ওল্ড স্টোরি অফ নেকেড মেন—কাপড় চায়।

সবুজরঙের রেশমী পর্দ্দাটাকে স'রিয়ে মিসেস কার্টার সামনের দিকে তাকালেন। কার্টারদের মেয়ে জোয়ানও মায়ের পিছনে এসে দাঁড়াল। সামনের লনের সবুজ ঘাস আর গোলাপ-কুঞ্জের পরে, ফটকের ওধারে একদল নির্লজ্জ নগ্ন লোক ভীড় ক'রে চীৎকার করছে। কি বলছে তারা, তা মিসেস কার্টার ও জোয়ান বুঝলেন না, কেবল জনতার সংখ্যাধিক্য ও চীৎকার করার উন্মত্ত কায়দা দেখে ভীতিবিহ্বল হয়ে উঠলেন।

তাঁরা বললেন, হাউ পিটিয়েবল!

দরোয়ান রামসিং এসে সেলাম জানাল।

ক্যা বাট হ্যায় রামসিং?—কার্টার প্রশ্ন করলেন।

কাপড়া মাংতা হ্যায় হুজৌর।

মিসেস কার্টার চ'টে উঠলেন, ইধা পর কেঁও? ক্যা, ইধা কাপড়েকা ডুকান হ্যায়?

জোয়ান বললে, বাজার তো মাড়ওয়ারী কাপড়াওয়ালা নেহি হ্যায়, ডুকানমে যানে ব'লো।

কার্টার উঠে দাঁড়িয়েছেন। পাইপটাকে ধরিয়ে তিনি বললেন, চলো।

মিসেস কার্টার বাধা দিলেন, ত্রাসে তাঁর দুটো নীল চোখ যেন দুটো ইন্দ্রনীল মণির মত জ্বলছে। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসের কথা মনে আছে তাঁর।

তিনি বললেন, পিস্তলটা নাও ডার্লিং।

জোয়ানও সায় দিল, ইয়েস, ডু টেক ছাট ড্যাডি।

কার্টার হাসলেন, ননসেন্স! যারা না খেয়ে ম'রে গেলেও একটি হাত তোলে না, তারা কাপড়ের জন্ত নিশ্চয়ই আমায় খুন করবে না।

হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন মিঃ কার্টার।

মিসেস কার্টার খুশি হলেন। আজকাল আর ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস নেই। দে আর আপটু এনি লিমিট। কি করা যায়? বাইরের কোলাহল ক্রমেই বাড়ছে।

মা-মা!

ইয়েস।

কল দি পুলিস প্লীজ।

রাইট, আমিও তাই ভাবছিলাম ডিয়ার।

টেলিফোন তোলার শব্দ হ'ল।

ফটকের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন মিঃ কার্টার। পাইপ থেকে ঘন ঘন কড়া তামাকের গন্ধ বেরোচ্ছে, বাঁ হাতের মুঠোয় একটা সাদা রুমাল বারংবার নিপীড়িত হচ্ছে। তাঁর দুদিকে দাঁড়িয়েছে বন্দুকধারী পুলিস ও দরোয়ান রামসিং তাঁর বডিগার্ডের মত।

জনতা ফেটে পড়ল, যেন আকাশ থেকে বাজ পড়ল—কাপড় চাই।

চোপ রও। মিঃ কার্টার গর্জ্জন ক'রে বললেন, চুপ ক'রে শান্তভাবে বল, কি চাও।

কাপড় চাই, কাপড়ের ব্যবস্থা কর।—আবার সবাই চীৎকার ক'রে উঠল।

বাম চক্ষু একটু কুঞ্চিত ক'রে কার্টার বললেন, হোয়াট! এই, ইধার আও, আও।

সামনেই ছিল তিনকড়ি। প্রাণপণে চীৎকার ক'রে যাচ্ছিল সে। তাকেই ডাকলে কার্টার।

তিনকড়ি এক লাফে ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। ওরে বাস্ রে! সায়েব! হাকিম!

এগিয়ে গেল মণীশ।

কার্টার তার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ ক'রে প্রশ্ন করলেন, আর ইউ দি লীডার?

লীডার নই, তবে এরা যা বলতে চায়, তা আমি আপনাকে বলব।

বল, দেন সে।—পাইপটা দাঁতের মধ্যে চেপে ধরলেন কার্টার।

ফল কিছুই হ'ল না। অর্থহীন আশ্বাসবাণী দিয়েই কর্তার তাদের বিদায় দিয়ে আবছা আবছা আশ্বাস। ব্যবস্থা হবে একটা। কিন্তু কবে, কি, সে সব বিষয়ে শব্দ নেই।

তিনকড়ি খুশি হ'ল না। এত হাঁটাহাটি, এত চেঁচামেচি ক'রে ফল হ' শহরের বড় রাস্তায় আরও ঘণ্টাখানেক ঘুরে শেষে মিছিল ভেঙে গেল। তখন দশটা।

তিনকড়ি ভাবলে, একবার চেষ্টা করা যাক। যদি শহরে এক-আধটা কাপড় পাওয়া যায়।

কিন্তু তা কি হয়? ব্ল্যাক-মার্কেট নামক চোর আর জুয়াচোরদের যে বিরাট সৃষ্ট হয়েছে, সেখানে আজকাল অতিপরিচয়ের সার্টিফিকেট না থাকলে কাপড় দুঃসাধ্য। আর যা পাওয়া যায়, তা কেনার মত টাকা নেই তিনকড়ির।

তিনকড়ি বাড়ি ফিরল।

সন্ধ্যাবেলা পুঁটীর জ্বর এসেছে। ম্যালেরিয়া। কাঁথা মুড়ি দিয়ে মেয়েটা ঘ হয়ে প'ড়ে আছে।

খাওয়াদাওয়া সেরে তিনকড়ি ক্ষেতে গেল বলদ দুটোকে নিয়ে। বলদ চেহারা দেখলে কান্না পায়। রোগা, টিংটিং করছে, হাড়গুলো জিরজির বেশিদিন বাঁচবে না ওরা। তখন যে কি হবে, তা তিনকড়ির বিধাতাপুরুষও জানে

হরিমতী মুশকিলে পড়ল। বাড়িতে জল নেই, বাসনগুলোও মাজতে হবে, পুঁটীর জ্বর।

কি আর করা যায়, বাধ্য হয়ে বেরোতে হ'ল।

কাপড় ভালভাবে গায়ে জড়ালেই কি সব ঢাকা পড়ে? নিতম্বের নীচে. পাশটায় মানুষের চোখ গিয়ে পড়বেই।

পুকুর খুব দূরে নয়।

যে ঘাটে সাধারণত ভীড় হয়, সেখানে গেল না হরিমতী। লজ্জা। একটু এ একটু নির্জনে, জলের ধারে গিয়ে বসল সে। আষাঢ় মাসের শেষের দিকে নেমেছিল, ভরা পুকুরের জল থইথই করছে। হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায়

বাসনগুলো মেজে প্রায় শেষ ক'রে এনেছে হরিমতী। এমন সময় কে যেন থেকে শিস দিলে।

হরিমতী চমকে তাকাল। তার দেহের অনাবৃত অংশগুলোকে খাতলোভী মত লেহন করছে গাঁয়ের বখাটে ছোকরা অবিনাশের দুটো চোখ।

জায়গায় পুরোনো পচা কাপড়টা ছিঁড়ে গেল।

অবিনাশ হেসে বললে, আহাহা, লজ্জায় চোটে শাড়িটা ছিঁড়লে যে!

তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করব মুখপোড়া, পুঁটীর দাদা বাড়িতে আসুক।—বল হরিমতী।

অবিনাশ আবার হাসল, ছাই করবে। কেন, আমি কি অন্যায় করছি বাব তোমায় জাপটেও ধরি নি, খারাপ কিছুও বলি নি, কেবল দেখছি। তোমরা দেখা জিনিস আর ভগবানও চোখ দিয়েছেন দেখবার জন্যে, তাই দেখছি। এতে দোষ কি?

বাসনগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে, বালতিটা জলে ভ'রে হরিমতী রাস্তা ধরল।

অবিনাশ বললে, তোমার একটা শাড়ির দরকার, যোগাড় ক'রে দিতে পারি আ নেবে? শুনছ?

হরিমতী ছুটতে ছুটতে মনে মনে ডাকলে, ঠাকুর, ঠাকুর!

ঠাকুর নামক প্রাণীটি সাড়া দিল না।

কেঁদে ফেললে হরিমতী আকুলভাবে হাউহাউ ক'রে।

তিনকড়ির শিরাগুলো দপদপ করছে উত্তেজনায়, বললে, চুপ। একটা কথাও চুপ।

হরিমতী কান্নার মধ্যেও তুবড়ি-কাটার মত গর্জে উঠল, চুপ কি? চুপ করব শাড়ি দাও এনে যে ক'রে হোক।

কি ক'রে আনব? চুরি করব?

কর।

বেশ, তাই যাচ্ছি।

বেরিয়ে গেল তিনকড়ি। রাত তখন বেশি হয় নি, তাদের খাওয়াও হয় কেবল বুড়ো এককড়ি সন্ধ্যে পড়তেই খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে।

সত্যি গেল লোকটা?

চোখ মুছে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হরিমতী ডাকলে, ওগো, কোথায় গেলে? পড়ি, খেতে এস, খেতে এস।

তিনকড়ি আর খেতে এল না।

মাঝরাতে ছগনলালের দোকানে, মানে—বাড়িতে একটা শাড়ি চুরি করতে গিয়ে পড়ল সে।

ফল কিছুই হ'ল না। অর্থহীন আশ্বাসবাণী দিয়েই কর্তার তাদের বিদায় দিয়েছেন—আবছা আবছা আশ্বাস। ব্যবস্থা হবে একটা। কিন্তু কবে, কি, সে সব বিষয়ে কোন শব্দ নেই।

তিনকড়ি খুশি হ'ল না। এত হাঁটাহাটি, এত চেঁচামেচি ক'রে ফল হ'ল কি? শহরের বড় রাস্তায় আরও ঘণ্টাখানেক ঘুরে শেষে মিছিল ভেঙে গেল। তখন বেলা দশটা।

তিনকড়ি ভাবলে, একবার চেষ্টা করা যাক। যদি শহরে এক-আধটা কাপড় সস্তায় পাওয়া যায়।

কিন্তু তা কি হয়? ব্ল্যাক-মার্কেট নামক চোর আর জুয়াচোরদের যে বিরাট আড়ত সৃষ্ট হয়েছে, সেখানে আজকাল অতিপরিচয়ের সার্টিফিকেট না থাকলে কাপড় পাওয়া দুঃসাধ্য। আর যা পাওয়া যায়, তা কেনার মত টাকা নেই তিনকড়ির।

তিনকড়ি বাড়ি ফিরল।

সন্ধ্যাবেলা পুঁটার জর এসেছে। ম্যালেরিয়া। কাঁথা মুড়ি দিয়ে মেয়েটা অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে আছে।

খাওয়াদাওয়া সেরে তিনকড়ি ক্ষেতে গেল বলদ দুটোকে নিয়ে। বলদ দুটোর চেহারা দেখলে কান্না পায়। রোগা, টিংটিং করছে, হাড়গুলো জিরজির করছে। বেশিদিন বাঁচবে না ওরা। তখন যে কি হবে, তা তিনকড়ির বিধাতাপুরুষও জানে না।

হরিমতী মুশকিলে পড়ল। বাড়িতে জল নেই, বাসনগুলোও মাজতে হবে, এদিকে পুঁটার জর।

কি আর করা যায়, বাধ্য হয়ে বেরোতে হ'ল।

কাপড় ভালভাবে গায়ে জড়ালেই কি সব ঢাকা পড়ে? নিতম্বের নীচে, বুকের পাশটায় মানুষের চোখ গিয়ে পড়বেই।

পুকুর খুব দূরে নয়।

যে ঘাটে সাধারণত ভীড় হয়, সেখানে গেল না হরিমতী। লজ্জা। একটু আড়ালে, একটু নির্জ্জনে, জলের ধারে গিয়ে বসল সে। আষাঢ় মাসের শেষের দিকে খুব বৃষ্টি নেমেছিল, ভরা পুকুরের জল থইথই করছে। হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায়।

বাসনগুলো মেজে প্রায় শেষ ক'রে এনেছে হরিমতী। এমন সময় কে যেন পেছন থেকে শিস দিলে।

হরিমতী চমকে তাকাল। তার দেহের অনাবৃত অংশগুলোকে খাজলোভী কুকুরের মত লেহন করছে গাঁয়ের বখাটে ছোকরা অবিনাশের দুটো চোখ।

ভাল ক'রে শাড়িটা টেনে আর একটু ভব্য হবার চেষ্টা করতেই ফঁ্যাস ক'রে এক জায়গায় পুরোনো পচা কাপড়টা ছিঁড়ে গেল।

অবিনাশ হেসে বললে, আহাহা, লজ্জায় চোটে শাড়িটা ছিঁড়লে যে!

তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করব মুখপোড়া, পুঁটীর দাদা বাড়িতে আসুক।—বললে হরিমতী।

অবিনাশ আবার হাসল, ছাই করবে। কেন, আমি কি অন্যায় করছি বাবা? তোমায় জাপটেও ধরি নি, খারাপ কিছুও বলি নি, কেবল দেখছি। তোমরা দেখবার জিনিস আর ভগবানও চোখ দিয়েছেন দেখবার জন্তে, তাই দেখছি। এতে দোষ কি?

বাসনগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে, বালতিটা জলে ভ'রে হরিমতী রাস্তা ধরল।

অবিনাশ বললে, তোমার একটা শাড়ির দরকার, যোগাড় ক'রে দিতে পারি আমি, নেবে? শুনছ?

হরিমতী ছুটতে ছুটতে মনে মনে ডাকলে, ঠাকুর, ঠাকুর!

ঠাকুর নামক প্রাণীটি সাড়া দিল না।

কেঁদে ফেললে হরিমতী আকুলভাবে হাউহাউ ক'রে।

তিনকড়ির শিরাগুলো দপদপ করছে উত্তেজনায়, বললে, চুপ। একটা কথাও না, চুপ।

হরিমতী কান্নার মধ্যেও তুবড়ি-ফাটার মত গর্জ্জে উঠল, চুপ কি? চুপ করব না, শাড়ি দাও এনে যে ক'রে হোক।

কি ক'রে আনব? চুরি করব?

কর।

বেশ, তাই যাচ্ছি।

বেরিয়ে গেল তিনকড়ি। রাত তখন বেশি হয় নি, তাদের খাওয়াও হয় নি। কেবল বুড়ো এককড়ি সন্ধ্যে পড়তেই খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে।

সত্যি গেল লোকটা?

চোখ মুছে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হরিমতী ডাকলে, ওগো, কোথায় গেলে? পায়ে পড়ি, খেতে এস, খেতে এস।

তিনকড়ি আর খেতে এল না।

মাঝরাতে ছগনলালের দোকানে, মানে—বাড়িতে একটা শাড়ি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল সে।

হৈ-চৈ চেঁচামেচি ক'রে অনেক লোক জড় করল ছগনলাল। কি মারটাই খেল তিনকড়ি! প্রহারে প্রহারে জর্জ্জরিত হয়ে নির্জীব হয়ে পড়ল সে। গ্রামের যারা এসেছিল, লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু ক'রে ফিরে গেল তারা। ছগনলালকে মনে মনে তারা সমর্থন করলে না বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে তিনকড়িকে ছাড়াবার সাহস হ'ল না তাদের। হাজার হোক, তিনকড়ি যে চোর হয়ে গেল।

ছগনলালের লোকেরা শেষরাত্তে তিনকড়িকে বেঁধে থানায় দিয়ে এল।

হাজতের মধ্যে বাঁধা অবস্থায় প'ড়ে রইল তিনকড়ি। বেদনায়, বিক্ষোভে তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। অসহ্য জ্বালায়, দুঃখে সে শুধু মাথার চুল টেনে ছিঁড়বার চেষ্টা করতে লাগল।

মণীশের কানে খবরটা এল বেলা নটা নাগাদ। নিরীহ শান্ত তিনকড়ি নিজেকে সামলাতে পারে নি। গ্রামের দু-একজন তাকে অনুরোধ করলে একটা কিছু করার জন্ত।

মণীশের দুঃখ হ'ল। নিজের কাজের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ অনুভব ক'রে সে তাড়াতাড়ি বেরোল। মানুষ চেয়ে চেয়ে না পেলে করবে কি? সহস্র সহস্র বৎসরের সভ্যতায় মানুষ যে শিক্ষা পেয়েছে, আজ এক মুহূর্ত্তে সেই শিক্ষাকে অগ্রাহ্য ক'রে মানুষ কি ক'রে নগ্নতাকে স্বীকার ক'রে নেবে? আর নীতির দিক থেকেই বা কি খারাপ করেছে তিনকড়ি? পুরোনো নীতিই কি ধ্রুব হয়ে থাকবে? প্রয়োজনের, অভাবের নীতি যে আলাদা।

ছগনলালকে ধরল গিয়ে সে।

ছগনলাল বুঝেও বুঝবে না, সব শুনেও মাথা নাড়ল সে, উসব হবে না মণীশবাবু, শালা চোর, ওর জেল হওয়াই উচিত।

মণীশ উঠে দাঁড়াল, চোখ দুটো তার জ্ব'লে উঠল, উচিত-অনুচিতের বিচার আপনি করবেন না। শেষবারের মত হাতজোড় ক'রে অনুরোধ করছি আপনাকে ছগনলালজী। গরিব মানুষ, যা মার খেয়েছে, তাতেই ওর অপরাধের বড় শাস্তি হয়েছে, জেলে আর পাঠাবেন না ওকে। একটা সংসার নষ্ট করলে কিন্তু আপনারও ভাল হবে না। তা ছাড়া আপনিই এসবের জন্ত দায়ী, এ আমি প্রমাণ করতে পারি।

ছগনলাল কথাগুলো শুনে কি যেন ভাবলে মণীশের দিকে তাকিয়ে। রাজনীতির আবর্ত্ত সেও লক্ষ্য করছে, হয়তো দূর থেকে কৌতূহলবশত। তবু লক্ষ্য করছে। সে আজ হঠাৎ অনুভব করলে যে, কালের চাকার ঘর্ঘরধ্বনিতে একদিন যখন ইতিহাসের অমোঘ বাণী ঘোষিত হবে, একদিন যখন তাদের রাজত্ব শেষ হবে, তখন হয়তো এক

নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে তাকেও হাতজোড় ক'রে দাঁড়াতে হবে। সেদিন এরা শত্রু হয়ে থাকলে ফল ভাল হবে না।

ছগনলালও দাঁড়িয়ে বললে, আপনার কথা মেনে নিলাম মণীশবাবু, শুধু আপনার জন্য ওকে ছেড়ে দেব, চলেন।

থানায় গেল দুজনে।

নেই। তিনকড়িকে আধঘণ্টা আগে সদরে চালান দেওয়া হয়েছে।

ছগনলালকে খুব বুঝিয়ে সদরে নিয়ে গেল মণীশ।

খবর পেয়ে পাশের বাড়ির তারিণীকে হাতে পায়ে ধ'রে সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়েছিল বুড়ো এককড়ি। বুড়ো, অন্ধ মানুষ, লাঠিতে ভর দিয়ে, তারিণীর পেছন পেছন ঠুকঠুক করতে করতে থানায় গিয়ে হাজির হয়েছিল।

দেখাও পেয়েছিল তিনকড়ির। সে একটা কথাও বললে না, শুধু কাঁদলে।

দারোগাবাবু বললে, আমি কি ক'রে ছাড়ি বুড়ো? আসামী যে। তুমি বরং ছগনলালকে ধর গিয়ে।

ছগনলালের দোকানে গেল বুড়ো।

ছগনলাল নেই, সে নাকি এই একটু আগে বেরিয়েছে।

বাড়ি ফিরে দাওয়ার ওপর ব'সে প্রায়ান্ধ বুড়ো কেঁদে কেঁদে বললে, পারলাম না গো মা, পারলাম না আনতে।

কাঠ হয়ে ব'সে রইল হরিমতী।

ঘরের ভিতর থেকে পুঁটী ডাকছিল, বউদি, অ বউদি, খিদে পেয়েছে গো, একমুঠ মুড়ি দে।

জবাব দিল না হরিমতী।

রান্নাঘরে গিয়ে উনুন ধরাবার চেষ্টা করল হরিমতী। পারল না, ধরাল না। ধোঁয়া নেই, অথচ চোখ দিয়ে তার দরদর ক'রে জল পড়ছে।

হরিমতী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তিনকড়ির জেল হয়েছে অনেকদিনের জন্য। ঘোর অভাবের সংসারে উপার্জ্জনক্ষম কেউ নেই। বুড়ো শ্বশুর, বাচ্চা ননদ, সে নিঃসম্বল, অসহায়া স্ত্রীলোক। মা বাপ নেই, ভাই নেই, কেউ নেই আর। ছিল স্বামী, গেছে। সব বন্ধক রেখেও পেটের খিদে মিটবে না, দেহের নগ্নতা দিন দিন বাড়বে, কদর্য্য ইঙ্গিত আর লালসাময় দৃষ্টিতে স্নাত হবে সে অহরহ। মানুষের দুর্দ্দিনে, দুর্দ্দশায় অন্য মানুষের পশু-প্রকৃতি বাড়ে, এই চিরন্তন ইতিহাস। সব কিছুর বিনিময়ে এক গ্রাস অন্ন আর এক ফালি ন্যাকড়ার লোভ দেখিয়ে হয়তো বাঁচবার আমন্ত্রণ জানাবে অনেকে। কি লাভ বেঁচে থেকে?

শুধু তাই নয়। বৃশ্চিকদংশনের মত একটা জ্বালা তার বুক পুড়িয়ে খাক ক'রে দিচ্ছে। সে, সে-ই স্বামীকে চুরি করতে বলেছিল। একমাত্র সে-ই দায়ী এই সর্ব্বনাশের জন্ত। কি লাভ বেঁচে থেকে ?—আবার ভাঁবে হরিমতী।

সন্ধ্যাবেলায় তিনকড়িকে নিয়ে মণীশ ফিরে এল। তিনকড়িকে মুক্ত করেছে সে।

তিনকড়ির বাড়ির সামনে আসতেই কান্নার শব্দ শোনা গেল, আর কোলাহল।

কি ব্যাপার ?—মণীশ প্রশ্ন করলে।

তিনকড়ি কিছু বুঝতে পারল না, বললে, জানি না তো।

বোধ হয় তোমার জন্তে কাঁদছে।

হবে।

বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই তারা দেখলে যে, উঠোনের মাঝখানে হরিমতীর অর্দ্ধ-নগ্ন দেহটা প'ড়ে আছে। তার মৃত চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত। তাকে ঘিরে দু-তিনজন প্রাচীনবয়স্কা স্ত্রীলোক, পুরুষ ও কয়েকজন ছোকরা। দাওয়ার ওপর পুঁটী আর এককড়ি।

তারিণীও ছিল, সে বললে, মুখুজ্জেদের বাগানে গলায় দড়ি দিয়েছিল। এক ঘণ্টা আগে গরু চরিয়ে ফেরবার সময় দেখতে পাই, মধুকে থানায় পাঠানো হয়েছে খবর দেবার জন্তে।

মণীশ স্তব্ধ হয়ে গেল।

তিনকড়ি বোধ হয় টলছে।

শত পুত্রের শোকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যেমন কেঁদেছিল, একটি পুত্রবধূর জন্ত তার চেয়েও বেশি কাঁদছে বুড়ো এককড়ি। তার লোলচর্ম্মের ওপর অশ্রু চকচক করছে।

মণীশ ভাবে। পরাধীন দেশের মানুষেরা কি শেয়াল কুকুর! এত দুর্ব্বল, এত অসহায় তারা—এত অসহায়! এক ফালি লজ্জা-নিবারণের কাপড়ের জন্ত এমন বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে! সে মুখ ফিরিয়ে নিলে। এইসব কান্না, হরিমতীর ওই অর্দ্ধ-নগ্ন শবদেহ তাকে লজ্জা দিচ্ছে, তার পৌরুষকে ধিক্কার দিচ্ছে।

একটা হিংস্রতা ঘনিয়ে এল তিনকড়ির চোখে, শত্রুদের সামনে পেলে সৈনিকের চোখে যেমন হিংস্রতা ঘনায়। অনেক, অনেক অদৃশ্য শত্রুরা যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দেহের মাংসপেশীগুলো তার ফুলে উঠল। সেই অদৃশ্য শত্রুদের দু হাতের নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবার একটা দুর্নিবার পিপাসা যেন তার দশটা আঙুলের দশটা নখের ডগায় এসে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

সে কাঁদবে না।

শ্রীনবেন্দু ঘোষ

গান্ধীজী

যা হয় হোক !
এবারে যখন দেখেছি তোমার রুদ্র চোখ ;
আর ত আমার দ্বন্দ্ব নাই ।
চিনেছি আমার চিরন্তন—
যুদ্ধের মাঠে ঘনালো ত তবে নিয়তির
শেষ নিমন্ত্রণ !
অধিনায়ক !
তৈরি তাই
বাজাও শাঁখ : ভাঙায় হাঁক
ছুটিয়া যাই ।

প্রশ্ন নাই—
হিংসা কিংবা অহিংসাই !
বহ্নিমন,
এ প্রাণপণ
বিজয় অথবা বীরমরণ !
বুঝেছি তাই,
বোঝাতে চাই,
স্বাধীনতাই শেষস্বপন ।
আমার দু হাতে আমার মাটিরে আমিই
করিব নিয়ন্ত্রণ ।

মীমাংসার দুর্বিনয়
কিছুতে আর সহ্য নয় ।
জিঘাংসার অহংকার
ভেঙেছে ত বারংবার
প্রসার আমার প্রসঙ্গেই—
মনে কি নেই ? মনে কি নেই ?

বুটে ও বুলেটে হয়রানি :
পার করে দেওয়া কালাপানি :
মুখের রুটিরে, টুঁটি টিপে ধ'রে, মুখস্থ
করা সবখানি :
সব জানি, সব মানি
কুচক্র !
আমারি রক্তে ভেজানো তক্তে ব'সে আছে
যারা সুবক্র :
সে নক্র !

গান্ধীজী ! গান্ধীজী !
এবারে তোমার বুঝেছি হিসেব হিজিবিজি
চূড়োন্ত !
রক্তে আমার তুললে কি ঝড় দুরন্ত !
সন্ন্যাসী !
কবির আকাশ, কবির সাগর যুদ্ধে যে ওঠে
উল্লাসি !

কাপুরুষ
ভানছে কেবল রুশের তুঁষ :
বুঝছে না :
দেশের মাটির গভীর প্রণামে কি রক্ত
দিল লালসেনা !
বুঝবে কি ?
বুঝছে কেবল 'উজবেকি'
'তুর্কমান'
মস্কোতেই মত্তপ্রাণ—
আগস্টের সৈনিকের, চীন দেশের দৈনিকের
শুনবে কখন্ অসম্মান ?

লালসেনা ! সে যোদ্ধায়
প্রণাম করি সশ্রদ্ধায় !
কিন্তু হায় অন্ধকে
কেমনে বোঝাই, বন্ধ কে ?

বিশ্ব কিংবা স্বদেশ তার,
চূড়ান্তিক চমৎকার !

ভুলতে দাও—
রঙিন নেশায় মৌতাতীদের রঙের ঘোরে
ঢুলতে দাও।
লক্ষ্য ঠিক
সুনির্ভীক
নয়ী ভারত নির্নিমিখ
পথে তোমার। অধিনায়ক !
নকল রৌদ্রে হাওয়ায় উর্দ্ধে গড়ছে যারা
মীনামহল
মোমের লোক
বুনছে যারা
বুনতে দাও শুকনোমূল ঝুটাকমল।

হাসছে ওই ঈশানকোণ
দীর্ঘ দূর আঁধার বন
রুদ্ধশ্বাস,
অরণ্যের বক্ষ ফের দেখছে নীল পূর্ব্বাভাস।
তৈরী তাই
চিন্তা নাই
সবখানে
ঝাঁপ দেবার প্রতীক্ষায় গুনছে দিন ময়দানে
জলে ও জলায়, জঙ্গলে
সাগরে, পাহাড়ে, হাজারে হাজারে, কাতারে
কাতারে, দঙ্গলে।

অধিনায়ক ! অধিনায়ক !
কবির স্বপ্ন সত্য হোক !
হানো শায়ক—
শুভ্র-সূর্য্যে চিতায় তুলিয়া রুদ্র-সূর্য্য
উদয় হোক।
জাগে ভারত, জাগে আকাশ অলক্তক !

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

কয়েকখানি নাট্যগ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন তথ্য

৩

হরধনুর্ভঙ্গ নাটক। ১২৮৮ সাল (২৮ জুলাই ১৮৮১)। বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত। পৃ. ৵০+১২০

ইহা একখানি সুলিখিত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য ; রচয়িতা—রাজকৃষ্ণ রায়। রাজকৃষ্ণ কেবল সুকবি নহেন, সুদক্ষ অভিনেতা ও খ্যাতনামা নাট্যকারও ছিলেন। কলিকাতার সাধারণ-রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্ম তিনি অনেকগুলি নাট্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; এগুলির মধ্যে পৌরাণিক নাটকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহার প্রথম নাট্যগ্রন্থ—'পতিব্রতা' একখানি পৌরাণিক নাটক, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। রাজকৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে রঙ্গালয়ে পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য-যুগের প্রবর্ত্তক বলা চলে।

আলোচ্য নাটকখানির একটি অভিনবত্ব আছে। অভিনয়-সৌকর্য্যার্থে বাংলা নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিরাট্ সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া রাজকৃষ্ণই সর্ব্বপ্রথম

এই ছন্দে 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকখানি রচনা করেন। এই আভিনয়িক ছন্দের উপযোগিতা বুঝাইবার জন্ম গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। আমরা ভূমিকাটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দুই তিন জন সুদক্ষ অভিনেতার অনুরোধে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে এই "হরধনুর্ভঙ্গ নাটক" খানি লিখিতে হইল। তাঁহাদের অনুরোধ, নাটক খানি গদ্যে না হইয়া পদ্যে হইলে বড় ভাল হয়, অথচ পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে লিখিয়া দেওয়াও চাই। সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত ছন্দে লিখিয়া শেষ করা যে কি পর্য্যন্ত দুর্ঘট, তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্ম আমি ইহার অধিকাংশ স্থলে "ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের" দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক প্রকার অনুরোধ রক্ষা করিলাম।

"এ দেশে কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ বাহির করেন। চতুর্দ্দশ অক্ষরে মিত্রাক্ষরিক পয়ার ছন্দ বাঙ্গালায় বহুদিন হইতে প্রচলিত, মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ সেই চতুর্দ্দশটি অক্ষরেই গ্রথিত। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে উক্ত কবির মেঘনাদবধ কাব্য খানি নাটকাকারে সজ্জিত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের কথাবার্ত্তায় কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যে রূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই উচ্চারণ ও প্রয়োগাদিকে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন ও সুন্দর অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়কারিদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদবধের চতুর্দ্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গির অনুগত হইয়া, আমাদের কর্ণে কেমন আর একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল। তখন বোধ হইয়াছিল, যেন মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আর এক প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রসূত হইতেছে। সেই আভিনয়িক ছন্দের পক্ষপাতী হইয়া, আমি এক সময়ে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও অসাধারণ-নট-চূড়ামণি ৺বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে, ঐ রূপ ছন্দের নাটক সৃষ্টি করিয়া অভিনয় করিতে অনুরোধ করি, তাহাতে তিনি বলেন যে, "এখন মাইকেলের অমিত্রাক্ষরই চলুক; ক্রমে ক্রমে পাকিয়া কিছু কাল পরে রঙ্গ-ভূমির অভিনেতারা এই মাইকেলী ছন্দ হইতে আভিনয়িক ছন্দের মৌখিক কবি হইয়া অভিনয় ক'রতে পারিবেন।" ইংলণ্ডেও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। শরচ্চন্দ্র বাবুর সেই কথা আমার মনে জাগিয়া ছিল। এখন দেখিতেছি, ফলেও তাহাই দাঁড়াইতে চলিল। শুভক্ষণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ দেখা দিয়াছিল, এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল, নহিলে আধুনিক "ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ" বাঙ্গালায়

হইত কি না সন্দেহ। এই ছন্দ আভিনয়িক নাটকের পক্ষে "জলবৎ তরল" এবং লেখকের পক্ষেও তাহাই। লোকের অনুরোধে বা নিজের ইচ্ছায় দুই চারি দিনের মধ্যে এক এক খানা বড় বড় নাটক পত্তে লিখিতে হইলে এই "জলবৎ তরল" ছন্দই—এই অমিত্রাক্ষর-ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দই—বিশেষরূপে উপযোগী। সুতরাং এই হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের অধিকাংশ স্থলেই ইহারই অনুসরণ করা হইয়াছে।... .

"ইংলণ্ডে কোন কোন অভিনেতৃসম্প্রদায় সেক্ষপীর, বেন্ জন্‌সন্, অট্‌ওয়ে, ইয়ং প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবিদিগের ছন্দোময় নাটকের ছন্দ এইরূপ আভিনয়িক ভাঙা ছন্দে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। অভিনয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া, তাঁহারা এই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের হাওয়া উড়াইয়াছেন। সেই হাওয়া যে, আমাদেরও গায়ে লাগিয়াছে, তাঁহা বলা বাহুল্য, কেন না ইংরাজি আমাদের বর্ত্তমান রাজভাষা।...

"মহাকবি সেক্ষপীর তদীয় জগদ্বিখ্যাত নাটকাবলীর মধ্যে গগু ও পগু উভয় ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার পত্তভাগ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; (১) মিত্রাক্ষর ও (২) অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মিত্রাক্ষর অপেক্ষা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভাগ অনেক বেশী। তিনি যে যে স্থলে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তত্তৎস্থলে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্থলে সে নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা দেখিতেছি, তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মহাকবি মিল্টন প্রভৃতির অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায় নিয়ম-বদ্ধ নহে, অভিনয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া নানাবিধ ছোট বড় পংক্তিতে ক্রমান্বয়ে গ্রথিত। সুতরাং উক্ত ছন্দকে আমরা ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা আভিনয়িক ছন্দ বলি। উহা এরূপভাবে লিখিত হইয়াছে যে, উহাকে পগ্যাকার গগুও বলা যাইতে পারে। আমরা কলিকাতাস্থ থিয়েটার রএল ও করিন্থিয়ান থিয়েটরে ইংরাজ অভিনেতৃগণ কর্ত্তৃক অভিনীত উক্ত মহাকবির 'হ্যাম্‌লেট্', 'ম্যাক্‌বেথ্', 'কিং লিয়ার', 'মাচ্ এডো এবাউট নাথিং', 'ওথেলো' প্রভৃতি নাটকগুলির আভিনয়িক বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া বোধ করিয়াছিলাম যেন স্বাভাবিক গদ্যে কথা কহা হইতেছে। দেশীয় রঙ্গভূমিতেও সেইরূপ হওয়া উচিত।

"আমি ১২৮৫ সালে "নিভৃতনিবাস" নামক এক খানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করি। তাহার দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ এইরূপ ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু খণ্ড কাব্য প্রভৃতিতে ইহা যেন "এক ঘেয়ে" হইয়া দাঁড়ায় দেখিয়া, অধিক লিখি নাই। যাহা হউক, এ স্থলে সেই স্থান তুলিয়া দিতেছি। (মৃতপত্নীর পার্শ্বে বসিয়া উন্মত্তভাবে) বিজয় বলিতেছেন ;—

প্রিয়তমে !—মনোরমে !
উঠ উঠ, বেলা হ'ল ;

উঠ না হে,
উঠ না হে,
থাক শুয়ে—থাক শুয়ে।
আমি কি নির্দ্দয়,
হায়,
জাগাই তোমায় তাই,
থাক শুয়ে,
উঠিও না,
খুল না খুল না আঁখি ;··

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ ;
অগ্নিচক্র মধ্যাহ্ন তপন ;
সূর্য্যকরে বিদগ্ধ ধরণী।
ডাকে না বিহঙ্গ শাখে,
রুদ্ধকণ্ঠে বসিয়া নীরবে।
প্রকৃতির প্রভাতের হাসি নাহি আর ;
মূর্চ্ছিত হইয়া যেন আকুল-হৃদয়া।
বহি'ছে গঙ্গার বারি, ধীরি ধীরি গতি,
নির্জ্জন প্রদেশে।
তরী নাহি একখানি ;
কেমনে হ'বেন পার রাম রঘুমণি
লক্ষ্মণের সনে ?
অয়ি গঙ্গে পতিতপাবনি !
কর পার ভব-সিন্ধু-পার-কাণ্ডারীরে,
দয়াময়ি ! (পৃ. ৪৪)

বাংলা নাটকে—কাব্যেও বটে—ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক-রূপে যে-সম্মান রাজকৃষ্ণ রায়ের ন্যায্য প্রাপ্য, তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়া আসিতেছেন। গিরিশচন্দ্রের জীবনীকারগণ গিরিশচন্দ্রকেই এই আভিনয়িক ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-লিখিত গিরিশ-জীবনীতে প্রকাশ :—

"রাবণবধ নাটকে গিরিশচন্দ্র ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ—প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।

* মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রচলন করিলেও পয়ারের ন্যায় চতুর্দ্দশ অক্ষর বজায় রাখিয়াছিলেন,—এই চতুর্দ্দশ অক্ষর থাকিয়া অনেক সময়ে ছন্দের স্বচ্ছন্দগতি ব্যাহত হয়, 'মেঘনাদবধ' অভিনয় ও তাহার শিক্ষাদানকালে গিরিশচন্দ্র ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যথা—

"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ ;" ইত্যাদি।

"চতুর্দ্দশ অক্ষরের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে ছন্দ আরও স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও সুমধুর হয় এবং তাহা অর্ধকাংশ স্বল্পশিক্ষিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের আয়ত্তাধীন করিবার পক্ষেও বিশেষ সুবিধা হয়—গিরিশচন্দ্রের এই ধারণা জন্মে।··· ('গিরিশচন্দ্র', পৃ. ২২৮)

রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের সহিত পরিচয় থাকিলে বা ইহার প্রকাশকাল সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকিলে গিরিশচন্দ্রের চরিতকারগণ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন কি না সন্দেহ। 'হরধনুর্ভঙ্গ' ও 'রাবণবধ' একই বৎসরে প্রকাশিত হয় ; উভয় নাটকেরই আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল—"১২৮৮ সাল" মুদ্রিত আছে। কিন্তু তারিখ ও মাসের উল্লেখ না থাকায় কেবলমাত্র সাল দ্বারা কোন্‌খানি আগে, কোন্‌খানি পরে প্রকাশিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কঠিন হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে। বাংলা দেশে প্রতি বৎসর যত পুস্তক মুদ্রিত হয়, মুদ্রাকরের প্রেরিত বিবরণী হইতে সেগুলির নামধাম প্রকাশকাল আদি সঙ্কলন করিয়া গবর্মেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরি চারি কিস্তিতে 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের গেজেট হইতে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' ও গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধে'র সঠিক প্রকাশকাল সংগ্রহ করিয়াছি।

'রাবণবধ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—৫ নবেম্বর ১৮৮১ তারিখে। নাটক প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই রঙ্গালয়ে তাহার অভিনয় হইয়া থাকে—ইহাই প্রথা। 'রাবণবধ'ও পুস্তকাকারে প্রকাশের তিন মাস পূর্ব্বে—৩০ জুলাই ১৮৮১ তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বগামী। তাঁহার 'হরধনুর্ভঙ্গ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—২৮ জুলাই ১৮৮১ তারিখে এবং বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় তাহারও পূর্ব্বে।

রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠুন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। নতুবা কাহারও গুণাপকর্ষণ করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য নহে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনপদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আট

গ্রামখানির দিকে দিকে বার্ত্তা র'টে গেল, বড় ইংরেজী ইস্কুল হবে। কৃষ্ণ চাটুজ্জের সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে হাসিমুখে মৃত্যুকামনায় কাশীযাত্রা দেখবার জন্ম যারা এসেছিল, তারাই সংবাদটা বহন ক'রে নিয়ে গেল। চাটুজ্জের এই কাশীযাত্রা দেখে মনের মধ্যে শ্মশান-বৈরাগ্যের যে স্পর্শ তারা অনুভব করেছিল, সে অনুভূতি শরতের মেঘের মত স্বল্প কিছুক্ষণের জন্ম ছায়ার বিষণ্ণতা বিস্তার ক'রেই মিলিয়ে গেল; মানুষের মন এই সংবাদটির আলোকে উত্তাপে প্রসন্ন উষ্ণ হয়ে উঠল।

বর্ষা শেষ হয়েছে একটা ঋতুর অন্তে নব ঋতুর প্রারম্ভ। চাটুজ্জেই যেন চ'লে গেলেন এখানকার বর্ষাঋতুর শেষ মেঘসঞ্চারের মত। এই স্থানটির জীবন-নাট্যে একটি অঙ্কের শেষ হয়েছে। পরবর্ত্তী অঙ্ক আরম্ভের সূচনা হচ্ছে।

এককালে মুসলমান জমিদারেরা গিয়েছেন। তারপর গিয়েছেন গন্ধবণিকেরা। তারপর উঠেছিলেন সরকার-বংশীয়েরা। পতনমুখে তাঁদের অতিক্রম ক'রে উঠেছিলেন তাঁদের বাড়ির দৌহিত্রেরা—স্বর্ণবাবু, শ্যামাকান্ত, রাধাকান্ত এবং আরও কয়েকজন। অকস্মাৎ তাঁদের সকলকে অস্তমিত ক'রে দিয়ে উদিত হচ্ছেন গোপীচন্দ্র। গোপীচন্দ্রের বাপ এখানে আগন্তুক মাত্র। স্বর্ণবাবুদের জ্ঞাতি, তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ সূত্রেই, এখানে এসে বাস করেছিলেন অনুগৃহীতরূপে। গোপীচন্দ্র ভাগ্যফলে সায়েবদের কয়লাকুঠিতে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে মুন্সীর কাজ করতে গিয়ে লক্ষপতি হয়েছেন। কিন্তু তাতেও এখানকার আকাশে অধিষ্ঠিত হবার স্থান লাভ করতে পারেন নাই। আজ বিধাতার দূতের মত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে তাঁকে হাত ধ'রে সকলের মধ্যস্থলে স্থান দিলেন। নবোদিত গোপীচন্দ্রের প্রথম রশ্মির মত নবগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়। মানুষেরা কলরব ক'রে উঠল ভোরের পাখীর মত।

রাধাকান্ত, তাঁর দাদা শ্যামাকান্ত এঁরা বিমর্ষ হয়েছিলেন। রাধাকান্ত তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, আমরা অস্তমিত হলাম। কথাটার মধ্যে বেদনা ছিল। থাকা স্বাভাবিক। তাঁর জ্যেঠতুত দাদা শ্যামাকান্ত বিচিত্র ধরনের মানুষ। গোপীচন্দ্রের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ গ্রামে তিনিই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা সম্পত্তিশালী এবং অর্থশালী ব্যক্তি। কিন্তু স্বভাবে তিনি অতিমাত্রায় কৃপণ এবং প্রকৃতিতে অত্যন্ত ভীরু। সেইজন্য প্রতিষ্ঠার কখনও প্রাধান্য লাভ করতে পারেন নাই। গৌরবর্ণ ছোটখাটো মানুষ। নিজের বাড়িতে সকলকে গালাগাল দিয়ে আসেন, আর নিজের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ব'সে অপরের

সম্প্রতির অসারতা এবং তাদের ঋণের পরিমাণের কথায় আলোচনা করেন। একমাত্র পুত্র, সে অহরহ মদ্যপান করে; শ্যামাকান্তের পাশের ঘরেই ব'সে সে মদ্যপান করে, শ্যামাকান্ত ব'সে নিরুপায়ের মত দেখেন। কুলধর্মে তাঁরা তান্ত্রিক, তিনি নিজেও মদ্যপান করেন, সুতরাং মদ্যপানটা দোষের নয়। তিনি নিজেই বলেন, ফার্স্ট গ্লাস ফর মেডিসিন, সেকেণ্ড গ্লাস ফর হেলথ, থার্ড ফর প্লেসার, ফোর্থ ফর ম্যাডনেস। শ্যামাকান্ত খুব ভাল ইংরেজী বলতে পারেন; সেক্সপীয়র মিল্টন তিনি পড়েন নি, কিন্তু বাল্যকালে তাঁর বাপের কর্মজীবনে তিনি সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলেন, তারই ফলে তাদের ভাষাটা তিনি প্রায় মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত করেছিলেন। শ্যামাকান্তের ভয়, তাঁর পুত্রের মদ্যপান, ফোর্থ গ্লাসেই আবদ্ধ নয়, নবম দশম এমন কি বিংশতিতম পাত্রেরও বেশি; ইদানীং সে আবার গেলাসে মদ খাওয়া ছেড়ে, বোতলের মুখে পান অভ্যাস করেছে, এবং বোতলের সংখ্যাও বাড়ছে ক্রমে ক্রমে। এর ফলে কি ঘটতে পারে, তাই কল্পনা ক'রে তিনি শিউরে ওঠেন। চিন্তা প্রবল হ'লে নিজে দু পাত্র মদ্যপান ক'রে দুনিয়াকে গালাগাল দিতে শুরু করেন—বাংলা এবং ইংরেজী দুই ভাষাতেই গালাগালি। তিনি মদ্যপান ক'রে গোপীচন্দ্রকে গালাগাল করছিলেন, সন অব এ বেগার। এ থিফ। হি ইজ এ থিফ। চোর, চোর। গোপে চোর।

ঈর্ষাকাতর শ্যামাকান্ত আপন মনেই ঘুরে বেড়ান আপনার বৈঠকখানা এবং কাছারি-বাড়ির সামনের চত্বরে। রাধাকান্ত আপনার অন্দর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন; শ্যামাকান্তের বৈঠকখানার পাশেই তাঁর বৈঠকখানা; সেখানেই যাচ্ছিলেন তিনি। শ্যামাকান্তকে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন, দাদা অপ্রকৃতিস্থ। রাধাকান্ত দাঁড়ালেন। বললেন, ঘরের ভেতরে গিয়ে ব'স দাদা।

শ্যামাকান্ত বললেন, আই অ্যাম অ্যাফরেড অব নান, নর ডু আই কেয়ার ফর এনিবডি। হি ইজ এ থিফ।

দাদার প্রকৃতি রাধাকান্ত জানেন, এখন এই মুহূর্তে তাঁকে বাধা না দিলে তিনি আরও দু-এক পাত্র মদ্যপান ক'রে পথে বেরিয়ে পড়বেন এবং রাস্তায় রাস্তায় গালাগালি দিয়ে ঘুরবেন। গ্রামসম্পর্কে তাঁদের নাতিসম্পর্কীয় অনেকে আছে, তারা তাঁকে নিয়ে কৌতুক আরম্ভ করবে। পিছন থেকে তারা তাঁর কাছা খুলে দেবে, শ্যামাকান্ত কাছাটা টেনে আবার গুঁজবেন এবং গাল দেবেন, শালা। তারপর আরম্ভ করবেন ইংরেজীতে গালাগাল; আরও বারকতক কাছা খুলে দেবার পর, তিনি আর কাছা গুঁজবেন না, উলঙ্গপ্রায় অবস্থায়, অশ্লীল গালাগালি দিতে আরম্ভ করবেন। লোকে অবশ্য বলে, শ্যামাকান্তবাবুর গালাগাল হোক অশ্লীল, তবু শুনতে ভাল লাগে। রাধাকান্ত জানেন, ভাল লাগে না, তারা কৌতুক অনুভব করে। কৌতুকের সঙ্গে পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠা

এবং সঙ্কিত সম্পদের সম্মান কোনমতে মর্য্যাদাটাকে রক্ষা করে। তিনি বললেন, ব্রা বলছি শোন, যাও, ঘরের ভেতরে যাও।

শ্যামাকান্ত ভয় করেন রাধাকান্তকে রাধাকান্তের, সাহসকে ভয় করেন, তাঁর দৃঢ়তা এবং ধীরতাকে সম্ভ্রম করেন। দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত রাধাকান্তের এই কথা কয়েকটিতে তিনি এবার একটু দ'মে গেলেন।

রাধাকান্ত বললেন, যাও, ঘরের ভেতর যাও।

অকস্মাৎ শ্যামাকান্ত বার বার ঘাড় নেড়ে অস্বীকার ক'রে ব'লে উঠলেন, নো নো নো। তারপর আরম্ভ করলেন, আমি মা রাজার ছেলে, প্রণাম নাহি জানি। কারও হুকুম আমি মানি না। কথাটা শেষ করলেন উর্দ্দুতে—ম্যয় নেহি যাউঙ্গা।

রাধাকান্ত তাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, তবে, মদ খেয়ে একজন মানী লোককে গালাগাল করবে?

গালাগাল? শ্যামাকান্ত কণ্ঠস্বর উচ্চ ক'রে এবার আরম্ভ করলেন, হি ইজ এ থিফ। ইট ইজ এ টুথ। টুথ ইজ টুথ, টুথ ক্যান নেভার বি অ্যান অ্যাবিউজ। গোপে ইজ এ থিফ।

রাধাকান্ত এবার কঠোর স্বরে বললেন, না। ও কথা সত্য নয়। যাও, ঘরের ভেতর যাও। ঘরের ভেতর ব'সে রাজার মাকে ডাইনী বললে দেশাচারে অপরাধ হয় না; মনের ক্ষোভ চাপতে না পার, ঘরের মধ্যে ব'সে যাকে যা ইচ্ছে তাই বল গিয়ে। একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললেন, ছি, ছি, ছি! জ্যাঠামশায়, বাবা এঁরা কত বড়লোক ছিলেন, কত পুণ্যকর্ম তাঁরা ক'রে গিয়েছেন। তাঁদের অযোগ্য সন্তান আমরা। তাঁদের কীর্ত্তিকে আমরা উজ্জ্বল করতে না পারি, তাকে ম্লান করলে আমাদের যে নরকেও স্থান হবে না। সে কথাটাও একবার মনে হয় না তোমার?

শ্যামাকান্ত আর বাইরে থাকতে সাহস করলেন না, তিনি আপনার ঘরের মধ্যে গিয়ে তক্তাপোশের উপর বিছানো ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়ে ব'সে আপন মনেই বলতে আরম্ভ করলেন, দি ইস টেরিবল, এ ডিস্‌ওবিডিয়েণ্ট টেরিবল ব্রাদার। বাট—বাট—। একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি মৃদুস্বরে বললেন, বাট টুথ ইস টুথ, দি—ভাট গোপে, গোপে ইজ এ থিফ।

রাধাকান্ত এসে আপনার বৈঠকখানায় বসলেন।

রাধাকান্তের বৈঠকখানাটি অতি চমৎকার; লম্বা ধরনের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, মাঝখানে একখানি বড় হল, দু পাশে দুটি ঘর, ঘর দুখানিও বেশ বড়; তিন দিকে বারান্দা, হলের সম্মুখের বারান্দার কোলেই ছোট একটি ফুলবাগান, তারপর তাঁর খামার

বাড়ি; হলের ভিতরেই রাধাকান্তের বৈঠকখানা। আসবাবপত্র খুব বেশি নয়, দু পাশে দুখানি প্রশস্ত তক্তাপোশের দুটি ফরাস, তক্তাপোশ দুখানির মাঝখানে একখানি টেবিল, টেবিলের দু পাশে তিনখানি চেয়ার। তক্তাপোশ দুখানির দু পাশে দেওয়ালের গায়ে দুখানি বেঞ্চ। টেবিলে ব'সে তিনি চিঠিপত্র লেখেন, দৈনিক হিসাবপত্রের খাতা লেখেন, আর লেখেন তাঁর দৈনিক জীবনবৃত্তান্ত। পড়ার সময় তিনি তক্তাপোশেই বসেন। কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ তাঁর আছে। পুরাণ-সংহিতার সংগ্রহই বেশি। বাংলা-সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী এবং তন্ত্রের অনেক বই। কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকারও গ্রাহক তিনি; সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও একখানি আসে। কিছু উপন্যাসও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, চণ্ডীচরণ সেন তাঁর প্রিয় লেখক।

রাধাকান্ত নিজের দিনলিপিখানি খুলে বসলেন। লিখলেন, গোপীচন্দ্র এখানে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। গতকল্য অপরাহ্নে জেলার মহামান্য রাজপ্রতিনিধি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের উপস্থিতিতে সবই স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। গোপীচন্দ্র অবশ্যই পুণ্যকর্ম্ম করিতেছেন। তিনি প্রচুর ধনসঞ্চয় করিয়াও এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত অত্র গ্রামে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। এই পুণ্যকর্ম্মের ফলে সেই প্রতিষ্ঠা তাঁহার অবশ্যম্ভাবী। তাহার সূচনা করিয়া দিয়া গেলেন স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি। তিনি গোপীচন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিয়াছেন, গোপীচন্দ্রকে যথেষ্ট মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা এ পর্য্যন্ত এ গ্রামের আর কোন জমিদার বা ধনী লাভ করে নাই। গতকল্য হইতেই আমি চিন্তা করিতেছি, আমাদের ভবিষ্যতের কথা। মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। কিন্তু অদ্য এইমাত্র দাদার কীর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তিনি মদ খাইয়া গোপীচন্দ্রকে গালাগালি করিতেছেন। তাঁহাকে বহু কষ্টেই ঘরের মধ্যে পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছি। উচ্চ শব্দে আহ্বান এবং উগ্র হিংসায় পরনিন্দা, ভদ্রতাবিগর্হিত, শাস্ত্রবহির্ভূত; ইহা অধীরতার লক্ষণ, ইহা পাপ। শুধু উচ্চারণেই পাপ নয়, শ্রবণেও পাপ। অসৎপ্রলাপরূপ তিক্তরসে দূষিত রসনায় মতই এই রস দূষিত কর্ণেরও একমাত্র শরণ, একমাত্র পরমামৃত রসায়ন ভগবৎনাম কীর্ত্তন, ভগবৎমহিমা স্মরণ। হে প্রভো, মঙ্গলময় মহেশ্বর, তুমি ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

বাইরের বারান্দায় জুতোর শব্দ উঠল। রাধাকান্তের কতকগুলি অনুভূতি বড় তীব্র; পায়ের শব্দে তিনি পরিচিত আগন্তুককে চিনতে পারেন। চটি টানার শব্দে তিনি বুঝলেন স্বর্ণবাবু আসছেন। তিনি কলম রাখলেন। স্বর্ণবাবু দরজার সামনে আসতেই সাদরে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, এস।

হেসে স্বর্ণবাবু বললেন, এলাম।

চাণক্য পণ্ডিতের কৌটিল্যনীতি অনুযায়ী নয়, এই যুগের অভিজাত সভ্যতার শিক্ষায় স্বর্ণবাবুর মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায় না। হাস্যমুখেই স্বর্ণবাবু এসে বসলেন।

রাধাকান্ত চাকরকে ডাকলেন, ওরে বিষ্টু, তামাক দে।

স্বর্ণবাবু হেসে বললেন, শ্যামাকান্তদাকে কি বলছিলে? কতক কানে এল, কতক এল না। বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনলাম। দাদা মদ খেয়েছেন বুঝি?

রাধাকান্ত হাসলেন, বললেন, তবে তো সবই শুনেছ।

কাকে গালাগালি করছেন আজ? আমাকে?

রাধাকান্ত স্বর্ণবাবুর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, তোমাকে নয়, সে তুমি জান মনে হচ্ছে। তা হ'লে মুখখানা তোমার অন্যরকম হ'ত। অন্তত আমি ধরতে পারতাম।

স্বর্ণবাবু একটু অপ্রস্তুত হলেন, বললেন, আমার উপর অবিচার করছ তুমি। শ্যামাকান্তদার গালাগালি আমার গায়ে লাগে না, ভালই লাগে। বিশেষ ক'রে যখন অশ্লীল গালাগাল করেন। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, গোপীচন্দ্রকে গালাগাল করছিলেন বুঝি?

চাকর বিষ্টুচরণ এসে গড়গড়ার মাথায় কল্কে বসিয়ে নলটি স্বর্ণবাবুর সামনে তুলে ধরলে; স্বর্ণবাবু নলটি হাতে নিয়ে মৃদু একটি টান দিয়ে বললেন, এ ব্যাটার হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে হয়। যেমন ব্যাটা চা তৈরি করে, তেমনই তামাক সাজে—টানতে এতটুকু জোর লাগে না, তেমনই ব্যাটা কাপড় কাঁচায়।

বিষ্টুচরণ স্মিতমুখে স্বর্ণবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্বর্ণবাবু আবার একটি টান দিয়ে বললেন, তামাকটা বোধ হয় কাইগড়ার, না?

হ্যাঁ।

আবার একটি টান দিয়ে স্বর্ণবাবু বললেন, দাদা কি এমন গালাগাল দিচ্ছেলেন গোপীচন্দ্রকে যে, তুমি তাঁকে—। স্বর্ণবাবু হাসলেন, তারপর হেসে বললেন, মনে হ'ল, যেন ধমক দিচ্ছিলে তুমি।

রাধাকান্তও হাসলেন এবার, বললেন, তুমি বলছিলে, কতক তোমার কানে যায় নি। না গেলেও, সবই তুমি সঠিক অনুমানে বুঝে নিয়েছ। সুতরাং ও কথার বেশি আলোচনা ক'রে লাভ কি?

স্বর্ণবাবু নলটি এগিয়ে রাধাকান্তের হাতে দিলেন, নাও, খাও। তারপর একটু এগিয়ে এসে বললেন, চোরকে যদি কেউ চোর বলে, তবে সেটা কি গালাগালি? প্রশ্নটা ক'রে তিনি রাধাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

রাধাকান্ত চুপ ক'রে রইলেন।

স্বর্ণবাবু বললেন, বল, আমার কথার জবাব দাও?

—রাধাকান্তবাবু বললেন, স্বর্ণ, ও আলোচনা থাক্।

স্বর্ণবাবু আরও একটু এগিয়ে এসে বললেন, গোপীচন্দ্র তার প্রথম কয়লার কুঠী মনিব সাহেব-কোম্পানির নামে ডাকতে গিয়ে, ওই মনিব-কোম্পানির টাকায় বেনাম ক'রে ডাকে নি?

রাধাকান্ত কোন উত্তর দিলেন না।

স্বর্ণবাবু প্রশ্ন করলেন, এটা চুরি নয়?

রাধাকান্ত বললেন, না, চুরি নয়।

চুরি নয়?

চুরি করলে বলতে হয়, গোপীচন্দ্র চুরি করেছিলেন কোম্পানির টাকা। কয়লার কুঠীটা নয়। কারণ ওটা সাহেবদের সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু যে জিনিস মানুষ চুরি করে, তা চোর ফেরত দেয় না। গোপীচন্দ্র সাহেবদের টাকা তো পাই-পয়সা ফেরত দিয়েছেন

স্বর্ণবাবু হেসে বললেন, উকিল হ'লে তুমি খুব বড় উকিল হতে রাধাকান্তদা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন রাধাকান্ত। বিষণ্ণ হেসে বললেন, কারও দোষ নয়কো গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। বাল্যকাল হেলায় হারিয়েছি, তার ফলে আজ বংশগত প্রতিষ্ঠা হারাতে বসেছি। অপরকে তার জন্য দোষ দিয়ে কি হবে, সেই জন্যই দাদাকে যে সক্ষম, যে কৃতী, তাকে গালাগাল করতে বারণ করছিলাম।

স্বর্ণবাবু হাত বাড়িয়ে নলটা নিলেন, দাও, তামাকটা মজেছে ভাল। তামাক টানতে টানতে তিনি অস্বীকারের ভঙ্গীতে বার বার মাথা নাড়লেন।

রাধাকান্ত বললেন, এ কথা তুমি অস্বীকার করছ? 'না' বলছ?

স্বর্ণবাবু নলটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন, তুমি বাল্যকাল হেলায় হারিয়েছ, আমিও হারিয়েছি, ও কথায় আমি 'না' বলছি না। কিন্তু গোপীচন্দ্রও কিছু বিদ্যালাভ ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করে নি। চুরি না বল, প্রবঞ্চনা তো বলতেই হবে। প্রবঞ্চনায় অর্থ লাভ ক'রে অর্থের জোরে আজ সে গ্রামের মাথায় বসতে চাইছে। সে আমি হতে দোব না—কিছুতেই না। আমার সূচ্যগ্র মেদিনী থাকতে না।

রাধাকান্ত স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

স্বর্ণবাবু হাসলেন, বললেন, আমরা এককালে শখের যাত্রার দল খুলেছিলাম। তুমি সাজতে যুধিষ্ঠির, আমি সাজতাম দুর্য্যোধন। উর্ব্বশী-উদ্ধার পালায়, পাণ্ডব কৌরব এক হয়ে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। তুমি আমার সঙ্গে যোগ দেবে?

রাধাকান্ত প্রশ্ন করলেন, তুমি কি মাইনর-ইস্কুলকে হাই-ইস্কুল করবে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্বর্ণবাবু বললেন, সে একটা আকাশকুসুম রাধাকান্তদা,

এত টাকা কোথায় আমার ? তোমারও টাকা নাই। টাকা আছে শ্যামাকান্তদার, সে তিনি খরচ করবেন না।

তবে ?

গোপীচন্দ্রের সব কাজে আমরা বাধা দোব।

একটু চুপ ক'রে থেকে রাধাকান্ত বললেন, দেখ স্বর্ণ, তোমাকে ভালবাসি, তুমি বন্ধুলোক, তাই বল'ছ। তিনি চুপ করলেন।

স্বর্ণবাবু বললেন, তুমি ভয় পাচ্ছ ?

ভয় নয় স্বর্ণ। শাস্ত্রবাক্য মনে পড়ছে। শাস্ত্রে বলে, গৃহের ভূষণ পুত্র, সভার ভূষণ পণ্ডিত, পুরুষের ভূষণ সদ্‌বুদ্ধি, রমণীর ভূষণ লজ্জা। গোপীচন্দ্রের সব কাজে বাধা দিতে চাও বলছ, তার মানে সৎ-অসৎ সব কাজেই বাধা দিতে চাও। সৎকার্য্যে বাধা দেওয়া কখনও সদ্‌বুদ্ধি নয়।

স্বর্ণবাবু বললেন, কোন্ শাস্ত্র আওড়াচ্ছ জানি না। কিন্তু সদ্‌বুদ্ধির চেয়েও শ্রেষ্ঠ ভূষণ হ'ল পুরুষের বীর্য্য।

রাধাকান্ত হেসে বললেন, বীর্য্য ভূষণ নয়, বীর্য্যই হ'ল পৌরুষের প্রাণ। বীর্য্যহীন পৌরুষ হয় না, হ'লে তার নাম হয় ক্লীবত্ব।

তবে ? স্বর্ণবাবুর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রাধাকান্ত বললেন, সৎকার্য্যের বিরোধিতা করে যে বীর্য্য, সে হ'ল অসুর বীর্য্য। তার—

স্বর্ণবাবু অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালেন। রাধাকান্তের কথার মাঝখানেই বললেন, উঠলাম।

রাধাকান্ত বললেন, ব'স, ব'স।

না। কাজ মনে প'ড়ে গেল। স্বর্ণবাবু বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দরজার এপাশে এসে কিন্তু থমকে ঘুরে দাঁড়ালেন। শ্লেষের সঙ্গেই বললেন, তা হ'লে সুরশক্তির সঙ্গেই যোগ দেবে ঠিক করেছ ?

রাধাকান্ত বললেন, না।

অর্থাৎ ?

রাধাকান্ত উঠে দাঁড়ালেন, অর্থ জটিল নয়, তবু পরিষ্কার ক'রে বলি। তুমি বিরোধ করতে না চাইলে, তোমার সঙ্গে আমি বিরোধ করব না। গোপীচন্দ্র আমার সঙ্গে বিরোধ করতে চাইলে তাতেও আমি পশ্চাৎপদ হব না।

যথেষ্ট, যথেষ্ট। এই আমার পক্ষে যথেষ্ট রাধাকান্তদা। আচ্ছা। কথা শেষ ক'রে স্বর্ণবাবু বেরিয়ে গেলেন। রাধাকান্ত দাঁড়িয়েই রইলেন।

—রাধাকান্তদা! আবার ফিরলেন স্বর্ণবাবু। এই দেখ, যার জন্ম আসা, তাই ভুলে গিয়েছি।

রাধাকান্ত বললেন, তাই তো বলছিলাম স্বর্ণ, তুমি অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছ। ধীরতাই হ'ল মানুষের সু-বুদ্ধি। যা সুন্দর, তাই শিব, সুতরাং তাই সৎ।

রাধাকান্তের এসব কথার কোন জবাব দিলেন না স্বর্ণবাবু, বললেন, এসেছিলাম একটি জিনিস চাইতে, ভিক্ষা বল, ভিক্ষা।

রাধাকান্ত হাসলেন, বস্তুটা কি?

আগে বল দেবে?

রাধাকান্ত একটু ভেবে বললেন, বস্তু হ'লে যা অদেয় নয়, তা দোব। কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি হ'লে না ভেবে দিতে পারব না।

স্বর্ণবাবু বললেন, বস্তুও বটে, দেয়ও বটে।

বল?

মানিকচকের জোলে, আমার জমির পাশে গোপথের গায়ে তোমার দু টুকরো জমি আছে; ওই দু টুকরো আমাকে দিয়ে, আমার অন্ত জায়গার জমি তুমি নাও।

কেন বল তো?

বলব। আগে দেবে বল।

সে তো আগেই বলেছি।

উঁহু, ত্রিসত্য কর।

আচ্ছা, তাই। হাসলেন রাধাকান্ত, দিলাম, দিলাম, দিলাম।

স্বর্ণবাবু বললেন, তা হ'লে শোন। গোপীচন্দ্রের বাড়ি থেকে যেখানে ইস্কুল হবে, সেখানে যাবার সোজাপথ হ'ল ওই গোপথ। গোপীচন্দ্র ইস্কুলের পাশেই আস্তাবল করছে। গাড়ি ঘোড়া আনবার জন্তে ওই গোপথকে বাড়িয়ে বড় রাস্তা করতে চায়। তাই গোপথের দু পাশের জমি আমার চাই। ও পথ বড় ক'রে গাড়ি আনতে আমি দোব না। তা ছাড়া, 'লড়িয়া' ব'লে মজা পুকুরটাও নাকি কাটাবে! সিচ নিয়ে আমি মামলা করব। সিচ বন্ধ করতে আমি দোব না।

রাধাকান্তের মুখ থমথমে হয়ে উঠল, বললেন, আমি তো তোমাকে বলেছি স্বর্ণ, গোপীচন্দ্র বিরোধ করতে চাইলে পেছুব না। তুমি কি আমাকে অক্ষম মনে কর?

স্বর্ণবাবু বললেন, না, তা নয়। ওখানে আমার জমি অনেকখানি, তোমার মাত্র ওই দু টুকরো। আমার পোষাবে, তোমার পোষাবে না। তা ছাড়া গোপীচন্দ্র বিনয় ক'রে চাইলেই বা তুমি 'না' বলবে কি ক'রে? প্রশস্ত সুগম রাস্তা করাটা তো ভাল কাজ। ভাল কাজে তো তুমি বাধা দেবে না, নিজেই বলেছ। স্বর্ণবাবু হাসতে

লাগলেন। তিনি সত্যই পুলকিত হয়েছেন এবার। শুধু তাঁর একটা কার্যোদ্ধার হয়েছেই নয়, বাক চাতুর্য্যে এবং বুদ্ধি কৌশলে তিনি রাধাকান্তকে পরাস্ত করেছেন। এর মধ্যে বেশ একটি মানস বিলাস আছে—আত্মগৌরব এবং জয়ের তৃপ্তিতে ভ'রে উঠে। হাসতে হাসতেই স্বর্ণবাবু চ'লে গেলেন।

রাধাকান্তও হাসলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর আঘাত বা পরাজয়টা বেদনাদায়ক নয়। তাঁর আভিজাত্যের অহঙ্কার, স্বর্ণবাবুর সঙ্গে একমত; তাঁর জৈবপ্রবৃত্তি-সুলভ ঈর্ষা স্বর্ণবাবুর মতই ক্ষুব্ধ; কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর জীবনে আরও কিছু সম্পদ আছে, যার তৃপ্তিতে অহঙ্কার নম্র হয়েছে, ক্ষোভ অন্তঃসলিলা হতে বাধ্য হয়েছে। হাসির মধ্যেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। সে দীর্ঘশ্বাস স্বর্ণবাবুর জন্যও হতে পারে, আবার তাঁর অন্তঃসলিলা ক্ষোভের অজ্ঞাত অবাধ্য স্ফুরণও হতে পারে; হয়তো দুইই হতে পারে।

* * *

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিতে দিতেই ফিরলেন নিজের বৈঠকখানায়। এটা তাঁর একটা অভ্যাস। বিশেষ ক'রে কূটকৌশল উদ্ভাবনায় গভীর চিন্তার সময় এবং সার্থকতার আনন্দে মনের অহঙ্কৃত অবস্থায় তাঁর বাঁ হাতটি অবিরাম এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। মুখে কোন রেখাপাত হয় না, দৃষ্টিতেও কোন ভাবান্তর ঘটে না, সুতরাং সঠিক বুঝতে পারা যায় না, তাঁর মানসিক অবস্থাটা কি! একমাত্র তাঁর নায়েব বুঝতে পারে খানিকটা। নায়েব শ্রীধর চাটুজ্জে পুরানো লোক, স্বর্ণবাবুর বাপের আমল থেকে সে এই বাড়িতে কাজ করছে। প্রবীন শ্রীধর নাকের ডগায় চালশের চশমাটা টেনে নামিয়ে, চশমা এবং ভ্রূর ফাঁক দিয়ে বাবুর মুখের দিকে চেয়ে তাঁকে একবার দেখে নিলে। স্বর্ণবাবুর প্রতীক্ষাতেই সে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে ছিল। স্বর্ণবাবু তাকে দেখেই বুঝলেন, নায়েবের কথাটা এইখানে এখনই শোনার প্রয়োজন সে যখন কাছারিকে পিছনে রেখে রাস্তার উপর এসে দাঁড়িয়ে আছে, তখন কাছারির মধ্যে যা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে, সে বিষয়ে তাঁকে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন। ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনি শ্রীধর চাটুজ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

মৃদুস্বরে নায়েব বললে, আপনি একবার আগে ভেতরে যান। ঠাকুরদালানে বড়দিদি রঞ্জনদিদি এঁরা ব'সে আছেন।

স্বর্ণবাবুর কপালের কুঞ্চনরেখা আরও ঘন এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বড়'দি অর্থাৎ তাঁরই জ্যেষ্ঠা সহোদরা, রঞ্জনদি অর্থাৎ তাঁর জ্ঞাতিভগ্নী, এঁরা অর্থাৎ আরও ভগ্নীর দল, কুলীনের ঘরের বোন, তাঁদেরই পোষ্য। স্বর্ণবাবু এঁদের সম্মান করেন না এমন নয়, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে শ্রদ্ধা নাই। তিনি প্রশ্ন করলেন, কেন?

শ্রীধর মাথা চুলকে বললে, তা তো ঠিক জানি না, তবে আপনি চ'লে যাওয়ার পরই

ওঁরা এলেন, আপনাকে না পেয়ে আমাকে ডেকে বললেন, তোমাদের বাবু আসবামাত্র আমাদের কাছে ডেকে দেবে। একবার কাশলে চাটুজ্জে, কাশিটা নিতান্তই কৃত্রিম, সর্দি নয়, মনের সঙ্কোচটাকেই ঝেড়ে যেন ফেলে দিলে, তারপর বললে, কাছারিতে গোয়ালপাড়ায় রঙলাল মোড়ল এসেছে আমাদের মণি দত্তকে সঙ্গে নিয়ে, নালিশ আছে। বোধ হয়—

স্বর্ণবাবু বললেন, দিদিদের বল গিয়ে, খাওয়ার পর ধীরে সুস্থে তাঁদের কথা শুনব। এখন কাজের সময়, ঘরোয়া ঝগড়া শুনবার আমার সময় নাই।

আজ্ঞে—। আবার একবার গলা ঝেড়ে নিলে চাটুজ্জে।

কি?

দু তরফেরই ব্যাপার বোধ হয় এক।

মানে?

আপনি একবার শুনেই আসুন না দিদিদের কাছে। ওঁরা বলছেন, মণি দত্তের আশকারায় রঙলালের কাছে অপমান হ'ল শেষকালে—

চমকে উঠলেন স্বর্ণবাবু। মণি দত্ত এ গ্রামের দত্তবংশের ছেলে। অত্যন্ত উদ্ধত-প্রকৃতির যুবক। দত্তবংশের এই শাখাটির প্রকৃতিই ধারাবাহিকভাবে উদ্ধত। মণির পিতামহ একদা হাতজোড় ক'রে নমস্কার করার জন্য সেকালের ব্রাহ্মণ জমিদারেরা পাইক দিয়ে ঘাড় ধ'রে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণামপদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। তার কপালে একটুকরো কাচ ফুটে গিয়ে ঘটনাটাকে তার জীবনকাল পর্য্যন্ত স্মরণীয় ক'রে রেখে ছিল। সমস্ত দত্তবংশের মধ্যে এরাই সম্পদশালী। ওই ঘটনাটুকু থেকেই অনেকদিন পর্য্যন্ত তাদের সম্পদের অহঙ্কার দমিত হয়েই ছিল। মণি দত্ত তাঁদেরই ইস্কুল থেকে মাইনর পাস ক'রে জেলায় গিয়েছিল ইংরেজী পড়তে। এণ্টান্স ফেল ক'রে এসে ব্যবসা করছে এখন। একখানা সাপ্তাহিক ইংরেজী কাগজ নেয়। ছোকরা অত্যন্ত উদ্ধত, কিন্তু মণি দত্ত এবং রঙলাল দিদিদের কাছে পৌঁছল কি ক'রে? গোঁফে তা দেওয়ার মাত্রা ঘন হয়ে উঠল। তিনি কাছারিতে না গিয়ে, পাশ কাটিয়ে ঠাকুরদালানে গিয়ে উঠলেন।

দালানে বোনেরা এবং বউয়েরা ব'সে একটি বেশ উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনায় রত ছিলেন, সে তিনি দেখবামাত্র বুঝলেন। তাঁকে দেখে বউয়েরা উঠে গেলেন। রজন-দিদি এ গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠাবতী মহিলা। তার মত যোগ্যতাও তাঁর আছে। কালের মান অনুযায়ী তিনি শিক্ষিতা মহিলা, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে জলপানি পেয়েছিলেন, তাঁর হস্তাক্ষর অনেক পুরুষের চেয়ে ভাল, সেলাইয়ের কাজেও তিনি পারদর্শিনী। এ ছাড়া তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা তাঁর ব্যক্তিত্বে। স্বর্ণবাবু আসতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সাধারণ বাঙালীর মেয়েদের চেয়ে তিনি দীর্ঘাকৃতি; এককালে তিনি রূপসী

ছিলেন, নিঃসন্তানজীবনে তাঁর সে রূপ এখনও আছে। উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমা পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

স্বর্ণবাবুর মত ব্যক্তিও তাঁকে সাক্ষাতে উপেক্ষা করতে পারেন না, তিনিই সর্ব্বাগ্রে কথা বললেন, কি রজনদি, কি ব্যাপার ?

তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি ?

বল ?

আমাদের বাপ-পিতামহের ইজ্জত কি সব গিয়েছে ? তোমরা কি সব মরেছ ?

স্বর্ণবাবু বললেন, ব্যাপারটা কি বল ?

মণি দত্তকে পৃষ্ঠরক্ষক ক'রে রঙলাল চাষা এসে আমাদের অপমান ক'রে যাবে ?

সে কি ?

জগদ্ধাত্রীদিদিকে সে বললে, এমন কুগর্ভ আপনার, আপনি আপনার ছেলেকে সাবধান করবেন। আপনাদেরও বউ-বাটা আছে ; তাদের অপমান করলে কি হয় সে বুঝে, ছেলেকে সাবধান করবেন। একটু স্তব্ধ থেকে রজনঠাকরুণ আবার বললেন, অমূল্য-ভূপতি মাতাল মুখ্যু দুষ্টু, সব সাত্য। কিন্তু তারা তো আমাদের বাপ-জ্যোঠারই দৌহিত্র।

জগদ্ধাত্রীদিদি, স্বর্ণবাবুর অন্য এক জ্ঞাতিভগ্নী। তাঁর ছেলে অমূল্য দুর্দান্ত মদ্যপ এবং ভয়ঙ্করপ্রকৃতির ছেলে।

স্বর্ণবাবুর সহোদরা বড়দিদি, ভূপতির মা, তিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি এবার বললেন, ভূপতি আমার ছেলে, কিন্তু তোমার ছেলে যদি ভূপতির মত হয় ?

রজনঠাকরুণ বললেন, মদ খায় না কে, ব্যাটাছেলেদের মধ্যে নষ্ট দুষ্টু নয়ই বা কে, আমার এতবড় বয়সে আমি তো দেখলাম না। আর নষ্ট দুষ্টু ব'লে অমূল্য ভূপতি এরা তো কই ভদ্রলোকের বউবেটিদের কিছু বলে না।

বড়দিদি বললেন, তা বলবে কেন ? হাজার হ'লেও বড় বংশের দৌহিত্র, বড় কুলীনের ছেলে, তারা তাই বলে, না, বলতে পারে ? যে মেয়ে নষ্ট, যে মেয়ে দুষ্টু, তাকেই বলবে। আগে ঘর সাবধান করতে হয়।

এতক্ষণে স্বর্ণবাবু বললেন, কিন্তু ব্যাপারটা কি ? অমূল্য-ভূপতি করেছে কি ?

রজনঠাকরুণ সম্ভবত কথাটা বলতে লজ্জা পেলেন, বললেন, বল না গো বড়দি।

বড়দি বললেন, আবার কি ? রঙলালদের কে বাপু একটি বিধবা মেয়ে আছে, তাকেই অমূল্য-ভূপতি কি নাকি বলেছে।

রজনঠাকরুণ বললেন, নবগ্রাম আর গোয়ালপাড়ার মধ্যে মাঠে একটা ঝরনা আছে, সেখানে গোয়ালপাড়ার মেয়েরা জল নিতে আসে। অমূল্য-ভূপতি সেইখানে নাকি

গিয়ে ব'সে থাকে। এখন ওই মেয়েটিরও কিছু অখ্যাতি আছে। আসল কথা হ'ল কি জান, মাছ পচলেই ভনভনে মাছি এসে জোটে। তা পচা মাছ সরিয়ে ফেললেই হয়। এমন মেয়েকে নবদ্বীপ পাঠিয়ে দিলেই চুকে যায়।

স্বর্ণবাবু বললেন, আচ্ছা, এর প্রতিকার আমি করছি।

রঞ্জনদিদি বললেন, এই ঠাকুরঘরে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে স্বর্ণ।

স্বর্ণবাবু বললেন, দাঁড়িয়েই যখন বললাম, তখন তাই হয়েছে রঞ্জনদি। কিন্তু—। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, অমূল্য-ভূপতি এদের একটু শাসন করা দরকার।

তুমি শাসন কর। তাদের বেত মার। তাদের কয়েদ কর।

হাসলেন স্বর্ণবাবু। বললেন, তারা আর ছোটটি নেই রঞ্জনদি।

তবে তোমার যে শাসন ইচ্ছা, কর।

হবে। আগে তোমাদের অপমানের প্রতিকার করি। তোমরা এখন যাও।

স্বর্ণবাবু অত্যন্ত ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে এসে উঠলেন কাছারিতে। নায়েব বেরিয়ে এল সেরেস্তা-ঘর থেকে। মাথা চুলকে বললে, ওরা চ'লে গেল।

চ'লে গেল?

বললে, নালিশের আর দরকার নাই। বিচারই যেখানে হবে না, সেখানে নালিশ ক'রে কি করব? মানে—। একবার গলা ঝেড়ে নিয়ে চাটুজ্জে বললে, রঞ্জনদিদির কথা সবই শোনা যাচ্ছিল কিনা!

স্বর্ণবাবু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ব'সে গোঁফে তা দিতে লাগলেন। অকস্মাৎ একটা কথা তাঁর মনে হ'ল। বললেন, দেখ তো ওরা কি গোপীবাবুদের ওখানে গেল, দেখ তো?

ঠিক এই সময়টিতেই, ভিতর-বাড়ির দিকের বারান্দায় কেউ ডাকলে, স্বর্ণমানিক!

চমকে উঠলেন স্বর্ণবাবু। 'স্বর্ণমানিক' ব'লে কে ডাকছে তাঁকে! তাঁর ছেলেবেলার আদরের নাম! জগদ্ধাত্রীদিদি? তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠে বেরিয়ে এলেন। সত্যই জগদ্ধাত্রীদিদি। প্রৌঢ়ত্বকেও অতিক্রম করেছেন তিনি। স্বর্ণবাবু তাঁকে প্রণাম ক'রে বললেন, আপনি আবার কেন এলেন দিদি? আপনার অপমান আর আমার মায়ের অপমান কোন তফাত নাই দিদি। এর প্রতিকার না ক'রে—

জগদ্ধাত্রী দেবী অকস্মাৎ ব্যাকুলভাবে স্বর্ণবাবুর হাত দুটি চেপে ধ'রে বললেন, না। স্বর্ণ ভাই, তোকে হাতে ধ'রে সেই কথা বলতেই আমি এসেছি।

স্বর্ণবাবু বিস্মিত হয়ে গেলেন, বুঝতে পারলেন না, জগদ্ধাত্রীদিদি কি বলছেন।

জগদ্ধাত্রী দেবী বললেন, ভাই স্বর্ণমানিক, ছি ছি ছি! এই নিয়ে আর কেলেঙ্কারি

করিস না ভাই। অন্তত আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন করিস না। ওরে, কুসন্তান যার হয়, এই অপমানই তো তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! বরং ওদের ব'লে দিস, ওকে যেন তারা ধ'রে মারে। বলিস, হাজার হ'লেও আমি মা, আমার মুখ চেয়ে আর অমূল্যের হতভাগী বউয়ের মুখ চেয়ে প্রাণটুকু রেখে যেন মারে। এ অপমান আমার পাওনা, এর জন্যে ওদের শাস্তি দিতে গিয়ে কেলেঙ্কারি আর বাড়াস না।

স্বর্ণবাবু স্তব্ধ হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন। এ কথার উত্তর তিনি খুঁজে পেলেন না। চোখে তাঁর জলও এসেছিল।

জগদ্ধাত্রী দেবীই আবার বললেন, মূর্খের আশি দোষ। গণ্ডমূর্খ কুলীনের ঘরের ভাগ্যে—। মনে কিছু ক'রস না স্বর্ণমানিক, বড়লোকের ছেলেরা, তোরা, মানুষের মত মানুষ হ'লি না। তাই তো কাল শুনে থেকে গোপীচন্দ্রকে দু হাত তুলে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ কর'ছি—আরও অনেক বাড়-বাড়ন্ত হোক গোপীচন্দ্রের! বড় ইস্কুল ভাল ইস্কুল করছে গোপীচন্দ্র, তার কল্যাণে দেশের ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক, পণ্ডিত হোক, মানুষের মত মানুষ হোক।

স্বর্ণবাবু ফিরে গিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কোন কথা আর তিনি বললেন না।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সীতা-হরণ

নয়নের আগে মোহের মারীচ
—সোনার হরিণ রূপী
নেচে ছুটে চলে ; তাড়া করে তায়
লোলুপ বৈজ্ঞানিক,
রসায়নাগারে গবেষণা-পথ ধরি।
অ্যাটম বোমার বজ্র বিস্ফোরণে
সোনার হরিণ হাওয়ায় মিশিয়া যায়।
শান্তি সীতারে দুরাশা-রাবণ
নিয়ে যায় চুলে ধরি'——
শ্রীরাম! তোমার সীতারে রক্ষা করো।

চিত্রগুপ্ত

অ্যাটম-বম্

আজি ধর্ষিত ধরায় চোখের
উছল অশ্রু মুছাল কে ?
অ্যাটম-বম্ !

আজি নিপীড়িত মর্ত্ত্যলোকের
সকল দাস্ত ঘুচাল কে ?
অ্যাটম-বম্ !

আজি হেভেন-এর কিংডমখানি
নিমেষে আর্থ-এ নামাল কে ?
অ্যাটম-বম্ !

আজি ভায়ে ভায়ে ছুরি-হানাহানি
মামার স্বার্থে থামাল কে ?
অ্যাটম-বম্ !

আজি চিরতরে পীস আনি ভবে
যীশুরে বেকার করিল কে ?
অ্যাটম-বম্ !

আজি যেথা যত পাপী ছিল সবে
কন্‌ডেম্‌ড্ সেল-এ ভরিল কে ?
অ্যাটম-বম্ !

অ্যাটম-বম্ ! অ্যাটম-বম্ !
সঙ্গেতে তার ভব-বেয়াধির
মহাবৈদ্য সে ফোর-ফ্রীডম্ !
অ্যাটম বম্ ! অ্যাটম-বম্ !
সৃজিল এটি যে নরোত্তম,
তাঁর গুণাবলী ঢাকে ঢোলে বলি,
জয় গেয়ে চলি জোর কদম।
তাঁর হাতেই যে অ্যাটম-বম্ !

"ববম"

চুরি

ঝরনা-কলম গিয়েছে আমার চুরি
ঘড়িটাও চুরি করেছে চাকর ব্যাটা
যত সামলাই—ভেঙে সব জারিজুরি
টাকাকড়ি সব যায় চুরি—একি ল্যাঠা!
আমি জমা করি ওরা খাপ্ পেতে থাকে
নেংটি পরিয়ে ছাড়বে রে কোনো ফাঁকে।

ধোবা ব্যাটা দেখ ভাল পাঞ্জাবি নিয়ে
পুরানো একটা বদলে দিয়েছে কাল,
চুরি যে করে নি প্রমাণ করতে গিয়ে
জুটিয়ে এনেছে ছেঁড়া মশারির ছাল;
ডজনে ডজনে কজনে কিনতে পারে?
রুমাল তোয়ালে একটাও ফেরে না রে।

ভাল বই চুরি যেতে কি দেখেছ দেরি?
পুরানো দোকানে জমা কি গো হয় সব?
পুষ্ট হয় কি বন্ধুর লাইব্রেরি?
বই কেনে শুধু নির্ব্বোধ গর্দ্দভ।

বই কিনে কিনে হয়রান হয়ে গেছি
সবাই কি পড়ো—বামা শ্যামা খেঁদী পেঁচী?

সদরে, সভায়, নেমন্তন্ন-বাড়ি
ছাতাটা জুতোটা সাম্‌লে রাখা ভার,
আনমনা লোকে ট্রাম, বাস, রেলগাড়ি
চড়ে কেন?—শুধু পুষতে পকেটমার।
গেছে ছাতা জুতো গিয়েছে টাকার থলি
চারিদিকে চোর কারে সামলিয়ে চলি!

চুরি চুরি চুরি বাটপাড়ি রাহাজানি
ঘটি বাটি চোর—চলেছে পুকুর চুরি
ওঁত পেতে থাকে চারিদিকে শয়তানি
পলকের ভুলে গলায় চালায় ছুরি।
হাল ছেড়ে ছিনু মনটারে বেঁধে বুকে;
তাও চুরি গেল—আপদ গিয়েছে চুকে।

শ্রীজীবনময় রায়

শিক্ষা

মাষ্টার মশায় মুখ তুলিয়া চাহিলেন। চোখের দৃষ্টি তাঁহার জিজ্ঞাসু। হেঁট হইয়া প্রণাম করিল সুমিত্রা। তিনি সম্মুখের চেয়ারখানি দেখাইয়া বসিবার ইঙ্গিত করিলেন।

খানিকক্ষণ কাটিল নিঃশব্দে। চেয়ারে শ্রান্তদেহ এলাইয়া, স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বসিয়া আছে সুমিত্রা, অদূরে তাকিয়ায় ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত মাষ্টার মশায়। হাতের জলন্ত সিগারেট ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ধূম্ররেখাকারে হাওয়ায় মিশিয়া যাইতেছে, সম্মুখের খোলা বইখানার পৃষ্ঠা মৃদু হাওয়ায় উড়িতেছে, সেই সঙ্গে দোল খাইতেছে সুমিত্রার অলকগুচ্ছ। সিগারেটের গন্ধ হাওয়ায় পরিব্যাপ্ত।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন মাষ্টার মশায়, হ'ল কিছু?

নতনেত্রে উত্তর করিল সুমিত্রা, না।

বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া বসিলেন মাষ্টার মশায়। সুমিত্রার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, অর্থাৎ? তোমাকে তারা চান না?

তেমনই সংক্ষেপে জানাইল সুমিত্রা, না।

কম্পিত কণ্ঠের প্রশ্ন আসিল, কি বললেন?

এইবার মুখ তুলিল সুমিত্রা। মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, তাঁরা বললেন, অনার্স ও এম. এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট আমি হতে পারি, কিন্তু ও কাজ করবার উপযুক্ত নাকি এখনও হই নি। কারণ আমার বয়েস কম আর এদিকে কোন অভিজ্ঞতা নেই।

তুমি কিছু বললে না?

অল্প হাসির সঙ্গে উত্তর করিল সুমিত্রা, হাঁা, আমি বললাম, বয়েস আমার অল্প সেটা ঠিক, তবে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হ'লে সুযোগ পেতে হয়। আপনারা যদি আমাকে সুযোগ না দেন, তা হ'লে আমি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব কি ক'রে? আর আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা কি বয়সের উপর নির্ভর করবে?

আর কিছু বলো নি?—উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন তিনি।

ক্ষুব্ধ অভিমানাহতস্বরে বলিল সুমিত্রা, কি আর বলব, আর বলবার দরকারই বা কি? এঁরা তো আমাকে জানেন, চেনেন, তবুও এঁরা যদি আমার প্রাপ্য সম্মান ও মূল্য না দেন, কি করতে পারি আমি?

মূল্য! হা-হা করিয়া তীব্রকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন মাষ্টার মশায়। তুমি মূল্য চাও সুমিত্রা—যোগ্যতার মূল্য? ছেলেমানুষ তুমি সুমিত্রা, একেবারে ছেলেমানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে প'ড়ে কেবল এম. এ. পাসই করেছ, কেবল ভাল ফলই করেছ তুমি, কিন্তু এখানকার বিশেষ যে শিক্ষা সেটা লাভই যে তোমার হয় নি। তুমিও শেষে সেই বুদ্ধিহীন বিদ্বানের দলেই পড়লে?

বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল সুমিত্রা।

সত্যই তো পাস করিবার আগে ও পরে তাহার নিজের মনেই তো জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। আগে ভাবিয়াছে সুমিত্রা, এত ভাল ফল তাহার, চাকরি তো তাহার ঘরে বাঁধা, আর এখন কর্মক্ষেত্রে নামিয়া দেখে তাহার বিপরীত।

মাষ্টার মশায় সান্ত্বনার বাণী খুঁজিলেন, বলিবার হয়তো কিছু পাইলেন না। একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, তারপর, এখন কি করবে?

সুমিত্রা জবাব দিল না।

মাষ্টার মশায় আর একটি সিগারেট ধরাইলেন। বলিলেন, সেখানে তোমার পরিচিত কেউ নেই?

সুমিত্রা বলিল, থাকবে না কেন? সেখানকার অনেকেই তো আমাকে চেনেন।

বাধা দিয়া বলিলেন মাষ্টার মশায়, না না, তেমন পরিচয় নয়। বলছিলাম সেখানে কি এমন কেউ নেই, যিনি তোমার পক্ষে একটু বলতে পারেন?

সুমিত্রা একটু ভাবিয়া বলিল, আছেন একজন। কিন্তু তার কি খুব দরকার আছে? তিনি একটু কেমন যেন, আমার তেমন ভাল লাগে না।

আবার হাসিলেন তিনি। ভাল লাগে না? এখন ভাল লাগা না লাগাটা একটু চেপে রাখো তো! একটু কাজ আদায় করতে শেখো। তুমি কালই যাও তাঁর কাছে। গিয়ে তাঁকে ধর, তাঁকে ব'লো, তিনি যেন তোমার পক্ষে একটু বলেন।

অর্থাৎ তোষামোদ! চুপ করিয়া রহিল সুমিত্রা। নতদৃষ্টি, সুন্দর কপালে সামান্ত কুঞ্চন জাগিয়াছে।

মাষ্টার মশায় তাহার দিকে তাকাইলেন। বলিলেন, বুঝি, তুমি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তুমি মাথা নত করতে চাও না। তোমার মন তেমন নয়; কিন্তু সুমিত্রা, পৃথিবীটা বড় জটিল। তাই তো বলছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাসই করেছ তুমি, কিন্তু তার বিশেষ শিক্ষাটাই যে তোমার হয় নি।

শ্রান্তভাবে আসন ছাড়িয়া উঠিল সুমিত্রা। নতদেহে প্রণাম জানাইয়া ধীরে বাহির হইয়া গেল। সেই অপসৃয়মান মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া মাষ্টার মশায় আর একটি সিগারেট ধরাইলেন।

পরদিন।

অপরাহ্নের ম্লান আলো ঘরে আলোছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। সুমিত্রা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সুশ্রী মুখখানি ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল। দেহের ক্লান্তি মনকে অবসন্ন করিতে পারে নাই। সাজসজ্জা একটু মলিন হইয়া উঠিয়াছে দুই-এক গাছা চুল কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। চেয়ারে বসিয়া পা দুইটা একটু সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া দিয়া একটি আরামের নিশ্বাস ফেলিল সুমিত্রা।

গোধূলির শেষরশ্মি মাষ্টার মশায়ের গায়ে ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাঁহার দৃষ্টি, উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার তাপস মূর্ত্তি।

সুমিত্রার দিকে চাহিয়া আজও তিনি সেই প্রশ্নই করিলেন, হ'ল কিছু?

অল্প স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে উত্তর করিল সুমিত্রা, হ্যাঁ, তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ জানাতেই তিনি বললেন যে, এতে দুশ্চিন্তা করবার কিছু নেই। উনি যথাসাধ্য করবেন আমার জন্তে। আর এও বললেন যে, তিনি আগেই আমার কথা নাকি ভেবেছিলেন, কিন্তু আমি তো তাঁকে কিছু বলি নি, তাই ওপর-পড়া হয়ে কিছু তিনি করতে চান নি। বললেন, কাজটা নাকি হয়ে যাবে।

স্তব্ধ হইয়া রহিলেন মাষ্টার মশায়। খানিক পরে ছোট একটি নিশ্বাস চাপিয়া বলিলেন, যাক, এতদিনে তোমার শিক্ষাটা শেষ হ'ল। জান, আমাদের দেশের দুর্গতি কোথায় এবং কেন? আমরা তো জ্ঞানদান করি না—বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানের

চর্চ্চা আর কতটুকু করা হয়, যা দান করা হয়, যার চর্চ্চা করা হয়, তা ওই খ-বিদ্যা। বিশেষ ক'রে খ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় ব'লেই এর নাম বিশ্ববিদ্যালয়। তুমি প্রথম হয়ে পাস ক'রে বেরুলে, কিন্তু তোমার মূল্য কেউ বুঝলে না, তোমার প্রাপ্য সম্মান কেউ দিলে না। কিন্তু যেই তুমি গেলে তোষামোদ করতে, অনুরোধ জানাতে, অমনই তুমি পেলে চাকরি। এই তো খ-বিদ্যা। এই শিক্ষাই আজকাল সবাই পায়, আমিও তোমাকে দিলাম এই শিক্ষা। সার্থক হ'ল তোমার প্রথম হয়ে পাস করা, পূর্ণ শিক্ষা লাভ করলে তুমি।

চুপ করিলেন মাষ্টার মশায়, তাঁদের অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটের ধূম উর্দ্ধোত্থিত হইতে লাগিল, আর বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল সুমিত্র

"গিরিনন্দিনী"

পূজোর ঝঞ্ঝাট

কি রকম পূজো কাটল আপনাদের?

আমি তো প্রায় শেষ হয়ে এলুম, মশাই। পৃথিবীতে বর্ত্তমানে বাস করা যে কি ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার, তা তো হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন? এবার আবার পূজোর কদিন বুঝলেন তো বিধাতা কি রকম পেছনে লাগতে পারেন?

উঃ, কী বৃষ্টি, বাপ রে বাপ! তাও কি হোমিওপ্যাথী ডোজে, একেবারে ফুল হাইড্রোপ্যাথী চলল কদিন ধ'রে। যা সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, তা তো হয়ে গেল পূজোর মধ্যে। ভেবেছিলুম, যাক, পূজোটা কাটবে নির্ঝঞ্ঝাটে, তার তো হিসেব গেল ঘুলিয়ে!

মশাই, পটকার জন্যে ঠায় রোদ্দুরে তিন ঘণ্টা লাইন ধ'রে দাঁড়িয়ে পাঁচ গজ ছিট, খেঁদির জন্যে ফ্রকের বাহারি কাপড়, গিন্নীর জন্যে তিন টাকা দশ আনা দিয়ে সস্তা কোরা কাপড়, পান্তুর জন্যে একটা এগারো সিকি দিয়ে প্যাণ্টুলুন কিনে নিয়ে এলুম। পাড়ার তিনটি বাঁকে যে যা চাইলে, সর্ব্বজনীন পূজোর চাঁদা দিলুম, ভেবেছিলুম তিন জায়গা থেকে মায়ের ভোগ চেয়ে এনে অন্তত নিজের ত্রিসন্ধ্যের রেশনটা বাঁচিয়ে ফেলব, তা হয়ে গেল। কোথায় ঠাকুর আর কোথায় ভোগ?

রাত্তিরে সবার খাওয়া-দাওয়া চুকলে কাঁচকলা সেদ্ধ ক'রে তিন দিন তাই গলাধঃকরণ করলুম, আর দেখলুম, গিন্নী নতুন কাপড়খানা প'রে তিনবার চোখের সামনে বাহার দিয়ে বেড়ালেন আর ভাবব্যং বংশধর আর রূপসীর দল ভাল জামা-কাপড় প'রে জানলার শিকের বাইরে ঠ্যাং বার ক'রে ক'রে বৃষ্টির জল কতখানি কমছে বাড়ছে, তাই সন্ধ্যে থেকে রাত্তির নটা পর্য্যন্ত পরখ করতে লাগল। এখন জ্বরে ভুগছে!

দেখুন দেখি, খামকা এই বাজারে কতকগুলো পয়সা নষ্ট হ'ল, কে কার জামা-কাপড়

দেখলে তার ঠিক নেই, ঠাকুর এলেন কখন আর গেলেন কখন তা তো জানা গেল শুধু প্যাঁজ প'ড়ে। অথচ দেখুন, এর জন্তে দেড় মাস আগে থেকে বায়না! কি—না, মা আসছেন! মা'র বরে যাচ্ছে।

ক্রমাগত তো দেখছি, মায়ের বদলে মায়ের পর মার আসছে, মা কই? এখনও যে এত ঝঞ্ঝাট নিয়ে টি'কে আছি কি ক'রে, সেইটেই মাথায় ঢোকে না।

আমার তো মনে হয়, দেবতারা পালিয়েছেন। মায়ের দু এক জায়গায় মূর্তি দেখলুম কিনা ষষ্ঠীর দিন আর অষ্টমীতে, দয়া ক'রে সেদিন আর বৃষ্টিটা পড়েন নি ব'লে, কিন্তু যাই বলুন মা দু-এক জায়গায় ছাড়া আর কোথাও আসেন নি, অধিকাংশ বারোয়ারিতে তো নয়ই।

এতদিন মা ছিলেন ছেলেপুলেদের নিয়ে একটি চালায়, এখন সব জায়গায় গিয়ে দেখি প্রত্যেক সন্তানটি তাঁর ভিন্ন গোত্তর, পাহাড়ের এক-একটি চূড়ো দখল ক'রে ব'সে আছেন। মা এতদিন রুদ্রমূর্তিতে মানুষের থেকে অন্তত তফাত হয়ে দেখা দিতেন, সেই সমুন্নত নাসা, দীর্ঘ টানা টানা চোখ, সেই ভ্রূর বিলম্বিত রেখা, সে সব কোথায়? মা আমার সিনেমার হিরোয়িনের মেক-আপ নিয়ে দাঁড়িয়ে। আর অসুরের পোজ কি? ওখানে উঠেও ছোকরা বায়স্কোপের প্যাঁচ দেখাচ্ছে, যেন তা না হ'লে কো-অ্যাক্টিং জমবে না! কি বিপদ বুঝুন।

আমার তো মনে হয়, আসছে বার থেকে অসুরটাকেও কায়াক ক'রে দিলে, প্রোডাক্শানটা জমবে ভাল। সিংহের লেজের কাছে মনে করুন অসুর ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ছে আর মা-দুর্গা তার বুকে চেপে ওরিয়েণ্ট্যাল ডান্সের কসরৎ দেখাচ্ছেন, এই রকম গোছের আর কি!

কারণ দেখ'ছ কিনা শক্তিকে ক্রমশ আমরা ভাগ ক'রে চলেছি, বিকৃত করতে শুরু করে'ছি, মানে বাঙালীর যা হয়ে থাকে, এক পাড়ায় সাতখানা ঠাকুর, তাই না পাওয়া যায় পুরুত, না মেলে ঢাকী; কারণ—রেশারেশি। এ দলের জোর ও দলকে দেখানো চাই, আর এই অমুককে চাঁদা দিলেন আমাদেরও দিতে হবে, কিন্তু আমরা আর দিই কত? জীবনের চতুর্দ্দিকে এই রকম চাঁদা ক'রে যদি চাঁটি খেতে হয়, তা হ'লে বাঁচি কি ক'রে? উৎসবের নামে যদি ক্রমশ এত ঝঞ্ঝাট বাড়তে থাকে, তা হ'লে ওসব বন্ধ ক'রে দেওয়াই ভাল।

মশাই, এই কথাটা একজন ভদ্রলোককে বলেছিলুম ব'লে তো তিনি আমায় যাচ্ছে-তাই ক'রে গালমন্দ দিলেন, বললেন, জানেন, এই উৎসব ক'রে আমরা কত কাঙালীকে খাওয়াই?

আমি বললুম, কাঙালী খাওয়ানো ভাল কথা, কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালী আমরা আমাদের

যে একবেলা ভাল ক'রে খাওয়া জুটছে না, মশাই। ওদের আর একদিন খাইয়ে হবে কি? পেটের অসুখ বাড়াবেন বই তো নয়! তার চেয়ে জাতটাকে আরও সতেজ ক'রে তোলার চেষ্টা করুন না চাঁদা তুলে, যাতে দেশে কাঙালী কেউ না থাকে।

ব'লে এক ঝঞ্ঝাট! তাঁর সঙ্গে আরও পাঁচজন এলেন ছুটে, এখানে সত্যি কথা বললেই তো লোকের ব্লাড-প্রেসার বেড়ে উঠে, তাই দল ভারি দেখে আমায় স'রে পড়তে হ'ল।

যাক, পূজোর পর্ব্ব তো এক রকম ক'রে কাটল। এর পর নমস্কার আর আলিঙ্গনের ঠেলা, আজও সামলাচ্ছি। চারদিন জলের জন্য বেরুতে পারা যায় নি, ভেবেছিলুম, ও ঝঞ্ঝাট বোধ হয় জলের ওপর দিয়েই কাটিয়ে দেওয়া যাবে; কিন্তু বরাত খারাপ, এখনও চোখের জলে নাকের জলে হাবুডুবু খাচ্ছি।

সংসারে গুরুজনরা যদি একস্তরে থাকেন তো একসঙ্গে বিজয়া সারা যায়, কিন্তু কেউ থাকেন টালায়, কেউ টালিগঞ্জে, কেউ রামরাজাতলায়, যাই কি ক'রে বলুন তো? ট্রাম, বাস, কাদা, বৃষ্টি, আপিস, রেশন, তেল, আলু সব সামলে আবার বিজয়া সারি কি ক'রে?

এই দেখুন না, তিনদিন আপিসে লেট হয়েছে ওপরওয়ালাদের মূর্ত্তি হয়েছে ঠিক অ্যালুমিনিয়মের হাতাবাটি তুবড়ে গেলে যে রকম হয় ঠিক সেই গোছের, অথচ লেটের কারণ জানেন?—ওই বিজয়ার কোলাকুলি।

মশাই, ট্রাম এসে গেছে, ঝুলতে ঝুলতে উঠেছি, পাশ থেকে টেনে ধরলেন খপ ক'রে এক পরিচিত ভদ্রলোক! আহা, মুখে কি হাসি! এক জোড়া দাঁতের পাটি বার ক'রে ব'লে উঠলেন, আসুন, আপনার সঙ্গে তো এখনও সারা হয় নি!

তার মানে, পনরো মিনিটের জন্তে তিনি আমার দফা সারলেন! তার আগে তো আর গাড়ি পাবার জো নেই? বুঝুন, ঝঞ্ঝাট! একে তো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে প্রত্যহ হাজার লোকের সঙ্গে বিজয়ার আলিঙ্গন সারতে হয়, তার ওপর এ এক ঝঞ্ঝাট!

তারপর ভাবুন আবহাওয়া, কি অবিশ্রান্ত বৃষ্টিই না হ'ল কদিন! ছাতা কোথায়? গুটি পাঁচেক আর-বছরে ঠেস দিয়ে কোথায় রেখে এসেছি, তা মনে নেই, নিশ্চয় সে জায়গাগুলোতে নেই, কিনতে গেলুম খুব সস্তার যেটা, তার দাম এগারো টাকা চার আনা, এর ওপর আছে সেল ট্যাক্স, পুরো বারো টাকাই ধরুন। বললুম, মশাই, গোটা পাঁচ-ছ টাকায় একটু সুবিধে গোছের ক'রে দিন দেখি একটা।

দোকানী বোধ হয় বাবুর দর-দেওয়া দেখেই বাবুরও দাম বুঝে ফেললে। সে নিতান্ত অভব্যের মতই যে-ছাতাটা দেখছিলুম, সেটা কস ক'রে হাত থেকে টেনে আবার ছাতার খাপে রেখে দিলে। কি বিপদ বুঝুন। আবার সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী, পাঁচ-ছ টাকায় আর ছাতা পাওয়া যায় না, তার হাতা পাওয়া যেতে পারে।

রাগ হ'ল মনে মনে। আমিও একটু রাগতস্বরে ব'লে উঠলুম, মশাই, এর বাঁটটা তো বাঁশের!

সে আরও স্বর চড়িয়ে ব'লে উঠল, ইদানিং বাঁশের দর জানেন?

দেখলাম যে বাঁশ নিয়ে আর তর্ক ক'রে লাভ নেই, কারণ ওটাও যে আজকাল চড়া দামে লোকে দিতে শুরু করেছে, তা খেয়াল ছিল না।

অতএব ভিজতে ভিজতেই বেরিয়ে পড়লুম বিজয়া সারতে। রাস্তায় থই থই করছে জল! বর্ষণের তো কথাই নেই।

জুতোটি হাতে নিয়ে সর্ব্বাঙ্গ জবজবে হয়ে যে বাড়িতে গেলুম, শুনলুম, তাঁরা আবার অপর জায়গায় কোলাকুলি সারতে বেরিয়ে গেছেন। ফিরে এলুম। এখনও নাক দিয়ে সর্দ্দি ঝরছে, ব্রায়োনিয়া ৩০ খেয়েও সামলাতে পারছি না। বুঝুন, ঝঞ্ঝাট কি রকম ভাবে আসে!

এতত্তেও আপনারা বলবেন, ভগবান পরম দয়ালু! তা আর নয়?

তাঁর দয়াতেই তো আজকাল প্রাতঃকালে উঠেই প্রত্যহ আধ সের ক'রে আলু আনবার জন্যে লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে!

শ্রীবিরূপাক্ষ

সংবাদ-সাহিত্য

আজ একুশে নবেম্বর। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের স্থগিত বিচার দিল্লীর লাল কেল্লায় সকাল হইতে শুরু হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় সেই উপলক্ষ্যে ছাত্রদের প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। গত কিছুদিন যাবৎ নানাবিধ সাময়িক-পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা ও চিত্র-সংগ্রহ মারফৎ বাংলা-মায়ের সন্তান সুভাষচন্দ্রের অপূর্ব কীর্ত্তি-কাহিনী অবগত হইয়া চমৎকৃত হইতেছিলাম। তথাকথিত-দুধ-ঘি-রাবড়ি-মৎস্য-সেবিত এই কাঠামোতে স্বপ্নে অথবা আজগুবি কল্পনাতেও যাহা ধারণা করা অসম্ভব, সুভাষচন্দ্র যে তাহা বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন, নিতান্ত গালগল্প নয়, প্রত্যক্ষ ফোটোচিত্রযোগে তাহার অকাট্য প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে। বহু শতাব্দীর অসামরিক অভ্যাস ও মনোবৃত্তিতে বিস্ময় বোধ না করিয়া উপায় নাই। বিচারের ধারা অনুসরণ করিতে গিয়াও পাইতেছি, এই বাঙালী নেতাজীর প্রতি অবাঙালী ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ সকল জাতির সামরিক নায়কদের অপরিসীম শ্রদ্ধা ভক্তি ও আনুগত্যের পরিচয়। ধর্মে ও মনে, দেশে ও দশায় বিচ্ছিন্ন বিপর্যস্ত লক্ষাধিক ভারতবাসী তাঁহার আহ্বানে সর্ববিধ বিভেদের সকল গণ্ডি হেলায় ভাঙিয়া

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কতদিন হবে,
চারিদিক হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে!

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
'আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।"

* * *

৫ই মে, ১৯৪২। হ্যালো, বার্লিন কলিং। সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর!

"ব্রিটিশ প্রচারবিভাগ বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যাহাই বলুক, সুচিন্তাপরায়ণ সকল ভারতবাসীর ইহা স্পষ্ট জানা উচিত যে, এই বিপুল পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একটিমাত্র শত্রু আছে, যে শত্রু শতাধিক বর্ষকাল তাহাকে শোষণ করিয়াছে, যে শত্রু ভারতমাতার জীবন-শোণিত চুষিয়া লইতেছে—সে শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে দিন পরাভূত হইবে, সেই দিনই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন আপোসহীন সংগ্রামেই আমার সমস্ত জীবন কাটিয়াছে। আমি শৈশব হইতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চিনিয়াছি। কূটনীতিতে ওস্তাদ তাহারা, কিন্তু সকল চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাধা দিতে পারে নাই, পৃথিবীর কোনও শক্তিই তাহা পারিবে না।

আমি আজীবন ভারতবর্ষের সেবক, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাহাই থাকিব। পৃথিবীর যে অংশেই আমি থাকি না কেন, একমাত্র ভারতের প্রতিই আমার আনুগত্য ও ভক্তি আজিকার মত চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। স্বদেশীয় বন্ধুগণ! ভারতবর্ষের আসন্ন মুক্তির মুখে আমি তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ১৯৪২ সালে শেষ স্বাধীনতা-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।"

* * *

২১, ২৪ ও ২৯ জুন, ১৯৪৩। টোকিও কলিং। সুভাষচন্দ্র বলিতেছেন—

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনও আপোসের আশা আমাদিগকে একেবারেই ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের স্বাধীনতা আপোসের অপেক্ষা রাখে না। ব্রিটিশ ও তাহাদের মিত্র শক্তিরা যখন চিরতরে ভারত পরিত্যাগ করিবে, তখনই স্বাধীনতা অর্জিত হইবে। যাহারা সত্যই স্বাধীনতা চায়, তাহাদিগকে তাহার জন্য সংগ্রাম বরণ করিয়া লইতে হইবে এবং রক্তমূল্যে তাহা ক্রয় করিতে হইবে।···অচিরকালমধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। স্বাধীন ভারতবর্ষে কারাগারের উন্মুক্ত দ্বারপথে তাহার মহৎ সন্তানেরা একে একে অন্ধকার বন্ধন-কোটর হইতে স্বাধীনতার আলোকে উত্তীর্ণ হইবেন।

...ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার দায়িত্ব আমাদের, ভারতবাসীরই শুধু। সে দায়িত্ব আমরা অন্য কোনও জাতির উপর চাপাইয়া দিব না, কারণ তাহা হইলে আমাদের জাতির সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে।...ব্রিটিশ শক্তিকে যদি আমরা ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে চাই, তাহাদেরই অস্ত্রে তাহাদের সহিত লড়িতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুদূর প্রাচ্য এশিয়ায় অবস্থিত আমার স্বদেশবাসীদের সাহায্যে আমি এমন বিরাট সৈন্যদল গঠন করিতে পারিব, ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শক্তিকে যাহারা নিঃশেষে বিদায় করিতে পারিবে।"

[সিঙ্গাপুর, জুলাই ২, ১৯৪৩ "সুভাষবাবু আজ আসিলেন। স্ত্রীপুরুষ শিশুবৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে স্বাগত জানাইতে ছুটিল। ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সে এক নিঃশ্বাসরোধ দৃশ্য। মানুষের সমুদ্র—ভারতীয়, মালয়বাসী, চীনা ও জাপানী—সকলেই সেই মহা-বিপ্লবীকে একবার চোখে দেখিবার আগ্রহজনিত সংঘর্ষে পরস্পর চূর্ণ হইয়া গেল। ঋজু দৃঢ় ভঙ্গী, গৌরবে অনমনীয় উচ্চ শির এবং মুখে ভুবন-ভোলানো হাসি লইয়া সুভাষবাবু সকলের হৃদয় হরণ করিলেন। মনে মনে আমাদের বিশ্বাস জন্মিতেছে যে সেই নেতা আসিলেন, যাঁহাকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি এবং যিনি আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন। ফোটোগ্রাফে তাঁহার চমৎকার দেহগঠন ও পুরুষোচিত দৈর্ঘ্য ঠিকমত প্রকাশ পায় না। আমাদের চান্সারি লেনের অফিসে স্থানীয় কর্মীদের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কালে আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। তাঁহার হাসির সামনে কোনও বিরোধিতাই টিকিতে পারে না। যখন অদম্য মিঃ ডি— জাপানীদের প্রতি অকপট বিশ্বাস স্থাপন করার বিরুদ্ধে বারম্বার বলিতেছিলেন, সুভাষবাবু তাঁহার দিকে একটু ফিরিয়া হাস্য করিলেন। পরে বলিলেন, 'আমাদিগকে সদাজাগ্রত ও সচেতন থাকিতে হইবে, সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, সাম্রাজ্যবাদপ্রবণ জাপানী বুরোক্র্যাটদের বিরুদ্ধেও' "—শ্রীমতী ম'র ডায়েরি হইতে।]

* * *

সিঙ্গাপুর, ৫ জুলাই, ১৯৪৩। জগৎসমক্ষে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রথম ঘোষণা-দিবস। "নেতাজী" সুভাষচন্দ্রের ঘোষণা শুনিলাম—

"আজ আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবের দিন। আজ বিধাতা সদয় হইয়া আমাকে অদ্বিতীয় সম্মানে ভূষিত করিলেন, আমি সমস্ত জগতের কাছে ভারতের মুক্তিফৌজের অস্তিত্বের কথা নিবেদন করিবার গৌরব লাভ করিলাম। সিঙ্গাপুরের সমরক্ষেত্রে এই ফৌজ আজ সামরিক শ্রেণীবদ্ধতায় সজ্জিত হইয়াছে, সেই সিঙ্গাপুর যাহা একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। এই ফৌজ ব্রিটিশের বন্ধন-জোয়াল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিবে। সমস্ত ভারতবাসীর ইহা গর্বের বিষয় যে, এই ভারতীয় ফৌজ সম্পূর্ণ ভারতীয় নেতৃত্বে সংগঠিত হইয়াছে, এবং সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত যখন আসিবে

হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি ধীর শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, আমি সব জানি। যাহারা দিল্লী যাইতে চাহিতেছে, ডালহৌসি স্কোয়ারে উহারা তাহাদিগকে পৌঁছিতে দিবে না। উহারা জানে, তাহাদের শেষ কামড় দিবার সময় সমাগত কিন্তু আমাদের বিচলিত হইলে চলিবে কেন ?

নন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া গুলি ও লাঠি চার্জের সংবাদ দিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ ও ভ্রাতৃগৌরবে গৌরবান্বিত শরৎচন্দ্র অবোধ ছাত্রদের দুর্বিনীত জনতার সংস্পর্শ পরিহার করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র এরূপ করিতেন কি ?

গোপালদা যেন নন্তুর কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না। সুভাষচন্দ্রের 'তরুণের স্বপ্ন' খুলিয়া পড়িলেন—

"নিঃস্বার্থ আত্মদানের কথা আর তো কোথাও শুনিতে পাই না। অত বড় একটা প্রাণ নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া মহাশূন্যে মিশিয়া গেল ; আগুনের ঝলকার মত ত্যাগ মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া বাঙালীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল ; সেই দিব্য আলোকের প্রভাবে বাঙালী ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের পরিচয় পাইল ; কিন্তু আলোকও নিবিল, বাঙালীও পুরাতন স্বার্থের গণ্ডিতে আশ্রয় লইল। আজ বাংলায় সর্বত্র কেবল ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি চলিতেছে। যাহার ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতা বজায় রাখিতে ব্যস্ত। যাহার ক্ষমতা নাই সে ক্ষমতা কাড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর। উভয় পক্ষই বলিতেছে, 'দেশোদ্ধার যদি হয়, তবে আমার দ্বারাই হউক, নয়তো হইয়া কাজ নাই।' এই ক্ষমতা-লোলুপ রাজনীতিকবৃন্দের ঝগড়াবিবাদ ছাড়িয়া, নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কর্মী কি বাংলায় আজ নাই।"

বাহিরে কোলাহল প্রবল হইল, একটিমাত্র ধ্বনি কানে আসিল, "আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ"।

—

—

'শনিবারের 'চিঠি'র কোনও পাঠকের সন্ধানে ১৩২১ ও ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের 'যমুনা' মাসিকপত্র থাকিলে আমাদের জানাইলে বাধিত হইব।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৫২

গান্ধীবাদ সম্বন্ধে আলোচনা

গঠনকর্মের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে পাঠকের মনে যে-সকল প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক, তাহার মধ্যে একটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। শুধু মোটা ভাতকাপড়ের আকর্ষণ বেশি না হইতে পারে, কিন্তু আমরা স্বাধীন হইব, আমাদের বাঁচা-মরার উপরে নিজেদের কর্তৃত্ব থাকিবে, ইহার লোভ তো মানুষকে অনেক দূর পর্যন্ত আগাইয়া লইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু লক্ষ্য এবং উদ্যমের দ্বারা সব হয় না। গঠনকর্মে কতদূর পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব, পথে কোন্ কোন্ বাধা আসিতে পারে, সে-সম্বন্ধেও বহুবিধ প্রশ্ন মনে জাগে। এবং সেগুলির নিরসন না হওয়া পর্যন্ত গান্ধীজীর আদর্শের সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় হইতে পারে না। বিশ্বাস দৃঢ় না হইলে, ভিতরে সংশয় অবশিষ্ট থাকিলে, কাজেরও জোর হয় না; তাহার যেন শিরদাঁড়া ভাঙিয়া যায়। অতএব বর্তমান প্রবন্ধে সমগ্র গান্ধীবাদ সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ইহার যথার্থ রূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

সুবিধার জন্য ইহা আলোচনার আকারে লেখা হইল। এক পক্ষে পাঠক সমাজতন্ত্রের সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্ন, অন্য পক্ষে লেখক গান্ধীজীর অহিংস আদর্শে বিশ্বাসী।

পাঠক। ধ'রে নিলাম যে মানুষ স্বাধীনতার লোভে গঠনকর্মের দ্বারা নিজের ভাত-কাপড়ের বন্দোবস্ত করতে রাজি হ'ল। কিন্তু পৃথিবীর প্রতি দেশে ধনীরা যে-ভাবে আর্থিক জীবনকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে কি জনসাধারণের পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব? রাজশক্তির প্রয়োগের দ্বারা মুক্তির চেষ্টাকে ব্যর্থ করা যায় না? এই তো গত ১৯৪২ সালে ভারতের সর্বত্র খাদির কাজ গবর্মেণ্টের চাপে সম্পূর্ণ অচল হয়ে গিয়েছিল।

লেখক। ধনীদের বাধা যে দুরন্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু সব রকম বাধা সত্ত্বেও জনসাধারণকে আর্থিক মুক্তির জন্য গঠনপদ্ধতির দ্বারা চেষ্টা করতেই হবে।

পাঠক। পারবে কি না পারবে তার ঠিক নাই, সামনের দেওয়ালে মাথা ঠুকে গেলেই কি এগুনো যায়?

লেখক। আপনি কি করতে বলেন? আপনার পথের সম্বন্ধে একটু শুনে নিই, তার পর আমি অহিংস উপায়ের যুক্তি দেবার চেষ্টা করব।

পাঠক। আমার মনে হয়, নূতন আর্থিক ব্যবস্থা সৃষ্টির চেয়ে প্রথমে রাজশক্তি অধিকার করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ রাজশক্তি হ'ল সমাজের অপর সকল শক্তির মূলাধার।

লেখক। কিন্তু জনসাধারণ সেই শক্তিকে দখল করবে কেমন ক'রে?

পাঠক। জনসাধারণের শিক্ষা এবং দক্ষতা নাই ব'লে সংগ্রাম চালানোর জন্ত একটি পার্টির প্রয়োজন। সেই পার্টি আন্দোলনকে সুদক্ষভাবে চালিয়ে জনসাধারণের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রকে অধিকার করবেন। তারপর সমাজের ভিতরে এবং বাহিরে যে-সকল বাধা-বিপত্তি আছে সেগুলিকে কাটাবার চেষ্টা করবেন। সেগুলি নির্মূল হওয়ার পরে তখন পৃথিবীর সর্বত্র নূতন সমাজ ও নূতন জীবন গ'ড়ে তোলার সময় আসবে, তার আগে নয়। এবং এজন্ত সামাজিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ তো চলবেই না, বরং সমস্ত আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে একান্তভাবে কেন্দ্রে সংগৃহীত করতে হবে। নয়ত নূতন সমাজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে, আমাদের আদর্শ মরীচিকার মত বিলীন হয়ে যাবে।

লেখক। আপনার এ কথা সত্য যে, রাজশক্তিকে অস্বীকার করা চলে না। সেইজন্ত গান্ধীজী অপরাপর নৈরাজ্যবাদীদের মত রাজশক্তির সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন না। তিনি আদর্শবাদী হ'লেও আসলে কর্মযোগী।

কিন্তু সমাজে রাজশক্তি আজ যে-আসন অধিকার ক'রে রয়েছে সে ত মানুষেরই গড়া জিনিস। মানুষ রাজশক্তির ভয়ে ত্রস্ত। তা ছাড়া সমাজের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণের জন্ত সে যে-সকল ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলেছে, সেগুলিকেও সে রাজশক্তির অধীন ক'রে রেখেছে ব'লেই ত রাষ্ট্রের আজ এত ক্ষমতা।

পাঠক। কিন্তু তা ছাড়া উপায়ই বা কি? রাজশক্তির সাহায্য বিনা মানুষ কি সমাজের কোনও প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে পারে?

লেখক। আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত স্বীকার করি। অর্থাৎ আত্মরক্ষার উপায় যদি মানুষের নিজের আয়ত্তে না থাকে, তবে তার পক্ষে রাষ্ট্রের কাছে দাসখত লিখে দেওয়া ছাড়া গতি নাই, তা স্বীকার করি। এবং সেক্ষেত্রে আপনি বিপ্লবের যে পন্থা নির্দেশ করেছেন, তাকে সমীচীন ব'লে মানতে হবে। কিন্তু গান্ধীজী আত্মরক্ষার শক্তিকে প্রতি মানুষের আয়ত্তে আনতে চান এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আর্থিক এবং অন্তবিধ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকেও রাষ্ট্রের আওতা থেকে মুক্ত করতে চান। অহিংস অসহযোগের দ্বারা প্রথমটি সম্ভব এবং গঠনকর্মের দ্বারা দ্বিতীয়টি সম্ভব হবে ব'লে তিনি মনে করেন।

পাঠক। রাষ্ট্রের সম্বন্ধে কথাটি একটু খুলে বলুন, পরিষ্কার হচ্ছে না।

লেখক। গান্ধীজী চান যে, বিপ্লবের সূচনা থেকেই আমরা মানুষের জীবনকে যথাসম্ভব রাষ্ট্রের প্রভাব থেকে মুক্ত কর'ব। আজকের সর্ববিধ বিঘ্ন সত্ত্বেও যদি সাধারণ মানুষের পক্ষে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাকে আংশিকভাবে নিজের আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়, তা হ'লে কম কথা নয়।

পাঠক। কিন্তু আংশিকভাবে পারাও কি সম্ভব? রাষ্ট্রপতিরা যখন দেখবে, দেশের সাধারণ লোক অতিমাত্রায় স্বাধীন হয়ে উঠছে তখনই তারা জনসাধারণের সংস্থাগুলিকে পিষে মেরে ফেলবে। রাজশক্তি যদি দয়া ক'রে বাধা না দেয়, তা হ'লে গঠনকর্মের দ্বারা হয়ত যৎসামান্য আর্থিক মুক্তি সম্ভব হতে পারে।

লেখক। সে কথা খানিক সত্য। তাই গান্ধীজী বলেন, নিছক গঠনকর্মের দ্বারা স্বরাজ-সাধনার শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছানো কার্যত হয়ত আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এবং রাজশক্তিকে অধিকার করার জন্য আইন-অমান্য বা শান্ত প্রতিরোধেরও প্রয়োজন হতে পারে।

পাঠক। তবে সেই চেষ্টা গোড়া থেকে করাই ত ভাল। মিছামিছি গঠনকর্মের পিছনে সময় অথবা শক্তির অপচয় ক'রে লাভ কি?

লেখক। লাভ আছে। জনসাধারণ নিজের চেষ্টায় যদি এক আনা পরিমাণও আর্থিক মুক্তি লাভ করতে পারে, গ্রামগুলি যদি খাওয়া-পরার জিনিস যৌথ-প্রচেষ্টার দ্বারা খানিক দাঁড় করাতে পারে, তবে জনসাধারণের মনে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে। ধন উৎপাদন বা বণ্টনের কোন্ ব্যবস্থা সকলের পক্ষে কল্যাণকর, তার সম্বন্ধে কার্যত অভিজ্ঞতা লাভ করবে। এবং যদি শান্ত প্রতিবোধ একান্ত করতেই হয়, তখন গঠনকর্মের ফলে তাদের নূতন শক্তি লাভ হবে। আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য বিরুদ্ধ শক্তি গ্রামগুলিকে আর অনাহারে মারতে পারবে না।

এই সব নানা কারণে গান্ধীজী গঠনকর্মের উপর এত বেশি জোর দেন।

পাঠক। সম্ভব হ'লে অবশ্য এতে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের পরও যেন চরকা আঁকড়ে আপনারা প'ড়ে থাকবেন না, বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য নেবেন। যাক্ সে কথা। আর একটি প্রশ্ন মনে জেগেছে, অনুমতি করেন তো জিজ্ঞাসা করি।

লেখক। বলুন।

পাঠক। আচ্ছা, আপনি তো রাজশক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে চান।

লেখক। না, তা নয়। রাজশক্তিকে জনসাধারণের আয়ত্তাধীনে এনে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

পাঠক। সে তো আমরাও চাই, তবে তফাৎ কোথায়?

লেখক। তফাৎ অনেক। আপনারা মনে করেন, সুদূর ভবিষ্যতে রাজশক্তি একদিন বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যাবে এবং সেই অবস্থা আনার জন্য আপনারা সাময়িকভাবে বঞ্চিত সর্বহারাদের হাতে রাজশক্তিকে এনে তাকে সমাজে সর্বশক্তিমান করতে চান। কিন্তু গান্ধীজী রাজশক্তির সম্পূর্ণ লয় চাইলেও মনে করেন, যতদিন

পৃথিবীতে মানুষ থাকবে, ততদিন হয়ত রাজশক্তিরও প্রয়োজন হবে। অতএব আজ থেকেই আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত, কি ক'রে স্বেচ্ছায় গড়া প্রতিষ্ঠানের মাত্রা সংসারে বাড়ানো যায় এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করা যায়। যতটুকু রাজশক্তি পরিহার করা চলবে না, তাকেও দোষমুক্ত করার জন্ম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ধ্বংস করা তাঁর লক্ষ্য নয়।

পাঠক। আচ্ছা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস লক্ষ্য না হ'লেও, যে কথা আগে জিজ্ঞাসা করছিলাম, এখনকার শক্তিমানদের হাত থেকে আপনারা তো শক্তি ছিনিয়ে নিতে চান? অহিংসায় অন্তত এটুকু করা চলে তো?

লেখক। ছিনিয়ে নিতে চাই, এভাবে বললে ঠিক হবে না। প্রভেদটুকু বিশদভাবে বলতে দিন। গঠনকর্ম বা আইন-অমান্তের দ্বারা জনসাধারণ বর্তমান শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধে বা রাজশক্তির সঙ্গে যখন সহযোগিতা বর্জন করে, তখন ধ্বংস করাই তাদের লক্ষ্য নয়। শাসকবর্গের উচ্ছেদসাধন করাই যদি তাদের উদ্দেশ্য হ'ত, তা হ'লে বিপক্ষকে কত বেশি ক্রুত করা যায় সেদিকেই বেশি দৃষ্টি থাকতো। কিন্তু এ বিষয়ে গান্ধীজীর দৃঢ় নিষেধ আছে।

পাঠক। তবে আপনার উদ্দেশ্য কি?

লেখক। ভাঙতে চাই বটে, কিন্তু সে শুধু প্রতিষ্ঠানের অমঙ্গল রূপটিকে। সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানই জনসাধারণের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে, তা সে সহযোগিতা ভালবাসা থেকেই আসুক অথবা ভয় বা লোভের বশেই হোক। কোন প্রতিষ্ঠানকে যখন আমরা মন্দ ব'লে চিনতে পারি, তখন তার থেকে আমাদের আশ্রয়কে ক্রমশ সঙ্কুচিত ক'রে আনি। প্রতিষ্ঠান যাঁরা চালান, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোনও অভিযোগ নাই। কিন্তু স্বার্থে আঘাত লাগার ফলে অথবা ভ্রান্ত আদর্শনিষ্ঠার বশে তাঁরা অসহযোগীদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। অসহযোগ যত ব্যাপক হয়, উৎপীড়নের মাত্রাও তত বৃদ্ধি পায়। আমরা যদি কিছুতেই ধৈর্য না হারাই, নিজেদের আদর্শে অবিচল থাকি, তা হ'লে শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের হৃদয়ে বিস্ময়ের আঘাত লাগবে, এবং তাঁরা আমাদের দাবি বিবেচনা করার জন্ত প্রস্তুত হবেন।

এই অবস্থায় **উভয়ে মিলে** পুরাতন প্রতিষ্ঠানটির পরিবর্তে সর্বজনের পক্ষে কল্যাণকর নূতন প্রতিষ্ঠান কি ক'রে গড়া যায়, আমরা তারই চেষ্টা করিব।

পাঠক। আচ্ছা, তা হ'লে অহিংসা এবং হিংসামূলক অসহযোগিতার মধ্যে এই তফাৎ যে, হিংসায় যেমন শোষণযন্ত্রের কর্ণধারগণের উচ্ছেদসাধন করা হয়, অহিংসায় সেই মানুষগুলিকে পরিবর্তিত ক'রে সহকর্মীতে পরিণত করা হয়?

লেখক। আপনি ঠিকই বলেছেন।

পাঠক। অবশ্য এরকম ঘটলে আপত্তির কিছু নাই, কিন্তু ব্যাপারটিকে সম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে না। যারা ক্ষমতার অধিকারী, স্বার্থে অন্ধ, তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ভয়ের দ্বারাই সম্ভব, ভালবাসায় নয়।

লেখক। ভয়ের বশে হৃদয়ের কোন পরিবর্তন হয়, কেমন ক'রে স্বীকার করি বলুন? ইস্কুলের ছেলেকে পর্যন্ত ঠেঙিয়ে বদলানো যায় না, আর হাজার হাজার লোকের মন প্রহারের দ্বারা বদলে দেবেন? যে আজ পরাস্ত হবে, সেও তো শোধ তোলার জন্ম চেষ্টা ছাড়বে না। আর কার হাতে অস্ত্রবল কতখানি থাকবে, এ বিজ্ঞানের যুগে তা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে? হিংসার পথের শেষ আছে ব'লে আমরা মনে করি না।

পাঠক। সে প্রশ্ন এখন না হয় নাই তুললেন। প্রথমে আপনার সত্যাগ্রহের বিষয়েই ভাল ক'রে বোঝা যাক। আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, রাজশক্তির বিরুদ্ধতার ফলে গঠনকর্ম কি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে? উত্তরে আপনি বলেন, যতদূর সম্ভব ততদূর এগুনোর দরকার। তার পরে রাজশক্তিকে আইন-অমান্য বা সহযোগিতাবর্জনের দ্বারা পঙ্গু ক'রে দিতে হবে।

আপনি রাষ্ট্রের বর্তমান অধিকারীদের হৃদয়কে ভালবাসার দ্বারা অথবা ভয়ের দ্বারা পরিবর্তন করতে চান, সে প্রশ্ন অবান্তর। এখন প্রশ্ন হ'ল, যতদিন সেই পরিবর্তন না ঘটছে, ততদিন রাজশক্তির বিরোধিতার সামনে দাঁড়িয়ে জনগণের প্রতিষ্ঠানকে আত্মরক্ষা করতে হবে। তারা পারবে তো?

লেখক। আত্মরক্ষার প্রশ্নই হ'ল মূল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। গান্ধীজী বহুবার এর উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন এবং সংগঠনেরও নানাবিধ উপায় নির্দেশ করেছেন। সেগুলির সম্বন্ধে বলার আগে আপনার মতও একটু শুনতে চাই।

আপনাদের পথে রাষ্ট্রের পুঞ্জীভূত শক্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণের বাঁচবার উপায় কি? আমরা তো প্রতি দেশে গঠনকর্মের সাহায্যে মানুষকে আংশিকভাবে রাজশক্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রে রাষ্ট্রকে সঙ্কুচিত করতে চেষ্টা করি। কিন্তু আপনি বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাস করেন না। রাষ্ট্র যদি সর্বশক্তিমান থেকে যায়, মানুষের খাওয়া-পরা মরা-বাঁচার উপর যদি তার সর্বময় অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে, তা হ'লে জনসাধারণের পক্ষে আত্মরক্ষা করা কি আরও কঠিন হয়ে পড়ে না?

পাঠক। না, তার উপায় আছে। কোনও একটি দেশের মধ্যে হয়তো জনসাধারণ রাজশক্তির নিকট পরাস্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আজ পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই একা একা চলে না। পৃথিবীর সর্বদেশের নিপীড়িত সর্বহারা জনগণকেও তেমনই একা একা বিচ্ছিন্নভাবে চলতে দেওয়া উচিত নয়। তারা একযোগে কাজ করলে তাদের বাঁচার আশা আছে, নয়তো পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

প্রতি দেশের মধ্যে সর্বহারাদের সম্মিলিত শক্তি রাষ্ট্রকে আঘাত করার চেষ্টা করবে, দণ্ডশক্তিকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে। হয়তো তাদের বার বার পরাজয় হবে। হয়তো ভারতবর্ষে তারা পরাস্ত হ'ল, কিন্তু চীনে বা স্পেনে ঘটনার সুযোগ নিয়ে তাদের বিজয়লাভ ঘটবে; তখন ভারত আবার এগিয়ে যাবে। কেননা পুঞ্জীভূত রাজশক্তি জগতের যে-কোন দেশে পরাস্ত হ'লে সর্বত্রই তার ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এই হ'ল ভরসার কথা।

লেখক। আপনি বিশ্ববিপ্লবের যে আভাস দিলেন, তার সম্বন্ধে একটি সমস্যা তো থেকেই যায়। সেটা অবশ্য হিংসাত্মক সকল সংগ্রামের বেলাতেই মনে আসে। আপনি যে বিপ্লবের কথা বলছেন, তাকে সফল করার জন্য পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে, কখন আঘাতের সময় হয়েছে, কখন হয় নি, এ-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল একটি রাজনৈতিক দলের একান্ত প্রয়োজন। তাঁরা কর্ণধার হয়ে জনশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ না করলে সকল উত্তমই বিফল হয়ে যাবে। কিন্তু বিপ্লবের পর এই শক্তিশালী নিয়ন্ত্রকের দল ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন, তার স্থিরতা কোথায়? বুদ্ধিবলের দ্বারা জনসাধারণকে পঙ্গু রেখে তাঁদের পক্ষে ক্ষমতার ফসল নিজেদের জন্য সংগ্রহ করার সম্ভাবনা কি একেবারে নাই?

পাঠক। অসম্ভব না হতে পারে, কিন্তু যারা সত্যই বিপ্লব চায় তারাও তো চুপ ক'রে ব'সে থাকবে না। ভ্রষ্ট বিপ্লবীদের হাত থেকে শক্তি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তারাই তখন জনসাধারণকে সাহায্য করবে।

লেখক। আচ্ছা, বিপ্লবী জননায়ক যদি ব্যভিচারী হয়, তা হ'লে সমস্ত বিপ্লবকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে ত?

পাঠক। পারে বই কি।

লেখক। তবে ত বিপদের কথা। বানের জলে খড়কুটো ভেসে যায়। কিন্তু খড়কুটোর তাড়নায় যদি নদীর গতি পর্যন্ত বদলে যায়, তা হ'লে বিপ্লবকে সফল করা তো অতিশয় কঠিন ব্যাপার। জনকয়েক বিপ্লবী নায়ক পথভ্রষ্ট হবেন না, এবং যথেষ্ট কৌশলের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত, ভ্রষ্টাচারী নেতাদের চক্রান্ত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে পারবেন, এই ভরসাই আপনার তা হ'লে শেষ ভরসা।

পাঠক। কিন্তু এর চেয়ে ভাল কোনো পথ দেখাতে পারেন?

লেখক। 'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এ কথা বলেছি যে, অহিংস অসহযোগকে সফল করার ব্যাপারে জনসাধারণের উত্তম এবং আত্মনিয়ন্ত্রণই প্রধান বস্তু। পার্টির নিয়ন্ত্রণ প্রথম অবস্থায় থাকলেও, পরে, অর্থাৎ বিপ্লব যখন ঘনীভূত হয়ে আসে, তখন বজায় রাখা সম্ভবও না, প্রয়োজনও হয় না। অহিংস অসহযোগের ধরণই এমন যে, সেখানে নিয়ন্ত্রণশক্তিকে কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত করার খুব বেশি প্রয়োজন নাই। যতটুকু বা

কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করতে হয়, তাও শাসনের দ্বারা নয়, বুঝিয়ে সুঝিয়ে মানুষকে রাজি করিয়ে চালাতে হয়। রাজি না হ'লে, যারা স'রে যাবে, তারা আন্দোলনের ক্ষতি করতে পারে না। গান্ধীজী বলেন, শেষ পর্যন্ত একজন খাঁটি সত্যাগ্রহী বেঁচে থাকলেও বিজয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ তাকে কেন্দ্র ক'রে সমাজের শুভ শক্তি আবার দানা বেঁধে ওঠে।

পাঠক। যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারও করি যে, অহিংস অসহযোগের দ্বারা জনসাধারণ কোনও একটি ক্ষুদ্র দেশে দুর্বল শাসকবর্গের হাত থেকে রাজশক্তি সাময়িক-ভাবে ছিনিয়ে নিতে পারে, তবু প্রবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ সে প্রতিরোধ করবে কেমন ক'রে, সে কথাটি ত পরিষ্কার হ'ল না! দেশের ভিতরের পরাজিত শাসকবর্গ বাইরের শক্তির সাহায্য নিয়ে জনসাধারণকে পরাস্ত করার চেষ্টা করবে নিশ্চয় এবং তেমন সাহায্য দেবার শক্তিরও অভাব হবে না।

লেখক। দেশের পরাজিত শাসকবৃন্দ সে চেষ্টা করবে কেন? নূতন সমাজগঠনে তারাও তো নূতন মর্যাদার আসন লাভ করবে, পরাজয়ের গ্লানি তার অন্তরে আমরা আসতেই দেব না।

অবশ্য যদি তাদের চিত্তের সম্যক্ পরিবর্তন না হয় অথচ রাজশক্তি দেশের জনসাধারণের অধিকারে এসে পড়ে, তবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ অসম্ভব নয়। এবং সেই অবস্থাতে আত্মরক্ষার উপায় যদি না থাকে, তবে গান্ধীজীর আদর্শ কোনদিনই জগতে প্রতিষ্ঠিত হবে না, স্বীকার করি। আত্মরক্ষার প্রশ্ন একদিক থেকে মূল প্রশ্ন।

আপনি অবশ্য বলেছেন জগতের সম্মিলিত ধনতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সর্বহারাগণ এক হ'লে তবেই তাদের বিজয়লাভ সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এক হয়েও তারা কি রাষ্ট্রের অধিকার থেকে অস্ত্রবল ছিনিয়ে নিতে পারবে? আজ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে মানুষকে হত্যা করার ক্ষমতা কি জগতের মুষ্টিমেয় লোকের আয়ত্তে চ'লে যায় নি? যে-দেশের আয়ত্তে যথেষ্ট লোহা, তেল বা ইউরেনিয়ম আছে তাদেরই পক্ষে কেবল তা হ'লে স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব হয়। অতএব অস্ত্রবলের উপর নির্ভর করলে জনসাধারণের মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়?

পাঠক। অবশ্য আজ পৃথিবীর যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, সেখানে বাস্তবিকই কোনো না কোনো শক্তিশালী জাতিপুঞ্জের সঙ্গে মিতালি ছাড়া বাঁচবার উপায় নাই। রুশিয়াকে সেইজন্যই ইংলণ্ড এবং আমেরিকার মত ধনতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়েছে। বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে তো লাভ নাই, না হ'লে ফাসিষ্ট রাক্ষসের উৎপীড়নে জগতের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

লেখক। কিন্তু মিতালি করতে গিয়ে কি রুশিয়াকে নিজের আদর্শ থেকে পেছুতে হয় নি?

পাঠক। সাময়িকভাবে ঘটলেও সেটা স্থায়ী বস্তু নয়। প্রতি দেশের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে জগতের সর্বত্র ধনতন্ত্রকে দুর্বল ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু যতদিন সকল দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, ততদিন রুশিয়া যে-পথ গ্রহণ করেছে সেই পথই সমীচীন ব'লে মনে করি।

লেখক। কিন্তু রুশিয়া অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধি করার পরিবর্তে নিজের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটিকেই তো ভেঙে দিতে বাধ্য হয়েছে।

আচ্ছা, সে কথা যাক। আপনার কথায় বুঝতে পারছি, যদি প্রতি দেশে জনশক্তি জাগ্রত হয়, দেশের অস্ত্রবল তাদের আয়ত্তে আসে, তবেই আপনার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা আছে।

পাঠক। ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তাতে অসুবিধা কোথায়?

লেখক। অসুবিধা তিন-চারিটি। প্রথম, জগতে মারণাস্ত্র যে ক্ষুদ্র জনসমষ্টির আয়ত্তে রয়েছে, তাদের হাত থেকে জনসাধারণ ছিনিয়ে নেবে কেমন ক'রে তার পথ দেখতে পাচ্ছি না। দ্বিতীয়ত, সেই গোষ্ঠীর মধ্যে, বৈজ্ঞানিকদের হৃদয় যদি জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়, তা হ'লে জনগণের কিছু সুবিধা ঘটতে পারে। কিন্তু সেই হৃদয়ের পরিবর্তন শুধু অনুরোধ বা প্রচারের দ্বারা কি ক'রে সম্ভব বুঝতে পারি না। তৃতীয়, ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, রুশিয়ার মত শক্তিশালী দেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ থেকে খানিক পেছিয়ে আসতে হচ্ছে, এটি আমার ভাল লাগে না। কতদিন এ রকম ভাবে তাকে চলতে হবে তাও কেউ বলতে পারে না। চতুর্থ, আজ যদি ভারতবর্ষ বা অপর কোনও দেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা জাগে, তবু অস্ত্রশক্তির উপরেই সব নির্ভর করে ব'লে তাদের চেষ্টা অনিশ্চিত কালের জন্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

পাঠক। আপনি তা হ'লে বাস্তবকে কিছুতেই স্বীকার করতে চান না।

লেখক। না, তা চাইব না কেন? বাস্তবকে স্বীকার করেন ব'লেই গান্ধীজী মানুষকে অস্ত্রের উপর নির্ভর না ক'রে বাঁচবার নূতন একটি কৌশল শেখাবার চেষ্টা করছেন। এবং সেটি যদি সফল হয় তা হ'লে জগতের ছোট রাষ্ট্রই হোক বা বড় রাষ্ট্রই হোক, অল্প লোকই হোক বা বহু লোকই হোক, শত্রু প্রবলই হোক বা দুর্বলই হোক, মানুষ নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে রক্ষা করতে পারবে। অন্যায় কোনও অধিকারকে মানুষ অহিংসার দ্বারা সংগ্রহও করতে পারবে না, রক্ষাও করতে পারবে না। কিন্তু যে অধিকার অপরকে বঞ্চিত না ক'রে ভোগ করা যায়, তাকে অহিংস কৌশলে দুর্বলতম রুগ্ন লোকও সার্থকভাবে রক্ষা করতে পারবে।

পাঠক। আপনি যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মশাই! জনসাধারণ সেইটে পারবে

কেমন ক'রে তাই বলুন। এতক্ষণ ধ'রে সেই কথাই তো কেবল আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আপনি ত আবহমান কাল থেকে চলতি পথের দোষ দেখানোতেই ব্যস্ত।

লেখক। না, দোষ দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়। আপনার পথে সাধারণ মানুষ সত্যিকার স্ব-রাজ লাভ করতে পারে কি না তারই সন্ধান করছি। আপনি জগতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনার যে উপায় নির্দেশ করেছেন, সে পথেও বুঝছি বার বার পরাজয় ঘটলেও অদম্য উৎসাহে সংগ্রাম ও সংগঠন ক'রে যেতে হবে। ক্ষণিকের পরাজয়ে ভীত হবো না, অবশেষে বিজয় অবশ্যম্ভাবী—এই বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে। মন যদি অপরাজিত থাকে, তা হ'লে অপর সকল বাধাই ক্রমশ তিরোহিত হবে। ধনতান্ত্রিক মুষ্টিমেয় শাসকবর্গ বৈজ্ঞানিকদের চিরকাল কিনে রাখতে পারবে না, অস্ত্রবল জনশক্তির আয়ত্তে আসবে। পার্টির নিয়ন্ত্রকমণ্ডলীর মধ্যে আদর্শভ্রংশ ঘটবে না, ঘটলেও জনগণ তাদের সংযত করতে পারবে। এসবের পিছনেই দেখছি বিপ্লবী মনের অচল আদর্শনিষ্ঠাই হ'ল বড় কথা।

পাঠক। সেটা অন্যায়, না অসম্ভব দাবি?

লেখক। অন্যায়ও নয়, অসম্ভবও নয়। কিন্তু কথা হ'ল, মনের উপরেই যখন প্রধান নির্ভর, তখন অস্ত্রবলের উপর আদৌ নির্ভর করার প্রয়োজন কি? মিছামিছি অস্ত্রশস্ত্রের পিছনে অর্থব্যয় ক'রে লাভ কি?

পাঠক। অস্ত্রধারণ না করলে জনগণের সংস্থা যে দুদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে!

লেখক। অস্ত্রধারণ ক'রেও তো নিশ্চিহ্ন হতে পারে। আর অস্ত্র ত্যাগ করায় কতকগুলি সুবিধাও আছে। বিরুদ্ধশক্তি যদি দেখে, জনগণ মরবে তবু মারবে না, তখন তাদের নিপীড়নের উগ্রতা কিছু ক'মে আসবে। আত্মরক্ষা করছি, এই ভেবে শাসকবর্গ নিজের অন্যায় অত্যাচারকে সমর্থন করতে পারবে না। হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভাবে তাদের অস্ত্রের মুষ্টি শিথিল হবে, হৃদয়ে চমক লাগবে। ক্ষণিকের জন্য হয়তো থেমে তারা ভাববে, জনগণ তা হ'লে কী চায়? তখন জনসাধারণের প্রতিনিধিরা তাদের কাছে এসে, কথা ব'লে নিজেদের দাবি কত ন্যায়সঙ্গত তাই বুঝিয়ে বলবে। সকলের পক্ষে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান রচনার প্রস্তাব করবে এবং শাসিত এবং শাসক উভয়ে মিলে নূতন প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবে।

শাসকবৃন্দের হৃদয় থেকে তখন আত্মলোপের ভয় মুছে গেছে, শাসিতদের হৃদয় তখন লোভ, ভয়, জড়তা প্রভৃতি তামসিকতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। আগে যারা শত্রু ছিল, তারা ভাই-ভাইয়ের মত এক মঙ্গল সহযোগিতার সূত্রে বাঁধা পড়েছে।

পাঠক। শুনতে মন্দ লাগল না বটে, কিন্তু যারা শোষক তাদের প্রতি ক্ষমার ভাব

পোষণ করা কি সম্ভব, না উচিত? আর স্বার্থান্ধ ক্ষমতার অধিকারী ধনী বা শাসক-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে কখনও পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে?

লেখক। ঘটবে—এই আশার আলোয় আমরা পথ চলি।

পাঠক। আমরাও যে পরিবর্ত্তনে বিশ্বাস করি না, তা নয়। তবে আগে অধিকারীদের শাসনের দ্বারা নির্বীর্য করতে হবে, তাদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে তারপর শিক্ষার দ্বারা পরিবর্ত্তন সম্ভব। যতদিন তাদের ক্ষমতা আছে, ততদিন হৃদয়ের পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়।

লেখক। অহিংস অসহযোগের দ্বারা সে পরিবর্ত্তন আনা যায় ব'লে আমাদের বিশ্বাস। শোষকের হৃদয়কে পর্যন্ত আমরা স্পর্শ করতে চাই।

পাঠক। আপনারা তা হ'লে মডারেটদের মত মিনতিতে বিশ্বাস করেন?

লেখক। না, তা নয়। নিয়মতান্ত্রিকদের সঙ্গে আমাদের একটা বড় প্রভেদ আছে। তাঁরা শুধু বুদ্ধির দুয়ারেই আঘাত দেন, বার বার সদ্‌যুক্তির দ্বারা বিরুদ্ধ শক্তিকে সুপথে চালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আমরা মনে করি, বুদ্ধি যেখানে স্বার্থবোধের দ্বারা আচ্ছন্ন, সেখানে প্রথমে হৃদয়ের দুয়ারে আঘাতের প্রয়োজন। স্বার্থের আবরণকে বিদীর্ণ করতে পারলে তবে মানুষের শুভবুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয়। সেখানে আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিল আছে, নিয়মতান্ত্রিকদের সঙ্গে নয়। কিন্তু প্রভেদ এইখানে, আপনারা হৃদয়ের যে দুয়ারে আঘাত দেন, আমরা সে দুয়ারে দিই না। যে ব্যক্তি ঘটনাচক্রে আমাদের বিরুদ্ধতা করছে, তার মনুষ্যত্বকে আমরা অবহেলা বা অপমান করতে চাই না। তার শরীরকে শাসনের দ্বারা বিপন্ন ক'রে মানুষ হিসাবে তাকে খাটো করতে চাই না। তারও মন বড়, হৃদয় মহৎ—এই বিশ্বাস নিয়ে হৃদয়ে আত্মীয়ের মত প্রবেশ করতে চাই। আমাদের ধৈর্য, অবিচল নিষ্ঠা দেখে তারও অন্তরে কল্যাণকুসুম প্রস্ফুটিত হবে, শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে।

পাঠক। বেশ, শোনালো ভাল। কিন্তু এ পথে জনসাধারণ কেমন ভাবে আত্মরক্ষা করবে, তা ত বুঝলাম না। আর সিদ্ধপুরুষ ছাড়া অহিংসার দ্বারা আত্মরক্ষা কারুর দ্বারা সম্ভব ব'লেও তো মনে হচ্ছে না।

লেখক। অতি সাধারণ মানুষও পারে ব'লে গান্ধীজীর বিশ্বাস। সংসারে মা চিরদিনই ছেলের জন্য এই শক্তির ব্যবহার করেন। মানুষের সমাজে প্রতিনিয়ত এই শক্তি কার্য করছে, নয়ত মানুষ বন্যপশুর মত চিরদিন নিষ্ঠুর হয়েই থাকতো।

গান্ধীজী জনসমাজের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শান্ত শক্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করা যাবে ব'লে বিশ্বাস করেন এবং তার জন্য সুচিন্তিত সাধনপন্থাও নির্মাণ করেছেন।

পাঠক। সে সম্বন্ধে পরে না হয় শোনা যাবে। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা হিংসায় পারব না ব'লেই কি অহিংস উপায় আশ্রয় করি নি?

লেখক। অনেকের পক্ষে এযুক্তি সত্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে নয়। তিনি মনে করেন, শুধু ভারতে কেন, জগতের সর্বত্র যদি আত্মরক্ষার জন্ম মানুষকে বাছাই করা, হত্যাবিদ্যায় সুদক্ষ একদল লোকের উপর নির্ভর করতে হয়, তা হ'লে দরিদ্রতম মানুষের পক্ষে স্ব-রাজ কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

পাঠক। কেন, দেশের সৈন্যসামন্ত যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীন থাকে তা হ'লে কেন হবে না? প্রতি মানুষের যদি অস্ত্রধারণের অধিকার থাকে, তা হলে হবে না কেন?

লেখক। হয় নি—ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়।

পাঠক। ইতিহাসে যা ঘটে নি, তা ঘটতে পারে না?

লেখক। পারে ব'লেই তো আমাদেরও বিশ্বাস। মানুষ জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতই না আশ্চর্য শক্তির অধিকার লাভ করেছে, আর মানুষের মনের বেলায়, বহুলোককে যেখানে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন, সেখানেই কেবল দণ্ড বা শাসনের সেই পুরাতন পদ্ধতি ছাড়তে পারবে না, একথা ভাবতে আমার ভাল লাগে না। প্রতি মানুষকে আত্মরক্ষার জন্ম চিরকাল নরহত্যার আশ্রয় নিতে হবে, এ বিষয়ে মানবসমাজ নূতন কিছু করতে পারবে না, এটা আমার নিতান্ত খারাপ লাগে।

পাঠক। পারলে আপত্তি কোথায়? কিন্তু তার কি কোনও সম্ভাবনার আভাস দেখা গেছে?

লেখক। গেছে ব'লেই তো আমাদের এত ভরসা। দক্ষিণ আফ্রিকায়, চম্পারণে, বারদোলিতে, পাঞ্জাবের গুরুদ্বারা আন্দোলনে, মেদিনীপুরে অথবা ত্রিবাঙ্কুরে বহু খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের মধ্যে সাধারণ মানুষের শান্ত শক্তি দুর্দমনীয় বিরুদ্ধতাকে লঙ্ঘন করতে পেরেছে ব'লেই আমাদের এত ভরসা।

পাঠক। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে কোনোবারই স্বার্থান্ধ রাজশক্তি সত্যসত্যই বিপন্ন হয় নি। সত্যই সে নিজেকে বিপন্ন বোধ করলে জনসাধারণের অহিংস বিদ্রোহকে নিষ্পেষিত করতে তার বিলম্ব হবে না।

লেখক। জনসাধারণ সত্যি সক্রিয় অহিংসাকে আশ্রয় করলে তাদের পরাজয় অসম্ভব। তবে আপনি যা বলেছেন, বৃহৎ কোন স্বার্থের দ্বন্দ্বে জনগণ জয়লাভ করেছে, এর দৃষ্টান্ত নাই। তাই ভারতের স্বরাজ-সাধনায় অহিংসার পরীক্ষা এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। গান্ধীজী সর্বান্তঃকরণে সিদ্ধিলাভের জন্ম বার বার চেষ্টা করছেন এবং নূতন নূতন কৌশল অবলম্বন করছেন। যদি স্বরাজ সাধনায় আমরা সিদ্ধিলাভ করতে পারি, তা হ'লে সমগ্র জগতের নিপীড়িত মানুষ নূতন শক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলবে।

পাঠক। কিন্তু বহুমানবকে সমবেত অহিংস প্রচেষ্টার যোগ্য ক'রে তোলা কি সম্ভব? অহিংসা তো মানুষের স্বভাবসিদ্ধ নয়।

লেখক। স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চয়ই। তবে সে স্বভাব হিংসার ভাবের চেয়ে আজ সমাজে বা সাধারণ ব্যক্তির অন্তরে দুর্বল হয়ে রয়েছে।

কিন্তু হিংসা মানুষের পক্ষে সহজ ব'লে তো আপনি বিশ্বাস করেন?

পাঠক। তা ত করিই।

লেখক। তা সত্ত্বেও যুদ্ধের জন্য মানুষকে কত শিক্ষাই না নিতে হয়। অহিংসাকে সমবেতভাবে সফল ক'রে তুলতে হ'লে তার চেয়ে দীর্ঘ শিক্ষা দিতে হবে, এতে আশ্চর্য্য কি?

পাঠক। কিন্তু আপনি সহজ পথ ছেড়ে দুর্গম পথ ধরছেন কেন?

লেখক। আপনার সহজ হিংসার পথে জনসাধারণের পক্ষে স্ব-রাজ প্রতিষ্ঠা করা কেমন ক'রে সম্ভব হবে, তাই ত ধারণা করতে পারি না। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে স্বীকার করি, কিন্তু সে অবস্থাও জনসাধারণের দৃষ্টিতে পর-রাজ হয়ে থাকবে। তাই আপাতত দীর্ঘ বা দুর্গম ব'লে মনে হ'লেও অহিংসার পথই ধরেছি, কেন না লক্ষ্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা এখানেই শুধু দেখতে পাই, অপর কোনও পথে পাই আছে।

পাঠক। কিন্তু বহুজনকে অহিংস সংগ্রামের জন্য সংগঠনের উপায় আছে?

লেখক। কিছু অগ্রহায়ণ মাসে আলোচনা করা হয়েছে। গান্ধীজী ধনোৎপাদনের ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা জনসাধারণের করায়ত্ত করতে চান। নিজের চেষ্টায় আর্থিক মুক্তি কিছু লাভ করার ফলে মানুষ আত্মবিশ্বাস লাভ করবে, এবং আত্মবিশ্বাস জাগলে শাস্ত প্রতিরোধের সময়েও বিরুদ্ধ শক্তির আঘাতে তাদের কেন্দ্রীয় সংস্থা ভেঙে গেলেও তারা স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে চলবার চেষ্টা করবে। বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করব না, গড়ার ভিতর দিয়েই আমাদের ভাঙার কাজ চলতে থাকবে, এই বিশ্বাসে জনসাধারণ অটল থাকবে। এই দৃঢ় উদাসীনতার আঘাত জগতের কোন প্রতিষ্ঠানই সহ্য করতে পারে না। এই নিষ্ঠা বজায় রাখতে পারলে জনসাধারণের স্বরাজ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

পাঠক। আচ্ছা, ভবিষ্যতে আপনার কাছে অহিংস সংগ্রামের জন্য সংগঠনের উপায় শোনা যাবে। আমার ত ধারণা মানুষকে অহিংস সংগ্রামের জন্য সমূহভাবে গড়া যায় না, হিংসা এসে পড়বেই, কেন না সকলের মন সমান হয়। ব্যক্তির পক্ষে যা সম্ভব, সমূহের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তবু এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য শুনতে আমার আপত্তি নাই।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

সপ্তর্ষি

সাত

হীরক-শুভ্র

হীরক-শুভ্র রজতকে জেল থেকে যে চিঠি লিখেছিল, তা এই—

শ্রীচরণেষু,

মেজদা, অনেকদিন তোমার কোন খবর পাই নি। বাড়ির সবাই আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে এক তুমি ছাড়া। তুমি অবশ্য কোনকালেই কলমের কারবার কর না, তুলিই তোমার মনের বাহন, একটা ছবি এঁকে পাঠালেও তো পার। সেদিন বউদিদির চিঠিতে জানলাম, তুমি বিয়ে করেছ। খবরটা আনন্দজনক হওয়া উচিত, নতুন বউদিদিকে দেখবার একটা কৌতূহলও যে না হচ্ছে তা নয়, কিন্তু তোমার মতন তেজী লোক যে বিয়ে ক'রে অবশেষে নীড় আশ্রয় করবে, এটা ঠিক আশা করি নি। যদিও তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল না, তবু তোমার কাছে প্রকাণ্ড কিছু একটা আশা করেছিলাম আমি। তুমি বিয়ে করেছ, এ খবর পেয়েও সে আশা ত্যাগ করি নি এখনও। যেসব খবরের কাগজ আমরা পড়তে পাই, প্রতিদিনই সেগুলোর পাতা ওলটাই তোমার নাম কোথাও দেখতে পাব ব'লে। তোমার মতন একটা উদ্দাম প্রকৃতি যে চুপচাপ থাকবে, এ কথা ভাবতেই পারি না। তোমার অসহিষ্ণু স্বভাবের জন্যে আমার কথা তোমাকে ভাল ক'রে বোঝাতেই পারি নি কোনদিন। তুমি কোনদিনই ধৈর্য্য ধ'রে শেষ পর্য্যন্ত আমার কথা শোন নি। চাষী মজুরদের নামোচ্চারণ করবামাত্র তুমি ক্ষেপে উঠেছ এবং আমাকে থেমে যেতে হয়েছে। দাদাকে আমি কোনদিন বোঝাবার চেষ্টা করি নি, কারণ তিনি আলাদা জাতের লোক। বোঝালে তিনি বুঝবেন, সায়ও দেবেন হয়তো, কিন্তু কর্ম্মী হিসেবে কিছুতেই ধরা দেবেন না। ওঁরা স্বপ্নসম্বল লোক। তোমার ওপর কিন্তু আমার আশা ছিল এবং এখনও আছে। তাই মনে করেছি, আজ ভাল ক'রে আমার কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলব। চিঠিতে বলার একটা সুবিধে—ধমক দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিতে পারবে না। যে আদর্শকে আঁকড়ে ধ'রে আমি জীবনের আর সব-কিছু বিসর্জ্জন দিয়েছি, সে আদর্শে অনুপ্রাণিত না হও, তার মর্ম্মটা অন্তত বোঝবার চেষ্টা কর, এ দাবিটুকু

কি আমি করতে পারি না? বাবা মা দাদু যে ভাষায় আমাকে চিঠি লেখেন, তা অনুকম্পার ভাষা। তাঁরা মনে করেন, নির্ব্বোধ আমি একটা বাজে হুজুগে মেতে বিপন্ন হয়েছি। আমার আদর্শের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা দেখি না তাঁদের চিঠিতে। তাঁদের সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা যেন-তেন-প্রকারেণ আমাকে জেলের পাঁচিলের বাইরে নিয়ে গিয়ে ক্যাপিটালিস্ট সমাজের ভাল ছেলে ক'রে তোলবার। এর জন্যে তাঁদের সুপারিশ-তদ্বিরের অন্ত নেই। দাদু, শুনেছি, এর জন্যে অনেক টাকাও নাকি খরচ করছেন স্থানে-অস্থানে। আমার আদর্শ-নিষ্ঠার এই কি পুরস্কার? আমার সবচেয়ে কষ্ট হয় ছোট-পিসীর চিঠি প'ড়ে। আমি ভারতবর্ষের লোক হয়ে রাশিয়া নিয়ে মেতেছি, এ নিয়ে তাঁর শানিত মন্তব্যগুলি ছুঁচের মত বেঁধে। আমি রাশিয়া নিয়ে মাতি নি, আমি একটা আদর্শ নিয়ে মেতেছি—এ কথা কেন যে তিনি বোঝেন না, জানি না। আজ যদি রাশিয়া তার মহৎ আদর্শকে ত্যাগ করে, তা হ'লে রাশিয়ার সঙ্গেও আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। রাশিয়া এই আদর্শকে মূর্ত্ত করেছে ব'লেই রাশিয়ার ওপর আমার ভক্তি। ছোটপিসী আমার মনের কথা বোঝেন না, তার কারণ তিনি ভিন্ন পথের পথিক।

ছোটদাদুর সঙ্গেও ভাব করেছি আমি। ছোটদাদুও আদর্শবাদী লোক। কিন্তু কমিউনিজ্‌মের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা থাকলে, আস্থা নেই। তাঁর বিশ্বাস—বৈষম্যই প্রকৃতির নিয়ম এবং প্রকৃতিই ছলে-বলে-কৌশলে সাম্যবাদ-প্রচেষ্টাকে বিফল ক'রে দেবে বার বার। কিন্তু তাই ব'লে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকব আমরা? আশ্চর্য্য যুক্তি তাঁর! তা ছাড়া তিনি কেমন যেন সন্দেহবাদী হয়ে উঠেছেন। লিখেছেন, "ইংরেজেরা এদেশে যখন আসে, তখন আমরা সবাই ইংরেজ-গুণ-গানে যেসব কথা বলেছিলাম, তা সেকালের সংবাদপত্রগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে এখনও। মিলিয়ে দেখো তোমাদের কমিউনিজ্‌ম-গুণ-গান সেগুলোর সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যাবে। ইংরেজদের সম্বন্ধে ভুল যখন ভেঙেছে, তখন আবার একটা নতুন ফাঁদে পা দেওয়াটা কি খুব সমীচীন?" এ লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। ওঁদের সকলের সম্বন্ধেই একটা কথা ভেবে আমি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করি। ওঁরা সমস্ত বুঝেও এসব কথা বলছেন আত্মরক্ষার জন্যে। জ্ঞাতসারে না হ'লেও অজ্ঞাতসারে এই প্রকৃতিই ওঁদের মর্ম্মমূলে রয়েছে। পৃথিবীর যে নব-জাগরণ

আসন্ন, তার যৌক্তিকতা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করলে যে শোষণ-যন্ত্রের ওঁরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অসম্ভব হয়। নিজেদের স্বার্থের জন্যই মানব-সমাজের বৃহত্তর আদর্শকে মনে মনে স্বীকার করলেও মুখে মানবার সাহস নেই ওঁদের। কিন্তু তোমারও কি নেই? তোমার সাহসের অভাব আমি কল্পনাই করতে পারি না। তোমাকে সুবিধাবাদী ব'লে ভাবতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমার মনে হয়, নিজের খেয়ালে মত্ত আছ ব'লে এ দিকটা ভাল ক'রে ভেবেই দেখ নি তুমি। অভিজাতসুলভ ঔদাসীন্যে ভুলে আছ সব। কিন্তু আজ তোমাকে আমার কথা শুনতেই হবে। একটা কথা জান? শুনলে হয়তো আশ্চর্য্য হয়ে যাবে—আমার মনে এর বীজ তুমিই বপন করেছিলে একদিন। আমাদের ছট্টু ব'লে একটা চাকর ছিল, মনে আছে তোমার? বেচারা দু টাকা মাত্র মাইনে পেত, খেত আমাদের পাতের এঁটো-কাঁটা কুড়িয়ে। সশঙ্কিত হয়ে থাকত বেচারা। কি একটা সামান্য অপরাধে তাকে হাণ্টার দিয়ে খুব মেরেছিলে তুমি। আমি ভাবলাম, আর বুঝি আসবেই না। কিন্তু বিকেলে দেখলাম, ঠিক এসেছে এবং ক্রমাগত চেষ্টা করছে তোমার মন যুগিয়ে চলবার। ধনীর হাতে দরিদ্রের শোচনীয় অপমানের চিত্রটা গভীর রঙে তুমিই এঁকে দিয়েছিলে সেদিন আমার মনে। সেই দিনই আমি ঠিক করেছিলাম যে, যদিও আমি ধনীর ঘরে জন্মেছি, তবু গরিবদের দিকেই থাকতে হবে আমাকে, আর কিছুর জন্যে না হোক, আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্যে। আমরা বড়লোক ব'লে অপরিসীম লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়েছিল যেন সেদিন আমার। টলস্টয়, মার্ক্স, লেনিন, স্টালিন অনেক পরে পড়েছি—মিলের কুলীদের সংস্পর্শে এসেছি তারও অনেক পরে।

কমিউনিজ্মের মূল কথাটা নিয়েই আলোচনা করব তোমার সঙ্গে। যারা এর মুখোশ প'রে নিজেদের নানা কাজ হাঁসিল ক'রে বেড়াচ্ছে, তাদের বিষয় আমার আলোচ্য নয়। তাদের উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রে অনেক লোক কমিউনিজ্মকে গাল দেয় শুনেছি। কমিউনিজ্মকে গাল না দিয়ে তাদের গাল দিলেই ভাল হয়। টিকি-তিলক-নামাবলীধারী ভণ্ডকে দেখে হিন্দুধর্ম্মের বিচার করা ঠিক নয়। কমিউনিজ্মের কথা আলোচনা করবার সময় একটা কথা মনে রাখা উচিত। ফলের থেকে বীজ এবং বীজের থেকে অঙ্কুরের আবির্ভাব যেমন অনিবার্য্য, মানবের ইতিহাসে ফিউডালিজ্ম থেকে

ক্যাপিটালিজ্‌ম এবং ক্যাপিটালিজ্‌ম থেকে কমিউনিজ্‌মও তেমনই অনিবার্য্য। নির্য্যাতিতদের দুঃখে বিচলিত হয়ে জনকতক উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব্যক্তি নিছক বক্তৃতার চোটে এতবড় ব্যাপারটাকে সম্ভবপর ক'রে তুলেছে, এ কথা যারা ভাবে, তারা ভুল ভাবে। রাত্রির পর যেমন দিন আসে, ক্যাপিটালিজ্‌মের পর শ্রমিকদের অভ্যুত্থান তেমনই অতিশয় স্বাভাবিক ব্যাপার একটা। মানব-সভ্যতার যাবতীয় কীর্ত্তির সমস্ত সম্মান যাদের প্রাপ্য, তাদের বঞ্চিত ক'রে জনকতক অলস ধনী কতদিন আর ভোগ করবে এই বসুন্ধরাকে? যারা কর্ম্মী, যারা বীর, তারা এইবার জেগেছে, ভীরু প্রবঞ্চকদের স'রে পড়বার সময় হ'ল এবার। নির্য্যাতিতেরা চিরদিন অত্যাচার সইতে পারে না। অত্যাচারীর চাবুকই মরিয়া ক'রে তোলে তাদের একদিন। সেদিন এসেছে এবং সে কথা প্রসন্ন চিত্তে স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভাল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোহ ত্যাগ করতে হবে এবং যারা ত্যাগ করতে রাজি নয়, তাদের জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে মোহ-মুদ্গরের। তোমাকেই করতে হবে, তুমি যদি এর যৌক্তিকতা স্বীকার কর। সামাজিক মানুষ হিসেবে তা হ'লে তুমি এর সহযোগিতা না ক'রে পারবে না।

একদল সূক্ষ্ম তার্কিক আছেন, তাঁরা বলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকলে জীবনে আর সুখ কি, সমাজের সঙ্গে প্রাণের নিগূঢ় যোগই বা কোথায়? বারোয়ারিতলায়, ওয়েটিং-রুমে বা ধর্ম্মশালায় বাস ক'রে কি আমরা শান্তি পাব? মানুষ যে কিসে শান্তি পায় আর কিসে পায় না, তা জানি না। একটা কথা কিন্তু জানি। যুগে যুগে মানুষ সমাজের হিতার্থে নূতন নূতন নিয়ম করেছে এবং সে নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে কালক্রমে শান্তিও পেয়েছে। সবাই হয়তো পায় নি, কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে পেয়েছে, তা মানতেই হবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মানব-সমাজে একদিন বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। যে কোনও পুরুষ নিছক গায়ের জোরে যে কোনও নারীর দেহ দাবি করতে পারত। বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হওয়াতে কতকগুলি পুরুষের দুঃখের কারণ ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিবাহ-প্রথাকে মেনে নিয়ে আমরা কি খুব অশান্তিতে আছি? বিবাহ-প্রথারও আবার নানা রকম চেহারা ছিল। Group marriage ছিল, বহু-বিবাহ ছিল। এখন সভ্যসমাজ থেকে সেসব উঠে গেছে। বহুপত্নীর মালিক হবার সাধ যাঁর, তাঁর হয়তো অসুবিধা হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে এক-পত্নীক জীবনে সন্তুষ্ট আছেন, তা অস্বীকার করি কি ক'রে? কমিউনিস্টরা

এখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক ভালবাসার বন্ধন ছাড়া অন্য কোন বন্ধন স্বীকার করতে চায় না, বাইরের মিথ্যা আইনের হাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়ে তারা অন্তরের সত্য আইনকে আশ্রয় করেছে। যাঁরা বিবাহ-আইনের নাগপাশে বেঁধে দাম্পত্য-জীবনকে রক্ষা করবার পক্ষপাতী, তাঁদের হয়তো রাগ হবে, কিন্তু যতদূর শুনেছি, অধিকাংশ লোকই সুখে আছে সেখানে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্বন্ধেও ওই কথা। কতকগুলো স্বার্থপর লোকের কষ্ট হবে হয়তো, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে সুখেও থাকবে অনেকে। বিচিত্র মানুষের মন। সবই সে সহ্য ক'রে নেয় কালক্রমে। শুধু তাই নয়, কোন একটা নিয়ম সে বেশিদিন মানতেই চায় না। পুরাতন শৃঙ্খল ভেঙে নূতন শৃঙ্খল পরবার জন্যে সে সতত উন্মুখ। এরই নাম হয়তো আধুনিকতা। আধুনিকতার দাবি যদি না মানতে চাও, 'ফসিলে'র দলভুক্ত হতে হবে তোমাকে। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, কমিউনিজ্‌ম সমাজের যে ব্যবস্থা করতে চাইছে, অধিকাংশ লোকের পক্ষে তা ভাল, না মন্দ? রাশিয়ার দিকে চাইলেই এর উত্তর পাবে। সেখানে বেকার লোক নেই, অলস লোকের স্থান নেই, বংশ বা অর্থগত জাতিভেদ নেই। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তারা এই ক বছরের মধ্যে যা করেছে, তা বিস্ময়কর। যেসব সমালোচক আরাম-কেদারায় ব'সে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে তাদের নানারকম ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করেন, একটা কথা ভুলে যান তাঁরা। কাজ করতে গেলেই ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব, অলস লোক ক্বচিৎ ভুল করে, মরা লোকে একেবারেই করে না। ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও তারা যা করেছে, তার কিছু আভাস রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'তে পাবে, অন্য কোন বই যদি হাতের কাছে না-ও পাও।

বর্তমান সভ্যসমাজে 'ডিমক্র্যাসি' নামে যা প্রচলিত, আসলে তা পুরাতন রাজতন্ত্রেরই নব-রূপ। নূতন রাজাটির নাম 'টাকা'। ডিমসের মাথা বিকিয়ে আছে এই টাকার পায়ে। মাথা বিকিয়ে দিয়েও কিন্তু তাদের স্বস্তি নেই। ইংলণ্ডের মত সভ্যদেশেও বেকার-সমস্যা ঘোচে নি, এখনও সেখানে লোকে পেটের দায়ে টেম্‌সের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এখনও সেখানে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি হয়, এখনও সেখানকার ভ্রূণহত্যা শিশুহত্যার তালিকা আতঙ্কজনক। অধিকাংশ লোকের সুখ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের শ্বাসরোধ ক'রে

কয়েকজন পুঁজিবাদী যেখানে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, সেইখানেই এই অবস্থা। আমাদের বিদ্রোহ এই ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরুদ্ধে।

তুমি হয়তো বলবে, কেন, ফ্যাসিজ্‌ম তো বেকার-সমস্যা সমাধান করেছে। সেখানেও কি আধুনিক পদ্ধতিতে মানব-সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে না? আপাত-দৃষ্টিতে হচ্ছে হয়তো, এবং যেটুকু হচ্ছে তা সম্ভবত সোশ্যালিজ্‌মের কল্যাণেই হচ্ছে। কারণ এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ফ্যাসিজ্‌ম সোশ্যালিজ্‌মেরই পরিবর্ত্তিত বক্র-রূপ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ও জিনিস টিকবে না। ওটা ক্যাপিটালিস্টদের আত্মরক্ষার প্রয়াস, এবং আমার মনে হয়, শেষ পর্য্যন্ত তা ব্যর্থ-প্রয়াস হবে। টবে কখনও অশ্বত্থগাছ হয় না। হয় সে ম'রে যাবে, না হয় টবকে বিদীর্ণ ক'রে সনাতন মাটিতে শিকড় চালাবে সে। অশ্বত্থগাছের সম্বন্ধে চিন্তা নেই, কর্ম্মীরা নিজেদের শক্তির সম্বন্ধে একবার যখন সচেতন হয়েছে তখন তাদের থামাতে পারবে না কেউ—ওর ক্যাপিটালিস্টিক খোলসটাই যথাসময়ে খ'সে যাবে আশা করি।

আমার কল্পনায় যতটুকু কুলিয়েছে আমি ভেবে দেখেছি, ভবিষ্যৎ মানবসমাজকে বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত বাস করতে হবে। ক্যাপিটালিস্ট সমাজের ছোটখাট একান্নবর্ত্তী পরিবারের যেসব গলদ থাকে, এতে তা থাকবে না। এ একান্নবর্ত্তী পরিবারে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না আলস্যকে, প্রশ্রয় দেওয়া হবে না নীচতাকে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকেও খর্ব্ব করা হবে না কোন দিক দিয়ে। খাওয়া-পরার জন্য আত্ম-বিক্রয় করতে হবে না, মামলা করতে হবে না সম্পত্তির অংশ নিয়ে। মানুষের অনুরাগ-বিরাগের মাপকাঠি হবে ভাল-লাগা না-লাগা, অন্ন-বস্ত্রের জন্য বাধ্যতামূলক ভণ্ডামি নয়। অর্থাৎ তখনই 'বার্ডস্‌ অব্‌ এ ফেদার'রা 'ফ্লক টোগেদার' করবার প্রকৃষ্ট সুযোগ পাবে। বস্তুতান্ত্রিক সুখ-সুবিধার জন্যে গরিব হাঁসকে বড়লোক কাকের মোসায়েবি ক'রে বেড়াতে হবে না সে সমাজে। যে অন্নবস্ত্র-বাসস্থানের জন্যে লোকে মনুষ্যত্ব বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, তখন কাজের পরিবর্ত্তে—যে কোন কাজের পরিবর্ত্তেই—মানুষ তা পাবে এবং প্রত্যেকেই সুযোগ পাবে নিজের যোগ্যতা এবং রুচি-অনুসারে কাজ করবার। সুতরাং তখনই গ'ড়ে উঠবে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সমাজ নিজের নিজের স্বাভাবিক প্রেরণাবশে। তখন যে জাতি-ভেদ থাকবে, তা স্বাভাবিক জাতি-ভেদ এবং

অন্নবস্ত্রের সমস্যা না থাকাতে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকবে না—প্রকৃতির রাজত্বে মহিষ এবং ময়ূরে যেমন বিরোধ নেই। মানুষ এতদিন যা নিয়ে ঝগড়া করেছে, তা অতি-স্থূল বস্তু-সম্পত্তি, ভবিষ্যৎ মানুষের সে বালাই থাকবে না। একমাত্র 'প্রাইভেট প্রপার্টি' যা নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, তা তার বুদ্ধি এবং মন। নিখিল মানবের কল্যাণের জন্য সে মনেরও উৎকর্ষ সাধন করতে হবে, তার যথেষ্ট সুযোগও দেওয়া হবে তাকে। অর্থাৎ নিজের হিত-চিন্তা করলেই হবে না শুধু, সকলের হিতের কথাই মনে রাখতে হবে। Love thy neighbour—এই উপদেশই পর্য্যাপ্ত হবে না তখন, Love the humanity as a whole—এই হবে তখনকার মনোভাব। তখন আলাদা আলাদা Nation থাকবে না, Frontier থাকবে না, Foreign ambassador থাকবে না—তখনই সফল হবে কবির স্বপ্ন—'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানবজাতি।'

কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, নিজের নিজের যোগ্যতা অনুসারে কাজ ক'রে জেলের কয়েদীরাও তো অন্নবস্ত্র পায়। কমিউনিস্ট সমাজ তা হ'লে বৃহদায়তন একটা জেলখানা হবে নাকি? জেলখানায় জেলের প্রাচীরের বাইরে যাবার হুকুম নেই কারও এবং এই বন্দীত্বই শাস্তি। এ শাস্তিটা না থাকলে সত্যিই তো জেলখানার বন্দোবস্তে নিন্দা করবার বিশেষ কিছু নেই। ক্যাপিটালিস্ট সমাজে গরিব মানুষরা জেলেই তো ভাল থাকে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে বাস করবার অনুমতি পেলে তারা জেল ছেড়ে আসতে চাইত কি না সন্দেহ।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ছে। বম্বের সমুর গল্পটা। মার্গারেড রীডের 'Indian Peasant Uprooted' বইটাতেও গল্পটা আছে। তার থেকেই অনুবাদ ক'রে দিচ্ছি আমি।

সমুর মাইনে ছাব্বিশ টাকা। কিন্তু কোন মাসেই পুরো মাইনে পায় না বেচারা। মিলের কাপড় নষ্ট করছে—এই ওজুহাতে কোন মাসে ৫৲, কোন মাসে ১০৲, কোন মাসে ১৫৲ পর্য্যন্ত কেটে নেওয়া হয়। সে মাসে সমু সমস্ত মাস খেটে ১৬৲ মাত্র পেলে। মিলের গেট থেকে বেরিয়েই দেখে লাঠি-হাতে কাবুলীওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। কাবুলীকে দেখেই চট ক'রে গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল সে। ভিড় হোক একটু, ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে স'রে

পড়া যাবে। ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে সে গেট থেকে নির্বিঘ্নে বেরুল বটে, কিন্তু কাবুলীর শ্যেনদৃষ্টি সে এড়াতে পারলে না। কাবুলী ঠিক তার পিছু নিয়েছিল। যে-ই একটা গলির মধ্যে সনু ঢুকতে যাবে, অমনই ক্যাঁক ক'রে ধরলে তার ঘাড়টা এবং এমন জোরে একটা ঝাঁকানি দিলে যে, বেচারার ঘাড়ের কাছের জামাটা ছিঁড়েই গেল।

শালা, বাগ্‌তা কাহে? রুপিয়া দেও—

নিরুপায় সনুকে কম্পিত হস্তে কাপড়ের খুঁট থেকে বার করতে হ'ল টাকা। ৬৲ কাবুলীর হাতে দিয়ে কাতর চক্ষে চেয়ে রইল সে। কাতরচক্ষের দৃষ্টিতে বিচলিত হবার লোক কাবুলী নয়।

সে বললে, সুদ আট রুপি হ্যায়—আওর দো রুপি দেনে ওগা—তোম্‌হারা পাস্ হ্যায়—দে দেও—

নিষ্করুণ কণ্ঠের নিষ্ঠুর আদেশ। সশঙ্কিত সনু তখন হাত কচলে কচলে আগা সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে লাগল যে, এ মাসে তার দশ টাকা মাইনে কাটা গেছে, এ মাসে আর বেশি দিতে পারবে না সে। দেওয়া সম্ভব নয় কিছুতেই। পায়ে ধরতে গেল তার।

কাবুলী খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর বললে, ই দো রুপি আসলমে চলা যায় গা তব। বুঝা?

সনু ঘাড় নেড়ে বললে, বুঝেছে। কোনক্রমে নিস্তার পেলে বাঁচে সে। কাবুলী নিস্তারই দিলে-তাকে অবশেষে দু টাকা সুদ আসলের অন্তর্ভুক্ত ক'রে।

সনু চলল বাড়ির দিকে। ইচ্ছে ছিল, মদের দোকানে ঢুকে আজ মাইনে পাবার দিনটা অন্তত এক পাত্র টেনে যাবে, কিন্তু তা আর হ'ল না। কোন রকমে টাকা কটা বাড়ি নিয়ে ফিরতে পারলে বাঁচে সে। বাড়ির দরজায় কিন্তু আর একজন পাওনাদার দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতি মাসেই মাইনে পাবার দিন কাবুলীওলার মত এ লোকটাও দাঁড়িয়ে থাকে।

বাড়িভাড়া দাও।

সনুকে আবার গেরো খুলে ৬৵৹ বার ক'রে দিতে হ'ল। একটিমাত্র ঘরের ভাড়া ৬৵৹। বাকি রইল ৩৸৵৹। সমস্ত মাস হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর পরের মাসের বিশে তারিখে এই তার উপার্জ্জন। ঘরের ময়লা দেওয়ালটায়

ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মনে হতে লাগল, বাঁচব কি ক'রে আমরা?

খানিকক্ষণ পরে বিড়িটি ধরিয়ে ঘরের দরজাটিতে এসে যে-ই বসল, বউও বসল এসে এবং অনর্গল ব'কে যেতে লাগল।

কি ক'রে চলবে সমস্ত মাস? যে কাপড় মিলে নষ্ট হয়েছে, তা বাজারে বেচে কি ১০৲ উঠবে? ৫৲, বড় জোর ৬৲—তার বেশি কেউ দেবে না, ফি মাসে দেখছি তো। আমি এ মাসে অবশ্য ১৬৲ রোজগার করেছি—কিছু চাল কিনতে পারব। কিন্তু তোমার জামা যে ছিঁড়ে গেছে একেবারেই, তা কি ক'রে হবে? ছেলেটা বাবুদের জুতোয় কালি-বুরুশ ক'রে রোজ দু'তিন আনা রোজগার করতে পারে অবশ্য। কিন্তু সে-ও যদি বাইরে যায়, ছেলেগুলোকে খাওয়াবে কে? আমি তো বাড়িতে থাকি না। কোলের ছেলেটাকে আপিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাই, নেশা ছুটে গেলেই সে উঠে চেঁচাবে খাওয়ার জন্যে। পেট ভ'রে মাই খাইয়ে যেতে পারি না, বুকে দুধই নেই, খাওয়াব কোথা থেকে? ছটা মরেছে, এটাও যাবে। দশজনকে পেটে ধরেছিলাম, চারটি বেঁচে আছে, তাও কোনক্রমে। মায়ের যত্ন না পেলে কি ছেলে বাঁচে? আমি যত্ন করি কখন, রোজকার করতে না বেরুলে যে পেট চলে না। আচ্ছা, আমাদের ঘরে তো জায়গা আছে—আরও দুজন ভাড়াটে নিলে কেমন হয়? দুজন কুলী আজ আমায় বলছিল। দুটো লোক অনায়াসেই নেওয়া যায়। অনেকটা সাহায্য হয় তা হ'লে। সমস্ত দিন ছেলেগুলো খিদেয় কাঁদে, রাত্রে একটু পেট ভ'রে খেতে দিতে পারি তা হ'লে।

দশ ফিট বাই দশ ফিট ঘরের মধ্যে আরও দুজন পুরুষ ভাড়াটে নেবার প্রস্তাবে সন্তু যেন ক্ষেপে উঠল। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে অশ্লীল ভাষায় সে গালাগালি দিতে শুরু করলে। বউকে গাল দিলে, মিলের মালিককে গাল দিলে, ক্যাশিয়ারকে গাল দিলে, কাবুলীকে গাল দিলে, মুড়িওয়ালাকে গাল দিলে, ভগবানকে গাল দিলে। পরিশ্রান্ত হয়ে চুপ ক'রে শুয়ে পড়ল খানিকক্ষণ পরে। মনে পড়ল, চোদ্দ বছর আগে বিয়ে করবার জন্যে কাবুলীর কাছে যে টাকা সে ধার করেছিল, তা রোজই বেড়ে যাচ্ছে। প্রতি মাসে ৬৲।৮৲, কোন মাসে দশ টাকাও সে দিয়েছে, শোধ কিন্তু হচ্ছে না। অতীতের কথা মনে পড়ল।...তার নিজের বয়স যখন সাত-আট বছর, তখন তার মা তাকে নিয়ে

বম্বেতে এসেছিল। মা মিলে কাজ করত, সে খেলা ক'রে বেড়াত রাস্তায়। মাঝে মাঝে একটা স্কুলেও যেত।...তার বড় ছেলেটাকে স্কুলে দেবার কথা মাঝে মাঝে মনে হয় তার। কিন্তু ছেলেটা যেতে চায় না। সে বুঝেছে যে, স্কুলে গিয়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে জুতো-বুরুশ ক'রে যদি সে রোজ তিন-চার আনাও রোজকার করতে পারে, বাবা-মার সাহায্য হয়। ছ বছরের মেয়েটা রাস্তায় নালার ধারে খেলা ক'রে বেড়ায় সমস্ত দিন। ছোট শিশু দুটো প'ড়ে থাকে অন্ধকার ঘরটার মধ্যে আপিঙের নেশায় অজ্ঞান হয়ে।...আরও যদি কিছু টাকা থাকত! আর চারটি বেশি ভাত, আর একটু বেশি ডাল দিয়ে মেখে খেতে পারতাম। তাড়ি তো খেতেই পাই না আজকাল। একটা ধুতি একটা জামা আর না কিনলে চলছে না। বউটাকে কতদিন বলেছি, আসছে মাসে ঠিক একখানা নতুন শাড়ি কিনে দেব। কিছুতেই হয়ে উঠছে না। টাকার অভাবে কতদিন যে দেশে যাই নি!...ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সমু। বউটা আগেই ঘুমিয়েছিল। ঘুমের জন্যে দাম দিতে হয় না, তাই তারা ওই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরের মেঝেতে শুয়েই প্রাণ ভ'রে ঘুমুতে লাগল।

এ গল্প এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়। এই সমু যদি সপরিবারে জেলে একসঙ্গে থাকবার হুকুম পায়, জেলে যাবার জন্য লালায়িত হয়ে উঠবে ও। কিন্তু যিনি কমিউনিস্ট সমাজকে রূপান্তরিত জেল ব'লে ঠাট্টা করেন, তিনি জানেন না যে, একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজেই সভ্য মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পাবার আশা করতে পারে। কারণ স্বাধীনতার বাধা যে আধিভৌতিক সমস্যা, তার সমাধান সে সমাজ করেছে। একটা কথা অবশ্য মনে রাখা উচিত। যে কোন সমাজে বাস করতে গেলেই অনিবার্য্যভাবে খানিকটা পরাধীনতা স্বীকার করতেই হয়, প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব আইন-কানুন আছে এবং তা না মেনে সে সমাজে বাস করা যায় না। কমিউনিস্ট সমাজেরও নিজেদের আইন আছে এবং সে আইন হয়েছে ওই সমুদের বাঁচাবার জন্যে। সে সমাজে শুধু সমুরাই বাঁচবে না, কর্ম্মী মাত্রেই বাঁচবে সেখানে। সেখানে স্থান নেই কেবল অলসের। এই সমাজের বিধি-ব্যবস্থা যাদের কাছে জেলের বিধি-ব্যবস্থা ব'লে মনে হয়, তাঁরা যে কি ক'রে হিন্দু সমাজের হাজার রকম কুপ্রথা মেনে ইংরেজ শাসনের স্টীল-ফ্রেমের মধ্যে টিকে আছেন জানি না। তাঁরা হয়তো বলবেন, এর মধ্যেও আমরা স্বচ্ছন্দে নেই—এ-ও আমরা চাই না, আমরা স্বাধীনতা চাই।

কমিউনিস্ট সমাজের স্বাধীনতাও যদি তাঁদের রুচিকর না হয়, তা হ'লে আর কি রকম স্বাধীনতা যে তাঁদের কাম্য হতে পারে, তা তো ভেবে পাই না। নিরঙ্কুশ বর্ব্বরের আত্মসর্ব্বস্ব স্বাধীনতা? সে রকম স্বাধীনতা ছিল অতীতকালে বন্যমানব-সমাজের দলপতিদের, এখন আছে ক্যাপিটালিস্ট সমাজের বিজ্‌নেস-ম্যাগ্‌নেটদের। সেকালের বন্য মানবসমাজ অবলুপ্ত হয়েছে, একালের ক্যাপিটালিস্ট সমাজও হবে। ওদের বিরুদ্ধেই আমাদের যুদ্ধ। সুতরাং সে রকম স্বাধীনতা যদি কারও কাম্য হয়, তার লোভ ছাড়তে হবে তাঁকে। এ ধরনের স্বাধীনতা-কামী ছাড়া আর একদল লোক আছেন, যাঁরা কমিউনিজ্‌মের বিরোধিতা করেন হিন্দুসভ্যতার প্রতি ভক্তির আধিক্যবশত। তাঁরা বলেন, এবং আমিও সে কথা বিশ্বাস করি, হিন্দুসভ্যতার মধ্যে ক্যাপিটালিজ্‌ম ছিল না। পঞ্চায়েৎ-শাসিত গ্রামে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করত সবাই। অশোক হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতির উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রে সেকালকে ফিরিয়ে আনতে চান তাঁরা। ফিরিয়ে আনতে পারলেও আমরা সুখী হতাম না। কারণ নানা দিক দিয়ে একাল অনেক এগিয়ে গেছে। মানবের মনীষা স্থাণু হয়ে ব'সে নেই এক জায়গায়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে অস্বীকার করবার প্রকৃতি আমাদের হবে না আশা করি। হওয়া উচিতও নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর ফলে যে মানব-সমাজের অনেক উন্নতি হয়েছে, তা মানতেই হবে। আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, সময় এবং দূরত্বকে জয় করতে পেরেছি আমরা, বহু ভয়াবহ ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি, যে প্রকৃতিকে একদিন নিয়তির মত ভয় করতাম, তাকে দাসীর মত খাটাচ্ছি আজ। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর সুবিধে নিয়ে একদল চতুর স্বার্থপর লোক নিজেদের বড় ক'রে তুলেছে অধিকাংশ লোককে বঞ্চিত ক'রে। উদ্ভব হয়েছে ক্যাপিটালিজ্‌মের। যে সব যন্ত্র মানব-সমাজের উপকারে লাগত, সেই সব যন্ত্র দিয়েই তারা পেষণ করছে অধিকাংশকে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করবার জন্যে। এরোপ্লেন থেকে বম পড়ছে, রেডিও দিয়ে মিথ্যে প্রচার হচ্ছে, মিলে ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে জীবন-ধারণের উপযোগী বস্তুসম্ভার নয়, যুদ্ধের মাল-মশলা এবং তার জন্যে খেটে মরছে যেসব মজুরের দল, তারা মরছেই, বাঁচছে না কেউ। বৃদ্ধি পাচ্ছে কেবল ক্যাপিটালিস্টদের মেদ-ভার। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানব-সমাজের এই যে দুর্গতি হয়েছে, তার থেকে তাকে বাঁচাতেই হবে—এই হচ্ছে

কমিউনিজ্‌মের লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমস্ত সুবিধা সবাই সমানভাবে ভোগ করবে। যে সাম্য যে উদারতার জন্যে তোমরা হর্ষবর্দ্ধনের আমলকে ফিরিয়ে আনতে চাও, কমিউনিস্টরা সেই সাম্য সেই উদারতাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন এ যুগে। অর্থাৎ হর্ষবর্দ্ধনের আমলের উদারতার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে সর্ব্বজনহিতকরভাবে মেলাবার চেষ্টার নামই কমিউনিজ্‌ম। সে চেষ্টা যদি সার্থক হয়, তা হ'লে আমরা যতটা খুশি হব, অপরিবর্ত্তিত হর্ষবর্দ্ধনের যুগ ফিরে পেলে ততটা হবে কি না সন্দেহ। তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। হিন্দুসভ্যতায় আর্থিক ক্যাপিটালিজ্‌ম ছিল না হয়তো, কিন্তু মানসিক ক্যাপিটালিজ্‌ম ছিল। ব্রাহ্মণকে সমাজের শিরোমণি ব'লে মানতে হ'ত সবাইকে। সে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যতদিন বজায় ছিল, ততদিন কোন গোল ছিল না। তাঁর বিদ্যাবত্তা চরিত্রবল স্বতই সকলের শ্রদ্ধা উদ্রেক করত, শ্রদ্ধা আদায় ক'রে বেড়াবার প্রয়োজন হ'ত না তাঁর। কিন্তু তাঁর মূর্খ-বংশধরেরা যখন কেবলমাত্র অর্কফলা ও উপবীত আস্ফালন ক'রে সে সম্মান দাবি করতে লাগলেন এবং নানা ফন্দি-ফিকির ক'রে তা আদায়ের ব্যবস্থা করলেন, তখনই তা ক্যাপিটালিজ্‌মের মত কুৎসিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। টিকি-তিলকধারী আচার-সম্বল ভণ্ডের প্রভুত্ব বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সহায়ক হ'ল। বৌদ্ধধর্ম্মেও এই দোষ দেখা দিয়েছে পরে এবং এর বারম্বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে ইতিহাসে। হেরিডিটি নিয়ে অনেকে তর্ক করেন। বলেন, ব্রাহ্মণের ছেলেরই তো ব্রাহ্মণ হওয়ার কথা। হেরিডিটি সম্বন্ধে জ্ঞান আর একটু বেশি থাকলে এ কথা বলতেন না। হওয়ার কথা নয়, হওয়ার সম্ভাবনা, পারিপার্শ্বিক এবং আরও বহুবিধ অবস্থা যদি অনুকূল থাকে। তা ছাড়া অত সূক্ষ্ম তর্কেরই বা প্রয়োজন কি! দেশজুড়ে যে সব রাঁধুনি-বামুন, মূর্খ-পুরুত, ভণ্ড-বাবাজী, শিষ্যলোলুপ-গুরুর দল কিলবিল ক'রে বেড়াচ্ছে, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তো বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেও এরা ব্রাহ্মণ হয় নি। এই অযোগ্যদের চরণে মাথা নত করতে বাধ্য ক'রে হিন্দুসমাজ এক হিসেবে ক্যাপিটালিজ্‌মকেই প্রশ্রয় দিয়েছে।

এতক্ষণে তুমি বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠেছ। বিশ্বাস কর, আমি যথাসাধ্য সংক্ষেপ করবার চেষ্টা করেছি। কমিউনিজ্‌মের মূল কথাটা তোমাকে বললাম, এর শাখা-প্রশাখা অনেক আছে, ভয় নেই, সে সম্বন্ধে কিছু বলব না।

সেগুলোতে details-এর তফাত খালি। কিন্তু একটা কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারতবর্ষে যে কমিউনিস্ট মুভ্‌মেণ্ট হয়েছে, তার স্বরূপ, উদ্দেশ্য এবং আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কিছু বলা উচিত। সব কথা অবশ্য বলা যাবে না, যেহেতু আমরা এখনও 'বে-আইনী'। এ চিঠি যদি ধরা পড়ে, তুমি আমি দুজনেই বিপদে পড়ব। লুকিয়ে এ চিঠি পাঠাচ্ছি—জেলের বাইরে লুকিয়ে পোস্ট ক'রে দেবে একজন। সুতরাং এ চিঠিতে সব কথা খোলাখুলি লেখা নিরাপদ নয়। মীরাট মামলার সরকারী উকিলের সওয়ালে আর জজদের রায়ে আমাদের ইতিহাস খানিকটা নিবদ্ধ আছে। খবরের কাগজে কিছু বেরিয়েছিল, তুমি পড়েছ কি না জানি না। ক্রমশ

বনফুল"

শরৎ-সাহিত্য-পরিচয়

১

সংক্ষিপ্ত জীবনী

শরৎচন্দ্রের জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে। তিনি পিতা—মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জন্ম-তারিখ—১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ (৩১ ভাদ্র ১২৮৩)। শরৎচন্দ্র ধনীর দুলাল ছিলেন না; তাঁহার বাল্য ও কৈশোর প্রধানতঃ মাতুলালয় ভাগলপুরেই কাটিয়াছিল। কিশোর বয়সে তিনি অনেক গল্প-উপন্যাস—কোরেল গ্রাম, চন্দ্রনাথ, দেবদাস, বড়দিদি, কাশীনাথ প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। অপরিণত বয়সের এই সকল রচনার কিছু কিছু উত্তরকালে বিভিন্ন মাসিকের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে টি. এন. জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন; পরীক্ষাদানকালে তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর ৩ মাস ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। পর-বৎসর ভাগলপুরে এফ.এ. পড়িবার সময় তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। সংসারের অর্থকষ্টে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কিছুদিন চাকরি লইতে হইয়াছিল। কিন্তু সংসারে তাঁহার মন বসিল না—একদিন স্নেহময় পিতার নিকট ভর্ৎসিত হইয়া তিনি নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। সন্ন্যাসিবেশে এখানে সেখানে ঘুরিবার পর শেষে মজঃফরপুরে আসিয়া কিছুদিন কাটাইয়াছিলেন। সেখানে 'ভারতবর্ষ' প্রচারের অন্যতম প্রধান কর্মী প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ও

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর স্বামী শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হয়। ১৯০৩ সালে হঠাৎ পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তিনি একবার ভাগলপুরে আসেন। অতি কষ্টে পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি কলিকাতায় সম্পর্কীয় মাতুলদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। তথা হইতে একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি ভাগ্যান্বেষণে ব্রহ্মদেশ যাত্রা করেন (ইং ১৯০৩)। তিনি রেঙ্গুনে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের আপিসে অনেক দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। তথায় স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, সাহিত্য-সেবা দ্বারা জীবিকার্জন করিবার মানসে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে* ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া স্থায়িভাবে কলিকাতায় আসেন। কিছুদিন বাজেশিবপুরে অবস্থিতি করিবার পর তিনি হাবড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত বর্ত্তমান পাণিত্রাস গ্রামে, রূপনারায়ণের তীরে পল্লী-আবাস নির্ম্মাণ করেন (ইং ১৯১৯?)। এই নির্জন পল্লীতে তাঁহার অনেক দিন কাটিয়াছে। শেষ-জীবনে জীবন-সঙ্গিনী হিরণ্ময়ী দেবীর ইচ্ছায় তিনি কলিকাতায়—বর্ত্তমান অশ্বিনী দত্ত রোডে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (ইং ১৯৩৪)। তথায় ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ (২ মাঘ ১৩৪৪) তারিখে তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে।

শরৎচন্দ্র তাঁহার দেশবাসীর যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, অল্প সাহিত্যিকেরই সে সৌভাগ্য ঘটে। দেশের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী সুবর্ণপদক প্রদান করেন। পূর্ব্ব-বৎসর এই পদক রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সমাবর্ত্তন-উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাহিত্যাচার্য্য (ডক্টর অফ লিটারেচর) উপাধিতে ভূষিত করেন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি অনেকদিন হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

সাহিত্যিক জীবনের উপকরণ

জীবিতকালেই বাংলা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আসন সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখন দিন দিন শরৎ-সাহিত্যের পঠন-পাঠন বাড়িতেছে। তাঁহার গ্রন্থগুলি নানা ভাষায় অনূদিত

* শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে রেঙ্গুন হইতে লিখিত শরৎচন্দ্রের একখানি পত্রের তারিখ—২২. ২. ১৬। তাহার পরের দুইখানি পত্রে কোন তারিখ নাই, ইহারই একখানিতে তিনি জানাইতেছেন,: "এপ্রেলের পূর্ব্বে জাহাজে বার্থ পাইব না।" বাজেশিবপুর হইতে লিখিত একখানি পত্রে ২৯. ৬. ১৬ তারিখ রহিয়াছে।

হইতেছে। রঙ্গালয় ও সিনেমাগুলিতেও তাঁহার গল্প-উপন্যাস নাট্যাকারে রূপান্তরিত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার কোনও তথ্যমূলক নির্ভরযোগ্য জীবনী রচনার প্রতি এখনও কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বিলম্ব ঘটিলে এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা দুরূহ হইবে। তাঁহার যে দুই একখানি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের আশ মেটে না; বিশেষতঃ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস—যাহা আমাদের নিকট তাঁহার জীবনীর সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ অংশ, তাহা এই জীবনীগুলিতে সঠিক ভাবে পাইবার উপায় নাই। শরৎচন্দ্রের ভবিষ্যৎ-জীবনীকারের কিঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারে, এই ভরসায় আমরা তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ

শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা—১৩১০ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকের "মন্দির" নামে একটি গল্প। বর্ম্মা-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে গল্পটি তিনি সম্পর্কীয় মাতুল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অজ্ঞাতসারে তাঁহার নামে কুন্তলীন-পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় পাঠাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, গল্পটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ২৫৲ টাকা পুরস্কার লাভ করে। সে-বার পুরস্কৃত রচনাগুলির প্রথম দশটি নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন—তৎকালীন 'বসুমতী'-সম্পাদক জলধর সেন।

ইহার চারি বৎসর পরে—১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী'তে শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যত্নে শরৎচন্দ্রের একটি কিশোর বয়সের রচনা—'বড়দিদি' নামে উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইলেও, মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার প্রকৃত আবির্ভাব যে ফণীন্দ্রনাথ পাল-সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকায়, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। শরৎচন্দ্রের অন্যতম সম্পর্কীয় মাতুল শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (পরে 'বিচিত্রা'-সম্পাদক) ছিলেন 'যমুনা'-সম্পাদকের বিশিষ্ট বন্ধু; প্রধানতঃ তাঁহারই মধ্যস্থতায় শরৎচন্দ্র 'যমুনা'য় লিখিতে স্বীকৃত হন। 'যমুনা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা—"বোঝা" নামে একটি গল্প (কার্ত্তিক-পৌষ ১৩১৯)। ইহাও তাঁহার অপরিণত বয়সের রচনা।

শরৎচন্দ্রের কিশোর বয়সের রচনাগুলি ভাগলপুরে তাঁহার সম্পর্কীয় মাতুলদের নিকট ছিল। এই সময়ে তাঁহারা শরৎচন্দ্রের এই সকল প্রাথমিক রচনা যাহাতে লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয়, তাহার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্যে' শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা জানাইলে উপেন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তে শরৎচন্দ্রের কিশোর বয়সের রচনা-সম্বলিত একখানি খাতা দিয়াছিলেন। পাছে পুরাতন রচনা

প্রকাশে শরৎচন্দ্র আপত্তি করেন, এই ভয়ে উপেন্দ্রনাথ এ কথা তাঁহাকে পূর্ব্বাহ্ণে কিছুই জানান নাই। বলা বাহুল্য, 'সাহিত্যে' "বাল্য-স্মৃতি" (মাঘ ১৩১৯), "কাশীনাথ" (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯), "অনুপমার প্রেম" ও "হরিচরণ" প্রকাশিত হইলে শরৎচন্দ্র প্রকৃতই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি অপরিণত বয়সের রচনা হুবহু মুদ্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

যাহা হউক, এদিকে রীতিমত পত্র-বিনিময়ে 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। 'যমুনা'কে নিয়মিত ভাবে রচনা দিয়া সাহায্য করিবেন—এ প্রতিশ্রুতি শরৎচন্দ্র একাধিক পত্রে দিয়াছেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ তারিখে তিনি রেঙ্গুন হইতে ফণীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন :—

"আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিম্বা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব এমন কথা কোন দিন মনেও করবেন না।...আমার সমস্তটাই দোষে ভরা নয়—।

আপনি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে চিঠিতে লিখতেন—অন্য কাগজওয়ালারা আমাকে অনুরোধ করবে। করলেই বা, charity begins at home..."

প্রত্যুত: ১৩১৯ সালের শেষার্দ্ধ হইতে ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত 'যমুনা'র প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বা সমালোচনা—কোন-না-কোন রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি বড়দিদি অনিলা দেবীর ছদ্ম নামেও কতকগুলি প্রবন্ধ—"নারীর লেখা", "নারীর মূল্য", "কানকাটা" ও "গুরু-শিষ্য সংবাদ" ১৩১৯-২০ সালের 'যমুনা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৩১৯ সালের শেষার্দ্ধ হইতে শরৎচন্দ্র 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথকে পত্রিকা-সম্পাদনে রীতিমত সাহায্য করিতেন। রেঙ্গুন হইতে 'যমুনা'র জন্য প্রবন্ধ ও গল্পাদি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতেন। এই সময়ে তিনি ফণীন্দ্রনাথকে যে-সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার সাহিত্যিক-জীবনেতিহাসের অমূল্য উপকরণ। সুখের বিষয়, এই সকল পত্রের ৭খানি ১৩৪৪ সালের বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যা নবপর্য্যায় 'যমুনা'য় প্রকাশিত হইয়াছে।

'যমুনা'য় "রামের সুমতি" (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯), "পথ-নির্দ্দেশ" (বৈশাখ ১৩২০) ও "বিন্দুর ছেলে" (শ্রাবণ ১৩২০) গল্প তিনটি উপর্য্যুপরি প্রকাশিত হইবার পর চারি দিকে সাড়া পড়িয়া গেল। রচনার জন্য বড় বড় পত্রিকাগুলির উপরোধ-অনুরোধ রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের নিকট পৌঁছিতে লাগিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়; ইহার অন্যতম প্রধান কর্ম্মী প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কতকাংশ পাঠাইয়াছিলেন

-অন্তরঙ্গ বন্ধুর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু নানা কারণে উহা গৃহীত হয় নাই। 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা 'বিরাজ বৌ' প্রকাশিত হয়—১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যায়। 'চরিত্রহীন' গৃহীত না হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হইতে দেখিয়া 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ বিচলিত হইয়াছিলেন। 'যমুনা'র সহিত শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক যাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি শরৎচন্দ্রের নাম অন্যতর সম্পাদক-রূপে ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ১৩২০ সালের শেষার্দ্ধ হইতে 'যমুনা'য় "চরিত্রহীন" বাহির হইতে শুরু হয়; ১৩২১ সালের পত্রিকায় উহাই ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু ১৩২১ সালের 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের কয়েকটি নূতন রচনা—"পণ্ডিত মশাই" ও আরও তিনটি গল্প প্রকাশিত হইল; এই বৎসরের প্রথমার্দ্ধেই আবার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স কর্ত্তৃক 'বিরাজ বৌ' ও 'বিন্দুর ছেলে' এবং রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স কর্ত্তৃক 'পরিণীতা' ও 'পণ্ডিত মশাই' পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইল। শরৎচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়িল। ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় "চরিত্রহীন" অসমাপ্ত রাখিয়া, শরৎচন্দ্র 'যমুনা'র সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। অতঃপর শরৎচন্দ্রের রচনা জন্য প্রধানতঃ 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠাই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী

শরৎচন্দ্রের কোন্ রচনা কবে কোথায় প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার নির্দ্দেশ সহ তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি পুস্তকের প্রথম সংস্করণে প্রকাশকাল আদৌ মুদ্রিত হয় নাই; অনেকগুলিতে কেবল সালের উল্লেখ আছে—মাসের উল্লেখ নাই। তালিকায় বন্ধনীমধ্যে পুস্তকের সন-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতে শ্রীযুত সনৎকুমার গুপ্ত বিশেষ পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। একই বৎসরে প্রকাশিত একাধিক পুস্তকের ক্রম-নির্ণয়ে এই ইংরেজী তারিখগুলি অপরিহার্য্য।

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে মুদ্রিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'বড়দিদি'ই (ইং। ১৯১৩) সর্ব্বপ্রথম; ইহার ১ম সংস্করণ প্রকাশ করেন—'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'বিরাজ বৌ' (মে ১৯১৪) হইতে আরম্ভ করিয়া অধিকাংশ পুস্তকই প্রকাশ করিয়াছেন—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স যথাক্রমে 'পরিণীতা' (আগষ্ট ১৯১৪), 'পণ্ডিত মশাই', 'চন্দ্রনাথ', 'নিষ্কৃতি', 'চরিত্রহীন' ও 'নারীর মূল্য'—এই ছয়খানি, এবং শিশির পাবলিশিং হাউস

'বামুনের মেয়ে'র (ইং ১৯২০) প্রথমে প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'পথের দাবী' (ইং ১৯২৬), সরস্বতী লাইব্রেরি 'তরুণের বিদ্রোহ' (ইং ১৯২৯) এবং আর্য্য পাবলিশিং কোং 'স্বদেশ ও সাহিত্য' (ইং ১৯৩২) প্রকাশ করিয়াছেন।

ইং ১৯১৩

১। **বড়দিদি** (উপন্যাস)। ১৩২০ সাল (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৩)। পৃ. ৭৯।

১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। প্রথম দুই সংখ্যার লেখকের নাম মুদ্রিত হয় নাই।

শরৎচন্দ্রের মুদ্রিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'বড়দিদি'ই সর্ব্বপ্রথম। ইহা প্রকাশ করেন—'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল।

ইং ১৯১৪

২। **বিরাজ বৌ** (উপন্যাস)।? [বৈশাখ ১৩২১] (২ মে ১৯১৪)। পৃ. ১৭৫।

'বিরাজ বৌ' গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের প্রথম পুস্তক। ইহা প্রথমে ১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' মুদ্রিত হয়। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের ইহাই প্রথম রচনা।

'বিরাজ বৌ'-এর নাট্য-রূপও প্রকাশিত হইয়াছে (শ্রাবণ ১৩৪১)।

৩। **বিন্দুর ছেলে** ও অন্যান্য গল্প। [শ্রাবণ ১৩২১] (৩ জুলাই ১৯১৪)। পৃ. ২১১।

ইহাতে "বিন্দুর ছেলে," "রামের সুমতি" ও "পথ-নির্দ্দেশ"—এই তিনটি গল্প আছে। এগুলি প্রথমে 'যমুনা' পত্রিকায় যথাক্রমে শ্রাবণ ১৩২০, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯ ও বৈশাখ ১৩২০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক "বিন্দুর ছেলে" ও "রামের সুমতি" নাট্য-রূপও প্রকাশিত হইয়াছে। 'বিন্দুর ছেলে'র প্রথম অভিনয় হয়—'শ্রীরঙ্গমে' ২০ ডিসেম্বর ১৯৪৪ ও 'রামের সুমতি'র প্রথম অভিনয় হয়—'রঙমহলে' ২২ জুন ১৯৪৪ তারিখে।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকের প্রথম গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ "Bindu's Son" নামে 'মডার্ন রিভিয়ু' (ফেব্রুয়ারি জুন ১৯২৭) পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। **পরিণীতা** (গল্প)। ১৯১৪ (১০ আগষ্ট ১৯১৪)। পৃ. ১১৫।

১৩২০ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রথম প্রকাশিত। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁহার যে ৬খানি পুস্তকের প্রথম সংস্করণ রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স প্রকাশ করেন, 'পরিণীতা' তাহাদের মধ্যে প্রথম।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী-কৃত ইহার নাট্য-রূপও প্রকাশিত হইয়াছে (মাঘ ১৩৪৭)। ২৪ ডিসেম্বর ১৯৪০ তারিখে নাটকখানি 'নাট্যনিকেতনে' প্রথম অভিনীত হয়।

৫। **পণ্ডিত মশাই** (উপন্যাস)। ১৩২১ সাল (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। পৃ. ১৪৮।

১৩২১ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

ইং ১৯১৫

৬। **মেজদিদি** ও অন্যান্য গল্প (গল্প)। ? অগ্রহায়ণ ১৩২২ (১২ ডিসেম্বর ১৯১৫)। পৃ. ১৭১।

ইহাতে তিনটি গল্প আছে—"মেজদিদি", "দর্প-চূর্ণ," ও "আঁধারে আলো"। গল্পগুলি প্রথমে ১৩২১ সালের 'ভারতবর্ষে' যথাক্রমে কার্ত্তিক, মাঘ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯১৬

৭। **পল্লী-সমাজ** (উপন্যাস)। মাঘ ১৩২২ (১৫ জানুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৮০।

১৩২২ সালের আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত। পুস্তকের ১৪শ সংস্করণটি সংশোধিত।

'পল্লী-সমাজে'র নাট্য-রূপ 'রমা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে (শ্রাবণ ১৩৩৫)।

৮। **চন্দ্রনাথ** (উপন্যাস)। ? (১২ মার্চ ১৯১৬)। পৃ. ১৫৭।

১৩২০ সালের বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রথম প্রকাশিত।

৯। **বৈকুণ্ঠের উইল** (গল্প)। ১৩২৩ সাল (৫ জুন ১৯১৬)। পৃ. ১৩৮।

১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১০। **অরক্ষণীয়া** (গল্প)। কার্ত্তিক ১৩২৩ (২০ নবেম্বর ১৯১৬)। পৃ. ১৭৪

১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

ইং ১৯১৭

১১। **শ্রীকান্ত,** ১ম পর্ব্ব (চিত্র)। [মাঘ ১৩২৩] (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭)। পৃ. ২৪৩।

ইহা "শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী" নামে ১৩২২ সালের মাঘ-চৈত্র ও ১৩২৩ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন—K. C. Sen ও Theodosia Thompson.

এই ইংরেজী অনুবাদ (পৃ. ১৭৫) *Srikanta* নামে E. G. Thompson-এর ভূমিকা সহ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

১২। **দেবদাস** (উপন্যাস)। আষাঢ় ১৩২৪ (৩০ জুন ১৯১৭)। পৃ. ১৫৬।

ইহা ১৩২৩ সালের চৈত্র ও ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৩। **নিষ্কৃতি** (গল্প)। ? (১ জুলাই ১৯১৭)। পৃ. ১২৫।

১৩২৩ সালের ভাদ্র, কার্তিক ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শ্রীদিলীপকুমার রায় 'নিষ্কৃতি'র ইংরেজী অনুবাদ *Deliverance* নামে (পৃ. ১৬+১০৪) প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদটি "Revised by Sri Aurobindo. With a Preface by Rabindranath Tagore.

১৪। **কাশীনাথ** (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৪ (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৭)। পৃ. ১৯২।

ইহাতে সাতটি গল্প আছে। এগুলির নাম ও প্রথম প্রকাশকালের নির্দেশ দেওয়া হইল:—(১) কাশীনাথ ('সাহিত্য', ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯), (২) আলো ও ছায়া ('যমুনা', আষাঢ়, ভাদ্র ১৩২০); (৩) মন্দির ('কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' সম্পর্কীয় মাতুল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত), (৪) বোঝা ('যমুনা', কার্তিক-পৌষ ১৩১৯), (৫) অনুপমার প্রেম ('সাহিত্য', চৈত্র ১৩২০), (৬) বাল্য-স্মৃতি ('সাহিত্য', মাঘ ১৩১৯), (৭) হরিচরণ ('সাহিত্য', আষাঢ় ১৩২১)।

১৫। **চরিত্রহীন** (উপন্যাস)। ? [কার্তিক ১৩২৪] (১১ নবেম্বর ১৯১৭)। পৃ. ৫৬৬।

ইহা প্রথমে ১৩২০ সালের কার্তিক-চৈত্র ও ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯১৮

১৬। **স্বামী** (গল্প)। ফাল্গুন ১৩২৪ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮)। পৃ. ৯১।

ইহাতে "স্বামী" ও "একাদশী বৈরাগী" নামে দুইটি গল্প আছে। প্রথমটি ১৩২৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা 'নারায়ণে' এবং দ্বিতীয়টি ১৩২৪ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭। **দত্তা** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩২৫ (২ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ২৬৭।

ইহা ১৩২৪ সালের পৌষ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

'দত্তা'র নাট্য-রূপ—'বিজয়া', (পৌষ ১৩৪১)।

১৮। **শ্রীকান্ত**, ২য় পর্ব্ব (চিত্র)। ভাদ্র ১৩২৫ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ১৯২।

ইহা ১৩২৪ সালের আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ; ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনপদ

নয়

স্বর্ণবাবু চ'লে যাবার পর রাধাকান্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। স্বর্ণভূষণকে তিনি ভালবাসেন। প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, স্থানীয় সমাজে নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা নিয়ে উভয়ের মধ্যে একটা ঈর্ষান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাও আছে, বৈষয়িক স্বার্থ নিয়ে মধ্যে মধ্যে উভয়ের মধ্যে বিবাদও হয়, তবুও উভয়ের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যার জন্য পরস্পরের জন্ম উভয়েই চিন্তিত হন, উভয়েই পরস্পরের কল্যাণ কামনা করেন ; যার জন্ম তাঁদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়েও অল্পেই মিটে যায়। যৌবনের প্রারম্ভে একদা প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নিয়ে উভয়ের মধ্যে এক প্রচণ্ড বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল ; সে বিরোধ সেদিন উভয় পক্ষের দুই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে দুই বংশের বংশগত বিরোধে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছিল। সে সময় একদিন স্বর্ণবাবুর এক জ্ঞাতি অসুস্থ রাধাকান্তের শারীরিক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে একা পেয়ে একখানা খাঁড়া হাতে তাঁকে কাটবার জন্ম ছুটে এসেছিল। সে বিরোধও মিটেছিল পরস্পরের মধ্যের অকৃত্রিম প্রীতির জন্ম। রাধাকান্ত এই সময় থেকেই নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে সংযত হয়েছেন। এই শুভমুহূর্ত্তেই তাঁর জীবনে এলেন তাঁর স্ত্রী—কাশীর বউ। রাধাকান্ত অন্ত মানুষে পরিণত হলেন। অকৃত্রিম মর্য্যাদাবোধের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জীবনে জাগ্রত হ'ল ন্যায়নিষ্ঠা নীতিবোধ, অন্ত দিকে ধর্ম্মপ্রবণতার ফলে শাস্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হ'ল জ্ঞান। জ্ঞান অবশ্যই শাস্ত্রজ্ঞান। রাধাকান্তের এই ন্যায়নিষ্ঠা এবং শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে স্বর্ণবাবুর কূটনীতি এবং বিষয়জ্ঞানের বিরোধ প্রায় অহরহই বাধে, মতান্তর হয়, তবুও পরস্পরের বাল্যপ্রীতির জন্ম মনান্তর ঘটে না।

অনেকে অবশ্য আরও একটা কথা বলে। কথাটা হয়তো আংশিকভাবে সত্যও বটে। লোকে বলে, গোপীচন্দ্রের এই অভ্যুত্থানের জন্যই বিব্রতপ্রতিষ্ঠা রাধাকান্ত এবং স্বর্ণবাবু প্রকৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছেন। দু-একজন বলে, গোপীচন্দ্রের অভ্যুত্থান যদি না হ'ত, তবে এই স্থানটিতে জীবনদ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করত

ধারাধরন ছিল অন্য ধরনের। ভূসম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের অবসর ছিল প্রচুর; সাধারণ শ্রমিক চাষীরা তাঁদের জমি চাষ ক'রে ফসল ফলিয়ে মাথায় ব'য়ে তুলে দিত মালিকের বাড়িতে; দেশাচারপ্রচলিত তিন ভাগের এক ভাগ নিয়ে যেত নিজেদের প্রাপ্য হিসেবে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে। শ্রমিকদের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ, একমাত্র চাষের কাজেই আবদ্ধ বললে ভুল হবে না। কাজের খোঁজে বাইরে যাওয়ার অর্থ ই ছিল, আসামের চাবাগানে কুলী হিসেবে চালান যাওয়া। তার অর্থ কালান্তক জ্বরে অথবা সাহেবের বুটের লাথিতে পিলে ফেটে অবধারিত মৃত্যু। তাই কর্ম্মান্তরহীন শ্রমিকদের শ্রমের কল্যাণে জমির মালিক গৃহস্থের ঘরে পল্লীলক্ষ্মী ছিলেন বাঁধা। শ্রমিকদের মধ্যে যারা দুর্ব্বল এবং যাদের চাষের বয়স হয় নাই, তারা এঁদের ঘরেই করত গো-সেবা। মূল জীবিকা চাষের কাজে নিশ্চিন্ত গৃহস্থের অবসর-যাপনের বিলাস ছিল এটি। অন্য দিকে গো-সেবা শাস্ত্রানুমোদিত পুণ্যকর্ম্মও বটে। রাধাকান্ত তাই নিজে হাতে এদের দুবেলা কিছু কিছু খাওয়াতেন। ঘরের এক কোণেই বস্তায় খোল এবং ভুষি থাকে, একটা ডালায় তাই ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে রাধাকান্ত বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পায়ের খড়মের শব্দ বেজে উঠবা-মাত্র গরুগুলি মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইলে। তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল রাধাকান্তের মুখে।

গরুগুলির প্রত্যেকটির নাম আছে। সবচেয়ে যেটি তাঁর প্রিয়, সেটি আকারে সব-চেয়ে বড় এবং সকলের চেয়ে বেশি দুগ্ধবতী; প্রকৃতিতে গাইটি সবচেয়ে উগ্র। রাধাকান্ত গাইটির নাম দিয়েছিলেন 'নন্দিনী' অর্থাৎ গোমাতা সুরভি-কন্যা 'নন্দিনী', কিন্তু রাধাকান্তের পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্র গরুটির উগ্র প্রকৃতির জন্য নামকরণ করেছে 'মারহাট্টানী' অর্থাৎ মার-হস্তানী। রাধাকান্তের দেওয়া নাম ছেলের দেওয়া নামের কাছে চাপা প'ড়ে গিয়েছে। রাধাকান্ত হেসে নন্দিনীকে বলেন, কি করব বল্? গৌরীর দেওয়া নামটা তুই যে শিঙ নেড়ে মাথায় তুলে নিলি। তিনি সস্নেহে তার গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দেন, মারহাট্টানী আরামে চোখ বুজে ঘাড় তুলে নির্ব্বোধ বড় চোখ মেলে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে স্নেহবিগলিতা নন্দিনীর মত। মারহাট্টানীর পরেই তাঁর প্রিয় হ'ল রঙ্গিনী ব'লে গাইটি। রঙ্গিনীর গায়ের রঙটি বড় সুন্দর, তাই তার নাম 'রঙ্গিনী'। প্রকৃতিতে রঙ্গিনী মারহাট্টনীর বিপরীত। রাধাকান্তের রাখাল প্রহ্লাদ বাউড়ী বলে, প্যাটের তলায় ছেলে শুইয়ে দাও ক্যানে, রাঙ্গী নড়বে না। এ ছাড়া শ্যামলী আছে, কালী আছে; মঙ্গলা, বুধি, সোমেশ্বরী আছে—এদের নাম হয়েছে জন্মবার থেকে।

প্রহ্লাদের বড় শখ, মারহাট্টানীর গলায় ঘুংরের মালা পরিয়ে দেয়। মারহাট্টানী পথে চলে ঘাড় তুলে বেশ একটু প্রখর গতিতে; তাতে সে কল্পনা করে, ঘুঙুরগুলো বেশ ঝমঝম ক'রে বাজবে। প্রহ্লাদ আজও মাথা চুলকে সবিনয়ে তার আরজি পেশ

করলে, মারহাট্টানীর গলায় ঘুঙুর দোষ বলেছিলেন— ! কথাটা ব'লে সে অকারণে একটু হাসলে।

রাধারাস্ত হেসে বললেন, দোষ। ভুষি এবং খোলের ডালাটা ফুরিয়ে গিয়েছিল, আলগোছে সেটা প্রহ্লাদের হাতে দিয়ে বললেন, নিয়ে আয় আর এক ডালা। মারহাট্টানী এবং রঙ্গিনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি দু হাতে দুজনের গলকম্বলে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। চাকর বিষ্ণু এসে বললে, দত্তপাড়ার মণি দত্ত আর রঙলাল মোড়ল এসেছে, কি দরকার আছে।

রাধাকান্ত বললেন, যাই।

* * *

হাত ধুয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন। মুখ তাঁর ঈষৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। মণি দত্ত তাঁর টেবিলের সামনে একখানা চেয়ারে ব'সে আছে। মণির উদ্ধত প্রকৃতির কথা এখানে সর্ব্বজনবিদিত। ছোকরা কিছু ইংরেজী প'ড়ে এবং এখান থেকে সাত মাইল দূরে রেল-ষ্টেশনে ব্যবসায় ক'রে কিছু অর্থ সঞ্চয় ক'রে দম্ভে কাণ্ডজ্ঞান পর্য্যন্ত হারিয়েছে, ধর্ম্মের অনুশাসন পর্য্যন্ত মানতে চায় না, পায়ে মাথায় সমান করতে চায়; দেবতা ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা ক'রে তাদের সঙ্গে সমান হতে চাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত্ত চেষ্টা ক'রে তিনি নিজেকে সংযত করলেন। বললেন, কি মণি? রঙলাল ব'সে ছিল মেঝের বিছানো একখানা মাদুরের উপর। মণি কিছু বলবার আগেই সে সম্ভ্রম এবং ভক্তিভরেই রাধাকান্তকে প্রণাম ক'রে বললে, আপনার কাছে এসেছি বাবু, একটি বিচারের জন্যে। নালিশ জানাতে এসেছি।

মণি নমস্কার করলে, বললে, বসুন আপনি।

অত্যন্ত স্বল্প সময়, কয়েকটা মুহূর্ত্ত বলা চলে, রাধাকান্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, কোমরে একটা বেদনা হয়েছে, বসলেই বেদনাটা চাগিয়ে উঠছে। দাঁড়িয়ে থেকে আরাম পাব।

বাধ্য হয়ে মণি দাঁড়িয়েই কথা বলতে আরম্ভ করলে, রঙলালকাকা আমার কাছে এল, আমাদের সঙ্গে ওদের একটা ভালবাসার সম্বন্ধ আছে। ওদের গ্রামে আমাদের জমি আছে, আমার ঠাকুরদাদার আমল থেকে ওরাই সেসব দেখাশুনো ক'রে আসছে। তাই আমি ওর সঙ্গে এসেছি। আমি সব শুনলাম। নালিশ ওর স্বর্ণবাবুর আপন-ভাগ্নে ভূপতি আর জ্ঞাতি-ভাগ্নে অমূল্যর ওপর। আমি শুনে স্বর্ণবাবুর কাছেই ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তা— । মণি হাসলে, হেসে বললে, ওঁর কাছারিতে ব'সেই শুনলাম, রঙলালের নামেই নালিশ নিচ্ছেন স্বর্ণবাবু। নালিশ করছেন ভূপতির মা আর মামীরা। আমার নামেও নালিশ হ'ল শুনলাম। তাই শুনে নালিশ না ক'রেই আমরা উঠে

এলাম আপনার কাছে। মণি আবার একটু হাসলে। বললে, আমার কথা থাক্। রঙলালকাকার জন্তেই আমার আসা। বল রঙলালকাকা, তোমার কথা বল।

রাধাকান্ত একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, কিন্তু আমি কি করতে পারি বল? ভূপতি অমূল্য এরা হলেন ভদ্রঘরের সন্তান।

মণি উষ্ণ হয়ে কথার মাঝখানেই ব'লে উঠল, মাতাল চরিত্রহীনকে ভদ্রসন্তান বলেন আপনি?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে রাধাকান্ত বললেন, ভূপতি অমূল্যের বাপেরা নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, ওদের মাতৃকুলও সম্মানিত সম্ভ্রান্ত বংশ। ভদ্রসন্তান না বললে অপরাধ হবে। ওরা ভদ্র ব্যক্তি না হতে পারে।

মণি বললে, মেনে নিলাম আপনার কথা। কিন্তু ভদ্রসন্তান অভদ্র হ'লে তার বিচার্ আপনারা করবেন না?

রাধাকান্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। এ কথার উত্তর চট ক'রে তিনি দিতে পারলেন না।

অবসর পেয়ে রঙলাল ব'লে উঠল, আমরা শূদ্দুর, আমরা চাষী ব'লে কি আমাদের মেয়েছেলের মান-ইজ্জৎ নাই বাবু? ভদ্দসন্তানে যদি আমাদের সেই মান-ইজ্জতে নজর দেয়, তা হ'লেও আপনকারা বিচার করবেন না?

মণি বললে, অবিশ্যি সংসারে সাধুলোক গঙ্গাজলখেকো চরিত্রের মানুষ কম, নাই বললেই হয়, বয়সকালে প্রায় সবারই একটু আধটু ও দোষ হয়; কিন্তু তার জন্যে তো ছোটলোক-পাড়া আছে, টাকা-পয়সা দিলেই মা এসে মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে যায়, শাশুড়ী বউকে এনে দেয়!

রাধাকান্ত এতক্ষণ পর্যান্ত মাটির দিকে চেয়ে প্রায় নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। এইবার বললেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। তোমরা আমাকে মাফ কর।

জটিল! মণি সবিস্ময়ে বললে, জটিল! এর মধ্যে জটিলতা কোথায় পেলেন আপনি?

আমার কাছে জটিল মনে হচ্ছে। রাধাকান্ত বললেন, প্রথমত ধর—। বলতে গিয়ে থামলেন, হেসে বললেন, কিছু মনে করবে না তো?

অন্যায় না বললে কিছু মনে করব কেন বলুন?

ন্যায়-অন্যায় বিচার বড় কঠিন মণি। আমার কাছে যেটা ন্যায় ব'লে মনে হয়, সেটা তোমার কাছে অন্যায় ব'লে মনে হ'তে পারে। কথা হ'ল, সত্য মিথ্যার। সত্য কথা শুনে যদি মনে কষ্ট পাও, সেটাকে যেন অন্যায় ব'লে মনে ক'রো না।

বলুন।

দেখ, চরিত্রহীনতা অন্যায় এবং পাপ। এ বিষয়ে শাস্ত্র বল, লোকাচার বল, সবাই একমত—তুমি আমি রঙলাল সবাই একমত।

নিশ্চয়।

কিন্তু চরিত্রহীনতা মাত্র পুরুষের মধ্যেই তো আবদ্ধ নয়! একটা পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোক যখন গুপ্তপ্রেম করে, তখন চরিত্রহীন উভয়েই। অন্যায় পাপ উভয়েরই।

মণি গম্ভীর হয়ে গেল, রাধাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে বললে, বলুন।

রাধাকান্ত বললেন, অবশ্য চরিত্রহীন পুরুষ সতী নারীর দিকে কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, তার শাস্তি-বিধান করা সমাজের কর্ত্তব্য, প্রত্যেক ধার্ম্মিক ব্যক্তির কর্ত্তব্য এ আমি স্বীকার করি। কিন্তু সমাজ বলতে আজ আর কিছু নাই। কলিতে একপাদ ধর্ম্ম, তাও আজ প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। আজ সমাজ ডেকে এর বিচার অসম্ভব, কেন না, সমাজের কর্ত্তারা অনেকে এ পাপে লিপ্ত, অনেকের সন্তান-সন্ততি লিপ্ত। তা ছাড়া সমাজে এখন ধর্ম্মবল অপেক্ষা ধনবলটাই হয়েছে বড়। অমূল্য-ভূপতিকে ডাকতে গেলে, তারা ধনবলের ভরসায়, ডাকে আসবে না, সমাজের বিচার উপেক্ষা করবে। তিনি নীরব হলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তিনি ম্লান হেসে বললেন, এখন তোমারাই বল, ব্যাপারটা জটিল কি না?

মণিও এ কথার জবাব চট ক'রে দিতে পারলে না। সে চুপ ক'রে রইল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে রঙলাল; সে বললে, তা হ'লে কি আমরা গোপীবাবুর কাছে যাব বাবু?

রাধাকান্তের কপালে তিন সারি রেখা ফুটে উঠল, তিনি বললেন, যদি মনে কর তাতে প্রতিকার হবে, তবে অবশ্যই যেতে পার। কথা শেষ ক'রে একটু হাসলেন তিনি।

আবার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ঘরখানা প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল, শুধু ক্লক-ঘড়িটার পেণ্ডুলামের একঘেয়ে টকটক শব্দ বেজে চলছিল। হঠাৎ একটা টিকটিকি ডেকে উঠল এর মধ্যে। মণি সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে সেই দিকে একবার তাকালে, তারপর বললে, সেই ভাল। নৈঋতের টিকটিকি—শুভই হবে বলছে।

রাধাকান্ত প্রশ্ন করলেন, গোপীচন্দ্রের কাছে যাবে?

না।

তবে?

মণি বললে, মনে মনে ভাবছিলাম, নালিশ-টালিশ ছেড়ে, আপনার উপদেশ নিয়ে যাব। আপনি যা বলবেন করতে, তাই করব। টিকটিকিটা ডেকে উঠল। দেখলাম, শুভ দিক থেকে ডেকেছে। এখন বলুন, রঙলালকাকা কি করবে?

রাধাকান্ত এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চকিত হয়ে উঠলেন।

রঙলাল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললে, বলুন বাবু, যা বলবেন তাই করব।

রাধাকান্ত একবার উপরের দিকে চাইলেন, তারপর বললেন, ধর্ম্মকে অবলম্বন ক'রে

নিজেদের ইজ্জৎ নিজেরাই রক্ষা কর রঙলাল। পরের সাহায্য নিতে গিয়ে, সেখানে মা ভগ্নী স্ত্রী কন্যা বধূ—এদের চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করবার সুযোগ দিয়ে তাদের অপমান ক'রো না। তবে বললাম যে, ধর্মকে মাথায় রেখো, আর রাজার আইনের দিকে লক্ষ্য রেখো।

মণি হঠাৎ নত হয়ে রাধাকান্তের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বললে, এই কথাই শুনব ব'লে আপনার কাছে এসেছিলাম। চল রঙলালকাকা।

* * *

নবশাক অথবা নবশাখ সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্‌গোপের নাম প্রথমেই উল্লেখ করা হয়; কৃষি-প্রধান দেশে কৃষি এবং গো-পালন—এই দুটো প্রধান কাজ এদের হাতে ছিল ব'লেই বোধ হয় এদের নাম সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে, এবং কৃষিকর্ম্মের প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যার দিক দিয়ে এরাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। বিশেষ ক'রে পশ্চিম-বঙ্গে কমপক্ষে শতকরা আশিটি গ্রামে সদ্‌গোপের বাস আছেই। আবার আশিটি গ্রামের অন্তত বাটখানি গ্রামে এরাই প্রধান। বহুকাল পূর্ব্বে এরা কেমন ছিল, সে কথা যাক; মুসলমান-আমলে এরা সদ্‌গৃহস্থসম্প্রদায়রূপে পরিগণিত ছিল। পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলরাই ছিল গ্রামের সর্ব্বেসর্ব্বা। সে আমলের জমিদারেরা এদের সম্ভ্রম না হোক, যথেষ্ট সমাদর করতেন। বৈষয়িক কর্ম্মে পরামর্শ নিতেন, সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে সাদর নিমন্ত্রণে মণ্ডলেরা লোকজন নিয়ে এসে ক্রিয়া-বাড়ির অনেক কাজের ভার গ্রহণ করত। আচারে এবং ধর্ম্মমতে এরা বৈষ্ণব। তবুও গ্রামের শিব কালী ইত্যাদির পূজার ভার ছিল এদের উপর, ভার বললে ঠিক হবে না, এরাই ছিল সেবায়েৎ, দেবত্র ছিল এদেরই অধিকারে। গোপথ গোচর ভূমির রক্ষণাবেক্ষণও এরাই করত। গ্রামে সংকীর্ত্তন হ'ত, চব্বিশ প্রহর উৎসব হ'ত, ভাগবৎ-পাঠ হ'ত, সেসব উৎসবের আসরে এরাই বসত আসর জমিয়ে এবং আক্ষরিক শিক্ষায় দক্ষ না হ'লেও, বংশানুক্রমিক শিক্ষায় বোধশক্তি রসজ্ঞান ছিল সম্ভ্রমের উপযুক্ত।

মুসলমান-রাজত্ব অবসান হ'ল। কোম্পানির আমলে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে এরা হ'ল সকল অধিকারচ্যুত। জমি হ'ল জমিদারের, জমিদারের বিনা সম্মতিতে দান বিক্রয় সকল হস্তান্তরের স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হ'ল এরা, গাছপালার ফল ভোগ ছাড়া ডালপাতার উপরও এদের অধিকার রইল না, গোচর গোপথ জমিদারের খাস সম্পত্তিতে পরিণত হ'ল, তাদের গ্রামের সাধারণের দেব-দেবী দেবত্র জমিদারের অধিকারভুক্ত হ'ল, ওরা তদ্বির তদারক করতে আরম্ভ করলে জমিদারের অধীনে অনুগৃহীতরূপে; বিনিময়ে অনুগ্রহের প্রসাদ বৃত্তি নিয়েই ওদের পরিতুষ্ট হতে হ'ল।

পূর্ব্বে যে পদ্ধতিতে গ্রাম্য খাজনা পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলী স্বাধীনভাবে সংগ্রহ ক'রে জমিদার

অথবা নবাব-সরকারের তহশীলদারকে পৌঁছে দিত মর্য্যাদার সঙ্গে, সেই পদ্ধতি একটা নামমাত্র পদ্ধতিতে আবদ্ধ রইল; জমিদার-নির্দ্দিষ্ট পুণ্যাহের দিন, পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলী এসে কিছু টাকা একটি পূর্ণ-ঘটের সম্মুখে আমানৎ ক'রে জমিদারের গোমস্তার হাত থেকে কিছু বাতাসা মণ্ডা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে আরম্ভ করলে। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রকে কাছা-গলায় জমিদার-কাছারিতে নজরের টাকা দিয়ে এসে হাত জোড় ক'রে বসতে হ'ল খারিজ-দাখিলের জন্য। বিপন্ন ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজনে সম্পত্তি বিক্রি করবার সংকল্প করলে, ক্রেতার সন্ধানের পূর্ব্বে ছুটতে আরম্ভ করলে জমিদারের দরবারে তাঁর সম্পত্তির জন্য। জমিদার-বাড়ির ক্রিয়াকর্ম্মে সদর-কাছারি থেকে গোমস্তার কাছে এই সময় থেকে চিঠি আসতে আরম্ভ করলে, "রোকায় অবগত হইবা।...তারিখে বাড়িতে যে ক্রিয়া হইবেক তাহা নির্ব্বাহের জন্য দশ-পনেরো জন চাকরের প্রয়োজন। তোমার এলাকা হইতে অন্তত পাঁচ-সাতজন চাকর পাঠাইবে।" সদ্‌গোপ নাম পর্য্যন্ত তাদের বিলুপ্ত হয়ে গেল, জাতিতে চাষা ব'লে তারা উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচিত হ'ল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হয়েছে, ওই সাল থেকে ১৯০৫ সাল একশো তেরো বৎসর। এই একশো তেরো বৎসরের মধ্যে সমগ্র সম্প্রদায় প্রায় তাদের হালের বলদের মত মূক ভারবাহী জীবে পরিণত হয়েছে। জমিদারের কর্ম্মচারীরা এখন ওদের সামনেই বলে, চাষাসে বিনা দাস্তা নেহি, লেকিন বিনা জুতাসে কেতা নেহি। ওরা কাষ্ঠ-হাসি হাসে। এও তাদের সয়ে গিয়েছে।

জনপদতুল্য এই গ্রাম, নবগ্রামের আশেপাশে একশোখানা গ্রামের মধ্যে সত্য সত্যই আশিখানা গ্রাম সদ্‌গোপ-প্রধান। বাকি কুড়িখানা গ্রামের মধ্যে নবগ্রাম, মিলনপুর, সীতাপুর, মণিহারপুর এই কখানা গ্রাম ব্রাহ্মণজমিদারপ্রধান স্থান। বিপ্রস্থান এবং চতুর্ভুজপুর শাস্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম। গোবিন্দপুর কায়স্থপ্রধান গ্রাম। এ অঞ্চলে কায়স্থেরা কেউ জমিদার হতে আজও পারেন নাই। আজও তাঁরা এ অঞ্চলের জমিদার-সেরেস্তা পরিচালনা করছেন। গোমস্তা নায়েব সবই তাঁরা। দু-চারজন সরকারী চাকরি পেয়েছেন—দারোগা, কেরানী, পোষ্টমাষ্টার এমনই চাকরি। এই আশিখানা গ্রামের সদ্‌গোপেরা এখন এই কখানি গ্রামের লোকের মুখের দিকে সসম্ভ্রমে চেয়ে কালাতিপাত করছে। নিঃস্ব অথবা অভাবী যারা, তারা খানসামার কাজ খুঁজতে আসে এই সব গ্রামে। অসহায় বিধবারা এঁদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। এঁদের জমি ওরা ভাগে ঠিকায় চাষ করে, এঁদের ধান নিয়ে ওদের মেয়েরা পরিপাটী ক'রে চাল তৈরি ক'রে দেয়। এই যখন স্থানকালের অবস্থা, তখন রঙলালের ওই অভিমান দুঃসাহস ছাড়া আর কি?

স্বর্ণবাবুর ক্রোধের আর সীমা ছিল না। তিনি ব'সে গোঁফে পাক দিতে দিতে এই

কথাই ভাবছিলেন। গুপ্তচরের প্রতীক্ষায় তিনি ব'সে আছেন। মণি এবং রঙলাল কোথায় যায়, সেই সন্ধানে তিনি লোক পাঠিয়েছেন।

এই অবস্থাটার সৃষ্টি হয়েছে আজ বৎসর কয়েকের মধ্যে। মণিহারপুরে সরকার-বাবুরা হাই ইস্কুল করেছেন, এ গ্রামে তাঁর বাবা স্থাপন করেছেন মাইনর ইস্কুল; বিপ্রস্থানেও আজ ছ বৎসর একটা মাইনর ইস্কুল হয়েছে। সদ্‌গোপেদের দু-চারজন ক'রে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছে। রঙলালের বাড়ি এখান থেকে দু মাইলের কিছু বেশি। রঙলালের দুই ভাইপো তাঁর ইস্কুলেই মাইনর ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছে; রঙলালের বড় ছেলে মাইনর পাস ক'রে গ্রামে একটা পাঠশালা খুলে বসেছে। রঙলালের এই নালিশ করতে আসার পিছনে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন—ওই তিনটি অর্দ্ধশিক্ষিত চাষীর ছেলের উত্তেজনা।

মুখে তাঁর ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল।

উইঢিপি থেকে বর্ষার সময় পাখা-গজানো উইপোকা ওড়া মনে পড়ল তাঁর। আলোর উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে; উনোনের মুখে পুড়ে যায়; কেরোসিনের ডিবে-প্রদীপের শিখায় আধপোড়া হয়ে ছটফট করে; হ্যারিকেনের কাচের ঢাকায় ধাক্কা খেয়ে পাখা খ'সে যায়; হালকা পলকা পাখা স্পর্শমাত্রে খ'সে পড়ে, ভেঙে যায়। মৃত্যুর জন্যই পিপীলিকার পক্ষোদ্গম হয়। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

গোপীচন্দ্র এর উপর আবার হাই ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। সর্ব্বনাশ হবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা তাঁর মনে হ'ল। সামান্য অবস্থার ব্যক্তি এই গোপীচন্দ্রের আকস্মিক বিস্ময়কর অভ্যুত্থানের আদর্শও এর আর একটা কারণ। গোপীচন্দ্রের অবস্থা একদা রঙলালের চেয়েও খারাপ ছিল। সে যখন অর্থশালী হয়ে বানিয়াদী বংশের অবমাননা ক'রে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তখন সাধারণ মানুষও চঞ্চল হবে বইকি!

তাঁর লোক ফিরে এল।

লোকটি রতন বাউড়ী। স্বর্ণবাবুর ক্রীতদাস বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্বর্ণবাবুর আধিপত্যের সাহায্যে বাউড়ী সমাজে সে প্রধান, কিছু জমি—চার বিঘে জমিও তাকে স্বর্ণবাবু খাজনা ক'রে দিয়েছেন। স্বর্ণবাবুর নাখরাজ জায়গার উপর রতনের বাস। যত গুপ্ত কাজ রতনই করে। কাপড় ঢাকা দিয়ে মদ নিয়ে আসে, নারীসম্ভোগের বাসনা হ'লে রতনই তা সংগ্রহ করে, অন্য স্থান হতে অন্যের দ্বারা সংগৃহীত নারীও রতনের হেফাজতে থাকে। রতন স্বর্ণবাবুর জন্য প্রাণ দিতে পারে।

কালো দীর্ঘাকৃতি জোয়ান, পেশীবহুল সবল অথচ ছিপছিপে শরীর রতনের, এক জোড়া জমকালো গোঁফে তার দাসত্বের পেশাকে বেশ একটি মর্য্যাদা দিয়েছে। মাথার গামছাটা জড়ানো ছিল পাগড়ির মত, সেটা আগে টেনে খুলে ফেলে রতন প্রণাম ক'রে দাঁড়াল।

ভ্রূভঙ্গীতে ইশারায় স্বর্ণবাবু প্রশ্ন করলেন, কি খবর ?

রতন বললে, আজ্ঞে, ওখানে ওরা যায় নাই। অর্থাৎ গোপীচন্দ্রের ওখানে।

হুঁ। স্বর্ণবাবু আশ্বস্ত হলেন।

রতন বললে, আমি সেই থেকেই পাহারা দিয়েছিলাম ওঁদের বাড়ির ছামনে। দেখাই নাই—দেখাই নাই। তা বাদে এতক্ষণে দেখলাম, ওরা দুজনে আধাকান্তবাবুর (রাধাকান্তবাবুর) বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা আস্তায় আস্তায় (রাস্তায় রাস্তায়) চ'লে গেল।

রাধাকান্তর ওখানে ? স্বর্ণবাবু চমকে উঠলেন। ধর্মধ্বজী দাম্ভিক রাধাকান্ত কি পরামর্শ দিলে ? ওর দেওয়া পরামর্শের পথটা স্বর্ণবাবুর কাছে বাঁকা ব'লে মনে হয়। কয়েকবার ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বললেন, হারামজাদা বাউড়ী, শূয়ারের জাত কিনা, যে দিকে চলবে সেদিক থেকে ফিরে আর আশপাশ চাইবে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, যা, গিরশের দোকান থেকে ফিরে আয়। গিরশে অর্থাৎ গিরীশ, মদের দোকানদার।

* * *

নবগ্রামের বাজারের নাম দত্তবাজার।

দত্তবাজারের মাঝখান দিয়ে চ'লে গিয়েছে প্রধান রাস্তাটা, পূর্ব্ব-পশ্চিমে। পূর্ব্ব প্রান্তে মহাপীঠ অট্টহাস; এককালে এই দিকটাই ছিল গ্রামের সদর, স্থানীয় ভাবায় গ্রামের মুখ। এই দিকেই গ্রাম্য হাট, এই দিকেই বাজার; বহু পূর্ব্বে নিকটস্থ নদীর ঘাটে ঘাটবন্দরের সমৃদ্ধির দিনে, এখানকার বাজারের ছিল অপরূপ সমৃদ্ধি।

আজকাল সে সমৃদ্ধি নাই। বাজারের অবস্থা দৈন্যে ভ'রে উঠেছে, সাত মাইল দূরের রেল-ষ্টেশনের বাজারের সংঘাতে। দত্তদের অবস্থা স্তিমিত। তীর্থস্থল অট্টহাসের যাত্রীও অনেক ক'মে গিয়েছে। যাত্রীর সংখ্যা অপেক্ষা বৈষয়িক রজ্জুর আকর্ষণে আকৃষ্ট প্রজাদের সংখ্যা বেশি। গ্রামের দক্ষিণ অংশে ব্রাহ্মণ-জমিদারদের বাস, সেই দিকেই তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলছেই—চলছেই। কাজেই গ্রামের মুখ বা সদর এখন দক্ষিণ দিকে। পূর্ব্বপশ্চিমমুখী রাস্তাটার অবস্থা এখন খারাপ হয়ে এসেছে। তবুও নবগ্রামের বাজার থেকে বেরিয়ে খানিকটা দূর পর্য্যন্ত রাস্তার রঙটা লালচে। অর্থাৎ কাঁকর দেওয়া হয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে। বাকিটা কাঁচা, বন্ধুর পথ, গর্ত্ত এবং ধূলোয় ভরা। এই রঙলালের গ্রামে যাওয়ার পথ।

রঙলাল প্রৌঢ়, কিন্তু সবল সমর্থ দেহ। মনের উত্তেজনায় সে জোরে পা ফেলে পথ অতিক্রম ক'রে চলেছিল। ভারি মোটা পায়ের তাড়নায় কালচে ধূলো উড়ছে। ধূলো উড়ে তার সর্ব্বাঙ্গে লাগছে। তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নাই। মনের অবস্থাও নয়

তেমন, তা ছাড়া মাটির সঙ্গে সমস্ত জীবনে এমন একটা মাখামাখির সম্বন্ধ আছে যাতে ধুলোকে তার ক্লেদ ব'লে মনে হয় না, গায়ের চামড়া ধুলোর আস্তরণে পীড়িত হয় না, নাক জ্বালা করে না, গন্ধ বিজাতীয় ব'লে মনে হয় না।

এই বন্ধুর পথ অতিক্রম ক'রে তারা নবগ্রামে আসে। খাজনা দিতে আসে, বাবুদের কাছে নালিশ করতে আসে, হাটে আসে, বাজারে আসে। সে আসা তাদের সপ্তাহে দু দিন এক দিন। কিন্তু গ্রামের ছেলেরা আসে সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে ছ দিন। মাইনর ইস্কুলে তারা পড়তে আসে।

দু মাইল, অর্থাৎ এক ক্রোশেরও বেশি একটা বিস্তীর্ণ মাঠ। দু পাশে শস্যক্ষেত্র, মাঝখান দিয়ে চ'লে গিয়েছে এই পথ। নবগ্রাম থেকে রঙলালের গ্রাম গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত পথের প্রায় মাঝখানে একটি ঝরনা। খানিকটা পতিত জমির মধ্যে গরুর চোখের মত কাজল-কালো জলে ভরা কয়েকটি অগভীর গর্ত্ত। গর্ত্তগুলি থেকে অবিরাম জল বেরিয়ে চ'লে যাচ্ছে স্বল্পপরিসর একটি নালা বেয়ে, অথচ গর্ত্তগুলি অহরহ জলে পরিপূর্ণই রয়েছে; ভিতর থেকে ভোগবতীর ধারার মত জল উঠছে নিশব্দ অদৃশ্য স্রোতে। এইখানেই ঘটনাটা ঘটেছে। গোয়ালপাড়ার বাসীন্দারা এই ঝরনার জল খায়। আধ ক্রোশ পথ তাদের কাছে দূর নয়, মেয়েদের কাছেও নয়। মেয়েরা বিকেলবেলা দল বেঁধে কলসী নিয়ে এখানে এসে পানীয় জল ভ'রে নিয়ে যায়। গ্রীষ্মের সময় এই নির্জ্জন প্রান্তরে অনেক তরুণী শখ ক'রে গা ধোয়, কাপড় কাচে। ঝরনার জল বড় ঠাণ্ডা। নবগ্রামের ভূপতি এবং অমূল্য কিছুদিন থেকে বিকেলে এখানে বেড়াতে আসতে আরম্ভ করেছে।

তাদের লক্ষ্য রঙলালেরই এক বিধবা জ্ঞাতিকন্যা—সুন্দরী যুবতী মেয়ে; অভিভাবকহীনা, বাড়িতে এক মা ছাড়া কেউ নাই। মেয়েটির চালচলনও অবশ্য ভাল নয়। অভিভাবকহীনত্বের সুযোগে সে অত্যন্ত স্বাধীন হয়ে উঠেছে। স্বেচ্ছাচারিণী বললেও অত্যুক্তি হয় না। মা এবং মেয়েতে ধান ভেনে কুটে চাল তৈরি করতে আরম্ভ করেছে জীবিকা-হিসেবে। সেই অজুহাতে সে নবগ্রামে যায় ধান মেপে নিয়ে আসবার জন্য এবং চাল মেপে দেবার জন্য। দৃষ্টিও মেয়েটির খারাপ। কিন্তু তাই ব'লে, নবগ্রামের ওই মাতাল লম্পট দুজন এইভাবে তার অপমান করবে, যে অপমান তাদের স্বজাতি এবং গ্রামকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করবে, এ তারা সহ্য করবে না।

তার ভাইপো এবং বড়ছেলে এরা দুজনেই প্রথমে আন্দোলনটা তুলেছিল। নইলে নষ্টদুষ্ট মেয়েদের গতি এমনিই হয়ে আসছে চিরকাল; রঙলালের আমলে গোয়াল-পাড়াতেই কয়েকটাই এমন ঘটনা ঘ'টে গিয়েছে; রজপুত বুড়ো রামু রায় তৃতীয় পক্ষে

বিয়ে ক'রে নিয়ে এল, বছরখানেকের মধ্যেই সে মেয়ে বাজে উঠে. নবগ্রাম যেতে শুরু করলে জলন্ত আগুনের খোলা মাথার ক'রে ; তারপর একদিন হ'ল নিখোঁজ। শোনা যায়, সে মেয়ে শেষ পর্য্যন্ত চাবাগানে চালান গিয়েছে। ছুতোরদের বিধবা মেয়েটা এই মেয়েটার মতই স্বাধীন হয়ে, চিঁড়ের ব্যবসা করতে গ্রাম-গ্রামান্তর ফিরত, শেষ পর্য্যন্ত সে সন্তানসম্ভবা হ'ল। জমিদারের গোমস্তা তার মান রেখেছিল। মেয়েটা সন্তানের কলঙ্ক হতে মুক্ত হয়ে প্রায় প্রকাশ্যভাবেই গোমস্তার সেবাদাসী হয়ে কাল কাটিয়ে গিয়েছে। তাদের জ্ঞাতিদেরই একজন পৈতৃক ঋণদায়ে জমিজেরাত বিক্রি ক'রে সস্ত্রীক গিয়েছিল চাকরি করতে মনিহারপুর জমিদার-বাড়ি। সেখান থেকে স্বামী ফিরে এসেছিল, কিন্তু স্ত্রী ফেরে নাই। কয়েকটি সন্তানও তার হয়েছে, তারা দেখতে নাকি জমিদার-বাড়ির ছেলেদের মত। এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। তাই এ ক্ষেত্রেও ষোড়শীর ব্যাপারটাকে তারা তার ভাগ্যফল ব'লেই নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করেছিল। আপত্তি তুললে রঙলালের ভাইপো এবং ছেলে।

ষোড়শীকে ডেকেও শাসন করেছে তারা। কিন্তু মেয়েটা অত্যন্ত মুখরা। রঙলাল বলে, 'হারামজাদা মেয়ে'।

ষোড়শী ভুরু কুঁচকে বলেছে, আমি ধান ভেনে খাই, ধান আনতে, চাল দিতে আমাকে যেতেও হবে, আসতেও হবে। খেতে যখন কেউ দেবে না, তখন বারণ করলেও শুনব না। তাতে যা খুশি তোমাদের করতে পার।

রঙলালের ছেলে নবীন বলেছিল, কিন্তু ওই মাতাল দুটো যে ঝরনার ধারে এসে ব'সে তোমাকে লক্ষ্য ক'রে হাসিঠাট্টা করে, তাতে তোমার অপমান হয় না, আমাদের হয়।

হয় যদি, তবে তার প্রতিকার করতে পার। তাদের শাসন করতে পার না, আমাকে নিয়ে পড়লে ক্যানে? বলে সেই—দরবারে হেরে, মাগকে মারে ধ'রে। তা আমি তো কারুর সাত পাকের পরিবার নই যে, আমাকে মারতে আসছ! ক্ষ্যামতা থাকে তো ওই মাতালবাবুদিগে শাসন কর গিয়ে। আমি কি করব? ঠাট্টা ইঁঙ্গিত করে—বাপ নাই, ভাই নাই, স্বামী নাই, অনাথা আমি সহ্য করি মুখ বুজে। আমি আস্কারাও দিই না, তার কথাও নাই।

সে আর দাঁড়ায় নি, বেশ উঁচু মাথা ক'রেই চ'লে গিয়েছিল।

নবীন, নন্দ এরা এবার মজলিস ডাকলে। এ কালের ছেলেদের ধারা-ধরনই আলাদা। কথা বলে, তাও যেন রঙলালদের কাছে নতুন ব'লে মনে হয়। হাল-আমলের ছেলে, তার উপর দু-চার কলম লেখাপড়া শিখেছে।

তাতিয়ে তুললে বুড়োদের ঠাণ্ডা রক্ত, মাতিয়ে তুললে ছেলেগুলোকে। ওরা ঠিক

করেছিল, একদিন ওদের দুজনকে ধ'রে মারপিট দেবে। যা হয় হবে। ব্রাহ্মণই হোক আর বড়লোকই হোক, তাতে হয়েছে কি ?

রঙলাল প্রভৃতি প্রবীণ মাতব্বরেরা পরামর্শ ক'রে মণি দত্তকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্ণবাবুর কাছে যাওয়াই স্থির করেছিল। মধ্যে থেকে মণির উত্তেজনায় অমূল্যের বাড়িতে গিয়ে তার মাকে ব'লে এল কতকগুলো রূঢ় কথা। স্বর্ণবাবুর কাছারি থেকে ফিরে রঙলালের ইচ্ছা ছিল, গোপীচন্দ্রের কাছারিতে যায়। স্বর্ণবাবুর প্রতিপক্ষ অর্থসম্পদশালী গোপীচন্দ্র সাগ্রহেই সাহায্য করতেন। কিন্তু মণিই নিয়ে গেল রাধাকান্তবাবুর কাছে। রাধাকান্তের কথাগুলি রঙলালের বুকের মধ্যে এখনও যেন গুরগুর করছে, একটা গম্ভীর ধ্বনি তুলে অহরহ বাজছে। ধর্মকে মাথায় রেখে, নিজেদের ইজ্জৎ নিজেরাই রক্ষা কর। ধর্ম্মের কথা যদি রাধাকান্তবাবু না বলতেন, তবে কথাগুলি এমন গুরুগুরু ধ্বনি তুলতে পারত না।

নবীন নন্দগোপাল—এরা অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল গ্রামের বাইরে।

তাল তেঁতুল আম জাম শিরীষ বট অশত্থ গাছের নিবিড় বেষ্টনীর মধ্যে ছায়াচ্ছন্ন সদ্গোপের গ্রাম গোয়ালপাড়া অর্থাৎ গোপীপল্লী। সাধারণত তন্দ্রাচ্ছন্ন পুরী ব'লে মনে হয়। পাখীর ডাক, ঝিঁঝির শব্দই বেশি শোনা যায়। মধ্যে মধ্যে গরু ডেকে ওঠে।

তারই মধ্যে কখনও কখনও ধ্বনিত হয়ে ওঠে চাষীর ডাক ; কাউকে কেউ ডাকছে—মোটা গলায়, সবল শ্বাসযন্ত্রের ফুৎকারে, একটানা ডেকেই চলেছে, রাম-রে-এ-এ-এ—

কখনও কোন গাছপালায় ঘেরা পুকুরের ঘাটে মেয়েদের হাসি বেজে ওঠে।

কখনও ঝগড়া বাধে। অসুরের মত সবলদেহ চাষী আকাশ ফাটিয়ে পরস্পরকে গালিগালাজ করে।

নবীন নন্দগোপাল এবং একালের ছেলেরা কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের। এরা এমন ভাবে চীৎকার করে না। বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চোখা চোখা কথা বলে।

রঙলালকে দেখেই তারা প্রশ্ন করলে, কি হ'ল ?

রঙলালের মুখ লাল হয়ে উঠেছে রৌদ্রে, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় আচ্ছন্ন। সে বললে, হ'ল না কিছু। একটু স্তব্ধ থেকে সে রাধাকান্তের কথাগুলিরই পুনরুক্তি করলে, ধর্ম্মকে মাথায় রেখে, নিজেদের ইজ্জৎ নিজেদিগেই রাখতে হবে। পরে কি ইজ্জৎ রেখে দিতে পারে ?

নবীন বললে, সে তো গোড়া থেকেই বলছি আমরা।

রঙলাল বললে, ওরে বাবা, তোদের মত রক্ত তো আমাদের গরম নয়, হট ক'রে—

বাধা দিয়ে নবীন বললে, রক্ত গরমের কথা নয়। তোমাদের আমল গিয়েছে আলাদা, তোমরা অনেক সয়েছ, আমরা তা সইব না।

নন্দ প্রশ্ন করলে, গোপীবাবুর কাছে গিয়েছিলে ?

না।

যাও নাই ? যাওয়া কর্তব্য ছিল কাকা। প্রতিকার হ'ত। তিনিই এখন শ্রেষ্ঠ লোক এ চাকলায়।

গ্রামের ছায়াচ্ছন্ন আঁকাবাঁকা পথে, পিছন থেকে বেরিয়ে এল ষোড়শী। ফরসা কাপড় প'রে, পান খেয়ে, বেশ সাজসজ্জা ক'রেই সে চলেছে। পিছনে একখানা খালি গাড়ি। একজন বাউড়ীর ছেলে গাড়িটা চা'লয়ে নিয়ে আসছে। এদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এসে ষোড়শী বললে, রাস্তা একটু ছেড়ে দাও কাকা, গাড়িখানা আসতে দাও।

রঙলাল বললে, তুই নবগেরাম চললি ?

পথের উপর পানের পিচ ফেলে ষোড়শী বললে, হ্যাঁ, খেতে তো হবে। ধান আনতে চললাম। সঙ্গে সঙ্গে সে একটু হাসলে। তাকে রক্ষা করবার জন্য এ মিথ্যে ব্যাকুলতা তাদের কেন ?

ওরা তো জানে না। ষোড়শীর লক্ষ্য ওই মাতাল দুজন নয় গোপীচন্দ্রের বড় ছেলে তার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সেই দৃষ্টির উত্তর দিতে সে নবগ্রামে যায় আসে।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১

আঁধারে উধাও দেহ···সিঁড়ি যেন অতলে উধাও—
আঁধারের ঢেউ লেগে উপরের বাতাস অধীর,
জনতার ভিড় থেকে এ আঁধারে পথ কি হারাও,—
কিসের সম্ভাবনা উদ্দাম করেছে শরীর ?—
সে যদি আসত নেমে এই রাতে এমনি আঁধারে
দূর পাহাড়ের দেশে দিনশেষে ছায়ারা নামলে,
উধাও মাটির পথে শালবন ঘেঁষে এক ধারে
ভোজনে তৃপ্ত হয়ে খুশি-মনে পাখীরা থামলে।···
সে যদি আসত ভেসে রাত্রির আঁধার প্লাবনে—
বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে বাতাসের স্রোত সাঁতরিয়ে—
স্নিগ্ধ শরীর নিয়ে হিম-জলে শীতল গাহনে
আধ-বোজা চোখে নীল ফুলেদের বার্তাকে নিয়ে।

সে যদি আনত শুধু উপহার আঁধার দেশের
সবুজ শেহালা তাজা, পাখীদের রঙিন পালক,
আদর-গলানো চোখে জেগে থাকা রাত্রিশেষের,—
আঁধারে কোমল-হওয়া চাউনির নরম আলোক।
চুলগুলি হিমে ভেজা, ভিজে মাটি পায়ের তলায়,
সবুজ ধানের মালা যদি এসে পরাত গলায়।

২

মনে হয় সেই বুঝি—সেই বুঝি সিঁড়ির আড়ালে
এখুনি শুনতে পাব পদপাত হয়তো হৃদয়ে,
ঘোরানো আঁধার সিঁড়ি, একবার নিশানা হারালে
চমকে ঈষৎ থেমে ডাকবে সে নাম ধ'রে ধ'রে।
সে জনার মুখচ্ছবি ছিল স্পষ্ট মনের মর্ম্মরে
বেদনার কুয়াশার ম্লান আজ বিকল বিলয়ে,
চেনা গান লেখা যেন বিদেশের বিচিত্র অক্ষরে।
আরো যারা ছিল তারা একে একে এসেছে সকলে
সিঁড়ির সোপান ভেঙে গান গেয়ে নতুন নেশায়
শুধু সেই একজন এতক্ষণ আঁধারে বিরলে
ব'সে থেকে,—এই মাত্র সিঁড়ি বেয়ে আসছে উপরে
এখুনি আমায় যেন ডাকবে সে নাম ধ'রে ধ'রে।

জ্বালব না আলো আমি নীচেকার তরল ছায়ায়,
যেখানে জোনাকি জ্বলে দুয়েকটি ছোট ঝাউগাছে,
নামব না নিশীথের সুপ্তির নীল নিরালায়—
পৃথিবী মেনেছে হার যেখানের গগনের কাছে।
তারি পদপাত শুনে, হয়তো বা মনের ভিতরে
আঁধারে ঈষৎ থেমে ডাকবে যে নাম ধ'রে ধ'রে।

৩

নেমে যাও ধীরে ধীরে এ তিমিরে সর্পিল সিঁড়ির
উদ্যত তরঙ্গ-দলে পদতলে উদ্ধত বিশ্বাসে,
অন্ধকার পুটপাকে যারা থাকে শঙ্কিত নিশ্বাসে
তাদের বর্জ্জন কর দৃঢ়তর সাহসে হে বীর।
মর্ম্মতলে হে পথিক সাবধানে কর পদপাত,
সোপান কুটিল আরো বিসর্জ্জিল বাসনা শ্রেণীর,

আনন্দ-সন্দেহ-শঙ্কা-বিরচিত যুক্ত ত্রিবেণীর
তটমূলে নিরন্তর অন্ধকারে তরঙ্গ-আঘাত।
নেমে যাও ধীরে ধীরে এ তিমিরে, সোপান পিচ্ছল,
লালাস্রাবী কীটেদের লোলুপতা অসহ্য নিবিড়,
পূর্ব্বভূত ঘটনায় তিক্ততার গেড়েছে শিবির;
দুর্ব্বল করেছে মন কলঙ্কিত নিশা-অশ্রুজল।
হে পথিক জেনো মনে এ আঁধার এই শেষ নয়
আলোকের সরলতা আছে পরে প্রশস্ত পথের,
মিলন-মুক্তির তীর্থে জয়যাত্রা যে মনোরথের
চক্রের আবর্তে তার সু নিষ্ঠ সাহস-সঞ্চয়।
নেমে যাও ধীরে ধীরে এ তিমিরে সর্পিল সোপানে,
অন্ধকারে অনির্ভয়ে এ হৃদয়ে নামো সাবধানে।

৪

রাত্রি গভীর হ'ল তরল আকাশে
কেন চ'লে যেতে চাও এই অসময়ে?
সহজ সুখের আশা যখন হৃদয়ে
উঠেছে আকুল হয়ে রাতের বাতাসে?
তোমার চোখের আলো লাগে অভিনব
আঙুলের শিরাগুলি কাঁপাও আশ্বাসে,
নরম চুলের গোছা বিকল নিশ্বাসে···
অধরের উষ্ণতায় হৃদয়-বিভব।
চাঁদের কুয়াশা নামে সিঁড়ির আঁধারে,
জলে-ভেজা মাটি আরো করুণ কোমল
এখানে ক্ষণেক রাখো চরণযুগল,
ক্ষণেক বহ্নির শিখা আনো দেহাধারে।
তারপর ফিরে যাব শয়ন-আগারে
আলো-নেবা ঘরে আরো ঘনাবে আঁধার,
ক্ষণেক হিসাব ভুলে হাসা ও কাঁদার
ভাসাব হৃদয়-তরী স্বপ্ন-পারাবারে।
জলবে অকূলে ধ্রুবতারায় স্পন্দন
অসমাপ্ত বিদায়ের একক চুম্বন।

শ্রীঊষা দেবী

বর্ব্বর জার্মান

ন্যুরনবের্গের মকদ্দমা এগিয়ে চলেছে, চতুর্দ্দিকে আটঘাট বেঁধে তরিবত ক'রে তামাম দুনিয়ায় ঢাকঢোল বাজিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওঃ, কী বাঁচনটাই না বেঁচে গেছ! এয়সা দুশমনের জাত যদি লড়াই জিতত, তা হ'লে তোমাদের দমটি পর্য্যন্ত ফেলতে দিত না। ভাগ্যিস আমরা ছিলাম, বাঁচিয়ে দিলাম।

বিলেতী কাগজগুলো যে দাপাদাপি করে, তাতে আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কিছু নেই। তারা মার খেয়েছে, এখন শুধু মার দিয়েই খুশি হবে না, হরেক রকমে দুশমনকে অপমান করবে, তাতে ডবল সুখ; সে সব কথা সবাইকে ইনিয়ে বিনিয়ে শোনাবে, তাতে তেহারা সুখ; তারপর দেশটার কলকব্জা অর্থাৎ তার জিগর-কলিজা, নাড়িভুঁড়ি বিনা ক্লোরফর্মে টেনে টেনে বের ক'রে তাকে আচ্ছা ক'রে বুঝিয়ে দেবে, বেলজেন কাকে বলে।

কিন্তু এ দেশের ইংরেজী কাগজগুলো যখন ফেউ লাগে, তখন আর বরদাস্ত হয় না। ছিলি তো বাবা বেশ, না হয় স্কচ না খেয়ে সোলান খেয়েছিস, না হয় এসপেরেগাস আরটিশো খেতে পাস নি, না হয় তুলতুলে ফ্যানল আর নানা রকমের হ্যাট ও ক্যাপ পাস নি ব'লে সর্দ্দি ও গর্মির ভয়ে একটুখানি পা সামলে চলেছিলি, তাই ব'লে যা বুঝিস নে, মালুম নেই, তা নিয়ে এত চেল্লামেল্লি করিস কেন? টু পাইস তো করেছিস, সে কথাটা ভুলে যাস কেন, তাই নিয়ে দেশে যা, দুদিন ফুর্ত্তি কর, যে জায়গা নাগাল পাস নে, সেখানে চুলকোতে যাস নি।

কিন্তু শোনে কে! সেই জিগির—জার্মান বর্ব্বর, বর্শ, হান।

পরশুদিন জার্মান বর্ব্বরতার প্রমাণ পেলুম, পুরনো বইয়ের দোকানে—একখানা কেতাব, আজকালকার ফলের চেয়েও সস্তার দরে কিনলাম। তার নামধাম—

BENGALISCHE ERZAEHLER / DER SIEG DER SEELE / AUS DEM INDISCHEN / INS DEUTSCH UEBERTRAGEN / VON / REINHARDT WAGNER /

অর্থাৎ

বাঙালী কথক / (Erzaehlen ধাতুর অর্থ—কাহিনী বলা) আত্মার জয়, / ভারতীয় ভাষা হইতে জার্মানে রাইনহার্ট ভাগনার কর্ত্তৃক অনূদিত।

চমৎকার লাল মলাটের উপর সোনালী লাইনে একটি অজন্তা ঢঙের সুন্দরী বাঁশী বাজাচ্ছে। ছবিখানি এঁকেছেন, কেউ কেটা নয়, স্বয়ং অধ্যাপক এডমুন্ড্ ক্লেফার।

কেতাবখানা যত্রতত্র বিক্রয় জন্য পাওয়া যাবে না—এস্তেহার রয়েছে। শুধু বিশেষ 'ব্যুশারফ্রয়েণ্ডে' সংঘের সভ্যরা কিনতে পারেন। বর্ব্বর জার্মান বটতলা ছাপিয়ে, পেঙ্গুইন বেচে পয়সা করতে চায় নি, তার বিশ্বাস—দেশে যথেষ্ট সাহিত্যের রসিক পাঠক আছে, তারা সংঘের সদস্য হয়ে বাছা বাছা বই কিনবে। আর যদি তেমনটা নাই হয়, হ'ল না, চুকে গেল—বাংলা কথা।

'বাংলা কথা' ইচ্ছে করেই বললাম, কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ভাগনার সাহেব খাসা বাংলা জানেন।

প্রথম আলাপে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহাশয় কোন্ ভাষার অধ্যাপক?

বাংলার।

বাংলার? বার্লিন য়ুনিভার্সিটিতে?

আজ্ঞে।

ছাত্র কটি?

গেল পাঁচ বছরের হিসেব নিলে গড় পড়তা ই।

গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠল। আমি যে য়ুনিভার্সিটিতে পড়েছি, সেখানে কি ক্লাসে নিদেন পক্ষে দেড়শটা বাঁদর ঝামেলা লাগাত। আদর্শ ছিল—৩০০ আপন ওয়ান প্রফেসরের। বললাম, ই একটু কম নয়?

ভাগনার বিরক্ত হয়ে বললেন, রবিবাবুর লেখা পড়েন নি—The rose which is single need not envy the thorns which are many?

উঠে গিয়ে ধনধান্যে পুষ্পেভরা রেকর্ডখানা লাগালেন।

ভাব হয়ে গেল।

কিন্তু মনে মনে বললাম, কুল্লে ই-এর জন্যে একটা আস্ত প্রফেসর। জার্মানরা বর্ব্বর।

অবতরণিকাটি ভাগনার সাহেব নিজেই লিখেছেন; আগাগোড়া তর্জ্জমা ক'রে দিলুম।

"সঙ্কলনটির আরম্ভ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গদ্য রচনাগুলোকে বাংলায় tschota galpa (ছোটগল্প) বলা হয়। ছোট গল্পগুলোকে একরকমের ছোটখাট উপন্যাস বলা যেতে পারে; শুধু নায়কনায়িকার সংখ্যা কম। গল্পগুলোর কাঠামো পশ্চিম থেকে নেওয়া হয়েছে, ভেতরকার প্রাণবস্তু কিন্তু খাঁটি ভারতীয়। মাঝে মাঝে দেখা যায়, সমস্ত গল্পটার আবহাওয়া একটি মাত্র মূল সুরের চতুর্দ্দিকে গড়া। কতকগুলো আবার গীতরসে ভেজানো। আবার এও দেখা যায়, ভারতবাসীরা ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের সঙ্গে এমনই বাঁধা, যে গল্পের বিকাশ ও সমস্যাসমাধান এমন সব কারণের উপর নির্ভর করে, যেগুলো পশ্চিমের নভেলে থাকে না। আশা-নিরাশায় দোলা-খাওয়া কাতর হৃদয় এই সব গল্পে কখনও বা ধর্ম্মের কঠিন কঠোর আচারের সঙ্গে আঘাত খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে; কখনও বা তার ছোট গণ্ডির ভেতর শান্তি খুঁজে পায়; সেই ধুকধুক-হৃদয়ের কঠোর দুঃখ, চরম শান্তির বর্ণনা করা হয়েছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। আন্দ্রেয়াস হয়েসলারের সঙ্গে আমরা সুর মিলিয়ে বলতে পারি, 'মানুষের আত্মার ভাঁজে ভাঁজে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি।'

ভারতীয়দের প্রেম বড় উদার, তাতে গণিকারও স্থান আছে। গণিকাদের কেউ

কেউ আবার জন্মেছে বেশ্যার ঘরে, বদ খেয়ালে বেশ্যা হয় নি। গ্যোটের গণিকাকে ভগবান অবহেলা করেন নি, এঁদেরও হয়তো অবহেলা করবেন না।

সঙ্কলনটি সুখদুঃখের গল্পেই ভর্তি করা হয়েছে; হাস্যরসের গল্প নিতান্ত কম দেওয়া হয়েছে। তার কারণও আছে; দুঃখ যন্ত্রণা সব দেশের সব মানুষেরই একরকম, কিন্তু হাস্যরস প্রত্যেক জাতিরই কিছু না কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। করুণরসে মানুষ মানুষকে কাছে টানে, হাস্যরসে আলাদা ক'রে। তবু তিনটি হাস্যরসের গল্প দেওয়া হ'ল; হয়তো পশ্চিমদেশবাসীরা সেগুলোতে আনন্দ পাবেন।

বিশ্বসাহিত্যের সেবা যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সবচেয়ে বড় লেখকের সবচেয়ে ভাল রচনা বাদ দেওয়া অন্যায়। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া চলে না। তাঁর 'লিপিকা' থেকে তাই কয়েকটি সবচেয়ে ভাল লিখন দেওয়া হ'ল; এগুলোকে কিন্তু ছোটগল্প বলা ভুল হবে।[১] লেখাগুলো সহজেই দু ভাগে আলাদা করা যায়, কতকগুলো মহাকাব্যের কাঠামোয় গড়া ব'লে গভীর সত্যের রূপ প্রকাশ ক'রে তোলে, আর কতকগুলো ছবির মত কিসের যেন প্রতীক, কেমন যেন আবছা অর্দ্ধ অবগুণ্ঠিত অনাদি অনন্তের আস্বাদ দেয়, অথবা যেন নিগূঢ় আত্মার অন্তর্নিহিত কোমল নিশ্বাস আমাদের সর্ব্বাঙ্গে স্পর্শ দিয়ে যায়।

সর্ব্বশেষে যাঁরা তাঁদের লেখার অনুবাদ করবার অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ ক'রে যাঁরা এই সঙ্কলনের গোড়াপত্তন ও সম্পূর্ণ করাতে সাহায্য করেছেন। সুরসিক, বহুভাষায় সুপণ্ডিত ল. ভ. রামস্বামী আইয়ার,[২] এম. এ., বি. এল বেশির ভাগ মূল লেখাগুলি পাঠিয়েছেন ও সঙ্কলন আরম্ভ করার জন্য উৎসাহিত করে শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করেছেন। সদুপদেশ দিয়েছেন ও অনুবাদে যাতে ভুলত্রুটি না থাকে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ নিম্নলিখিত মহাশয়দের কাছে, হের দ. প. রায় চৌধুরী, ডি. ফিল (গ্যোটিঙেন), ইঞ্জিনিয়র বিদ্যার্থী অ. ভাদুড়ী; য. চ. হুই, এম. এস. সি; য. ভ. বসু, ডি, ফিল (বার্লিন) এবং ইঞ্জিনিয়রীঙ ডিপ্লোমাধারী স. চ. ভট্টাচার্য্য।[৩] পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য গৃহিণীকে ধন্যবাদ।"

অবতরণিকাটি নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা করা যায়; কিন্তু আমার উদ্দেশ্য পাঠক যেন নিজেই ভাগনার সাহেবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। আমার শুধু একটি বক্তব্য, যে অবতরণিকার ভাষাটি সরল, যাঁরা মূল জার্মানে কাণ্ট হেগেল এমন কি টমাস মান্‌ও

---

১ রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' থাকতে ভাগনার কেন যে সেগুলো কাজে লাগালেন না, তা বোঝা গেল না।

২ ইনি শব্দতাত্ত্বিকদের ভিতর সুপরিচিত।

৩ D. P. Roy Chowdheury; A. Bhaduri; J. C. Huii, J. Bh. Bose, S. C. Bhattacharyya.

পড়েছেন তাঁরাই জানেন জার্মানে কি রকম আড়াইগজী সব বাক্য হয়। ভাগনারের জার্মান অনেকটা বাংলা ছন্দের—কিছুটা প্রমথ চৌধুরীর মত। বাক্যগুলো ছোট ছোটো; সাদা, খাস জার্মান কথার ব্যবহার বেশি, কিন্তু দরকারমত শক্ত লাতিন কথা লাগাতে সায়েব পিছুপা হন নি। জার্মান গুরুচাণ্ডালী সম্বন্ধে বাংলার মত ভয়ঙ্কর সচেতন নয়, ভাগনার আবার সাধারণ জার্মানের চেয়েও অচেতন।

পাঠকের সবচেয়ে জানার কৌতূহল হবে যে, কার কার লেখা ভাগনার সায়েব নিয়েছেন। তার ফিরিস্তি দিচ্ছি :—

১। আমার দেশ (কবিতা) শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়[১] (Sohridvidsohendralal Raj)

২। সন্ন্যাস : শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (বিবদল)

৩। অঙ্কিত ; গোলাপ ; চোর ; কুসুম ; শিউলি : শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় (সিঁদুর-চুপড়ি, মধুপর্ক)

৪। দেবতার ক্রোধ ; রত্নপ্রদীপ : শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (আল্পনা ও জলছবি)

৫। পদ্মফুল ; জন্মমৃত্যুশৃঙ্খল (আংশিক অনূদিত) : শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু (মায়াপুরী)

৬। একাকী ; প্রেমের প্রথম কলি : শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (হাসি ও অশ্রু)

৭। বউচোর ; রসময়ির রসিকতা : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ষোড়শী, গল্পাঞ্জলি)

৮। গলি ; পরীর পরিচয় ; নূতন পুতুল ; ছবি ; সুয়োরাণীর সাধ ; সমাপ্তি ; সমাধান ; লক্ষ্যের দিকে ; সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় ; পায়ে চলার পথ ; কণ্ঠস্বর ; প্রথম শোক ; একটি দিবস : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Sohrirabindranath Thakur (লিপিকা)

৯। আঁধারের আলো : শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মেজদিদি)

১০। 'পাষাণ হৃদয়' : শ্রীমতী সুনীতি দেবী (বঙ্গবাণী)

এখনই ব'লে দেওয়া ভাল যে, পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৬ সালে। তার মানে এই নয় যে, এই কজনই তখন নামজাদা লেখক ছিলেন। বরঞ্চ মনে হয়, ভাগনার ১৯১৮-২০-এর সময় বাংলা লিখতে শিখতে আরম্ভ করেন ও সেযুগে এঁদের যে খুব প্রতিপত্তি ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় যে কেন বাদ পড়লেন ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্যি মনে রাখতে হবে যে, নির্ব্বাচনটা ঠিক

১ জীবিত মৃত সকলের নামের পূর্ব্বেই ভাগনার 'শ্রী' ব্যবহার করেছেন। বাংলা 'শ' বুঝাইতে হইলে জার্মানে sch (ইংরেজীতে Schedule এর sch), 'জ' বুঝাইতে হইলে 'dsch', 'চ' বুঝাইতে 'tsch', 'য়' বুঝাইতে হইলে 'j' ব্যবহার করা হয়েছে।

ভাগনারের হাতে ছিল না। এদেশ থেকে যেসব বই পাঠানো হয়েছিল, তার থেকে ভাল হোক, মন্দ হোক তাঁকে বাছতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাম ভাগনার চলতি জার্মান কায়দায় 'টেগোর' লেখেন নি।

নানা টীকাটিপ্পনী করা যেত, কিন্তু সেটা পাঠকের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। জার্মান-মন এই গল্পগুলোতেই কেন সাড়া দিল, তার কারণ অনুসন্ধান তাঁরাই করুন।

সাধারণ জার্মানের পক্ষে দুর্বোধ কতকগুলো শব্দ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে ; যেমন—অগ্নি (দেবতা), অলকা, অন্নপূর্ণা, আরতি, আষাঢ়, B· A., বেলপাতা, ভৈরবী রাগিণী, ভর্তৃহরি, ফুলশয্যা, চোরাবাগান, দোয়েল, জয়দেব, যোগাসন, হাতের নোয়া, একতারা, হোলি, হুলুধ্বনি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মেদিনীপুর, শালিগ্রাম, সমুদ্রমন্থন, পয়সা, পানিকৌড়ি, রজনীগন্ধা, রাসলীলা, সাহানা, শুভদৃষ্টি, রথযাত্রা, ব্রাহ্মসমাজ, ইংরেজী ওড়িয়া, বামুন।

সবগুলোর মানে সব কটাই অতি সংক্ষেপে ঠিক ঠিক দেওয়া হয়েছে। মাত্র একটি ভুল—মেঘদূতকে Epos বা মহাকাব্য বলা হয়েছে। উড়ে বামুনরা যে গঙ্গাস্নানের সময় ডলাই-মলাই ও ফোঁটা তিলক কেটে দেন সে কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে বিষ খেতে দেন, সেটা বলতে ভাগনার ভুলে গিয়েছেন। B. A. উপাধি ভাগনার জার্মানদের বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং M. A. যে লাতিন Magister Artium সেটা বলতে ভোলেন নি। আশা করতে পারি আমাদের প্রতি জার্মানদের ভক্তি বেড়েছে।

আম-কাঁঠাল, শিউলি বকুল বহু গল্পে বার বার এসেছে, কিন্তু ফুল আর ফলের ছয়লাপে ভাগনার ঘাবড়ে গিয়ে সেগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। তবে তিনি 'রজনীগন্ধা'র প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতদুষ্ট।

অনুবাদ কি রকম হয়েছে? অতি উৎকৃষ্ট, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পদে পদে ছত্রে ছত্রে এই কথাটি বারে বারে বোঝা যায় যে, দূর বার্লিনে ব'সে কী গভীর ভালবাসা দিয়ে ভাগনার অনুবাদগুলো করেছেন এবং সেই ভালবাসাই তাঁকে বাংলার ছোটগল্পের অন্তঃস্তলে নিয়ে গিয়েছে।

ভৈরবী কোন্ সময় গাওয়া হয়, ফুলশয্যাতে কে শোয়, মেদিনীপুর কোন্ দিকে, হাতের নোয়া আর হুলুধ্বনি কাদের একচেটে, কৃত্তিবাস কাশীরামদাস কে এই সব বিস্তর বায়নাক্কা বরদাস্ত করে' জার্মান ১৯২৮ সালে এই বই পড়েছে আর সুদূর বাংলার হৃদয়রস আস্বাদন করবার চেষ্টা করেছে।

বর্ব্বর নয় তো কি!

"টেকচাঁদ"

আষাঢ়ে

দুপুরবেলা—

কাক-চিলের ডাক শোনা যায় কচিৎ।

পাশের বাড়ির দুরন্ত ছেলেদের পায়ের দুপদাপ শব্দ

কানে আসে,

আবার থেমে যায়।

অদৃশ্য অক্টোপাসের মত শুঁড় দিয়ে ঘিরে ধরেছে যেন

আজকের এই অসহ্য গরম।

এত গরমে,—

এমন অনেক কিছু মনে হতে পারে,

যাতে মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ দোলে,

আপত্তি করা চলে না।

চোখ বুজে ছবি এঁকে চলেছে বেকার সুদর্শন,

প্রচ্ছন্ন মানসপটে।

তক্তাপোশ অসহ্যের সীমায় এসে পৌঁছনোয়

তাকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছে ছাতে।

মেঝের ওপর একখানা মাদুর বিছিয়ে,

দুই হাত আড় ক'রে চোখে ঢেকে শুয়ে আছে

সদ্য দ্বিতীয়শ্রেণীর এম. এ,

সুদর্শন বসু।

সুদর্শন নামটা—

একেবারে চক্ষুহীনের পদ্মলোচন ডাকের শখ নয়;

বেশ সুষ্ঠু শ্রীমান চেহারা,

দেখলে কিছুতেই বেকার মনে হবে না,—

বিধাতাপুরুষ রসিক সুজন।

সুদর্শন চোখ বুজে ভেবে চলেছে—

সৃষ্টি ক'রে চলেছে বলাই চলে,

সে সৃজন ক'রে চলেছে তার কল্পনার স্বর্গলোক।

এই পৃথিবীতে—
আমাদের এই মরস্বর্গের ধূলিতে
কত রত্ন ছড়িয়ে থাকে
কে তার সন্ধান রাখে ?
তবু তারা আছে।
সমুদ্রের অতলে রত্নরাশির খবর
কজনা রাখে ?
তবু সেই অগাধ নীল জলের মধ্যে,
নানারকম জলজ গাছের মাঝখানে,
ঝিনুকের সযত্ন কোটরে
কত মুক্তা ফ'লে থাকে।

সুদর্শন ঘুমিয়ে না জেগে
এ সম্বন্ধে সন্দেহ হ'তে পারে
তার স্থির নিষ্কম্প্র দেহের প্রতি চেয়ে,
আর তার নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে ;
তবু সুদর্শন জেগেই আছে।
সেই দুই হাত আড় ক'রে চোখ ঢেকে
এই আষাঢ় মাসের ঝলসানো দুপুরে
অনায়াসে ভেবে চলল
সমুদ্রতলের অনাবিষ্কৃত মুক্তারাশির কথা।

আরও অনেক কথা
যা ভাবতে তার ভাল লাগে
এবং পুলক ব'লে যে অনুভূতি রয়েছে
তার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটে।

হ্যাঁ, সুদর্শন একটা মানুষের মত মানুষ—
(যদিও সে কথা কেউ জানে না,
জানে না তার মেসের ম্যানেজার

পাশের মুদী-দোকানের সেই খাঁদা লোকটা,
জানে না চাকর চিন্তাহরণ,
এমনি আরও অনেকে।)
কিন্তু একদিন সে ফুটে উঠবে
প্রস্ফুটিত কমলের মতই
তার অগাধ ঐশ্বর্য্য, অপরিসীম জ্ঞান
আর অদ্ভুত বুদ্ধির প্রাখর্য্য নিয়ে।

সেদিন—
মানে তখনকার সেই গরমকালে,
তার মাথার উপর
অষ্টপ্রহর ঘুরবে বৈদ্যুতিক পাখা,
দরজায় থাকবে ভেজানো মোটা খস
আর পুরুগদি-আঁটা চেয়ারে,
সে ইচ্ছেমত ঘুরপাক খেয়ে
একটু-আধটু কথা ব'লে
অনেককে অনুগৃহীত করবে—
(কালকের ইন্‌টারভিয়ুতে দেখা সেই
দাম্ভিক সাহেবটাকেও)
আরও অনেককে
(যাদের পরে তার ব্যক্তিগত রোষ আছে)।

আবহাওয়া-অফিসের কর্ম্মচারীরা
ক্রমবৃদ্ধিপ্রাপ্ত তাপের দিকে চেয়ে
বিস্মিত হয়ে উঠছেন।
এ বছরে আজকেই সবচাইতে বেশি তাপ বেড়েছে।
সুদর্শনকে দোষ দেওয়া যায় না।

আরতি রায়

ভ্রম-সংশোধন :—'শরৎ-সাহিত্য-পরিচয়' প্রবন্ধে দু-একটি ছাপার ভুল আছে। ২৩৮ পৃষ্ঠায় "তথায়" শব্দটি (পংক্তি ১৩) বাদ যাইবে এবং "পূর্ব্ব-বৎসর" (পংক্তি ১৭) স্থলে "পূর্ব্ব-বারে" হইবে।

কলকাতায় কদিন

কেমন কাটছে, জিজ্ঞেস করছেন তো? কেন আর ওসব ব'লে লজ্জা দিচ্ছেন দাদা? বরং জিজ্ঞেস করুন, তোমার খাটিয়া আসতে আর কত দেরি?

মশাই, মারপিট গুলিগালাজ খবরের কাগজে দু-একটা না থাকলে আমার আগে মনে হ'ত, দূর, আজকাল কাগজের লোকেরা কেবল ফাঁকি দিয়ে কাজ সারছে; কিন্তু কদিন কলকাতায় যে কাণ্ড গেল, তা কি বলুন তো? কাগজ নির্ঝঞ্ঝাটে পড়তাম, সে বেশ ছিল; কিন্তু এ কি রে বাবা, এ যে ঘাড়ের ওপর তুমুল কাণ্ড! কখন কে যে কোথা থেকে কি করবে, তা আগে থেকে বোঝে কার বাবার সাধ্যি? বাপ রে বাপ, কি ঝঞ্ঝাট!

মশাই, হাঙ্গামার প্রথম দিন ভাবলাম, ট্রামে বাসে উঠে যেনতেনপ্রকারেণ আপিসটা সারতে হবে তো? প্রাণ যাক, কিন্তু ওটা গেলে খাব কি? কিন্তু ও হরি! একটি গাড়ির টিকি দেখা গেল না মশাই! একখানা রিক্শা পর্য্যন্ত নেই!

সাত মাইল হাঁটা আবার সাত মাইল চতুর্দ্দিকের হাঙ্গামা এড়িয়ে বাড়ির ছেলে বাড়িতে পরিবারের কাছে সন্ধ্যেবেলা হাজরে দেওয়ার মানে বোঝেন? বাপ রে বাপ! তার ওপর রাস্তায় কেবলই মনে হবে, এই বুঝি কানটা ফুটো হয়ে গেল, এই বুঝি গলির মোড়ে ফস ক'রে কে একটা সাড়ে ছ ইঞ্চি ঝাড়লে! যা হোক, যেতে তো হবেই। দুর্গা ব'লে বেরুলাম, কিন্তু ওইখানেই হ'ল প্রথম ভুল। ও নামের বদলে হরিনাম নিলেই ভাল করতাম। পাঁজির কথাটা গিয়েছিলাম ভুলে, কারণ এবার যে দেবীর ঘোটকে আগমন আর ঘোটকে গমন, ফলং ছত্রভঙ্গ, হ'লও তাই।

মশাই, বড় রাস্তা বাঁচিয়ে গলি দিয়ে যাচ্ছি, কোত্থেকে দুটো ছ-সাত বছরের ফচকে ছোঁড়া বেরিয়ে এসে মুরুব্বির মত বলে, কোথায় যাচ্ছেন?

পিত্তি জ্ব'লে গেল। গ্রহের ফের, তাই মুখ ভেঙিয়ে ব'লে উঠলাম, কেন? আপিসে। তোমাদের সে খোঁজে দরকার কি? তার উত্তরে তারা বলে কি জানেন? আজ আর আপিস যায় না, বাড়ি যান।

শুনুন একবার কথা! এখনও আধো-আধো কথা কয়, ভাল ক'রে কথা ফোটে নি, সে আমাকে আপিস যেতে বারণ করছে!

মহা রাগ হ'ল, এরা বলে কি?

তারপর ভাবলাম, দূর, কাদের ওপর রাগ করছি, এইসব প্যাঁটকা ছেলে, ওদের আবার কথা! হুঁঃ! এই ভেবেই এগুলাম দু-চার পা। ও মশাই, কি বলব, একটু যেতেই কখন ফুচ ক'রে পেছন দিক থেকে এসে আমার কাছাটা টেনে খুলে দিয়েই পিট্টান দিলে! সামনেই ছিল এক গোবরের গাদা, কাছা বাঁচাতে গিয়ে পড়লাম তার ওপর আছাড় খেয়ে, শেষ পর্য্যন্ত সেই কাছাও বাঁচল না, উপরন্তু গোবরগাদায় প'ড়ে কুমড়ো-গড়ান

দাঁড়িয়ে হাত-পা হ'য়ে একাকার। আর রাস্তার লোকের সে কি হাসি, যাকে বলে, এক বিতিকিচ্ছিরি দৃশ্য! বুঝুন ঝঞ্ঝাট।

এই বেশে আপিসে যাব? তা হ'লে তো তখনই নোটিশ পড়বে যে, আমি কোথায় দাঙ্গাহাঙ্গামা ক'রে এলুম! অগত্যা বাড়ি ফিরতে হ'ল, কিন্তু ফিরেও সেই ঝঞ্ঝাট। আমাকে ওই অবস্থায় ঢুকতে দেখেই পাজিটা তাড়াতাড়ি গিয়ে রান্নাঘরে গিন্নীকে সুর টেনে টেনে খবর দিলে, মা, বাবা মারামারি ক'রে বাড়ি ফিরে এল।

হন্তদন্ত হয়ে গিন্নী ছুটে এসে আমায় দেখেই চোখমুখ কপালে তুলে ব'লে উঠলেন, ওমা! এ কি কাণ্ড! কোথায় মারামারি ক'রে এলে? পঞ্চাশ বার বললাম, ওগো, আজ হাঙ্গামা হচ্ছে, বেরিও না, তা কি আমার কথা কানে যায়? নিজের মতেই সব। আপিসে একদিন উনি না গেলে আপিস যেন উঠে যাবে! তা কেন? নিজের ষোল আনা শখ, একটা হুজুগ না হ'লে যে উনি থাকতে পারেন না!

এর উত্তরে কি বলব বলুন তো? যাকে নিয়ে ঘটনা, সে হাজির থাকা সত্ত্বেও, বিনা জিজ্ঞাসাবাদে একতরফা ডিক্রী হয়ে গেল। এর ওপর পাজিটা ট্যারা চোখে হঠাৎ আমার কাছার দিকে চেয়ে নাক টিপে 'ইস' ব'লে ঘর থেকে ছুটে পালাল। গিন্নী সেই দিকে দেখে যেন আঁতকে উঠলেন, আমায় তৎক্ষণাৎ কাপড় ছাড়িয়ে ফের নাইয়ে নিজে নেয়ে শুদ্ধ হলেন। কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, ওটার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, ওটা পবিত্র জিনিস, বিশুদ্ধ গরুর। তিনি বললেন, ও একই কথা। মোদ্দা বোঝা গেল যে, গরু ও আমি অভিন্ন।

এর ওপর যা বললেন, তা আর আপনাদের শুনিয়ে গৃহের শান্তিভঙ্গ ও নিজের প্রেষ্টিজ না খোয়ানোই ভাল। কেবল বলেন, বুড়ো মদ্দ, ছোট ছেলেদের সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলে, লজ্জা করে না? বুঝুন, আমি লাগতে গেলুম!

কর্মের ভোগ, কি করব বলুন? একটা পোষ্টকার্ডও পাই না, অবশেষে কোনমতে তাই একটা যোগাড় ক'রে জ্বর হয়েছে ব'লে আপিসে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম; প'ড়ে গিয়ে শরীরটাও কাহিল হয়ে গিয়েছিল খুব। ভাবলাম, যাক, দু দিন কম্প্লিট রেষ্ট নিলেই শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে, তদ্দিনে গোলমালও মিটে যাবে, বাস্তবিক মিটলও। কিন্তু আমার ঝঞ্ঝাট কি এত সহজে মিটবে ভাবেন?

মশাই, প্রাতঃকালে উঠেই শুনি, কল একেবারে খলখল ক'রে হাসছে, একবিন্দু জল নেই। বুঝুন, কি ব্যাপার! একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করি সত্যি কথা, কিন্তু কর্মক্ষম লোকের চেয়ে অকর্মা অবলার সংখ্যা সেখানে বেশি, তা ছাড়া সবারই আপিস।

জলের কল ধর্মঘট করেছে, অতএব তুমি ঘটি বাটি ঘড়া নিয়ে রাস্তার টিউবওয়েলে ছোট আর সেখানে গিয়ে লাইন দাও। ঝি-চাকর কই?

জল আনতে হবে একপোয়া পথ হেঁটে, তাও কি এক বালতি দু বালতি? উঃ, বাপ রে বাপ! সে আনছিই! আর তেমনই খাসা টিউবওয়েলটি, তিনবার হেঁচকি দিলে তবে তার মুখ থেকে কিছু বেরোয়, রীতিমত কুস্তি করতে হয় তার সঙ্গে। তাও বিকেলে গিয়ে দেখি, তার ডাঁটি নেই, সবাই তার মাথায় চাটি মেরে মেরে দফা শেষ ক'রে দিয়ে গেছে! একে ধরুন বেচারীর অনভ্যেস, তার ওপর হঠাৎ তার ডাঁটি ধ'রে সবার অত টানাটানি, যন্ত্র হ'লেও সইতে পারবে কেন?

একটা ভারীকে ধরলুম, বললুম, বাবা, এক কলসী জল দিবি? সে বললে, হাঁ দিব, চার আনা। তার মানে শুধু মুখ-ধোবার জন্যে সকালে এক টাকা বাড়িতে জল লাগবে। এর ওপর প্রাতঃকালের অন্যান্য কার্য্যাদি বাবদ জলের খরচটা হিসেব ক'রে নিন। বলুন তো, কি ঝঞ্ঝাট?

আমি ছাপোষা গেরস্থ মানুষ, আমার কাছে জলেরও এই দাম হ'লে আমি বাঁচি কি ক'রে? এ রকম আদাজল খেয়ে আপনারা সব্বাই আমার পেছনে লাগলে আমার কি করা কর্ত্তব্য, তাই দয়া ক'রে বাতলে দিন প্রভু!

শ্রীবিরূপাক্ষ

প্লট

মনটা আজ কদিন থেকে নূতন প্লটের পেছনে অনর্থক ঘোরাফেরা করছে। লিখতে হবে; কিন্তু লেখবার কিছু নেই, কল্পনার এলাকায় যা আসে, তাই লেখা হয়ে গেছে। একটি ছোট প্রেমের নকশা শিপ্রা কিছুদিন আগে পাঠিয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'তে, মনোনীত না হওয়ায় সেটা ফিরে এসেছে এই অভিমত নিয়ে যে, এ ধরনের গল্প পাঠকদের কাছে উচ্ছিষ্ট অন্নের মতই পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রেম আর বিরহ ছাড়া যে এই ঘুণ-ধরা বাংলায় লেখবার কিছু নেই, তা কি ক'রে বোঝাবে সম্পাদক মহাশয়কে। প্রবন্ধ নয় যে, ঝরঝর ক'রে 'স্বাধীনতার পথে নারী' 'নারী ও সাম্যবাদ' 'নারী-জীবনের আদর্শ' যা হয় দুপাতা লিখে পাঠিয়ে দেবে। গল্প-লেখার খোরাক যেটুকুও ছিল, তা সেই কালিদাসের যুগ থেকে রবীন্দ্র-যুগ পর্য্যন্ত ভাঙিয়ে খেয়ে সাহিত্যজীবীরা নিঃশেষ ক'রে ফেলেছেন—পক্ষীশের চালের মত।

সোনালী রঙে ছাপানো প্যাডখানা খুলে বসল, কিন্তু কি লিখবে? পঞ্চাশ সালের মন্বন্তরের হাহাকার, কঙ্কালসার মানুষের ব্যর্থ অভিযান,···না। ও নিয়ে কান্নাকাটি করতে আর ভাল লাগে না। আধুনিক লেখক-লেখিকারা ওর শেষ রসটুকু পর্য্যন্ত চুষে আঁটিসার ক'রে ফেলেছেন। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক পূজা সংখ্যা, বিশেষ সংখ্যা, চারিদিকে তার বীভৎস নিষ্ফল আক্রোশ ভাল-লাগার পরিবর্ত্তে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে।

সেই একঘেয়ে ছিচকাঁদুনি জোয়ার-ভাটা থেকে নিস্তার পেয়ে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলবার আগেই সমস্ত মন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, গরমের দিনে মশা আর ছারপোকার কামড়ের মত। অথচ দেশময় প্রকৃত যেদিন অন্নের জন্য হাহাকার উঠল, তখন তো কই এঁদের দেখা যায় নি! মুমূর্ষুর মুখে জল না দিয়ে মৃতের মুখে আগুন দেওয়া যে দেশের রীতি, সে দেশের আইনানুসারে এঁদের দোষ দেওয়া চলে না। তার ওপর দুর্ভাগা বাংলার অধিকাংশ সাহিত্যিকই যখন বেকার, নিত্যনূতন কাহিনীর খোরাক তাঁরা পাবেন কোথায়? কিন্তু মাঝে মাঝে ভয়ে আঁতকে ওঠে শিপ্রা, এঁরা যেমন রেষারিষি ক'রে পাইকারী হারে লিখে চলেছেন, হঠাৎ তার উৎস শেষ না হয়ে যায়! তা হ'লে গড়পড়তা মৃত্যুর হার পঞ্চাশের রেকর্ডকেও হয়তো অতিক্রম ক'রে যাবে।

নাঃ, লেখবার জন্য কলম নিয়ে বসলেই যত অনাছিষ্টি মাথায় এসে ঢোকে। পার্কার পেনটা নিজের অজ্ঞাতসারেই কাগজের ওপর গোটাকতক রেখা টেনেছিল, সেগুলো হঠাৎ যেন প্রাণবন্ত হয়ে একটি সুদর্শন তরুণের মুখাকৃতি ধারণ করেছে—অবিকল বহুদিন-অদেখা রাজদ্রোহী শিশিরের মত। বে-আইনীভাবে হাত যে এমন একটা অভ্রান্ত সত্যকে গ'ড়ে তুলবে, তা কে জানত! অকারণ দু চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল তার। শিশির তার সঙ্গেই পড়ত থার্ড ইয়ারে, পরীক্ষার আগেই আগষ্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে জেলে যায়. সেই থেকে তার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় নি। কিন্তু তার ধীর গম্ভীর নম্র মূর্ত্তি, সেই হারানো দিনের টুকরো টুকরো কাহিনীগুলোর স্মৃতি কেমন যেন মাঝে মাঝে জীবন্ত হয়ে ওঠে। শত চেষ্টা ক'রেও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না সে, মানুষ হয়ে মানুষকে কি ক'রে ভুলবে?...যাক। মনটা ঘুরে ফিরে সেই একঘেয়ে জোয়ার-ভাটার কূলে এসে ভিড়তে চাইছে, যার ওপর সম্পাদক মহাশয় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি ক'রে ব'সে আছেন, কলম দিয়ে ছবিটার ওপর নির্দ্দয়ভাবে গোটাকতক আঁচড় কেটে ছিঁড়ে ফেলে দিলে কাগজটা।

• • •

প্রবন্ধই লিখবে সে। আজকাল মেয়েদের মধ্যে প্রবন্ধ লেখার একটা রেওয়াজ উঠেছে। তাদের মধ্যে. কেউবা নিজেদের ভ্রমণবৃত্তান্তকে জানাবার অধীর আগ্রহ এমন ভাবে প্রকাশ করছেন, যা পড়লে হাসি পায়। আমি ভারতের, অমুক জায়গায় এই জিনিসটি দেখে এমন আশ্চর্য্য হয়েছি! কিংবা এটি ভারতের মাত্র অমুক জায়গায়ই দেখা যায়,—ভারতের মধ্যে ঘুরতে আর কোথাও বাকি নেই তার, কাশ্মীর থেকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত সে চ'ষে বেড়িয়েছে, কিন্তু অমন আশ্চর্য্যের বস্তু একটিও চোখে পড়ে নি। যা পড়েছে, তা তথাকথিত সাহিত্যিকরা কচলে কচলে এমন তেতো ক'রে ফেলেছেন যে, চাইতেও মন সাড়া দেয় না। অনেকে রান্নার আসর জমিয়ে আছেন দিব্যি। নিত্যনূতন

আবিষ্কার ক'রে তাঁরা এমন তাক লাগাচ্ছেন যে, তাঁদের ত্রিসীমানারও যাবার সাহস হয় না। আর ওইসব স্ত্রী-আচারগুলোর ওপর বিতৃষ্ণা তার সবচেয়ে বেশি। অনেকদিন আগে একটা পত্রিকায় গ'বের আচারের প্রস্তুত প্রণালী পাঠিয়ে এমন···। আশ্চর্য্য! এইসব খুঁটিনাটি নিয়েও মেয়েরা খোঁচাখুঁচি করতে পারে! পাঁচশো পঁচিশ রকম মসলা নিয়ে ওদের ঘাঁটাঘাঁটি করা অভ্যাস কিনা!

মনের মধ্যে কেমন একটা তীব্র অবসাদ আসে শিপ্রার। যা সে পায় নি, তার জন্ত নয়, আলু থেকে শুরু ক'রে ঝাঁটা পর্য্যন্ত যা নিয়ন্ত্রিত হারে পেয়ে পেয়ে মানুষের মন উত্যক্ত হয়ে উঠেছে, তার ওপর। কি শুভক্ষণেই না যুদ্ধ বেধেছিল! হঠাৎ কাবর দলকে টেনে এনে একবারে পেটি বুর্জোয়ার পাতকোয় ফেললে। অকস্মাৎ তার চমক ভাঙল পাশের ঘরে মাসীমার পোষা বেড়াল ছুটোর কামড়া-কামড়ির শব্দে। লিখতে বসলেই যত রাজ্যের ঝামেলা ভিড় ক'রে আসে। লেখার খোরাক ওর মধ্যে যথেষ্ট থাকলেও সব কথা গুছিয়ে বলা যায় না, এমন বিরাক্ত মন নিয়ে।

দুর্ভাগা বাংলার ওপর দিয়ে একটার পর একটা কশাঘাত এসে তাকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অর্থাভাব, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব তার ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণের পীড়ন সহ্য করতে যে মানুষ কি ক'রে বেঁচে আছে, শত চেষ্টা ক'রেও তা বুঝে উঠতে পারে না। সামনে দিয়ে আরদালী রহমান চলেছিল, তাকে ডেকে শিপ্রা বললে গাড়ি বার করতে। ইতস্তত ক'রে রহমান বললে, আজ চারদিকে হাঙ্গামা, পুলিসের গুলি চলছে, সাহেব পর্য্যন্ত হেঁটে ধুতি প'রে বেরিয়েছেন। বললে, জানি। আমি নিজেই বেরুব। ব'লে, কলম রেখে, অল্প প্রসাধন সেরে নীচে নেমে এল। বারান্দার সামনে দয়াল গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। গাড়িতে উঠে ষ্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তার ওপরে। সমস্ত পথ নির্জ্জন। কোথায় গেল সব? পুলিসের গুলি থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্ত হয়তো ঘরের মধ্যে ব'সে আছে। আর সাহিত্যিকরা? তাঁরা নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে উৎসুক দৃষ্টি হেনে ভাবপ্রবণ মনের খালবিল পরিপূর্ণ করছেন। বেশ কিছুদিন লেখবার মত একটা খোরাক এসেছে।

পাশ দিয়ে একটা জীপ-কার বেরিয়ে গেল, তার ওপর দুজন মিলিটারি পুলিস লুইস গান উঁচু ক'রে ব'সে রয়েছে। ঘৃণায় সমস্ত মন জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছিল তার—একটা পাটকেল ছুঁড়লে কিংবা কঞ্চির ডগায় একটা রুমাল বেঁধে স্বাধীনতা চাই বললে, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যাঁরা গুলি চালায়, তাদের স্পর্দ্ধা দেখে।

বৎসরের পর বৎসর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জাঁতিকলে থেকে এখনও যাঁরা শিরদাঁড়া সোজা ক'রে আছেন, তাঁদের নির্ম্মূল করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাই বোধ হয় আজকের এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। রাস্তার ওপর একটি ছোট ছেলে গাড়ি-চাপা অবস্থায় প'ড়ে

রয়েছে, তার সমস্ত দেহ বারকয়েক মিলিটারি গাড়ির চাকায় পিষে রাস্তার গরম পিচের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেছে যে, হঠাৎ দেখলে মানুষের জাত ব'লে বোঝা যায় না।

এ আজ যেন শুধু ওকে নয়, শিপ্রার মনে হ'ল, এমনই ক'রে ওরা সমস্ত ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন দিয়ে দলিত মথিত ক'রে পথের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, তাদের নিজেদেরই অজ্ঞাতে। হাজরা রোডের মোড়ে একটি বৃদ্ধ রাস্তায় প'ড়ে ছটফট করছে, তার অদূরেই একটি যুবকের রক্তাক্ত দেহ হুমড়ি-খাওয়া অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে নীচে বৃদ্ধের পাশে এসে দাঁড়াল, ক্যাম্বিসের জুতো আর কণ্ট্রোলের আধময়লা লালপেড়ে ধুতি দেখলে কেরানী ব'লেই মনে হয়, চাকরির মায়া যাদের কাছে জীবনের চেয়েও মূল্যবান। তারপর যুবকটির দিকে এগিয়ে এল—শিশির। হ্যাঁ, শিশিরই তো! মুখে একমুখ দাড়িগোঁফ, বোধ হয় সদ্য জেল থেকে মুক্ত হয়েছিল বেচারী। গায়ে হাত দিয়ে দেখলে, সমস্ত দেহে এখনও উত্তাপ রয়েছে, কিন্তু প্রাণ নেই। একটা বুলেট তার বুক চিরে বেরিয়ে গেছে। কয়েক ফোঁটা জল গণ্ড বেয়ে শিশিরের বিদ্রূপ-মাখানো ওষ্ঠের পাশে ঝ'রে পড়ল। যারা তাকে বন্দী করেছিল, তারাই তাকে মুক্তি দিয়েছে।

হু-হু ক'রে একটা সৈন্য-বোঝাই মিলিটারি গাড়ি পাশ দিয়ে চ'লে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক বুলেট চিলের মত মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। এক মুহূর্ত্ত আগেও যদি সে জানত, তা হ'লে এদের মত সেও মাথা তুলে দাঁড়াত। বেঁচে থেকে এমন মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে মরণই ভাল। কিছুক্ষণ পরে একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এসে এদের দুজনকে তুলে নিয়ে গেল। অনেকক্ষণের একটা রুদ্ধনিশ্বাস পরিত্যাগ করলে শিপ্রা। বাস্তব জীবনের রঙ্গমঞ্চে মানুষ যে এমনই ঘটনার সম্মুখীন হয়, এ ধারণা তার এর আগে ছিল না। প্লট হিসাবে এ মন্দ নয়। বাড়ি ফিরে এইটাই রূপায়িত করবে সে। আজকের এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে ভবিষ্যতে কত গল্প লেখা হবে, তাদের মধ্যে শিশির বেঁচে থাকবে সকলের অগ্রগামী দূত হয়ে। লঘু পায়ে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলে সে।

শ্রীতারকনাথ গুপ্ত

সংবাদ-সাহিত্য

শোক-সংবাদ পরিবেশন করিয়া 'সংবাদ-সাহিত্য' আরম্ভ করিতে হইতেছে। 'শনিবারের চিঠি'র পাঠকবর্গের নিকট ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন গত ১৬ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। নানা শাস্ত্রে, বিশেষ করিয়া অর্থনীতিবিজ্ঞানে, তাঁহার

পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, ইতিহাসবোধ ছিল সুগভীর। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তদনুযায়ী জাতীয় প্রকৃতিবিচারে তাঁহার বুদ্ধি ছিল অন্ধ-অনুকরণমোহমুক্ত; আর ছিল স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় জীবনবিকাশের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, তাই সত্য ও কল্যাণময় পন্থানির্ণয়ে তাঁহার দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। এই সকল সৎ এবং দুর্লভ গুণের সঙ্গে ছিল আরও এক মহনীয় গুণ—চারিত্রিক মাধুর্য, সপ্রেম উদারতা, যাহার ফলে তাঁহার তত্ত্ববিচারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা আত্মপ্রতিষ্ঠার দম্ভে উদ্ধত অথবা প্রতিবাদের রূঢ়তায় রূঢ় ছিল না, ছিল সত্য ও শুভ পথনির্ণয়ের আগ্রহে আগ্রহান্বিত, অথচ শান্ত ধীর বিচারের দৃঢ়তায় সুসংযত এবং দৃঢ়। 'শনিবারের চিঠি'তে অর্থনীতি এবং আমাদের দেশের ভাবী সমাজব্যবস্থার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সে প্রবন্ধগুলি দেশের পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা করিবার গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই অকালমৃত্যু দেশের পক্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যের পক্ষে, অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁহার নিকট আমাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক। মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে নিতান্ত আকস্মিকভাবে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। একাধারে সাহিত্যিক এবং বন্ধু বিয়োগে আমরা মর্মান্তিক শোক অনুভব করিতেছি। তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করিতেছি। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পত্নী ও সন্ততিবর্গের দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

* * *

আমাদের জাতীয় জীবনে আরও এক অপূরণীয় ক্ষতি—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকগণের অন্যতম লাহোর 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের পরলোকগমন। কালীনাথ রায় ছিলেন নির্ভীক সাংবাদিক, জালিয়ান-ওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি যে তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহার জন্য সরকার তাঁহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু কর্মক্ষমতায় তিনি পূর্বের মতই তৎপর ছিলেন। তাঁহার কাছেও আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল। তাঁহার আত্মার শান্তিকামনা এবং পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

তারপর ? শোকসন্তপ্ত চিত্তে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, উহার পর আর কি লিখিব ? লিখিবার অবশ্য অনেক কিছুই আছে। বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব, অহিংসা ও শান্তির প্রতীক, কল্যাণের ঋষি মহাত্মা গান্ধী বাংলায় পদার্পণ করিয়াছেন। ভারতের যৌবনশক্তির পরমপ্রিয় জওহরলাল আসিয়াছেন। ভারতের মুক্তিকামী নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন পর কলিকাতায় সমাগত। তাঁহাদের শ্রদ্ধা-নিবেদন, স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইয়া দুঃখদুর্গত বাংলার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ জানাইবার আছে। বহু লক্ষ প্রাণ দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, জলপ্লাবনে বিনষ্ট হইয়াছে, গ্রাম জনশূন্য হইয়াছে, মানুষের কঙ্কালের টুকরা আজও শ্মশানে পথে প্রান্তরে নদীতটে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, এখনও মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যায় নাই; বাংলার শস্যক্ষেত্র বালুস্তূপে পরিণত হইয়াছে, সেই দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার আছে। হঠাৎ একটা উন্মত্ত অট্টহাসি কানে আসিল। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কে হাসে, কাহারা হাসে এমন হাসি ? কোথা হইতে এ হাসি ভাসিয়া আসিতেছে ? কলম রাখিয়া দিয়া কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলাম। স্তব্ধ মহানগরীর রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে বায়ুস্তরে মৃদুস্বরে প্রশ্ন ভাসাইয়া দিলাম, তোমরা কে ? তোমরা কি দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে মৃত লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মা ? কয়েক মুহূর্ত পরেই কানে আসিল, তীক্ষ্ণ তীব্র জ্বালাময় কণ্ঠের উত্তর, মূর্খ ! তুমি মূর্খ ! যাহারা অনাহারে, অচিকিৎসায়, বিনাপ্রতিবাদে দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মরিয়াছে পথে প্রান্তরে, তাহারা কি এ হাসি হাসিতে পারে ? আবার প্রশ্ন করিলাম, তবে তোমরা কে ? উত্তর আসিল নারীকণ্ঠে, আমরা তাহারাই, যাহারা আগস্ট-বিপ্লবে গুলি খাইয়া মরিয়াছি, দাঁড়াইয়া বুক পাতিয়া গুলি খাইয়াছি। এতদিন অবরুদ্ধ ক্ষোভে স্তব্ধ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আজ ভারতের মুক্তিদূত বাংলায় পদার্পণ করিয়াছেন, আমরা অট্টহাস্যে তাঁহাদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতেছি। ধীরে ধীরে দৃষ্টিপথ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিল, দেখিলাম, ক্ষুদ্র একটি জনতা মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। জনতার পুরোভাগে এক বৃদ্ধা। হাতে তাঁহার ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা। তাঁহার দুই হাতে গুলির ক্ষতচিহ্ন। ভগ্নহস্তেই সেই পতাকা ধরিয়া

আছেন। ললাটে আর একটি গভীর ক্ষত হইতে অনর্গলধারায় রক্ত নির্গত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার পিছনে রক্তাক্তকলেবর একটি জনতা। বৃদ্ধাকে প্রণাম করিলাম। বৃদ্ধা বলিলেন, পথ ছাড়িয়া দাও। মহাত্মা মেদিনীপুর সন্দর্শনে আসিবেন, আমরা তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতে চলিয়াছি। আমি আবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, আমি বাংলার একজন সাহিত্যসেবক। তোমার পরিচয়, তোমার কাহিনী আমাকে বল। আমার জানিবার অধিকার আছে। তাঁহার মুখে অশনিদীপ্তির মত হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, আমার নাম মাতঙ্গিনী হাজরা। আমার পশ্চাতে যাহারা, তাহারা মেদিনীপুরের—সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া, তমলুক, মহিষাদল ও ময়না এই ছয় থানার অধিবাসী, আগস্ট-আন্দোলনের বলি। ইহার অধিক কিছু বলিব না। বাংলার সাহিত্যিক বলিয়া তুমি নিজের পরিচয় দিতেছ, তুমি আমাদের কাহিনী সংগ্রহ কর। দেশের ধূলা ঘাঁটিয়া মাটির বুকে রক্তলেখায় লিখিত লিপি উদ্ধার করিয়া লও। ছাড়, পথ ছাড়। আরও আছে, তাহারা আসিতেছে।

* * *

মনে পড়িয়া গেল। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দেশক্রমে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমায় আগস্ট-আন্দোলন এবং সরকারী দমননীতি সম্পর্কে রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ফিরিয়া সেই রিপোর্ট খুলিয়া বসিলাম। রিপোর্টের মর্ম সাত দফায় ভাগ করা হইয়াছে।—

(১) ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত পুলিস ও সৈন্যদল মোট ২২টি স্থানে গুলি চালাইয়াছে। গুলির আঘাতে মোট ৪৪ জন নিহত, ১১৯ জন আহত এবং ১৪২ জন সামান্য আহত হইয়াছে।

(২) এই সময়ের মধ্যে মোট ৬৩ জন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৩১ জন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করা হয় এবং ১৫০ জন স্ত্রীলোককে প্রহার ও তাঁহাদের শ্লীলতাহানি করা হয়।

(৩) জনতা সুতাহাটা থানা আক্রমণ করিলে নিরস্ত্র লোকদের উপর এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণ করা হয়।

(৪) ৪২২৬ জন লোককে ভীষণ প্রহার করা হইয়াছে, ১৮৬৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, ৫০৭৬ জনকে বে-আইনীভাবে আটক রাখা হইয়াছে, ৯ জনকে ভারতরক্ষা আইনে বন্দী করা হইয়াছে এবং ৪০১ জনকে স্পেশাল কনষ্টেবল করা হইয়াছে।

(৫) ১২৪টি বাড়ি আগুন ধরাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এই অগ্নিকাণ্ডে অনুমান ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫ শত টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। ৪৯টি বাড়ি ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহাতে ক্ষতি হইয়াছে ৮০৭৫ টাকা। ১০৪৪টি বাড়ি হইতে ২ লক্ষ ১২ হাজার ৭ শত ৯০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে। ১৩৭৩০টি বাড়িতে খানাতল্লাসী হইয়াছে এবং ২৭টি বাড়ি পুলিস ও সৈন্তেরা দখল করিয়াছে।

(৬) ২৫ হাজার ৩ শত ৬৫ টাকা মূল্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে এবং ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা পাইকারি জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে।

(৭) ৭৩ বৎসর বয়স্কা একটি মহিলা-কর্মী যখন শোভাযাত্রা লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি গুলির আঘাতে নিহত হন। ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক ছয়টি বালকও গুলির আঘাতে নিহত হয়। একটি শিশুকে বুটজুতা দিয়া মাড়াইয়া পিষিয়া ফেলা হয়।

* * *

রিপোর্ট উল্টাইতে উল্টাইতে এক জায়গায় দৃষ্টি আপনি থামিয়া গেল। পাইয়াছি—মাতঙ্গিনী হাজরার পরিচয় পাইয়াছি। রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়িয়া গেলাম—

৭৩ বৎসর বয়স্কা মহকুমার প্রবীণ কংগ্রেস-সেবিকা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরার পরিচালনায় আর একটি শোভাযাত্রা উত্তর দিক হইতে প্রবেশ করিল। তাহারা শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ভট্টাচার্যের পরিচালনাধীনে সৈন্তদের সম্মুখীন হয়। বাণপুকুরের পাশে সঙ্কীর্ণ স্থানে সৈন্তগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারা কিছুদূর সরিয়া যায়। তখন লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নামক একটি বালক সৈন্তদের নিকটে দৌড়াইয়া গিয়া একজনের বন্দুক কাড়িয়া লয়। সৈন্তেরা তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করে। অতঃপর আমাদের স্বাধীনতার বীর সৈনিকেরা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে আবার সরকারী সৈন্তদের সম্মুখীন হয়। সৈন্তেরা বহুক্ষণ পর্যন্ত গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দৃঢ়-হস্তে জাতীয় পতাকা ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। সরকারী সৈন্তেরা প্রথমে তাঁহার দুই হাতে গুলি মারে। তাঁহার হস্তদ্বয় নত হইল, কিন্তু জাতীয় পতাকা তিনি

উর্ধ্বেও ধরিয়া রাখিলেন এবং আগাইয়া চলিলেন। তিনি ভারতীয় সৈন্যদের অনুরোধ করিলেন, তাহারা যেন চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগ দেয়। উত্তরে আসিল একটি বন্দুকের গুলি, উহা তাঁহার কপাল ভেদ করিল। তাঁহার মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। তাঁহার রক্তে ধরণীর ধূলি পবিত্র হইল। দেহ নিষ্প্রাণ, কিন্তু তখনও তাঁহার হাতের জাতীয় পতাকা সগৌরবে পতপত করিয়া উড়িতেছে। একজন সরকারী সৈন্য দৌড়াইয়া গিয়া লাথি মারিয়া জাতীয় পতাকা মাটিতে ফেলিয়া দিল। তাঁহার নিকট হইতে কয়েকপদ পিছনে লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (১৩), পুরীমাধব প্রামাণিক (১৪), নগেন্দ্রনাথ সামন্ত ও জীবনচন্দ্র বেরার মৃতদেহ পড়িয়া। বহু লোক আহত হইয়াছে। কয়েকজন আহত লোককে তাহাদের সঙ্গীরা সরকারী হাসপাতালে লইয়া গেল। এখানেও সৈন্যেরা আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসায় বাধা দিল। একজন স্ত্রীলোক একজন আহত বিপ্লবীর শুশ্রূষা করিতেছিল। লোকটি 'জল' 'জল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি নিকটবর্তী পুকুরে শাড়ির আঁচল ভিজাইয়া তাহার জন্য জল আনিল। কিন্তু একটা পশুস্বভাব সৈন্য তাহার দিকে বন্দুক তুলিয়া জল দিতে মানা করিল। স্ত্রীলোকটি উচ্চৈঃস্বরে বলিল, তুমি আমাকে খুন করিতে পার, আমি তোমার হুমকির কাছে নতি স্বীকার করিব না। সৈন্যটি তাহাকে গুলি করিতে সাহস করিল না। আর একটি শোভাযাত্রা আসিল দক্ষিণ হইতে। শোভাযাত্রা শঙ্কর-আরা পুলে পৌঁছামাত্র সরকারী সৈন্যেরা গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করে। ফলে নিরঞ্জন জানা (১৭) তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং পূর্ণচন্দ্র মাইতি (২২) আহত হইয়া দুই দিন পরে হাসপাতালে মারা যায়। বহুসংখ্যক বিপ্লবী আহত হয়। শোভাযাত্রায় যে সকল স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা আহত ব্যক্তিদিগকে জল দেয়। কয়েকজন সৈন্য এই সকল শুশ্রূষাকারিণীকে তাড়া করে। এই সব সাহসী নারী একটি বঁটি ও এক বালতি জল লইয়া প্রত্যাবর্তন করে। তাহারা চীৎকার করিয়া সৈন্যদের বলে, যদি আহত ব্যক্তিদের শুশ্রূষায় বাধা দাও, তবে এই বঁটি দিয়া তোমাদের কাটিয়া ফেলিব। ইহার পর আর তাহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। গুরুতর-ভাবে আহত কয়েকজন লোককে শোভাযাত্রাকারীরাই শহরের হাসপাতালে বহন করিয়া লইয়া যায়। অনেককে বাড়িতে লইয়া যাওয়া হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে তিন হাজার লোকের একটি শোভাযাত্রা কাঠের পুল দিয়া শহরে প্রবেশ করে। সেখানকার সৈন্যদের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত অপূর্ব ঘোষ শোভাযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যাহারা নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য গুলির সম্মুখীন হইতে পারিবে, তাহারাই যেন অগ্রসর হয়। যে সকল কংগ্রেসী বিপ্লবী শোভাযাত্রা চালনা করিতেছিল, তাহারা

দ্রুতপদে অগ্রসর হয়। তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিল। তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়। বাকি শোভাযাত্রীদের উপর লাঠি চালনা হইল। ধৃত ব্যক্তিদের দারুণ লাঠিপেটা করা হয়। তারপর সাত জনকে রাখিয়া বাকি লোকদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যাহাদের আটক রাখা হয়, তাহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকও ছিল। পরে তাহাদের প্রত্যেকের দুই বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

পশ্চিম হইতে প্রায় এক হাজার লোকের একটি শোভাযাত্রা থানার দিকে অগ্রসর হয়। প্রচণ্ডভাবে লাঠিচালনা করিয়া তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে প্রায় ২০ হাজার নিরস্ত্র ও অহিংস লোক বীরের মত সরকারী বাহিনীর সম্মুখীন হয়। অবিরাম গুলিবর্ষণে তাহাদিগকে যখন পিছনে হটিতে হইয়াছে, তখনও তাহাদের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার লোক গভীর রাত্রি পর্যন্ত ধৈর্যের সহিত পুনরাক্রমণের সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়াছে। কিন্তু সরকারী বাহিনী অবিরাম শহরে আসিতে থাকে এবং শহরটি সুরক্ষিত করিয়া রাখে। ফলে জনতাকে ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে হয়। নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট গিয়া মৃতদেহগুলি দাবি করে। কিন্তু তাহাদিগকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিলাম। মনে মনে বার বার প্রণাম করিলাম মাতঙ্গিনী হাজরাকে। সংকল্প করিলাম, মাটির ধূলা ঘাঁটিয়া এই রক্তলিপিকে উদ্ধার করিতে হইবে। পিঠে লোটা ও কম্বল বাঁধিয়া পদব্রজে বাহির হইতে হইবে—পরিব্রাজকের মত। একা নয়—বাংলার সাহিত্যিক মণ্ডলীকে সবিনয় আহ্বান জানাইব।

হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া গোপালদা প্রবেশ করিলেন। দেখিয়াই বুঝিলাম, গোপালদা আজ অস্ত্র মুড়ে আছেন। ব্যঙ্গহাসি ঠোঁটের ডগায় লাগিয়া আছে ডাক্তারের ছুরির মত। ইমোশনের স্ফীতি দেখিলেই নির্বিকার চিত্তে সে ছুরি বসাইয়া দিবেন। তাহাতে বেদনা তুমি যেমনই অনুভব কর। বলিলেন, কি ভায়া, আজ যে দেখি চংটা পাল্টাইয়া ফেলিয়াছ! ব্যাপার কি? বলিলাম, শুনুন, আজ কি দেখিলাম! পড়িয়া গেলাম। পড়া শেষ করিয়া বলিলাম, শুনিলেন? দাদার হাসি অপারেশন-উদ্যত ছুরির মত ঝলকিয়া উঠিল। বলিলেন,

ভায়া দেখিতেছি, 'সিসেম খার খোল' যাদুমন্ত্রের স্বপ্ন দেখিতেছ। লেখাটাও হইয়াছে ওই জাতীয়। পাল্টাইয়া ফেল। একটু থামিয়া বলিলেন, জঙ্গী বড়-লাটের বক্তৃতা শুনিয়া আমি এবার যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছি। দাদা উঠিলেন, যাইবার সময় বলিলেন, পাল্টাইয়া ফেল লেখাটা। আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। আবার স্তব্ধ রাত্রি থমথম করিতে লাগিল। হঠাৎ আমার মনে হইল, আমি সেই শোভাযাত্রীদের পাশে দাঁড়াইয়া আছি। সম্মুখে যেন কেহ দাঁড়াইয়া। তিনি মহাত্মাজী। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর, চোখের দৃষ্টি অহিংস, অথচ ভাস্বর। আমি আশ্বস্ত হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আপসোস হইতেছে, গোপালদা চলিয়া গিয়াছেন। জঙ্গী বড়লাটের এত বড় বক্তৃতাটার উত্তর মহাত্মাজীর ওই মুহূর্ত্তের ভঙ্গীটিতেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

—

লিখিতে লিখিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সকালে উঠিয়া বসিলাম। কর্ম্মমুখর শহরের কলরব চারিদিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। মাতঙ্গিনী দেবীর অস্তিত্ব আর অনুভব করিতেছি না। রাত্রের স্বপ্নঘোর প্রভাতের সঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে। খবরের কাগজ খুলিয়া বসিলাম। দেখিলাম, গত রাত্রি দশটার সময় মহাত্মাজী শান্তিনিকেতন হইতে সোদপুর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে দেখিলাম, মহাত্মাজীর দর্শনলাভের জন্য প্রত্যেক স্টেশনে ট্রেন থামাইবার জন্য দর্শনপ্রার্থীরা লাইনের উপর শুইয়া ছিল। মহাত্মাজী হাসিয়া বলিয়াছেন, "আমারই সত্যাগ্রহ অস্ত্র ইহারা আমার উপরেই প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে!" সংবাদটি বড় ভাল লাগিল, তাই উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

—

সংবাদের অন্যত্র দেখিলাম, বোলপুর হইতে শান্তিনিকেতন-যাত্রাপথে মহাত্মাজী আশ্রমের উপকণ্ঠে গাড়ি হইতে নামিয়া পদব্রজে তীর্থযাত্রীর মত আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। মুখেও তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন, শান্তিনিকেতন তাঁহার কাছে তীর্থস্বরূপ, তিনি হাঁটিয়া যাইবেন।

শান্তিনিকেতনে বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, স্বর্ণ বা ব্রোঞ্জ নির্মিত সৌধ-প্রতিষ্ঠায় মহাকবির স্মৃতি উপযুক্ত মর্যাদায় রক্ষিত হইবে না। তিনি যে অমূল্য ঐতিহ্য রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকে তাহা গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া তোলা এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে সক্ষম করিয়া তোলাই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হইবে।

জাতিকে সেই উপযুক্ততায় যোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাধীনতার। স্বাধীনতা-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের মুখে এই বাণীর গুরুত্ব বিপুল। ইহার মধ্যে আমরা শুনিতে পাইতেছি, মহাত্মাজীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, তিনি তাহাদেরই আহ্বান জানাইতেছেন—

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

—

আর একটি সংবাদ, রামপুরহাটে যে পথে মহাত্মাজী হাঁটিয়া সভাস্থলে গমন করেন, সেই পথে একটি ছিন্নবস্ত্রপরিহিত অল্পবয়স্ক বালককে ধূলা সংগ্রহ করিতে দেখা যায়, ধূলা কুড়াইয়া সে তাহার জীর্ণ কাপড়ের খুঁটে বাঁধিতেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, তাহার মা তাহাকে মহাত্মার পদধূলি সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিয়াছেন। তাহার মা এবং ভগ্নী কাপড়ের অভাবে মহাত্মা-সন্দর্শনে আসিতে পারেন নাই। মহাত্মা কেমন, তাই দেখিয়া গিয়া মায়ের কাছে বর্ণনা করিবে, তাঁহার পদধূলি তাঁহাদের দিবে।

তাহার বর্ণনা শুনিবার জন্য এবং মহাত্মার পদধূলির জন্য তাঁহারা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। পৃথিবীর সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উত্তোলিত-শির তুষার-মহিমায় চিরশুভ্র প্রশান্ত দেবতাত্মা গৌরীশঙ্করশৃঙ্গের মত দেশ কাল স্বার্থ সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উন্নতশির হে মহাত্মা, তোমার মাহাত্ম্যের প্রভাব গঙ্গাধারার মত নামহীন গ্রাম, পরিচয়হীন অবজ্ঞাতের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছে। আমরা আজ নির্ভয়ে বলিতে পারি, "দিন আগত ওই।"

—

'উদ্বোধন' পত্রে শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী "শ্রীঅরবিন্দ" প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, "কানাইর (১০ই নভেম্বর) ও সত্যেনের (২৩শে নভেম্বর) ফাঁসি—কানাই ও সত্যেন প্রভৃতির কথা মনে করিয়াই কবি সত্যেন দত্ত লিখিয়া গিয়াছেন যে—

'ফাঁসির কাষ্ঠে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান'।"

"কাষ্ঠে" নয়, "মঞ্চে"। আর এ লাইনটি কবি সত্যেন দত্তের নয়,—নজরুল ইস্‌লামের। নিজের ক্ষীণ স্মৃতি বা শোনা কথার উপর নির্ভর করিলে উদোর প্রাপ্য বুদোর ভাগ্যে পড়িয়া থাকে—ইতিকথা রচনার সময় এ বিষয় গিরিজা-বাবুর মনে রাখা উচিত।

—

নজরুল সংখ্যার 'গুলিস্তাঁ'য় গোলাম রহমান এক পাকিস্তানী প্যাঁচ মারিয়াছেন। গত বৎসরে প্রকাশিত 'কবিতা'র নজরুল সংখ্যায় শ্রীনলিনীকান্ত সরকার লিখিত "নজরুল" প্রবন্ধটিকে একটুখানি ছাঁটকাট করিয়া তিনি বেমালুম নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। নলিনীকান্ত লিখিলেন, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি মনীষিগণ প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া নজরুলকে চিঠি ও টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। গোলাম রহমান হুঁশিয়ার লোক, হুবহু গ্রহণ করিলে পাছে কেহ চোর বলে, এইজন্য তিনি সুকৌশলে "প্রায়োপবেশন" শব্দটি বদলাইয়া লিখিয়াছেন—

"রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি মনীষিগণ অনুরোধ জানিয়ে উপবেশন ভঙ্গ করার জন্য চিঠি-টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগলেন।"

গোলাম রহমানের প্রবন্ধটির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নলিনীবাবুর লেখা হইতে গৃহীত। মোসলেম লীগ যে এইরূপে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যকেও আত্মসাৎ করিয়া যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিবে, ইহা আমরা ভাবিতে পারি নাই।

—

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫২

সত্যাগ্রহের মূল কথা

ভারতীয় সাধনার অন্তর্নিহিত ধারা

শতদ্রু নদী যেখানে হিমালয় পর্বত ভেদ করিয়া পঞ্জাবের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, সেইখান দিয়া তিব্বত এবং মানস-সরোবরে যাইবার একটি দুর্গম পথ আছে। আমার জনৈক ইংরেজ শিক্ষক এক সময়ে এই উপত্যকায় পাথর এবং পর্বতের প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে যান। সেখানে তাঁহার সঙ্গে এক সাধুর সাক্ষাৎ হয়। সাধু দরিদ্র, জীর্ণ পোষাক পরিয়া পশ্চিম অভিমুখে চলিয়াছেন। পায়ে জুতা নাই, হিমের তাড়নায় পা ফাটিয়া ঘা হইয়া গিয়াছে, সেই ঘায়ের উপরে তিনি কয়েক প্রস্থ কাপড় জড়াইয়া অতি ধীরে ক্লান্তপদক্ষেপে আগাইয়া চলিয়াছেন। আমার শিক্ষক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তিনি মানস-সরোবর পর্যন্ত যাইবেন। তিনি তখন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এত কষ্ট করিয়া সুব্যবস্থা না করিয়া তীর্থে বাহির হইয়াছেন কেন? সাধু উত্তর দিয়াছিলেন, এই পবিত্র ভূমি দিয়া আমি চলিয়াছি, হয়তো কোনও দিন মানস-সরোবরে পৌঁছাইতে পারিব না সত্য, হয়তো পথ চলিতে চলিতে আমার দেহের অবসান ঘটিয়া যাইবে, কিন্তু আমি যে পর্যন্ত পৌঁছাইব, সেই তো আমার মানস-তীর্থ।

বিচিত্র এই ভারতবর্ষ, বিচিত্র এখানকার মানুষ! ভারতীয় সাধনার পিছনে যে দুদমনীয় বলিষ্ঠ শক্তি চিরদিন তাহাকে প্রাণ দিয়া আসিয়াছে, যে-বস্তু আজ সর্ববিধ গ্লানি এবং অকল্যাণের নিষ্পেষণেও মরে নাই—এ সেই পদার্থ। আমার এক বন্ধুর প্রপিতামহ কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত চৈতন্যদেবের হাঁটা সমস্ত তীর্থপথটি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে গিয়াছিলেন।

পাগল সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহারা হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে অথবা নঙ্গাপর্বতের শীর্ষে শুধু ক্ষণিকের জন্য আরোহণ করার উন্মাদনায় হেলায় প্রাণ বিসর্জন করিতে ইতস্তত করে না, ইহা তাদেরই মতন পাগলামি। যে পাগলামির বশে বৈজ্ঞানিক আগ্নেয়গিরির গহ্বরে যন্ত্রপাতি শুদ্ধ প্রবেশ করিয়া বাষ্প সংগ্রহ করেন, অথবা দারুণ বিষ নিজের, এমন কি পুত্রের শরীরে প্রবেশ করাইয়া চিকিৎসাবিদ্যার গবেষণা করেন, এ সেই ধরণের বাতুলতা। এই বাতুলতা পিছনে রহিয়াছে বলিয়াই ইউরোপের পর্বতপ্রমাণ লোভ, স্বার্থপরতা এবং নিষ্ঠুরতার জঞ্জাল সত্ত্বেও সে বড়। ইউরোপীয় সাধনার পিছনে যে বীর্য অবিচলভাবে বর্তমান, সে বস্তু হয়তো স্বার্থান্বেষী বণিকের নিষ্ঠুর বাণিজ্যপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় সত্য, অন্ধ সৈনিকের মৃত্যুভয় উপেক্ষা করা সংগ্রামের ভিতর দিয়া,

সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্ত আত্মদানের আগ্রহে প্রকাশ পাইয়া সমগ্র জগৎবাসীকে উদ্‌বেজিত করে সত্য, তবু ইউরোপের মধ্যেই তাহার সাত্ত্বিক প্রকাশও আছে, তাই আজ ইউরোপ বড়। হয়ত লোভের তমসাস্তূপের ভারে সেই অমূল্য বস্তু নষ্ট হওয়ার মত হইয়াছে; তবু সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্ত সেই সম্পদকে উদ্ধার করিতে হইবে, তাহাকে আজ বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। কেন না, সে সম্পদ তো শুধু ইউরোপের নয়, সমগ্র মানবজাতির সম্পদ।

ভারতবর্ষের জীবনধারার অন্তরালে যে শক্তিটি আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহাকেও তেমনই সমগ্র মানবজাতির কল্যাণপ্রয়োজনে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাকে বিপথগমনের ব্যর্থতা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ধারাটি ভারতের শিক্ষিত জনসমাজের জীবনের মধ্যে কদাচিৎ প্রকাশ পায়, সেখানে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার কারণও আছে। ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজ নিজের বলে বলীয়ান হইয়া, অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিকার হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া বড় হইয়াছিল। সেখানকার দরিদ্র জনসাধারণ আজও মুক্তিলাভ করে নাই সত্য, কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষমতা প্রচুর। অভিজাতসম্প্রদায়ের পরাজয়ের পর তাহাদেরই মধ্য হইতে মানুষ ধনী হইয়াছে, শক্তিমান হইয়াছে, জগতে ইউরোপের সাম্রাজ্যকে বিস্তারিত করিয়াছে। স্বীয় শক্তির উপর তাহাদের অধিষ্ঠান। কিন্তু ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইংরেজ বণিকের প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরেজী বাণিজ্য রক্ষার জন্ত যে রাজতন্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে মজুরি করার জন্ত এক শ্রেণীর মানুষ আমাদের সমাজে উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন করিয়া দেখা দিল। অভিজাত সম্প্রদায় ভাঙিয়া যাহারা দরিদ্র হইল, দরিদ্র শিল্পীকুলের মধ্যে যাহারা ঘটনাচক্রে শিক্ষার সুযোগ লাভ করিল, তাহারা সকলে মিলিয়া আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত সমাজ রচনা করিয়াছে। নিজের বীর্যের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নয়, পরগাছার মত বিদেশী বণিক, বিদেশী রাজতন্ত্রের প্রয়োজনে। এবং নির্বীর্য বলিয়াই মধ্যবিত্তের জীবন শুধু দূর হইতে ইউরোপীয় সভ্যতার সমৃদ্ধিকে তারিফ করিয়াছে, তাহার ক্ষীণ ও অতিজীর্ণ অনুকরণ করিয়াছে, ইঙ্গ-বঙ্গ এক বিচিত্র সভ্যতা রচনা করার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। এই জন্তই আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে তপস্যার ভাব নাই, চাকরি বজায় রাখার জন্ত, বা ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের কাছে প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টাই তাহার মধ্যে ষোল আনা ফুটিয়া উঠে।

ইউরোপে বিজ্ঞান নিয়োজিত হয় জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্ত। জনসাধারণের বুদ্ধিকে, তাহাদের চিন্তাকে, তাহাদের ব্যবহার, আচরণ এবং জীবনযাত্রাকে সমুন্নত করার জন্ত বৈজ্ঞানিকগণ কতই না চেষ্টা করেন! কিন্তু ভারতের বৈজ্ঞানিক সমাজ

পরগাছার মত, বিদেশী ধনতন্ত্রের আশ্রয়ভোজী। কোটি কোটি দরিদ্র জনসমূহের জীবনের সঙ্গে তাহার অধ্যাত্মযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এখানকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুধু বাহারিয়া আলোকলতার মত রূপ লয়, মানুষের জীবনকে সিঞ্চিত সমৃদ্ধ করে না। মধ্যবিত্তকুলের শোভাবরণ চাকুরিজীবী বৈজ্ঞানিকের তো এখানে সামাজিক দায়িত্বের বোধই নাই, তাই তাহার গবেষণার মধ্যে তপস্যার প্রয়োজনও নাই।

অথচ তপস্যার এই শক্তি ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব হইতে মুক্ত, অথচ শহরের দারিদ্র্য যে সকল মানুষের মনকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিতে পারে নাই, এমন ভারতবাসীর প্রাণে আজও বর্তমান আছে। আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি, এবং দেখিয়া ধন্য হইয়াছি বলিয়া মনে করি। ভারতের অরণ্যে প্রান্তরে, ইহারই সন্ধানে বারংবার ঘুরিয়াছি। কাশীর জীর্ণ এক গলির মধ্যে একজন লোক তবলা বাজানো শিখিতেছে। শীতের দিন, কাঁচা মাটির ঘর, মেঝেও কাঁচা। তাহার উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গুরুর নির্দেশমত ঘণ্টার পর ঘণ্টা তবলা বাজাইয়া চলিয়াছে। মাটির মধ্যে হাঁটু চাপিয়া ঈষৎ বসিয়া গিয়াছে, হাতের আঙুল ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, তাহাতে মোম ঘষিয়া নরম করিতেছে, তবু অভ্যাসের বিরাম নাই। এমন দৃঢ়তা দেখিয়া মাথা আপনিই নুইয়া আসে।

ওড়িশার সুদূর পল্লীর মধ্যে সাধকশ্রেণীর জনৈক পাথরের কারিগরের সন্ধান পাইয়াছিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, কোনদিন তো আপনার সাধনার দ্বারা সমাজ সার্থক হইবে না, সমাজ তো আপনাকে উপেক্ষা করে, তবু কিসের জোরে এ পথ ধরিয়া রহিয়াছেন? তিনি উত্তর দেন, আজ আদর নাই সত্য; কিন্তু কোন না কোন দিন আমার বংশধরেরা পুনরায় আদর পাইবে। সেইজন্য শিল্পের ধারাটিকে বীজের মত বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, আমি সাধনা ছাড়িয়া দিলে যে বীজই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ওড়িশার এক গ্রাম্য কবির সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, তিনি 'সমাজসংস্কারের চেষ্টায় একঘরিয়া অবস্থায় অষ্টাদশ বর্ষকাল যাপন করিয়াছিলেন, তবু সংস্কারের চেষ্টা ছাড়েন নাই। অথচ নিজের কাব্যসাধনাও ক্রোধের বশে, অবহেলার পীড়নে নষ্ট হইতে দেন নাই, মনের মাধুর্য বিন্দুমাত্র তাঁহার ক্ষয় হয় নাই। এই সকল সাধকই ভারতের অন্তর্নিহিত বস্তুটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

গরীব অশিক্ষিত জনসমূহের জীবনেও ইহার প্রকাশ অক্ষুণ্ণ আছে। দরিদ্র তীর্থযাত্রী দিনের পর দিন হাঁটিয়া পার্বত্যপথে দেবদর্শনের জন্য যাত্রা করে। কোথায় গঙ্গোত্রী হইতে এক বিন্দু জল সংগ্রহ করিয়া কোনদিন সুবিধা হইলে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে সেই জল মহাদেবের মাথায় অর্পণ করিবার চেষ্টা করে। বদরীকেদারের মন্দিরে যে পতাকা ওড়ে, তাহারই ছিন্ন এক অংশ সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনে যমুনার পাশে এক ক্ষুদ্র মন্দিরে অর্পণ করিয়া আসে—শুধু এইটুকু সাক্ষ্য দিবার জন্য যে, সে দেবতার উদ্দেশে ভারতের

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া সাধ্যমত সামান্ত উপহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

পরকালে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্ত, অথবা শুধু ভ্রমণের নেশায় পুণ্যসংগ্রহকে উপলক্ষ্য করিয়া আজও সহস্র সহস্র ভারতবাসী তীর্থযাত্রার কষ্টকে আনন্দে বরণ করিয়া লয়। তাহারাই দেবতার মন্দিরে পয়সা চড়ায়, গঙ্গার ঘাটে যেখানে রামায়ণ-মহাভারতের পাঠ হয়, সেখানে স্নানান্তে ফিরিবার সময়ে এক মুঠা চাল দিয়ে প্রণাম করে, কোথাও সমবেত জনতা পথ দিয়া যাইতেছে দেখিলে জোড়হাতে "হরিবোল" বলিয়া প্রণাম করে, রোগজীর্ণ শিশুকে বাঁচানোর জন্ত অনাহারে নিজের জীবন উৎসর্গের উদ্দেশ্তে দেবস্থানে হত্যা দেয়—ইহারাই ভারতবর্ষ, ইহাদেরই মধ্যে ভারতের শ্রেষ্ঠতম যুগে লব্ধ মানস-শক্তি—সাত্ত্বিক বীর্য—আজও ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় হারামণির মত বাঁচিয়া আছে। হয়তো আজিকার দুর্দিনে সেই শক্তির তামসিক প্রকাশই বেশী, বহু কুসংস্কার তাহার প্রভাবে বাঁচিয়া রহিয়াছে; কিন্তু তবু সেই অন্ধবিশ্বাসের পিছনে জীবনের যে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, সে বড় সত্য, তাহার আজও মরণ ঘটে নাই। কখনও কখনও এক-আধজনের জীবনে তাহার সাত্ত্বিক বিকাশও দেখা যায়। ওড়িশার কবি বা শিল্পী, হিমালয়ের সাধুর জীবনে তাহার অমৃতরূপ ফুটিয়া উঠে সত্য, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এত ক্ষীণ, ভারতের জীবনে তমোরাশির পরিমাণ আজ এত বেশী যে, ওই শান্ত শক্তিকে যদি বিকীর্ণ করা না যায়, আমাদের মানুষ হইয়া জগতে বাঁচিয়া থাকার কোন সার্থকতা থাকিবে না। কিন্তু ভারতের অন্তর্নিহিত সাধনার ধারা আজও যে বাঁচিয়া আছে, এইটিই আমাদের সকলের চেয়ে বড় ভরসার কথা।

সার্থক মরণের উপায়

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসীর মধ্যে কি প্রভেদ, জান? গৃহস্থ জীবনকে আঁকড়ে থাকে, কি ক'রে বাঁচবে তারই ভাবনা করে? আর সন্ন্যাসী মরণকে আলিঙ্গন করতে চায়। মরবে তো সকলেই। কিন্তু মানুষ নিজের জীবনটুকু কত সার্থকভাবে আহুতি দিতে পারে, সন্ন্যাসী সেই বিষয়েই চিন্তা করেন। সেই আহুতির দ্বারাই তিনি মরণের অতীত অমৃতপদ লাভ করেন।

গান্ধীজী স্বামী বিবেকানন্দের মত একই পথের পথিক। সত্যাগ্রহ-সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, ইহার মূলমন্ত্র হইল, মৃত্যুকে স্বীকার করা, মৃত্যুকে বরণ করা। এবং জীবনের এই উৎসর্গ পরলোকে কোনও ফললাভের জন্ত নয়, পুণ্যের বেসাতি খরিদ করার জন্ত নয়, জগতের নিপীড়িত জনগণ দুঃখের ভার হইতে কি করিয়া মুক্তিলাভ করিবে, তাহারই পথ অনুসন্ধানের জন্ত। স্বামীজী বলিতেন, যদি মানুষের

দুঃখ-নিবৃত্তির জন্ত আমাকে কোটি জন্ম সংসারের ক্লেশের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হয়, আমি তাই আসিব। সকল বোধিসত্বগণের ওই একই বাণী। সে বাণী ভারতের সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও ক্ষীণধারায় বর্তমান। স্বামী বিবেকানন্দ অথবা গান্ধীজী তাহাকে আত্মিক পুণ্যের লোভ হইতে মুক্ত করিয়া জনসমাজের কল্যাণের পথে চালিত করিয়াছেন। নদীর যে ধারা পাথরের বিঘ্ন পাইয়া নিস্ফল স্রোতে জনসমাজ হইতে দূরে পর্বতের অন্তরালে বহিয়া চলিয়াছিল, কখনও কখনও যাহার আওয়াজ আমাদের কানে দূর হইতে পৌঁছাইত, সেই স্রোতধারাকে গান্ধীজী আজ মানুষের কল্যাণের জন্ত পাহাড় কাটিয়া বাহির করিয়া সমাজের দৈনন্দিন জীবনভূমিকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু কত দীর্ঘদিনের দুঃখ, কত অসংখ্য সাধকের চেষ্টাই না ইহার পিছনে থাকিয়া আজিকার ঘটনাকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে! এক শতাব্দীর বেশী সময় ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম, আর্যসমাজ প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্দোলন ধীরে ধীরে সমাজের অন্তরস্থ মলিনতাকে মার্জিত করিয়াছে। কুসংস্কারের নাগপাশকে প্রতিদিনের অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার দ্বারা ঈষৎ শিথিল করিয়াছে, কত চিন্তাশীল লেখকই মানুষের দৃষ্টিকে পুণ্যের আয়োজন হইতে মাটির দিকে ফিরাইয়াছেন, তাহারই সমবেত ফলে আজিকার জীবনপ্লাবন সম্ভব হইয়াছে। যে পুণ্যলোভে ধর্মাত্মা সাধু তপস্যায় নিরত হন, সেই তপস্যার বীর্যকে আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষে কত তরুণ বিপ্লবী সমাজের কল্যাণের চেষ্টায় চেষ্টিত হইয়া অমোঘ মৃত্যুর পথকে বরণ করিয়াছিল।

ইহাদের সকলের দান আজিকার সত্যাগ্রহ সাধনার পিছনে রহিয়াছে। বহু সাধকের যুগ-যুগান্তের প্রচেষ্টার দ্বারা ভারতের অন্তরে যে সাত্ত্বিক বল সঞ্চিত হইয়াছিল, লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহাই আবার মাটি ভেদ করিয়া, নূতন উৎসমুখে বাহির হইয়া সমাজের জীবনকে প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গান্ধীজীর একার কোন্ ক্ষমতা আছে যে, শুধু তাঁহার চেষ্টায় সমগ্র দেশের রূপই তিনি বদলিয়া দিবেন? সে অভিমানও তাঁহার নাই।

তাঁহার কীর্তি শুধু এইটুকু, বহুজনকে তিনি মৃত্যুবরণের জন্ত নূতন সাধনপথের নির্দেশ দিয়াছেন। এবং সেই সাধনপথে অগ্রসর হইলে, আমাদের ইহজীবনে যে সকল ক্লেদ সঞ্চিত হইয়াছে, সেগুলি ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। গান্ধীজী বলেন, 'ইহকাল বা পরকাল বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু নাই। মনীষী জীন্স্ আমাদের ওই ভেদবুদ্ধিটুকু নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, একটি অণুকণার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডেরই মত বিশাল বস্তু থাকিতে পারে, মানুষকে সে শিক্ষা তিনি দিয়াছেন।'

অতএব সত্যাগ্রহের দ্বারা মৃত্যু আমরা বরণ করিব, পরলোকে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্ত

নয়, ইহলোকে সামাজিক মলিনতা ও প্রতি মানুষের চরিত্রের আবিলতাকে ধুইয়া মুছিয়া শুভ্র উজ্জ্বল মনুষ্যত্বের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিবার জন্য। এই হইল সত্যাগ্রহের মূলমন্ত্র। সত্যাগ্রহ সাধনায় ব্যক্তি অবশেষে মোক্ষ লাভ করিতে পারে সত্য, সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত মুক্তি সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য নয়। ব্যক্তি সমাজ হইতে অবিচ্ছিন্ন, বহুর মুক্তিতে একের মুক্তি, এই সত্যকে আশ্রয় করিয়া সত্যাগ্রহী অগ্রসর হন, এবং তাঁহার বিক্রমভরা পদক্ষেপের ফলে সমাজদেহের সঞ্চিত গ্লানি একে একে খসিয়া পড়ে।

যোগীর সিদ্ধিলাভের মত সমাজের দারিদ্র্য ঘুচিয়া যাইবে, পরাধীনতার গ্লানি মিটিয়া যাইবে, জগৎসমাজ হইতে শোষণের কলুষ মুছিয়া গিয়া সকল মানুষ মনুষ্যত্বের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহারই জন্য সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহ-তরুর মূলে নিজের জীবনরসকে সিঞ্চিত করেন। মৃত্যুঞ্জয়ী বহু বিগত সাধকের অমৃত আশীর্বাদ তাঁহাদিগকে সমর্থন করুক, জগতে যত বোধিসত্ত্ব জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্য সত্যাগ্রহীর চিত্তকে অমোঘ আবরণে আবৃত করুক। সত্যাগ্রহীর অন্তরে পরাজয়ের গ্লানি যেন না আসে, সত্যকে অবিচল নিষ্ঠায় আশ্রয় করিয়া তিনি যাত্রা করুন। সত্যাগ্রহের জয় হোক্! জয় হোক্!

শ্রীনির্মলকুমার বসু

সপ্তর্ষি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কানপুর কমিউনিস্ট মামলার সময়ই সর্ব্বপ্রথমে লোকে জানতে পারে যে, ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি ব'লে একটা পার্টি আছে। তার আগে এর নামই শোনে নি কেউ। আমার যতদূর মনে পড়ে, বিটলভাই প্যাটেলের আনুকূল্যে মিস্টার ডাংগে প্রথমে সোশ্যালিজ্‌ম-আন্দোলন শুরু করেন বম্বেতে। আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি, চৌরিচৌরা হয়ে গেছে। মহাত্মাজী আইন-অমান্য-আন্দোলন বন্ধ ক'রে দিয়ে জেলে গেছেন। চরকা-চালানো, অস্পৃশ্যতা-পরিহার, মাদকদ্রব্য-বর্জ্জন, বিদেশী বয়কট—এসব ছাড়া দেশে তখন উগ্রতর আর কিছু হচ্ছে না। দেশবন্ধুর দল অধীর হয়ে কাউন্সিলে ঢোকবার আয়োজন করছেন। কমিউনিস্টদের তখন দল ব'লে কিছু নেই, দু-চারজন লোক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছেন দেশের মধ্যে। কিছুদিন পরে বাংলা দেশে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্‌স পার্টি স্থাপিত হ'ল কলকাতায়। আমি

যোগ দিলাম তাতে। প্রথম আমিও যে সকলের মত মহাত্মাজীর স্বদেশী-আন্দোলনে মেতেছিলাম, তার প্রধান কারণ ছিল—তাঁর অভিযান ইংরেজদের বিরুদ্ধে, যে ইংরেজ, ক্যাপিটালিজ্‌মের প্রতীক হিসেবে, আমাদেরও শত্রু। পরে আবিষ্কার করলাম, ভারতের স্বাধীনতা-অপহারক যে ইংরেজ, তারই সঙ্গে বিরোধ তাঁর, ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে তাঁর কোন শত্রুতাই নেই, বরং ভারতের ক্যাপিটালিস্টদের পক্ষপুট দিয়ে ঢেকে রক্ষা করবারই আগ্রহ তাঁর। এ কথা আবিষ্কার করার পর আর কংগ্রেসের ওপর কোন আস্থা রইল না। যদিও তার কিছুদিন আগে লাহোরে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে দেশবন্ধু সভাপতির অভিভাষণে তারস্বরে বলেছিলেন, স্বরাজ আমরা সকলের জন্যে চাই, একটা বিশেষ শ্রেণীর জন্যে নয়। টাটার লেবার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিও ছিলেন তিনি কিছুদিন, কিন্তু তাঁর উক্তিকে কাজে পরিণত করতে হ'লে জনসাধারণের মনে যে প্রেরণা জাগানো উচিত ছিল, তাদের আত্মচেতনা-কে উদ্বুদ্ধ করবার যে ব্যাপক আয়োজনের প্রয়োজন ছিল, সেসব কিছুই করতে দেখলাম না তাঁকে। ভোট-সংগ্রহ ক'রে স্বরাজ্য-পার্টি গ'ড়ে কাউন্সিলের সৌধমঞ্চে তিনি সেই জাতীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করতে মত্ত হলেন, যা দানীবাবু শিশিরবাবু বহুবার করেছেন রঙ্গমঞ্চে এবং যা আমরা প্রতিদিনই উপভোগ করি খেলার বা ঘোড়-দৌড়ের মাঠে। কাগজে কাগজে তাঁর জয়জয়কার হতে লাগল, কিন্তু যে জনসাধারণের জন্যে তিনি স্বরাজ অর্জ্জন করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল। তাঁর শিষ্য সুভাষ-বাবুরও অনুরূপ ব্যবহার দেখলাম। ইনি যদিও অনেক শ্রমিক-সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু দেশের ধনিকরা এঁকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধেও অস্ত্রের মত ব্যবহার করেছে অনেকবার। এঁরা বড় বক্তা, বিরাট বিদ্বান, অসাধারণ মেধাবী, রাজনৈতিক দাবাখেলায় সুদক্ষ, কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের কেউ নন এঁরা। আমার মনে হ'ল, ইংরেজদের তাড়িয়ে কংগ্রেস সত্যিই যদি স্বরাজ পান, তা হবে বড়লোকদের স্বরাজ, যেসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে কবি ভাষা ফোটাতে চেয়েছিলেন, তারা মূঢ় ম্লান মূকই থেকে যাবে। আর একটা মজার ব্যাপার, এই সময় সকলে তখন বলতে লাগল, মহাত্মা গান্ধীই জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ এনেছেন। ঠিক ভাষা হ'ত 'মত্ততা এনেছেন' বললে। নিজেদের উন্নতি-অবনতি সুখ-দুঃখ বিস্মৃত হয়ে মহাত্মাকে ঘিরে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল

সবাই। অর্থাৎ যে কর্ত্তা-ভজা মনোবৃত্তির জন্ম ভারতের অধঃপতন, সেই অন্ধ-ভক্তির শিখরে দাঁড়িয়েই গান্ধীজী মহাত্মা হলেন এবং অশিক্ষিত লোকের মনে সেই সব আশা-ভরসা জাগিয়ে তুললেন (হয়তো অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও), যা সফল হওয়া কলিকালে অন্তত অসম্ভব। এযুগে যন্ত্র-সভ্যতাকে অস্বীকার ক'রে রাম-রাজত্ব স্থাপনের প্রয়াস থেকে তিনি কিন্তু নিবৃত্ত হলেন না কিছুতে। দুর্ব্বল অশিক্ষিত লোকদের সবল শিক্ষিত ক'রে তোলবার চেষ্টা না ক'রে তাদের শোনালেন অহিংসা-মন্ত্র, এবং বয়কট করতে বললেন শিক্ষা। শিক্ষা শব্দটার পূর্ব্বে বিদেশী বিশেষণটা থাকাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্জ্জন করাটাই স্বদেশ-ভক্তির অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। মূর্খের মূর্খতাটাই হয়ে উঠল গর্ব্বের বস্তু। শুনেছি নাকি স্বদেশের কাজে নাববার আগে গোখ্‌লের নির্দ্দেশমত ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছিলেন তিনি। ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ ক'রেও তিনি যদি এই তাদের মুক্তির উপায় ঠিক ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমার আর বলবার কিছু নেই। আমি আর একটা কথাও ভেবে পাই না। দরিদ্র জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেলে বড়লোক মিল-ওনারদের সঙ্গে কি ক'রে বন্ধুত্ব রাখা সম্ভব? মোট কথা, মহাত্মাজীর আন্দোলনে আমি আশ্বাস পেলাম না। যাঁরা হিংস্র পথ অবলম্বন ক'রে লাট-বড়লাট মারছিলেন, তাঁদের কার্য্যকলাপও আমার প্রাণ স্পর্শ করল না যেন। কতকগুলো সাহেব মেরে লাভ কি? ফলে নিরপরাধী বহু লোক নির্য্যাতিত হবে শুধু। তা ছাড়া, দেশ বলতে সত্যি সত্যি যা বোঝায়, সেই অশিক্ষিত অসহায় নগ্ন রুগ্ন ক্ষুধার্ত্ত জনমজুর চাষীর দল, তাদের কি কোনও উপকার হবে দু-চারজন সাহেব মেরে? আমার তো তা মনে হয় না। তারা সবল হোক, শিক্ষিত হোক, জাগুক—এই আমি চাই।

সুতরাং এদের জাগরণের জন্যেই শেষে আত্মনিয়োগ করলাম আমি পুরোপুরি। আমার কাজ হ'ল তাদের শিক্ষিত করবার চেষ্টা করা, অন্যান্য দেশের শ্রমিকরা কেমনভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে সে খবর তাদের এনে দেওয়া, তাদের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং স্বার্থরক্ষা করা। চরকা বা পতাকা ঘাড়ে ক'রে অহিংস শোভাযাত্রার শোভা-বর্দ্ধন করলে অথবা দু-একটা সাহেব খুন করলে আমার স্বদেশ-সেবার বাজার-দর বেড়ে যেতে পারত, কিন্তু

যাদের ম্লান মুখে শত শতাব্দীর করুণ কাহিনী লেখা রয়েছে, তাদের মুখ চেয়ে ওসব পথে যেতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না।

কাজে নেবে কিন্তু দেখলাম, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করা বড় সহজ কাজ নয়। আমার ভদ্র চেহারা এবং ভদ্র পোশাকই প্রথম বাধা হ'ল। প্রথমে আমার কথা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইলে না। 'নাইট স্কুল' করলাম, নিজে পড়াবার জন্যে রোজ যেতাম, ছাত্রই জুটত না। তা ছাড়া অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর এবং বয়স্ক, অ আ থেকে শুরু ক'রে তাদের শিক্ষিত ক'রে তোলা সহজও ছিল না আমার পক্ষে। বক্তৃতা করতাম, আমার বক্তৃতার ভদ্র ভাষা কেউ বুঝত না। বক্তৃতা দেবার জন্যে শেষে তাদের মধ্যে থেকেই চালাক-চতুর একজন লোককে বেছে নিয়ে বাহাল করলাম মাসিক ত্রিশ টাকা মাইনে দিয়ে। একটা ম্যাজিক-লণ্ঠন এবং স্লাইডও কিনলাম কিছু। অল্পবয়স্কদের অক্ষর-পরিচয় করাবার জন্যেও একজনকে নিযুক্ত করলাম। নিজে রাত জেগে জেগে দেশী-বিদেশী খবরের কাগজ থেকে নানা খবর অনুবাদ করতাম। সেগুলো ছাপাতাম একটা সাইক্লোস্টাইলে। একটা সাইক্লোস্টাইলও কিনেছিলাম সেজন্যে। তোমার মনে আছে কি, একবার একটা নিমন্ত্রণে যাবার সময় শাল আংটি ঘড়ি প'রে যাই নি ব'লে তোমরা রাগ করেছিলে? তখন বলি নি, এখন কিন্তু বলতে বাধা নেই, শাল আংটি ঘড়ি আমার ছিল না, সবই বিক্রি ক'রে দিয়েছিলাম এই কাজের জন্যে। দাদু মাসে মাসে আমাকে যে পকেট-মনি দিতেন, কলেজের বই কেনবার জন্যে যে টাকা পেতাম, সবই এর জন্যে খরচ করেছি। লাইব্রেরিতে ব'সে আর ক্লাসের নোট টুকে পরীক্ষার পড়া করতাম, একটাও বই কিনি নি। নিজের বাহাদুরি করবার জন্যে তোমাকে এসব লিখছি না, যা যা করেছি তাই অকপটে বর্ণনা করছি কেবল। যাদের আমরা বহু যুগ ধ'রে শোষণ করেছি, তাদের জন্যে এই সব সামান্য ত্যাগ খুব যে একটা বড় কিছু তাও আমার মনে হয় না। যাই হোক, এত ক'রেও কিন্তু মন পাই নি ওদের। যে চালাক-চতুর ছোকরাকে বক্তৃতা দেবার জন্যে বাহাল করেছিলাম, সে আমার সামনে যদিও কমিউনিজ্‌মের বক্তৃতা দিত, আড়ালে কিন্তু আমারই নামে লাগাত মনিবদের কাছে গিয়ে। শুধু মনিবদের কাছেই নয়, নিজেদের মধ্যেও গোপনে প্রচার করত যে, আমার মত ধনীর দুলাল ধাওড়ায় যাতায়াত করছে, অন্য কোন

উদ্দেশ্যে নয়, মেয়েমানুষের খোঁজে। তার দোষ ছিল না বিশেষ। ইতিপূর্ব্বে দু-একজন ধনীর দুলাল তাদের উপকার করবার ছুতোয় এসে সত্যিই নারী-ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছিলেন। আমার নিঃস্বার্থ পরোপকারের মর্ম্ম তারা বোঝে নি ব'লে প্রথমটা আমি মর্ম্মাহত হয়েছিলাম, কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি, নিঃস্বার্থ পরোপকারের মর্ম্ম খুব কম লোকেই বোঝে। অধিকাংশ লোকই নিজেরা স্বার্থপর মতলববাজ ব'লে প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক কাজের পেছনেই মতলব অনুসন্ধান করে, না পেলেও মনে ভাবে, নিশ্চয়ই আছে কিছু একটা। রঘুকে এজন্যে অপরাধী করি না আমি। সে মনিবদের কাছে আমার নামে লাগাত, সেখান থেকেও টাকা পেত ব'লে। যে টাকার লোভ বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিরা সামলাতে পারেন না—যার লোভে প'ড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রীধারীরাও মিথ্যে সার্টিফিকেট লিখছেন, মিথ্যে রায় দিচ্ছেন, মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছেন, মিথ্যে মকদ্দমা করছেন, বস্তুত না করছেন হেন অপরাধই নেই—তার লোভে প'ড়ে রঘুও যদি এ কাজ ক'রে থাকে, খুব বেশি দোষ কি দেওয়া যায় তাকে? অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় অসুখের এপিডেমিক যেমন স্বাভাবিক, ক্যাপিটালিজ্‌মের আওতায় অর্থ-গৃধ্নুতাও তেমনই একটা স্বাভাবিক জিনিস। কারণ নিছক পরিশ্রম বা যোগ্যতার পরিবর্ত্তে এ সমাজে সসম্মানে সৎপথে থেকে সুখে জীবনযাপন করা যায় না, অথচ কিছুমাত্র পরিশ্রম না ক'রে অযোগ্যতম ব্যক্তিও রাজার হালে থাকতে পারে টাকা থাকলে। তাই সবাই টাকা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়। রঘুও হয়েছিল। পরে এসব কথা ভেবে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি, তখন কিন্তু দুঃখ হয়েছিল খুবই, বিশেষ ক'রে যেদিন আমার ম্যাজিক-লণ্ঠনটা চুরি গেল। এত কষ্ট হয়েছিল যে, পুলিসে খবর পর্য্যন্ত দিয়েছিলাম। পুলিস অবশ্য এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি, তারা তখন মদের দোকানে পিকেটিং বন্ধ করতে ব্যস্ত ছিল। আর একটা জিনিস আবিষ্কার ক'রেও দুঃখ পেয়েছিলাম। দিস্তা দিস্তা কাগজ কিনে যেসব জিনিস আমি সাইক্লোস্টাইল করতাম, তা সবাই আগ্রহ ক'রে নিত। একদিন আবিষ্কার করলাম, তা তারা নেয় পড়বার জন্যে নয়, জিনিসপত্র মুড়ে নিয়ে যাবার জন্যে। তাদের স্বাস্থ্যোন্নতি করবার চেষ্টাও আমার সফল হয় নি। যেখানে সেখানে থুতু ফেলা অন্যায়, ঘরের আশপাশে জল জমতে দেওয়া উচিত নয়, ঘরদোর বিছানাপত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

'পরিষ্কার না রাখলে নানা রকম অসুখ হয়, মশা-মাছি-ছারপোকার থেকে আত্মরক্ষা মানে যে নানাবিধ রোগ থেকেই আত্মরক্ষা, ঘরের কপাট-জানলা যতদূর সম্ভব খুলে রাখাই উচিত—আমার এই সব বক্তৃতা শুনে তারা হাসত। দু-একজন মাঝে মাঝে আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করবার চেষ্টা করত, কিন্তু তা দু-একদিন। একটি পথ দিয়ে গিয়ে কেবল তাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছিলাম। যখন তাদের বোঝাতে পারলাম যে, দিন-রাত পরিশ্রম ক'রে তারাই মিল চালাচ্ছে, অথচ মোটা মুনাফাটা যাচ্ছে কতকগুলো অকর্ম্মণ্য লোকের পকেটে, তখন যেন তাদের একটু সাড়া পেলাম। ধর্ম্মঘট ক'রে তাদের দাবি জাহির করতে পারলে ওই সব মেকী মালিকরা যে সে দাবি মেটাতে বাধ্য হবে, এ কথা শুনে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল তারা। ক্যাপিটালিস্ট-সমাজে ওই একটিমাত্র জিনিস আছে, যা লোকের প্রাণে সত্যিকার উৎসাহ জাগাতে পারে—বক্তৃতা নয়, আদর্শ নয়, মহত্ত্ব নয়—টাকা। আয় বাড়বার লোভ দেখাতেই ওদের ঘুম ভাঙল যেন। আমাদের পাড়ার 'মিলে' কুলী-স্ট্রাইক আমিই যে করিয়েছিলাম, তা বোধ হয় জান। কিন্তু তার জন্যে কি বেগ যে আমায় পেতে হয়েছে, তা বোধ হয় জান না। আমার কথায় তারা তো স্ট্রাইক করলে, কিন্তু আড়াই শো বুভুক্ষু-পরিবারের দিন চলা ভার হয়ে উঠল, যখন মুদীরা ধার দেওয়া বন্ধ ক'রে দিলে। এটা যে সম্ভব, তা আমি কল্পনা করি নি। মুদীরা যে কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে যোগ দেবে, এ কথা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাদের আমি স্বদলভুক্ত মনে করেছিলাম। কর্তৃপক্ষ নাকি অগ্রিম টাকা দিয়ে তাদের সব জিনিস কিনে নিয়েছিলেন। সাত দিন কাটতে না কাটতে অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। তারা দলে দলে এসে আমাকে বলতে বাধ্য হ'ল, অবিলম্বে খাওয়ার বন্দোবস্ত না করলে কাজে যোগ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তাদের। আমার রোখ চ'ড়ে গিয়েছিল। বললাম, তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা আমিই করব, তোমরা এক মাস অন্তত কাজে যোগ দিও না। ব'লে তো বসলাম, কিন্তু পরে হিসেব ক'রে দেখলাম, আড়াই শো পরিবারের খাওয়ার ব্যবস্থা করা মানে দৈনিক আড়াই শো টাকার ব্যবস্থা করা অন্তত। আমার নিজের হাতে তখন কিছু নেই। মেডেলগুলো পর্য্যন্ত বিক্রি ক'রে দিয়েছি। এক মাস যদি স্ট্রাইক চলে, প্রায় আট হাজার টাকার দরকার। ধার করবার জন্যে বেরুলাম। বড়লোক বন্ধু যারা ছিল,

সব হিতৈষী হয়ে উঠল একযোগে। কেউ আমায় পাগল ভেবে চিন্তিত হ'ল, কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করলে, কেউ রাগ করলে, কেউ হাসলে—টাকা কেউ দিলে না। কাবুলীরা বিনা বন্ধকে অত টাকা দিতে রাজি হ'ল না। আমার তখন বন্ধক দেবার মত কিছু নেই। বাবা-মাকে এ কথা বলতেই সাহস হ'ল না আমার। সাহস হ'লেও সফল হতাম কিনা সন্দেহ। কারণ বাবা নিজেই তখন চতুর্দ্দিকে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন টাকা ধার করবার জন্যে। মাকে ধ'রে পড়লে তাঁর গয়নাগুলো দিতেন হয়তো, কিন্তু কেঁদে কেটে এমন একটা অনর্থ করতেন যে, মুশকিলে প'ড়ে যেতাম আমি। এই ভয়ে পারতপক্ষে বাড়িতে এসব আলোচনাই আমি করতাম না কারও সঙ্গে। মরিয়া হয়ে শেষে অসমসাহসিক কাজ ক'রে ফেললাম একটা। দমদমে গিয়ে দাদুকে সব কথা খুলে বললাম। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে যে আলাপ হয়েছিল, তার প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট মনে আছে আমার এখনও।

সব শোনবার পর তিনি বললেন, মিলের কুলীদের জন্যে তোমার হঠাৎ এত দুঃখ হ'ল কেন?

বড়লোক মিল-ওনার ওদের ঠকাচ্ছে ব'লে।

ঠকাচ্ছে? যে মাইনে দেবে বলেছিল, তা দিচ্ছে না?

যা দিচ্ছে, সেটা অত্যন্ত কম।

অত কমে ওরা রাজি হ'ল কেন?

রাজি না হয়ে উপায় কি? স্বেচ্ছায় ওর বেশি কেউ দেবে না।

দেবে কেন, ওই হ'ল ওদের বাজার-দর। কুলী আবার কত মাইনে পাবে?

বুঝলাম, দাদুর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। যে লোকের সা-রে-গা-মা-র সম্বন্ধেই ধারণা নেই, তাকে বেহাগ-ভৈরবীর তফাত বোঝাতে যাওয়া পণ্ডশ্রম।

চুপ ক'রে রইলাম। দাদুই কথা কইলেন আবার।

কুলীকে তুমি বাবু বানাতে চাও নাকি?

কুলীকে আমরা কুলী ক'রে রেখেছি ব'লেই সে কুলী। বাবু হতে তার বাধা কি? সেও তো মানুষ।

ও, বটে।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, অতএব এই মহৎ কর্ম্ম করবার জন্তে তুমি এন্তার টাকা খরচ করতে প্রস্তুত হয়েছ।

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, আমার সর্ব্বস্ব, এমন কি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কেটে দিতে আমি প্রস্তুত আছি ওদের বাঁচাবার জন্যে।

কিন্তু সেটা ধীরে-সুস্থে করলে ক্ষতি কি? এক্ষুনি আট হাজার টাকাই খরচ করতে হবে?

এক্ষুনি আট হাজার টাকা না পেলে আমার মান থাকবে না। আমার কথায়আড়াই শো লোক স্ট্রাইক ক'রে অনাহারে আছে—আমি কথা দিয়েছি, তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করব।

কথা দিয়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

তা হ'লে এ নিয়ে আর আলোচনা করা বৃথা। ভদ্রলোকের কথার দাম আট হাজার টাকার চেয়ে নিশ্চয় বেশি। নিয়ে যাও। কিন্তু তোমার হিসেবে এটা লেখা থাকবে, মনে থাকে যেন। আর তোমার ওই প্রোলিটারিয়েটদের এত লম্ফঝম্ফ যে একজন ক্যাপিটালিস্টের ফুলিশ উদারতায়, সে কথাও তারা ভুলে যাবে না আশা করি।

দাদু সেদিন টাকাটা না দিলে যে কি করতাম, জানি না। তারপর থেকেই আমাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হ'ল যে, আয় বাড়াবার প্রলোভন না দেখালে শ্রমিক কিষাণ কারও সাড়া পাওয়া যাবে না এবং বার বার আমি একা তার তাল সামলাতে পারব না। সুতরাং পার্টিতে যোগ দিতে হ'ল। প্রথম প্রথম অবশ্য কিছুদিন আমরা একটা ঘরে ব'সে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করি নি, কারণ কাজ করবার মত যথেষ্ট অর্থ আমাদের হাতে ছিল না তখন। শুধু বক্তৃতা ক'রে শ্রমিক বা কৃষকের মন গলানো যায় না, তারা হাতে হাতে ফল দেখতে চায়। তবু কিন্তু আমাদেরই চেষ্টায় এই সময় খড়গপুর রেলওয়ে স্ট্রাইকটা হয়েছিল, যদিও সেটা বিশেষ কিছু নয়। আর এই সময়টা মাঝে মাঝে প্রায়ই জামসেদপুর যেতাম সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার জন্যে। ছোটকাকা সেই সময় জেল থেকে ফিরে এলেন। তাঁকে নিয়ে দিনকতক হৈ-চৈ করলাম। কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়, তিনি ছোটকাকা ব'লে। দেশের জন্যে তাঁর ত্যাগটাকে তো অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া কাকীমা চ'লে যাওয়াতে ব্যাপারটা সত্যিই নিদারুণ হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। তাই তাঁকে ঘিরে একটা উৎসব-কোলাহল সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলাম।

কিন্তু সেসব যে তাঁর চিত্ত স্পর্শ করতে পারে নি, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যেত। এ ছাড়া আর কোন দিক দিয়ে কংগ্রেসের ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলাম ব'লে মনে পড়ে না। এমন কি সাইমন কমিশন বয়কট হুজুগে মাতবারও প্রেরণা পাই নি আমি, যদিও আমাদের দলের জনকয়েক খুব মেতেছিল এ নিয়ে। লর্ড বার্কেন্‌হেডকে মুখের মতন জবাব দেবার জন্যেও দিল্লীতে যখন অল পার্টিজ কন্‌ফারেন্স চলছিল এবং কন্‌স্টিটিউশনে শতকরা কতজন হিন্দু, কতজন মুসলমান, কতজন শিখ থাকবে এ নিয়ে যখন নেতারা মাথা ঘামাতে লাগলেন এবং অবশেষে মতিলাল নেহেরুকে মহাত্মা গান্ধী যখন ভার দিলেন রিপোর্ট তৈরি করবার, তখনও তাতে উল্লসিত হবার কোন হেতু ছিল না আমার দিক দিয়ে। আমার মনে হয়েছিল, সাইমন কমিশন এবং নেহেরু কমিশন একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ, দেশের নাইন্টি-এইট পার্‌সেন্টদের জন্যে যে সাম্য আমার কাম্য, তার আভাসমাত্র সাইমন বা নেহেরু কেউ দেবেন না। সুতরাং ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই নি।

কিছুদিন পরে সহসা কিন্তু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম বারদোলির খবর পেয়ে। গভর্মেণ্ট খাজনা বাড়িয়েছেন ব'লে সেখানকার চাষীরা খাজনা দিতে অস্বীকার করেছে। বল্লভভাই প্যাটেল তার নেতৃত্ব করেছেন। আমি আর কলকাতায় থাকতে পারলাম না। চ'লে গেলাম বারদোলিতে। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, তা অপূর্ব্ব। বারদোলির কৃষকদের বীরত্ব ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হতে দেখলাম আমার চোখের সামনে। আবালবৃদ্ধবনিতার যে শৌর্য্য, যে আত্মত্যাগ সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা সত্যি সত্যিই যদি সারা ভারতের শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পারত, তা হ'লে ভাবনা ছিল না। বারদোলিতে হয়েছিল বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যে। মহাত্মাজী তাঁকে যে 'সরদার' উপাধি দিয়েছিলেন, সত্যিই সর্ব্বতোভাবে তার উপযুক্ত তিনি। তিনি যদি আর কিছু না ক'রে তাঁর এই সঙ্ঘবদ্ধ করবার শক্তিকে জনসাধারণের কাজে লাগাতেন, মস্ত বড় কাজ হ'ত একটা। এই শক্তিমান পুরুষ তা হ'লে খুব বড় একজন কমিউনিস্ট নেতা হতে পারতেন। কিন্তু জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে, শক্তিমান ক'রে তোলবার আগ্রহ এঁদের ততটা নেই, যতটা আছে ইংরেজকে জব্দ করবার আগ্রহ, এবং সেই উদ্দেশ্যেই এঁরা সঙ্ঘবদ্ধ অন্ধ জনতাকে মাঝে মাঝে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেছেন। অন্ধ জনতা

যে অন্ধই থেকে গেছে, তার প্রমাণ—বারদোলি আর দ্বিতীয়বার মাথা তুলতে পারে নি। সরদারজীর স্থান নেবার মত দ্বিতীয় লোক আর দেখা যায় নি সেখানে। ইংরেজকে জব্দ আমরাও করতে চাই, কিন্তু তার চেয়েও আমরা বেশি ক'রে চাই জনসাধারণকে নিজের শক্তির সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলতে। তা যদি করতে পারি, ইংরেজ আপনিই জব্দ হয়ে যাবে। একজন গান্ধী, একজন বল্লভভাই, একজন সুভাষ, একজন নেহেরু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাই না আমরা। আমরা ঘরে ঘরে গান্ধী বল্লভভাই সুভাষ নেহেরুকে পেতে চাই এবং তা পাওয়া সম্ভব হবে যদি আমরা প্রত্যেক ভারতবাসীকে সেই সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং শিক্ষা দিতে পারি, যা গান্ধী, বল্লভভাই, সুভাষ, নেহেরু বরাবর পেয়েছেন। বিদ্যাসাগর ফ্যারাডে দীন-দরিদ্রের ঘরে জ'ন্মেও বড়লোক হতে পেরেছিলেন, এ কথা উল্লেখ ক'রে যারা সাম্যবাদের সমালোচনা করেন, নির্মম দারিদ্র্যের পেষণে কত প্রতিভা যে অকালে নষ্ট হয়ে যায়, সে খবর তাঁরা রাখেন না। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ছে। জামালপুরের শ্রমিকদের অবস্থাটা কি রকম দেখতে গিয়ে অপরূপ জিনিস দেখেছিলাম একবার একটা। দেখলাম, ওয়ার্কশপের জিনিসপত্র দিয়ে একটা বারো বছরের ছেলে ছোট্ট একটা এঞ্জিন বানিয়েছে। অল্প কয়লাতে বেশ খানিকক্ষণ চলে সেটা। সেই এঞ্জিনের সাহায্যে ছেলেটা নিজের ঘরে টানা-পাখা লাগিয়ে দিব্যি হাওয়া খায় রোজ। দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। বললাম, তুমি এটা পেটেণ্ট কর, যা খরচ লাগে আমি দেব। এ কথা শুনে তার বাপ-মা ভয় পেয়ে গেল। ওয়ার্কশপের জিনিসপত্র চুরি ক'রে জিনিসটা তৈরি হয়েছিল, জানাজানি হয়ে গেলে তাদের চাকরি থাকবে না। পরে খবর পেয়েছি, সে ছেলে বিদ্যাসাগরও হয় নি, ফ্যারাডেও হয় নি। হয়েছিল ওই ওয়ার্কশপেরই একটা নগণ্য মজুর। ওভার-টাইম খেটে, না খেতে পেয়ে, যক্ষ্মা হয়ে মরেছিল শেষকালে। সোভিয়েট দেশে তার এ পরিণতি হ'ত না বোধ হয়। নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ম'রে যাওয়াই স্বাভাবিক, বেঁচে থাকাটা আকস্মিক, বড় হওয়া সুদূর-পরাহত। তা ছাড়া দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ না করতে হ'লে বিদ্যাসাগর ফ্যারাডে যে আরও বড় হতেন না, তাই বা কে বললে তাঁদের?

বারদোলি থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম। এসে পড়লাম অল-বেঙ্গল স্টুডেণ্টস কন্‌ফারেন্সের হিড়িকে। পণ্ডিত জওহরলাল সভাপতি।

তুমি সেই সময়টা তেতলার ঘরে খিল দিয়ে ছবি-আঁকায় মগ্ন থাকতে ব'লে বোধ হয় টের পাও নি যে, তখন ছাত্রমহলে কি উত্তেজনাটা হয়েছিল। জওহরলালের বক্তৃতায় কমিউনিজ্‌মের অনেক খোরাক ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, জওহরলালই কমিউনিজ্‌মের সুরটা ভালভাবে তুলেছিলেন আমাদের মনে। তখন খুব ভাল লেগেছিল, পরে কিন্তু পণ্ডিতজীর ব্যবহারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এখন বুঝেছি, কমিউনিজ্‌ম তাঁর প্রাণের জিনিস নয়, মুখের কথা মাত্র। তিনি তাঁর শিক্ষা এবং চিন্তার মারফৎ—অর্থাৎ অ্যাকাডেমিক্যালি—কমিউনিজ্‌মের যে অনিবার্য্যতা অনুভব করেছিলেন, তাই ওজস্বিনী ভাষায় ব'লে বেড়িয়েছেন সভায় সভায়, কিন্তু আসলে অর্থাৎ মনে-প্রাণে তিনি একজন অ্যারিস্টক্র্যাট, ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত-পালিত মতিলাল নেহেরুর একমাত্র পুত্র, নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর মন যে ছাঁচে ঢালা তা আমীরী ছাঁচ। তাই হেড এবং হার্টের সঙ্গে তাঁর এত বিরোধ এবং তাই তাঁর কমিউনিজ্‌মের এত বক্তৃতা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত বাপুজীর কাছে তাঁকে হার মানতে হয়েছে। সুভাষবাবুর সঙ্গে যদিও আমার মতের পুরোপুরি মিল নেই, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে বাহাদুরি দিই আমি। মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহের ধ্বজাটা তিনি বরাবর উঁচু ক'রেই রাখতে পেরেছেন। আমার নিজেরই অতীত মাঝে মাঝে ভীত ক'রে তোলে আমাকে। যে ক্যাপিটা-লিজ্‌মের বীজ আমার রক্তধারায় সুপ্ত আছে, তা একদিন জেগে উঠে আমার এতদিনকার গড়া আদর্শের অট্টালিকায় ফাটল ধরিয়ে দেবে না কি, কে জানে! সান্ত্বনা পাই টল্‌স্টয় এবং আরও অনেক বড়লোকের কথা ভেবে, যাঁরা টাকার দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড় ছিলেন, তবু কিন্তু যাঁরা মানবজাতির কল্যাণের জন্যে চিত্তকে উন্মুখ রেখে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করতেও পশ্চাৎপদ হন নি।

স্টুডেণ্ট্‌স কন্‌ফারেন্স শেষ হবার পর আর একটা বড় রকম কাজ নিয়ে পড়লাম আমরা। এটা প্রত্যাশাই করছিলাম। জামসেদপুর স্ট্রাইক। এর ইন্ধন আগে থেকেই যুগিয়ে রেখেছিলাম আমরা। গর্কির 'মাদার' যদি প'ড়ে থাক, তা হ'লে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতির ধারা অনেকটা বুঝতে পারবে। ঠিক অমনই ক'রে লুকিয়ে প্যাম্‌ফ্লেট বিলি ক'রে আসতাম, ওই রকম লুকিয়েই মীটিং করতে হ'ত। গালাগালি তো বটেই, মারও খেতে হয়েছে একবার। এই

-.য়েই ভাল ক'রে পুলিসের নজরে পড়ি। আমাদের চেষ্টা কিন্তু সার্থক হয়েছিল। এক কথায় ১৮০০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘট ক'রে বসল। কিন্তু তারপরই মুশকিল হ'ল। সেই চিরন্তন মুশকিল। ধর্ম্মঘট ভাঙবার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষের প্রাণপণ চেষ্টা তো ছিলই, দেশের অনেক নেতাও চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে এটা না টেকে। টাটা স্বদেশী প্রতিষ্ঠান, তাকে ভাঙবার চেষ্টা তো স্বদেশ-দ্রোহিতার সামিল, এই হ'ল অনেকের ধুয়ো। নিজেদের এবং নিজেদের দলের নানা স্বার্থে জড়িত-বিজড়িত হয়ে তথাকথিত নেতারা কখন যে কোন্ কথা বলেন, তার গোপন ইতিহাস বিবৃত করবার এ স্থান নয়। যদি কোনদিন দেখা হয়, বলব। সে বড় কৌতুকজনক ইতিহাস। আর এই খবরের কাগজের কর্ত্তৃপক্ষেরা! এরা কার কাছ থেকে কত ঘুষ খেয়ে কি যে কখন লিখে বসবে, তার ঠিক নেই। বিজ্ঞাপন পাওয়ার লোভেই এরা জনসাধারণের সর্ব্বনাশ করতে পারে। তা ছাড়া ব্ল্যাক শিপ সবদেশেই থাকে, এদের দলেও ছিল, এবং সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছিল, তাদের চিনতে দেরি হচ্ছিল ব'লে। এরাই শ্রমিকদের অধীর ক'রে তুলছিল নানারকম গুজব আর ভাংচি দিয়ে গোপনে গোপনে। শেষটা এমন হ'ল, সব ভেঙে প'ড়ে বুঝি! সুভাষবাবু এলেন মিটমাট করতে। মিটমাট হ'ল, শ্রমিকদের দিক দিয়ে মোটামুটি ভালই হ'ল, অন্ততপক্ষে মন্দের ভাল বলতে হবে। কিন্তু তাও ভেস্তে গেল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে গিয়ে আবার। এই সময় একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে হতাশ হয়েছিলাম। পরে বম্বে টেক্সটাইল স্ট্রাইকেও এ জিনিসটা লক্ষ্য করেছি। নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে বৃহত্তর স্বার্থকে বলি দিতে অনেকে ইতস্তত করে না। শ্রমিকদের যতক্ষণ পর্য্যন্ত সৈনিকের মত শিক্ষা না হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের মুক্তি নেই। একতাই প্রত্যেক আন্দোলনের শক্তি। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থের কুঠার যদি তার মূলে আঘাত করে, তা হ'লে কতক্ষণ টিকবে? কিন্তু এর উপায় কি? যুক্তি দিয়ে অশিক্ষিত শ্রমিককে বোঝানো যাবে না, লাঠির গুঁতো কিংবা টাকার গুঁতো ছাড়া অন্য কিছুই তাদের ফেরাতে পারে না। কিন্তু ওই দুই বস্তুই বিপক্ষের হাতে। সুতরাং সে হিসেবে আমরা নিরুপায়। বম্বে টেক্সটাইল স্ট্রাইকে এই সত্যটা আরও মর্ম্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করলাম। মিলওয়ালাদের সঙ্গে গভর্মেণ্টও যোগ দিলেন এবং স্ট্রাইক ভাঙবার জন্যে গুণ্ডা পর্য্যন্ত আমদানি করলেন বাইরে থেকে। প্রায় সঙ্গে

সঙ্গেই লিলুয়াতে স্টাইক হ'ল, জামসেদপুরের টিন্‌প্লেট কম্পানিতে হ'ল, বজবজে হ'ল, কলকাতার জুট-মিলগুলোতে হ'ল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হ'ল না কিছুই। থেমে গেল সব। কারণ শ্রমিকরা এখনও এদেশে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সচেতন হয় নি। এখনও ভদ্রলোকের বেকার ছেলেরাই আলতো আলতো ভাবে কমিউনিজ্‌ম করছে—লাইফ-ইন্সিওরেন্সের এজেন্সি, বইয়ের-দোকান, মাসিক-পত্রের সম্পাদকি অথবা হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্‌টিস করতে করতে, এবং তারাও সবাই খাঁটি লোক নয় ব'লে শ্রমিকদেরও খাঁটি ক'রে তুলতে পারছে না।

বম্বে থেকে ফেরবার পথেই আমি ধরা পড়লাম। জেলে ব'সে এখন কমিউনিজ্‌ম নয়, ভাষাতত্ত্ব চর্চ্চা করছি। জেলে ব'সে খবরের কাগজের মারফৎ কিছু কিছু খবর অবশ্য পাই এখনও। মনে হয়, না পেলেই ভাল হ'ত। কারণ যা পাই, তা আশ্বাসজনক নয়। কমিউনিজ্‌ম এখন নাকি কংগ্রেসের অঙ্গীভূত হয়েছে, অর্থাৎ সেই দলের অঙ্গীভূত হয়েছে যাদের মূলমন্ত্র ন্যাশনালিজ্‌ম—কমিউনিজ্‌ম নয়। সাইমন কমিশনের উল্টো পিঠ হুইট্‌লে কমিশনে ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের এন. এম. যোশী আর চমনলাল গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে খুব হৈচৈ করলেন। ডাউন উইথ যোশী, ডাউন উইথ চমনলাল পর্য্যন্ত হয়ে গেল। গভর্মেণ্ট এঁদের মত লোককেই চান, আমরা তাঁদের বিচারে বে-আইনী। গান্ধী-আরুইন প্যাক্টে মহাত্মাজীর বিচারেও আমরা অস্পৃশ্য। তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যাবার আগে মুসলমানদের সঙ্গে আপোস করতে গিয়ে জিন্নার ফোর্টিন পয়েণ্ট্‌স শুনলেন, কিন্তু আমাদের একটা পয়েণ্ট শোনাও দরকার মনে হ'ল না তাঁর। দেশের লোকের কাছেও হয় আমরা হেয় না, হয় অজ্ঞাত। যাদের জন্যে আমরা এত দুঃখ বরণ করেছি, সেই সব দরিদ্র কিষাণ-মজুরেরা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবে, মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে হয়। হয়তো তারাও কিছু ভাবে না, ভাববার অবসরই নেই তাদের। নানাবিধ বোঝার ভারে তাদের পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছে রোজ, তারই যন্ত্রণায় তারা কাতর, আমরা কখন তাদের জন্যে কি একটুখানি করেছি, তা তাদের মনে থাকবার কথা নয়। তার জন্যে দুঃখ নেই, কারণ জনপ্রিয় হওয়া কোনকালেই আমাদের (অন্তত আমার) লক্ষ্য ছিল না। আমার লক্ষ্য আমার আদর্শ। সেই আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে এ খবর যখন পাই, তখনই কেবল বড় কষ্ট হয়। যেদিন খবর পেলাম, মানবেন্দ্র

রায় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, সেদিন রাত্রে ঘুম হয় নি আমার। সেই মানবেন্দ্র রায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে নানা কেলেঙ্কারির পর বেরিয়ে গিয়ে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস করলেন। গিরি আর শিব রাও গোল টেবিল বৈঠকে গেলেন। এই গিরিই আবার ফিরে এসে মাদ্রাজে গবেষণামূলক বক্তৃতাও করলেন, ভবিষ্যৎ ইণ্ডিয়ান কন্‌ষ্টিটিউশনে লেবারের স্থান কি হবে। দেশ জুড়ে কেবল গবেষণা, খোশামোদ এবং বক্তৃতা! কমিউনিস্ট নেতারাও কাজ করবেন না। অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি মিস্টার জে. এন. মিত্র এক উদাহরণও দিয়েছেন, রেলের কর্ম্মীরা স্ট্রাইক করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে, কিন্তু যমুনাদাস মেটা, গিরি আর যোশীর জন্যে তা নাকি হয় নি। কাশ্মীরে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাটা হয়ে গেল, যেটাকে ব্রিটিশভক্ত মুসলমানেরা কমিউনাল আখ্যা দিলেন, সেটার আসল কারণ যে অর্থ-নৈতিক, এ কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলবার মত কমিউনিস্ট নেতা পাওয়া. গেল না। অন্তত খবরের কাগজে কোন আভাস পেলাম না তার। জওহরলালের 'হুইদার ইণ্ডিয়া' প'ড়ে এবং নরিম্যানের মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনা শুনে কিছু তৃপ্তি পেয়েছিলাম, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে হ'ল, এ রকম মুখের বাণী তো ক্রমাগত শুনে আসছি স্থরেন বাঁড়ুয্যের আমল থেকে। সত্যি সত্যি কিছু কাজ হচ্ছে কি? কাগজে অবশ্য খবরের অভাব নেই। আনসারি আর বিধান রায় এই দুই ডাক্তারে মিলে মৃতপ্রায় কংগ্রেসকে আবার চাঙ্গা ক'রে তোলবার চেষ্টা করলেন। প্রেস্‌ক্রিপশন—কংগ্রেসকে আবার কাউন্সিলে ঢুকতে হবে। স্বয়ং মহাত্মাজী সে প্রস্তাব করলেন পাটনায়—মহাত্মাজী, যিনি সি. আর. দাশের স্বরাজ্য-পার্টির বিরোধিতা করেছিলেন! মহাত্মাজীর এবার নতুন শত্রু জুটেছে—কংগ্রেসে সোশ্যালিস্ট পার্টি। কমিউনিজ্‌মের লেবেল কপালে লাগিয়ে এঁরাও ভোট ক্যান্‌ভাস ক'রে বেড়ালেন এবং কাউন্সিলের অর্দ্ধেক আসন দখল ক'রে বসলেন। কিছুদিন পরেই এল হোয়াইট পেপার এবং সভায় সভায় কাগজে কাগজে তার বাচনিক প্রতিবাদ।...কানপুরে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্ট্রাইক ঘোষণা করলেন—একটু আশান্বিত হলাম। কিন্তু যে স্ট্রাইক দেশব্যাপী হবে ভেবেছিলাম, তা শুরু হতে না হতেই থেমে গেল গভর্মেণ্টের লাঠির চোটে। লাঠি আরও অনেককাল থাকবে, কিন্তু নূতন কর্ম্মী তো কই দেখা

যাচ্ছে না আর! যে আদর্শকে লক্ষ্য ক'রে আমরা একদিন অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, যার জন্যে কমিউনিস্ট নেতারা কোন বিপদকেই বিপদ ব'লে গণ্য করেন নি, নবনীর চিঠি পেয়ে মনে হ'ল, সে আদর্শ দেশের ছেলেদের মধ্যে আর নেই। তারা সিনিক হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস টেররিজ্‌ম কমিউনিজ্‌ম কোন কিছুরই ওপর আর আস্থা নেই তাদের। মুখে স্বীকার না করলেও, এখনও সকলেরই আস্থা ব্রিটিশ গভর্মেন্টের ওপরেই। তু ক'রে যদি ডাকে, লক্ষ লক্ষ ছেলে ছুটে যাবে চাকরি করবার জন্যে, তা সে যে চাকরিই হোক। নবনী আই. সি. এস. হতে চায়। আই. সি. এস. হয়ে মায়ের দুঃখ ঘোচাবে—এই তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা। তার চিঠি পেয়ে হতাশ হয়ে গেছি আমি। তার ওপর আমার অনেক আশা ছিল। তোমাকে আজ জেল থেকে ব'সে এই চিঠি লিখছি অনেক আশা নিয়ে। যে সাম্যের বাণী আমাদের দেশে বুদ্ধ চৈতন্য প্রচার ক'রে গেছেন, যে সাম্যের প্রেরণা আমাদের ভারতীয় সভ্যতার মর্মমূলে, যে সাম্য-দৃষ্টিতে আমরা প্রতি জীবে শিব প্রত্যক্ষ করি, সেই সাম্যবাদই একদিন মানুষের মুক্তি আনবে—এই বিশ্বাস নিয়ে অতিশয় অন্ধকার দুর্গম পথে আদর্শের মশাল জেলে একদিন যাত্রা করেছিলাম। এসে পৌঁছেছি জেলে। ছাড়া পাবার আশা নেই। হয়তো জেলেই মরতে হবে। কিন্তু ম'রেও যে শান্তি পাব না, মেজদা, যদি মরবার আগে শুনে না যাই যে, আমাদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার ভার নিয়েছে কেউ। মেকী কমিউনিস্টে দেশ ছেয়ে গেছে, অন্তত একজন খাঁটি লোকও জেলের বাইরে কাজ করছে এ খবরটুকু পেলেও আমার কারাবাস সার্থক হবে। এর জন্যে জন্মজন্মান্তর কারাবাস করতেও রাজি আছি আমি।...কয়েকদিন পরেই দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন হবার কথা। সে উৎসবে আমি থাকতে পারব না ব'লে দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আমার সব দুঃখের অবসান হবে, তুমি যদি রাজি হও। কথাটা একটু ভেবে দেখো। তুমি শক্তিমান লোক, ইচ্ছে করলে সবই করতে পার। ভেবে দেখো, বুঝলে?

প্রণত

হীরক

সমাপ্ত

"বনফুল"

শরৎ-সাহিত্য-পরিচয়

২

ইং ১৯১৯

১৯। **শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী,** ১-৭ খণ্ড। ইং ১৯১৯-১৯৩৫।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে বসুমতী কার্য্যালয় কর্তৃক শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে সুরু হয়।

১ম খণ্ড (২০ অক্টোবর ১৯১৯) :— দত্তা, পরিণীতা, শ্রীকান্ত ১ম পর্ব্ব, অরক্ষণীয়া, একাদশী বৈরাগী, মেজদিদি, মামলার ফল।

২য় খণ্ড (২০-১-২০) :— শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব, দেবদাস, দর্প-চূর্ণ, পল্লীসমাজ, বড়দিদি।

৩য় খণ্ড (১৮ জুন ১৯২০) :— স্বামী, বৈকুণ্ঠের উইল, পণ্ডিতমশাই, আঁধারে আলো, চন্দ্রনাথ, নিষ্কৃতি।

৪র্থ খণ্ড (২৫-৯-২০) :— চরিত্রহীন, ছবি, বিলাসী।

৫ম খণ্ড (২১-২-২৩) :— গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, মহেশ।

৬ষ্ঠ খণ্ড (২৫-৯-৩৪) :— শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব্ব, নব-বিধান, ষোড়শী, রমা, অভাগীর স্বর্গ।

৭ম খণ্ড (১৭-৯-৩৫) :— শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব, দেনা-পাওনা, রমা, নারীর মূল্য।

ইং ১৯২০

২০। **ছবি** (গল্প)। মাঘ ১৩২৬ (১৬ জানুয়ারি ১৯২০)। পৃ. ১০৪।

ইহাতে প্রকাশিত তিনটি গল্প—"ছবি" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত ১৩২৬ সালের পূজা-বার্ষিকী 'আগমনী'তে, "বিলাসী" ('ভারতী', বৈশাখ ১৩২৫), ও "মামলার ফল" ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত বার্ষিকী 'পার্ব্বণী'তে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

২১। **গৃহদাহ** (উপন্যাস)। ? [ফাল্গুন ১৩২৬] (২০ মার্চ ১৯২০) পৃ. ৫৩২।

ইহা ১৩২৩ সালের মাঘ—চৈত্র ; ১৩২৪ সালের বৈশাখ—আশ্বিন, অগ্রহায়ণ—ফাল্গুন ; ১৩২৫ সালের পৌষ—চৈত্র ; ও ১৩২৬ সালের আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, পৌষ—মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

২২। **বামুনের মেয়ে** (উপন্যাস) [আশ্বিন ১৩২৭]

ইহা শিশির পাবলিশিং হাউস-প্রবর্ত্তিত "উপন্যাস সিরিজ"-এর ২য় বর্ষের প্রথম উপন্যাস (নং ১৩) —১৩২৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

ইং ১৯২১

২৩। **বারোয়ারি উপন্যাস**। ইং ১৯২১ [বৈশাখ ১৩২৮]। পৃ. ২৪৪।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই বারোয়ারি উপন্যাসের কেবলমাত্র ২১শ ও ২২শ অধ্যায় শরৎচন্দ্রের লিখিত।

ইং ১৯২৩

২৪। **দেনা-পাওনা** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩০ (১৪ আগস্ট ১৯২৩)। পৃ. ৩০৭।

ইহা ১৩২৭ সালের আষাঢ়—আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র ; ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও চৈত্র ; ১৩২৯ সালের বৈশাখ—শ্রাবণ, আশ্বিন—কার্ত্তিক ও মাঘ—চৈত্র ; ১৩৩০ সালের বৈশাখ ও আষাঢ়—শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার নাট্য-রূপ 'ষোড়শী' (শ্রাবণ ১৩৩৪)।

২৫। **নারীর মূল্য** (সন্দর্ভ)। ? [চৈত্র ১৩৩০]। পৃ. ১৩৩।

ইহার প্রথম দুইটি সংস্করণ প্রকাশ করেন—এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। প্রথম সংস্করণের পুস্তকের প্রকাশকাল—১৮ মার্চ ১৯২৪ ; এই তারিখ প্রকাশকের পুরাতন খাতাপত্র হইতে পাওয়া যাইতেছে।

"নারীর মূল্য" প্রথমে শরৎচন্দ্রের বড়দিদি "শ্রীমতী অনিলা দেবী"র ছদ্মনামে ১৩২০ সালের বৈশাখ—আষাঢ় ও ভাদ্র—আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়।

'নারীর মূল্য' পুস্তকে শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার-স্বাক্ষরিত "প্রকাশকের নিবেদন" অংশটিও প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের রচনা। আমরা উহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"১৩২০ সালের 'যমুনা' মাসিকপত্রে নারীর মূল্য প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমরা এগুলি গ্রন্থাকারে ছাপিবার অনুমতি লাভ করি।

"কি মনে করিয়া যে শরৎবাবু তখন আত্মগোপন করিয়া শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে তিনিই জানেন, তবে, তাঁহার ইচ্ছা ছিল এম্‌নি আরও কয়েকটি 'মূল্য' লিখিয়া 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়া পরে যখন গ্রন্থ ছাপা হইবে, তখন তাহা নিজের নামেই বাহির করিবেন। তারপরে, এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল, না লিখিলেন তিনি আর কোন মূল্য, না হইতে পাইল 'দ্বাদশ মূল্য' ছাপা। আমরা গিয়া বলি, মশায়, আপনার দ্বাদশ মূল্য আপনারই থাক্, পারেন ত আগামী জন্মে লিখিবেন, কিন্তু যে 'মূল্য' আপাততঃ হাতে পাইয়াছি তাহার সদ্ব্যবহার করি,—তিনি বলেন, না হে, থাক্, এ আর বই করিয়া কাজ নাই। কিন্তু কারণ কিছুই বলেন না। এম্‌নি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। অথচ, তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাও নয়,—আমাদের শুধু মনে হয়, তখনকার কালে নারীরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে কথা কহিতে শিখে নাই বলিয়াই এ

কাজ তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন কাগজে কাগজে ইঁহাদের দাবী-দাওয়ার প্রাবল্য ও পরাক্রান্ত নিবন্ধাদি দর্শন করিয়া এই বৃদ্ধ গ্রন্থকার ভয় পাইয়া গেছেন। তবে, এ কেবল আমাদের অনুমান, সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে; এ বই ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ করিয়া ভাল করিয়াছি, কি মন্দ করিয়াছি তাহা পাঠক বলিতে পারেন, আমাদের ত মনে হয় মন্দ করি নাই। কিন্তু ইহার যত কিছু দায়িত্ব সে আমাদেরই।"

২৬। **নব-বিধান** (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩৩১ (অক্টোবর ১৯২৪)। পৃ. ১৩৬।

ইহা ১৩৩০ সালের মাঘ-ফাল্গুন ও ১৩৩১ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

ইং ১৯২৬

২৭। **হরিলক্ষ্মী** (গল্প)। ? [চৈত্র ১৩৩২] (১৩ মার্চ ১৯২৬)। পৃ. ৯২।

ইহাতে তিনটি গল্প আছে,—হরিলক্ষ্মী, মহেশ ও অভাগীর স্বর্গ। প্রথম গল্পটি ১৩৩২ সালের 'শারদীয়া বসুমতী'তে, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পটি যথাক্রমে ১৩২৯ সালের 'বঙ্গবাণী'র আশ্বিন ও মাঘ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়।

২৮। **পথের দাবী** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩৩ (৩১ আঁগস্ট ১৯২৬)। পৃ. ৪২৬।

ইহা ১৩২৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র ; ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ; ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-কার্ত্তিক, পৌষ-মাঘ ; ১৩৩২ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্ত্তিক-ফাল্গুন ; ও ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে সমগ্রভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

"এই উপন্যাসখানি 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৩৩ সনে ইহার ১ম সংস্করণ বাহির হইলে গভর্ণমেণ্ট এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।"... (২য় সংস্করণ)

ইং ১৯২৭

২৯। **শ্রীকান্ত**, ৩য় পর্ব্ব (চিত্র)। [চৈত্র ১৩৩৩] (১৮ এপ্রিল ১৯২৭)। পৃ. ২১৩।

ইহা ১৩২৭ সালের পৌষ-ফাল্গুন ও ১৩২৮ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' আংশিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩০। **ষোড়শী** (নাটক)। ? [শ্রাবণ ১৩৩৪] (১৩ আগস্ট ১৯২৭)। পৃ. ১৫৩।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্য-রূপ। ২১ শ্রাবণ ১৩৩৪ তারিখে নাট্যমন্দির লিঃ কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত।

১ জুন ১৯২১ তারিখের পত্রে শরৎচন্দ্র শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়কে লিখিয়াছিলেন :— "দু-এক দিন শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটারে যোড়শীর রিহার্সাল দেখ্‌বো। (বইখানা ভারতীতে যখন বার হয় নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন শিবরাম চক্রবর্ত্তী। আমি আবার আটখোল বদলে শিশিরের অভিনয়ের জন্য তৈরি করে দিয়েছি। বোধ হয় নেহাৎ মন্দ হয় নি ...)"—'মাসিক বসুমতী', মাঘ ১৩৪৪।

ইং ১৯২৮

৩১। **রমা** (নাটক)। ? [শ্রাবণ ১৩৩৫] (৪ আগস্ট ১৯২৮)। পৃ. ১৪৪।

'পল্লী সমাজ' উপন্যাসের নাট্য-রূপ। ১৯ শ্রাবণ ১৩৩৫ তারিখে আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত।

৩২। **তরুণের বিদ্রোহ** (সন্দর্ভ)। ই° ১৯২৯ (১৮ এপ্রিল ১৯২৯)। পৃ. ২৩।

"১৯২৯ সালের ইষ্টারের ছুটিতে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা।"

সরস্বতী লাইব্রেরি কর্ত্তৃক এই পুস্তিকাখানি প্রচারের তিন বৎসর পরে আর্য্য পাবলিশিং কোং ইহার পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ প্রচার করেন (২৩ আগষ্ট ১৯৩২)। এই সংস্করণে "তরুণের বিদ্রোহ" ছাড়া "সত্য ও মিথ্যা" নামে একটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধটি ১৩২৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা 'নারায়ণে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩৩। **শেষ প্রশ্ন** (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩৩৮ (২ মে ১৯৩১)। পৃ. ৪০০।

ইহা 'ভারতবর্ষে'র ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ—কার্ত্তিক, মাঘ—চৈত্র; ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন; ১৩৩৬ সালের বৈশাখ,...শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন—চৈত্র; ১৩৩৭ সালের চৈত্র ও ১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু "ভারতবর্ষে প্রকাশিত রচনার সহিত পুস্তকে মুদ্রিত উপন্যাসের যে সর্ব্বত্র মিল নাই এ কথা বলা প্রয়োজন।"

৩৪। **স্বদেশ ও সাহিত্য** (সন্দর্ভ)। ভাদ্র ১৩৩৯। পৃ. ১৫৬।

আর্য্য পাবলিশিং কোম্পানি এই পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। ইহাতে যে কয়টি প্রবন্ধ আছে, সেগুলির নাম ও সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের নির্দ্দেশ দিতেছি :—

স্বদেশ :—আমার কথা (১৯২২ সালের ১৪ই জুলাই হাবড়া জিলা কংগ্রেস কমিটির

সভাপতির পরিত্যাগ কালে পঠিত অভিভাষণ) ; স্বরাজ সাধনায় নারী (১৩২৮ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে পঠিত অভিভাষণ) সাপ্তাহিক 'বাঙ্গলার কথা', ১৩ জানুয়ারি ১৯২২ ; শিক্ষার বিরোধ (১৩২৮ সালে "গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা আয়তনে" পঠিত) 'নারায়ণ' অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২৮ দ্রষ্টব্য ; স্মৃতিকথা (১৩৩২ আষাঢ় "দেশবন্ধু স্মৃতিসংখ্যা" 'মাসিক বসুমতী' হইতে গৃহীত) ; অভিনন্দন (১৩২৮ সালের জুন মাসে, স্বর্গীয় দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবাসীর পক্ষ হইতে পঠিত অভিনন্দন)।

সাহিত্য :—ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য (১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌শাখার অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ) ; গুরু-শিষ্য সংবাদ (যমুনা, ১৩২০ ফাল্গুন ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা হইতে গৃহীত) ; সাহিত্য ও নীতি (১৩৩১ সালের ১০ই আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ) 'বঙ্গবাণী', পৌষ ১৩৩১ দ্রষ্টব্য ; সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি (১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় সভাপতির অভিভাষণ) 'মাসিক বসুমতী', চৈত্র ১৩৩১ দ্রষ্টব্য ; ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত ('ভারতবর্ষ', ১৩৩১ ফাল্গুন সংখ্যা হইতে গৃহীত) ; আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ (১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ় শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে, সাহিত্য-সভায় পঠিত সভাপতির অভিভাষণ) 'বঙ্গবাণী', শ্রাবণ ১৩৩০ দ্রষ্টব্য, সাহিত্যের রীতি ও নীতি ('বঙ্গবাণী' ১৩৩৪ আশ্বিন সংখ্যা হইতে গৃহীত) ; অভিভাষণ (১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দেশবাসীর প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর) 'কালি-কলম', আশ্বিন ১৩৩৫ দ্রষ্টব্য ; অভিভাষণ ৫৪তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতি-প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত) 'মাসিক বসুমতী', আশ্বিন ১৩৩৬ দ্রষ্টব্য ; যতীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা ; শেষ প্রশ্ন (সুমঙ্গ ভবনের শ্রীমতী… সেনকে লিখিত পত্র, 'বিজলী' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা হইতে গৃহীত) ; রবীন্দ্রনাথ (১৩৩৮ সালে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষে পঠিত) 'জয়ন্তী-উৎসর্গ', পৌষ ১৩৩৮ দ্রষ্টব্য।

৩৫। **শ্রীকান্ত,** ৪র্থ পর্ব্ব (চিত্র)।? [ফাল্গুন ১৩৩৯] (১৩ মার্চ ১৯৩৩)। পৃ. ২৪৬।

ইহা ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন চৈত্র ও ১৩৩৯ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা'র প্রথমে প্রকাশিত হয়।

৩৬। **অনুরাধা-সতী ও পরেশ** (গল্প)।? [ফাল্গুন ১৩৪০] (১৮ মার্চ ১৯৩৪)। প. ১২৩।

ইহা তিনটি গল্পের সমষ্টি। "অনুরাধা" ১৩৪০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে', "সতী" ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে, এবং "পরেশ" ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'শরতের ফুলে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩৭। **বিরাজ বৌ** (নাটক)। ? [শ্রাবণ ১৩৪১] (১৮ আগস্ট ১৯৩৪)। পৃ. ১১৪।

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের নাট্য-রূপ। ১২ শ্রাবণ ১৩৪১ তারিখে 'নব নাট্যমন্দিরে' প্রথম অভিনীত।

৩৮। **বিজয়া** (নাটক)। ? [পৌষ ১৩৪১] (২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪)। পৃ. ১৭২।

'দত্তা' উপন্যাসের নাট্য-রূপ। ৬ পৌষ ১৩৪১ তারিখে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'নব নাট্যমন্দির' কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত।

শরৎচন্দ্র মৃত্যুর পূর্ব্বে 'বিজয়া' নাটকের শেষ দুই পংক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নাংশ রচনা করিয়াছিলেন, উহা পরবর্ত্তী সংস্করণের পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে :—

রাস। দয়াল, মেয়েটি কে ?

দয়াল। আমার ভাগ্নি নলিনী।

রাস। বড় জ্যাঠা মেয়ে। (প্রস্থান)

দয়াল। (সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া) অন্তরে বড় ব্যথা পেয়েছেন। ভগবান্ ওঁর ক্ষোভ দূর করুন। গাঙ্গুলী মশাই, চলুন আমরা অভ্যাগতদের খাবার ব্যবস্থাটা একবার দেখি গে। আজকের দিনে কোথাও না অপরাধ স্পর্শ করে।

পূর্ণ। প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে কোথাও ত্রুটি নেই দয়ালবাবু—সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক আছে। (প্রস্থান)

দয়াল। (ইঙ্গিতে বরবধূকে দেখাইয়া) নলিনী, এদেরও যা হোক দুটো খেতে দিতে হবে যে মা! যাও তোমার মামীমাকে বলো গে।

নলিনী। যাই মামাবাবু—

দয়াল। আমিও যাচ্ছি চলো—(প্রস্থান)

ক্ষণকালের জন্য রঙ্গমঞ্চে বরবধূ ভিন্ন আর কেহ রহিল না।

নরেন। গম্ভীর হয়ে কি ভাবচো বলো তো ?

বিজয়া। (সহাস্যে) ভাবচি তোমার দুর্গতির কথা। সেই যে ঠকিয়ে Microscope বেচেছিলে তার ফল হলো এই। অবশেষে আমাকেই বিয়ে করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো।

নরেন। (গলার মালা দেখাইয়া) তার এই ফল। এই শাস্তি?

বিজয়া। হাঁ তাই তো। শাস্তি কি তোমার কম হলো না কি!

নরেন। তা হোক্‌, কিন্তু বাইরে একথা আর প্রকাশ কোরো না,—তাহলে রাজ্যিশুদ্ধ লোক তোমাকে Microscope বেচতে ছুটে আসবে।

উভয়ে হাস্য

নলিনী। (প্রবেশ করিয়া) এসো ভাই, আসুন Dr. Mukherji. মামীমা আপনাদের খাবার দিয়ে বসে আছেন,—কিন্তু অমন অট্টহাস্য হচ্ছিল কেন?

বিজয়া। (হাসিয়া) সে আর তোমার শুনে কাজ নেই—

যবনিকা

৩৯। **বিপ্রদাস** (উপন্যাস)। মাঘ ১৩৪১ (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫)। পৃ. ৩২৩।

ইহা ১৩৩৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র; ১৩৪০ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, আশ্বিন-ফাল্গুন; ও ১৩৪১ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ-ভাদ্র, কার্ত্তিক-মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশের পূর্ব্বে "বিপ্রদাস" ১০ম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ৩য়-৫ম বর্ষের (১৩৩৬-৩৮) 'বেণু'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

৪০। **রসচক্র** (বারোয়ারি উপন্যাস)। ১১ বৈশাখ ১৩৪৩। পৃ. ২২৯।

এই বারোয়ারি উপন্যাসের সূচনা করেন—শরৎচন্দ্র। তাঁহার লিখিত অংশটি ৩ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়া ১৩ পৃষ্ঠায় ১৪ পংক্তিতে শেষ হইয়াছে।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৪১। **ছেলেবেলার গল্প** (সচিত্র)। ? [বৈশাখ ১৩৪৫; ইং এপ্রিল ১৯৩৮]। পৃ. ১২১।

ইহাতে সাতটি গল্প আছে। গল্পগুলির নাম:—১। লালু ('মৌচাক', চৈত্র ১৩৪৪), ২। ছেলেধরা (ব্রজমোহন দাশ-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'ছোটদের আহরিকা', ১৩৪২), ৩। কোলকাতায় নতুন-দা (শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত বার্ষিকী 'গল্পের মণিমালা', ১৩৪৪), ৪। লালু (শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'সোনার কাঠি', ১৩৪৪), ৫। বছর পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী ('পাঠশালা', আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৪৪); ৬। লালু; ৭। দেওঘরের স্মৃতি ('ভারতবর্ষ', আষাঢ় ১৩৪৪)।

৪২। **শুভদা** (উপন্যাস)। ? [জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫] (৫ জুন ১৯৩৮)। পৃ. ২৫৪।

৪৩। **শেষের পরিচয়** (উপন্যাস)। ? [আষাঢ় ১৩৪৬] (৭ জুন ১৯৩৯)। পৃ. ৪১৪।

ইহার ১৫ পরিচ্ছেদ ("রাখাল এ প্রশ্নে নীরবে বাহির হইয়া গেল।" পর্য্যন্ত) প্রথমে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। ১৩৩৯ সালের আষাঢ়-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন-চৈত্র ; ১৩৪০ সালের বৈশাখ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ; ১৩৪১ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্ত্তিক, ফাল্গুন ; ও ১৩৪২ সালের বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকের বাকী অংশ শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর রচিত।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

বাংলা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের গল্প, প্রবন্ধাদি বহু রচনা এখনও বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। এই শ্রেণীর সকল রচনার সন্ধান না পাইলেও কতকগুলির নির্দেশ দিতেছি।

যমুনা:— (১) ফাল্গুন ১৩১৯ "নারীর লেখা। (শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়া, শ্রীমতী অনুরূপা ও শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য")—অনিলা দেবী। (২) আষাঢ় ১৩২০ "কানকাটা"—অনিলা দেবী। ১৩১৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত "কানকাটা" প্রবন্ধের সমালোচনা।

ভারতবর্ষ:— (১) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩...সমাজ-ধর্ম্মের মূল্য (প্রবন্ধ) —অনিলা দেবী। (২) জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪...আসার আশায় (গল্প)। (৩) কার্ত্তিক ১৩৩৯...টাউন হলে ৫৭তম জন্মদিন উৎসবে শরৎচন্দ্রের প্রতিভাষণ।

নারায়ণ:— বৈশাখ ১৩২৯...মহাত্মাজী।

বিজলী (সাপ্তাহিক):— ২৫ আশ্বিন ও ২৩ কার্ত্তিক ১৩৩০...."দিনকয়েকের ভ্রমণ-কাহিনী"।

মাসিক বসুমতী:— কার্ত্তিক-পৌষ, চৈত্র ১৩৩০ ; বৈশাখ, আষাঢ়, পৌষ ১৩৩১ ; বৈশাখ ১৩৩২..."জাগরণ" (উপন্যাস, অসম্পূর্ণ)।

হিন্দু সঙ্ঘ (সাপ্তাহিক):— ১৯ আশ্বিন ১৩৩৩..."বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা"। (১৩৩৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে পুনর্মুদ্রিত)।

প্রবর্ত্তক:— কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ সাহিত্য-সম্রাট্ শরৎচন্দ্র প্রবর্ত্তক আশ্রমে ও আলাপ-সভায়।

বিচিত্রা:— (১) ফাল্গুন ১৩৪০...."সাহিত্য-সম্মিলনের রূপ"—১৩ই মাঘ ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ। (২) আশ্বিন ১৩৪২..."বাংলা বইয়ের দুঃখ" (প্রবন্ধ)। (৩) চৈত্র ১৩৪২, বৈশাখ ১৩৪৩..."অনাগত" বা "আগামী

কাল" (উপন্যাস, অসম্পূর্ণ)। (৪) ভাদ্র ১৩৪৩…"মুসলিম সাহিত্য-সমাজ"। ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ ১৩৪৩, ১০ম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক) :— ১৬ জুলাই ১৯৩৬…কলিকাতা টাউন-হলে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ-সভার উদ্বোধন-বক্তৃতা।

কিশলয় :— আশ্বিন ১৩৪৪…মহাত্মার পদত্যাগ।

বাতায়ন (সাপ্তাহিক) :— (১) শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪৪…ভালোমন্দ (ইহা একখানি বারোয়ারি উপন্যাসের সূচনা মাত্র)। (২) ২৭ ফাল্গুন ১৩৪৪ (শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা)…ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক-সম্প্রদায়।

বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা :— আশ্বিন ১৩৪৪ (১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) …৬২তম জন্মদিন উপলক্ষে ৩১ ভাদ্র ১৩৪৪ তারিখে প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে।

ছোটদের মাধুকরী (বার্ষিকী) :—আশ্বিন ১৩৪৫…বাল্য-স্মৃতি (আলোচনা)।

বাংলার রূপ (শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৫) :— "সত্যাশ্রয়ী" (বে-আইনী ঘোষিত মালিকান্দা অভয় আশ্রমে বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র-সম্মিলনীর অধিবেশনে—১৯২৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদত্ত অভিভাষণ)।

বেণু :—(১) বৈশাখ ১৩৩৬ · যুব-সঙ্ঘ ; (২) আশ্বিন ১৩৩৬ ··নূতন প্রোগ্রাম ("শ্রীপরশুরাম" ছদ্ম নামে লিখিত সমালোচনা)।

স্বদেশী-বাজার (মাসিক) :—আশ্বিন ১৩৩৬…বর্তমান সাহিত্য (প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা)।

জয়ন্তী-উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত মানপত্রখানিও শরৎচন্দ্রের রচনা।

আত্মকথা

শরৎচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে স্থানে স্থানে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, শরৎ-জীবনীর উপকরণ-হিসাবে তাহাও উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীকান্তে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার ভূমিকায় ই. জে. টমসন্ শরৎচন্দ্রের একটি বিবৃতি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে শরৎচন্দ্রের আত্মপরিচয় আছে। উহা এইরূপ :—

In Sarat Babu's own words, 'My childhood and youth were passed in great poverty. I received almost no education for want of means. From my father I inherited nothing except, as I believe, his restles spirit and his keen interest in literature. The first made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early, and the second made me a

dreamer all my life. Father was a great scholar, and he had tried his hand at stories and novels, dramas and poems, in short, every branch of literature, but never could finish anything. I have not his work now—somehow it got lost; but I remember poring over those incomplete mss. over and over again in my childhood, and many a night I kept awake regretting their incompleteness and thinking what might have been their conclusion if finished. Probably this led to my writing short stories when I was barely seventeen. But I soon gave up the habit as useless, and almost forgot in the long years that followed that I could even write a sentence in my boyhood. A mere accident made me start again, after the lapse of about eighteen years. Some of my old acquaintances started a little magazine, but no one of note would condescend to contribute to it, as it was so small and insignificant When almost hopeless, some of them suddenly remembered me, and after much persuasion they succeeded in extracting from me a promise to write for it. This was in the year 1913. I promised most unwillingly—perhaps only to put them off till I had returned to Rangoon and could forget all about it. But sheer volume and force of their letters and telegrams compelled me at last to think seriously about writing again. I sent them a short story, for their magazine *Jamuna.* This became at once extremely popular, and made me famous in one day. Since then I have been writing regularly. In Bengal perhaps I am the only fortunate writer who has not had to struggle.

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভ'রে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম; আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কত বার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যান নি এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয়

সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে সুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প রচনা অ-কেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তার পর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোন কালে একটি লাইনও লিখেছি সে কথাও ভুলে গেলাম।

আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য কোন রকমে একবার রেঙ্গুন পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত "যমুনা"র জন্য একটা ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাংলার পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তার পর আমি অদ্যাবধি নিয়মিত-ভাবে লিখে আসছি। বাঙ্গলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান্ লেখক যাকে কোন দিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি।" ('বাতায়ন', শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা, ১৩৪৪)

* * *

১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে যে সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, শরৎচন্দ্র তাহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে নিজের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

…"ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধ'রে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বা'র হই, ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ-যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান ক'রে দেন। সেখানে আর এক দফা সম্বর্দ্ধনা লাভের পর আবার বোধোদয়, পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাগরেদি সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন সম্বর্দ্ধনার ঘটা—এমনি ক'রে বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল।

এলাম সহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্তি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ।

এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তার পরে বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য আছে।

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য; সেখানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকীল হতে; এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ; কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় ক'রে তিনি একদিন পড়ে শুনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয় বার পরিচয় ঘটলো, এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এর পরে এ বাড়ীর উকীল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইল না; আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরোনো পল্লীভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম 'হরিদাসের গুপ্ত কথা' আর বেরোলো 'ভবানী পাঠক।' গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হলো আমাকে বাড়ীর গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে। একই স্কুলে বেশী দিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টার মশাই স্নেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হলো সহরে। বলা ভাল, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয় নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না, প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হ'য়ে গেল। বোধ হয়, এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক্ দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু চেষ্টার দিক্ দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তার পরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সে দিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনো দিন ভুলবো না। কোনো কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের

মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, একথা সত্য নয়। ওইতো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এতবড় সম্পদ্ সে দিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই গেলাম যে, জীবনে একটা ছত্রও কোনো দিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কি করে যে নবীন বাংলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো, আমি তার কোনো খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনো দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্য; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বার বার ক'রে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে Art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটেছে কি না,—এ সব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হোল না। আর কোথাও না হোক্, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।"—('জয়ন্তী-উৎসর্গ')।

* * *

ভাগলপুরে সাহিত্য-সভা গঠন ও তাঁহার প্রাথমিক রচনা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র "বাল্য-স্মৃতি" প্রবন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"ভাগলপুরে আমাদের সাহিত্য-সভা যখন স্থাপিত হয় তখন আমাদের সঙ্গে শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ ভট্ট বা তাঁর দাদাদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। বোধ হয় একটা কারণ এই যে তাঁরা ছিলেন বিদেশী এবং বড়লোক।...স্বর্গীয় নফর ভট্ট ছিলেন সেখানকার সবজজ। তার পরে কি করিয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের ক্রমশঃ জানা-শুনা এবং

ঘনিষ্ঠতা হয় সে-সব কথা আমার ভালো মনে নাই। বোধ হয় এই জন্ত যে, ধনী হইলেও ইঁহাদের ধনের উগ্রতা বা দাম্ভিকতা কিছুমাত্র ছিল না। এবং আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় এইজন্ত বেশি যে, ইঁহাদের গৃহে দাবা-খেলার অতি পরিপাটি আয়োজন ছিল। দাবা-খেলার পরিপাটি আয়োজন অর্থে বুঝিতে হইবে—খেলোয়াড়, চা, পান ও মুহুর্মুহু তামাক।

সম্ভবত: এই সময়েই···শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ আমাদের সাহিত্য-সভার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হন। আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সভায়···গুরুগিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোন কালেই ঘটে নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন একটা নির্জ্জন মাঠের মধ্যেই বসিত। জানা আবশ্যক যে সে-সময়ে সে দেশে সাহিত্য-চর্চ্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল। এই সভায় মাঝে মাঝে···কবিতা পাঠ করা হইত। গিরীন পাড়তে পারিত সব চেয়ে ভালো, সুতরাং এ-ভার তাহার উপরেই ছিল, আমার পরে নয়। কবিতার দোষগুণ বিচার হইত এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য-সভার মাসিক-পত্র 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইত। গিরীন ছিলেন একাধারে সাহিত্য-সভার সম্পাদক, 'ছায়া'র সম্পাদক ও 'অঙ্গুলি-যন্ত্রে' অধিকাংশ লেখার মুদ্রাকর। এ সম্বন্ধে এই আমার মোটামুটি মনে পড়ে।

সাহিত্য-সভার সভ্যগণের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন···বিভূতি। যেমন ছিল তাঁর পড়াশুনা বেশি, তেমনি ছিলেন তিনি ভদ্র এবং বন্ধু-বৎসল। সমজদার সমালোচকও তেমনি।···

ছেলেবেলায় লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সবগুলার নাম আমার মনে নাই। শুধু···দুখানা বইয়ের নষ্ট হওয়ার বিবরণ জানি। একখানা—'অভিমান' মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা,—অনেক বন্ধুবান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়ল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেক দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না।···

দ্বিতীয় বই 'শুভদা'। প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই, অর্থাৎ 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' প্রভৃতির পরে।"—('ছোটদের মাধুকরী', আশ্বিন ১৩৪৫)

ভ্রম-সংশোধন :— গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত ৬-সংখ্যক পুস্তক 'পরিণীতা'র কোন নাট্যরূপ প্রকাশিত হয় নাই; ২৩৩ পৃষ্ঠার প্রথম দুই পংক্তি বর্জ্জনীয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সান্ত্বনা

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিলাম। স্কুলের পর স্কুল-কমিটির মীটিং ছিল। নানা বিষয়ের আলোচনা হইল। তাহা ছাড়া, কমিটির মেম্বাররা সকলেই বৈকালিক চা-পানপর্ব্ব শেষ করিয়া আসিয়াছিলেন। কাজেই ঢিমা তালে আলোচনা চালাইতে লাগিলেন, এবং কাজের বিষয় ছাড়াও অনেক বাজে বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। ফলে দেরি হইয়া গেল। সকাল দশটায় দুই মুঠা নাকে মুখে গুঁজিয়া স্কুলে গিয়াছি, স্কুলে এক কাপ চা খাইয়াছি মাত্র; ক্ষুধায় পেটের নাড়ীগুলি পাক দিতেছিল। গৃহিণীর কাছে আজিকার খাটুনির ফিরিস্তি দিয়া, রুটি ও চিনির সঙ্গে কেমন করিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ করুণা ও এক কাপ চায়ের বদলে দুই কাপ চা আদায় করিয়া লইব, তাহাই মনে মনে জল্পনা করিতে করিতে বাড়ি ফিরিলাম।

বাড়ি ফিরিতেই গৃহিণী কহিলেন, শুনছ, বাজারে নাকি অনেক ইলিশ নেমেছে, আট আনা দশ আনায় এক-একটা; পাড়ায় সবাই এক-একটা এনেছে; রাস্তায় যে যাচ্ছে, তারই হাতে একটা ক'রে মাছ। ছেলে দুটিকে এত ক'রে বললাম, গেল না। আমার যেমন অদেষ্ট, তেমনই তো ছেলে! তা তুমি একবার যাও দেখি চট ক'রে। এই তো বাজার! যেতে আসতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না। ততক্ষণ আমি খাবার চা গরম ক'রে রাখছি।—বলিয়া প্রতিবাদের অবসর না দিয়া বাজারের থলিটি আনিয়া হাতে তুলিয়া দিলেন। পরক্ষণেই মুখের দিকে তাকাইয়া রোষগূঢ়কণ্ঠে কহিলেন, তুমিও যাবে না তো? গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইলাম, থমথমে মুখ; চোখের কোণে বিদ্যুৎ জমিতে শুরু করিয়াছে, বর্ষণের দেরি নাই। সোৎসাহে কহিলাম, যাব না! বল কি? এখনই যাচ্ছি। জামাকাপড়গুলো ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে, বদলে নিয়েই যাচ্ছি।

আজ দুই মাস ধরিয়া বাজারে মাছ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মাছ কণ্ট্রোল করিয়াছেন। ফলে, মেছুনীরা বাজারে মাছ বিক্রয় করা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যাহাদের মাছ খাইবার বাসনা হয়, তাহাদের জেলেপাড়ায় গিয়া, মেছুনীদের সাধ্যসাধনা করিয়া, ন্যায্য দামের চারগুণ দাম দিয়া মাছ আনিতে হয়। কাজেই গৃহিণীদের মেজাজ দিনরাত গনগন করিতেছে এবং গৃহকর্ত্তারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

থলিটি হাতে ঝুলাইয়া বাহির হইলাম। অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। রাস্তায় আলোর বালাই নাই। রাস্তার ধারে ধারে সিকি মাইল অন্তর, এক-একটি করিয়া কাঠের ল্যাম্পপোষ্ট খাড়া করা আছে, প্রত্যেকটির মাথায় কাচের আবরণীও আছে, কিন্তু কখনও নিয়মিতভাবে আলো জ্বালা হয় না। ইহাই এই শহরের—তথা এই জেলার ভাগ্যলিপি। শহরের বাহিরে দাঁড়াইয়া যেদিকে তাকাইবেন, দিগন্তপ্রসারিত মাঠ, কিন্তু শস্য জন্মায় না; যেখানে সেখানে বড় বড় ফলের বাগান, কিন্তু ফল ধরে না; শহরের দুই পাশে দুইটি নদী,

কিন্তু বর্ষার মাস দুই ছাড়া সারা বৎসর মরুভূমির মত ধুধু করে, মিউনিসিপ্যালিটি বা অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানের যাহারা কর্ণধার, তাহারা দেখিতে শুনিতে মানুষ, কিন্তু তাহাদের বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই, এখানে আলোক-স্তম্ভের মাথায় আলো জ্বলিবে না, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ?

বাড়ি হইতে বাজার প্রায় এক মাইল। রাস্তার ধার দিয়া চলিয়াছি। সামনে ও পিছন হইতে মাঝে মাঝে মিলিটারি লরি গর্জ্জনে পীলা চমকাইয়া দিয়া পার হইয়া যাইতেছে। রাস্তাটি পিচের তৈয়ারি, কিন্তু দুই পাশ ধূলায় ভর্ত্তি। জুতা প্রায় সমস্তটা ধূলায় ঢুকিয়া যাইতেছে ও মধ্যে ধূলা ঢুকিতেছে। তাহার উপর, জুতা জোড়াটি পুরাতন ; বহুদিনের পরিচয়-হেতু আচরণে শৈথিল্য দেখা দিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে পা হইতে খুলিয়া যাইবার চেষ্টা, জোর করিয়া আটকাইয়া রাখিতেছি। এ যে কত কঠিন ধরনের কসরৎ, ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

রাস্তায় একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। বাম হাতে একটি সুঠাম চেহারার ইলিশমাছ ঝুলিতেছে। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, কি মাষ্টার মশায়, থলি হাতে কোথায় ? কহিলাম, বাজারে। চমৎকার মাছটি তো ! ভদ্রলোক মাছটি তুলিয়া, ঠিক আমার নাকের সামনে ঝুলাইয়া গদগদকণ্ঠে কহিলেন, চমৎকার মাছ, না ? পরম আত্মপ্রসাদের সহিত কহিলেন, সত্যি। মাছটি নামাইয়া লইয়া কহিলেন, অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি মশায়। পয়সা থাকলেই হয় না আজকাল, পায়া-বল চাই। মাছওয়ালার ভগ্নীপতি আমার মক্কেল (ভদ্রলোক মোক্তার)। মাছটি আবার তুলিয়া ধরিয়া ডান হাতের আঙুলগুলি অতিশয় মমতার সহিত মাছটির পেটে বুলাইয়া কহিলেন, পেট দেখছেন, ডিমে টইটুম্বুর। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাজারে আর আছে মাছ ? ভদ্রলোক মাথাটি একবার এপাশে একবার ওপাশে নাড়িয়া কহিলেন, খুব সম্ভব নেই। ভুরু নাচাইয়া চোখ দুইটা চাড়াইয়া কহিলেন, থাকবে কি ক'রে মশায় ! দুশো লোক মুখিয়ে ছিল, মাছের ঝাঁকা নামাতে না নামাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব সাবাড়। মাছ খেতে না পেয়ে সবাই যেন হন্যে হয়ে উঠেছে। ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলাম, সত্যি বলছেন, একেবারে নেই ? ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিলেন, মিথ্যে ব'লে লাভ ? বিশ্বেস না হয়, গিয়ে দেখুন। চলিবার উপক্রম করিতেই ভদ্রলোক হাত ধরিয়া থামাইয়া কহিলেন, দেখুন, বাজারে পাবেন না নিশ্চয়। তবে এক কাজ করতে পারেন। মাছ বাজারে আসতে না আসতেই জেলেরা আদ্ধেক সরিয়ে নেয়। যদি জেলেপাড়া যেতে পারেন, তা হ'লে একটা-আধটা পেতেও পারেন। তবে দর সুবিধে পাবেন না। তা না হোক, মাছ তো পাবেন। তাই করিগে।—বলিয়া আবার চলিবার উপক্রম করিতেই ভদ্রলোক কাঁধে হাত দিয়া থামাইয়া কহিলেন, কিসের দরই বা সুবিধে মশায় ? আলু

আড়াই টাকা সের, বেগুনের সের বারো আনা, ঝিঙের মত জিনিস,' তাও এক সের কিনতে যান, আটটি গণ্ডা পয়সা গুনে দিতে হবে। বাঁচবেন কি খেয়ে বলুন? আর বেঁচে আছি ব'লেও তো বিশ্বেস হয় না; মাঝে মাঝে নিজেকে চিমটি কেটে দেখি।—বলিয়া আমাকে একটি চিমটি কাটিবার উপক্রম করিতেই সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, সত্যি, যা বলেছেন। আচ্ছা, চলি, দেখি একটু চেষ্টা ক'রে ভদ্রলোক কহিলেন, আচ্ছা, আসুন। যা বললাম তাই করুন গিয়ে।

মাছের বাজারে গিয়া দেখিলাম, ভিড় একেবারে নাই। জনকয়েক লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খুব সম্ভব মাছ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে; একটু দূরে কতকগুলা লোক জড়ো হইয়া কি কিনিতেছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাছ কি পাওয়া যাবে না? লোকটা কহিল, কোথায় পাবেন মাছ? সে না আসতে আসতেই সাবাড়, তবে আঁশ, পোঁটা কিনতে চান তো যান ওখানে।—বলিয়া নাক উঠাইয়া অদূরবর্তী জনতাকে নির্দেশ করিল। একজন কহিল, আপিসে যদি চাকরি-বাকরি করেন তো, মাছের আশা ছেড়ে দিন। বেলা তিনটে থেকে যদি এখানে হাঁটু গেড়ে ব'সে থাকতে পারেন, তবেই মাছ পাবেন, না হ'লে।— বলিয়া মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া বক্তব্য শেষ করিল। আর একজন কহিল, আর যদি জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হন, ছোটখাটো হাকিমও হন, নেহাৎপক্ষে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হন, তা হ'লে আর বাজারে আসতে হবে না কষ্ট ক'রে, বাড়িতে ব'সেই মাছ পাবেন। আর একজন কহিল, সত্যি। ওদের বোধ হয় কোন অসুবিধেই নেই; না হ'লে লোকের এত কষ্ট দেখেও তো গা-গোছ নেই কারও! ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে ব'সে ব'সে মজা দেখছে সব। একজন উপদেশ দিল, হাতে পয়সা যদি বেশি থাকে তো জেলেপাড়ায় গিয়ে দেখতে পারেন।

ইহাই চিন্তা করিতে করিতে চলিয়া আসিলাম। জেলেপাড়া অনেক দূর। এমন সময়ে সেখানে যাওয়া ঠিক হইবে কি? অথচ খালি হাতে বাড়ি ফিরিতেও সাহস হইতেছে না। গৃহিণীকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব? এত আশা করিয়া পাঠাইয়াছেন। একে তো মেজাজ এমনিই আগুন হইয়া আছে, তাহাতে ইন্ধন যোগানো নিরাপদ হইবে না।

পায়ে পায়ে কতকটা আগাইয়া আসিতেই একটা গলির মুখে দেখিলাম, একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া একটি লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছে। সামনের দোকানে ডে-লাইট জ্বলিতেছে, তাহারই আলো মেয়েটির মুখে গায়ে পড়িয়াছে। মেয়েটির বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি হইবে না; ঈষৎ স্থূলাঙ্গী; মোটামুটি সুন্দরী; চোখ দুইটি ডাগর, কথা বলিবার সময়ে ঢুলাইবার চেষ্টা করিতেছে; পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিয়াছে, সামনে পাতা-কাটা, মাথায় উবুঝুঁটি; দুই কানে সোনারি টৌপ; হাতে একহাত করিয়া ঝলমলে সোনার (আসল না কেমিক্যাল, কে জানে) চুড়ি। এই কন্ট্রোলের দিনেও পরনে পুরা মাপের মিহি শাড়ি।

মেয়েটির হাবভাব ভাল নয় দেখিয়া সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই মেয়েটি কহিল, কিগো বাবু, কি চান? চমকিয়া উঠিলাম। মেয়েটি কি ভাবিয়াছে আমাকে? আমি একজন ভদ্রলোক, বিশেষ করিয়া শিক্ষক, গৃহিণীর কৃপায় হাতে থলি উঠিয়াছে বলিয়া আমার চালচলন এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাকে এই ধরনের সন্দেহ! মুখ ফিরাইয়া ভারী গলায় কহিলাম, কিছু না। মেয়েটি একগাল হাসিয়া কহিল, আমাদের বাবু যে! দুই পা আগাইয়া আসিয়া মুখচোখ ঘুরাইয়া আবদারের সুরে কহিল, আমাকে চিনছেন না বাবু? আমি আপনাদের গুরুদাসীর মেয়ে হরিদাসী। পুরনো খদ্দের আপনি আমার; আগে এলে আমার কাছ ছাড়া কোথাও দাঁড়াতেন না পর্য্যন্ত। অনেকদিন আসেন নি কিনা, তাই ভুলে গেছেন।

সামনের লোকটা মুখের চেহারা গম্ভীর করিয়া তুলিয়া আমার দিকে কটমট করিয়া তাকাইল। ভয় পাইয়া কহিলাম, আমি তো—আমি তো আসি না কখনও, আজই এসেছি মাছ কেনবার জন্যে। মেয়েটি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, মাছের কথাই তো বলছি বাবু! আপনি আবার কি কেনার কথা ভাবছেন?—বলিয়া লোকটার দিকে কটাক্ষ করিতেই লোকটা হাসিয়া কহিল, তাই বলুন। মেয়েটি কহিল, মাছ চাই নাকি আপনার? তা হ'লে আসুন আমার সঙ্গে। ঘরে মাছ আছে আমার, টাটকা মাছ, এখনও ধড়ফড় করছে।

মেয়েটির পিছনে পিছনে চলিলাম। লম্বা সরু গলি, অন্ধকার। মেয়েটি হনহন করিয়া চলিল, আমিও যথাসাধ্য তাহার পাছু পাছু চলিলাম।

মনে হইতে লাগিল, কাজটা ভাল হইতেছে কি? মেয়েটির হাবভাব ভাল নয়; কোথায় লইয়া যাইতে কোথায় লইয়া গিয়া উঠাইবে, সঙ্গে অবশ্য টাকাকড়ি বেশি নাই, কিন্তু লোকে দেখিলে কি বলিবে? আমি যে মাছের জন্যই উহার পাছু পাছু ধাওয়া করিয়াছি, তাহা কি কেহ বিশ্বাস করিবে?

একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম, মেয়েটি মুখ ফিরাইয়া কহিল, আসুন, আর একটু গেলেই আমাদের পাড়া। একটু থামিয়া দাঁড়াইতেই সঙ্গ লইলাম। মেয়েটি ঢিমা তালে চলিতে লাগিল, কহিল, কি ভাবছেন অত? সঙ্গে যেতে ভয় করছে বুঝি? ভয় কিসের? অতবড় জোয়ান লোক আপনি। মুখ ফিরাইয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, তা ছাড়া কতদিনের চেনা, আপনি 'চিনি না' বললে আমি শুনব কেন? মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিলাম, নীরসকণ্ঠে কহিলাম, ভয় কিসের? তবে দেরি হয়ে যাচ্ছে কিনা! মেয়েটি কহিল, আমার তো আর দোষ নেই; নিজেই দেরি ক'রে এসেছেন, গিন্নী রাগ করেন তো বুঝিয়ে বলবেন।

বড় রাস্তা পার হইয়া আর একটা গলিতে ঢুকিলাম, এবং আরও কতকটা গিয়া

জেলেপাড়ায় পৌঁছিলাম। একটা পুকুরের চারিপাশে জেলেদের বস্তি। পুকুরের পাড়ে কয়েকটা জাল শুকাইতেছে। একটা ঘরের বাহিরের দাওয়ায় জনকয়েক লোক গোল হইয়া মুখামুখি বসিয়া খুব সম্ভব গাঁজা খাইতেছে। মেয়েটির সঙ্গে আমাকে যাইতে দেখিয়া একজন হাঁক দিয়া কহিল, কে র‍্যা হরিদাসী? মেয়েটা খনখন করিয়া জবাব দিল, কে আবার? আমাদের এক বাবু, পুরনো খদ্দের, 'মাছ কিনতে এসেছে। লোকটা কড়া গলায় কহিল, দর কম করিস না ব'লে দিচ্ছি, যে বাবুই হোক, ভারি তো পেয়ারের বাবু! আর একজন লোক শ্লেষের স্বরে কহিল, রাতের বেলায় মাছ কিনতে এসেছে! আর একজন লোক এতক্ষণ কাসিতেছিল, কাসির টানেই কহিল, মাছ কিনতে এসেছে না আর কিছু! বজ্জাত মাগীগুলো যা-তা শুরু করেছে পাড়ায়।

মাথা নীচু করিয়া পার হইয়া গেলাম। অপমানে সারা মন জ্বলিতে লাগিল। পৃথিবীর যেমন কাণ্ড! দিন কয়েক মাছ খাইতে না পাইয়া একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। ভাবিতেছেন, আয়তির আয়ুটুকু ফুরাইয়া আসিল বলিয়া! তবু পাড়ার অন্য মেয়েদেরও একই অবস্থা বুঝিয়া এতদিন কোনমতে সহ্য করিতেছিলেন; আজ অন্য সকলের মৎস্যপ্রাপ্তির সংবাদ শোনা অবধি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছেন না।

মেয়েটি হাসিয়া কহিল, কি সন্দেহ করছে দেখছেন? রাত ক'রে এসেছেন কিনা! এত রাত্রে মাছ কিনতে কেউ আসে না এ পাড়ায়। কহিলাম, আর কতদূর তোমাদের বাড়ি, বল দেখি? মেয়েটি মুখের ইঙ্গিতে কহিল, ওই যে।

বাড়ির দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতেই মেয়েটি কহিল, ভেতরে আসুন না। আমাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া চোখমুখ ঘুরাইয়া কহিল, হরিদাসী গরিব হ'লেও শহরের অনেক বড় বড় লোকের পায়ের ধুলো পড়ে তার ঘরে, আপনার লজ্জা কিসের? কথার ধরন দেখিয়া গা ঘিনঘিন করিয়া উঠিল; কিন্তু কথা-কাটাকাটি করিতে ইচ্ছা হইল না। নীরবে তাহার পিছু পিছু গিয়া উঠানে দাঁড়াইলাম।

বাড়িটি নেহাৎ ছোট, পাশাপাশি দুইটি কুঠুরি, সামনে এক টুকরা উঠান। উঠানে পা দিতেই ঘরের ভিতর হইতে একটা বুড়ী কাঁপা গলায় ডাক দিল, কে র‍্যা? দাসী? এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলি লা?—বলিয়া টানিয়া টানিয়া কাসিতে লাগিল। হরিদাসী ফিসফিস করিয়া কহিল, মা, কেলো রুগী, সারারাত জেগে ব'সে থাকে আর কাশে, আর কেউ এলেই হাঁক পাড়ে, কে এল লা! কারও ঘরে আসবার যো নেই বুড়ীর জ্বালায়। তা আপনি একটু দাঁড়ান এখানে, আমি মাছ আনছি।—বলিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

আমি একা দাঁড়াইয়া রহিলাম। অন্ধকার ইহার মধ্যে বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। ঘরের পিছনে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ। গাছের মাথায় অসংখ্য জোনাকী জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে। একটা বাদুড় সোঁ-সোঁ শব্দে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া সশব্দে

গাছের ডালে ঝুলিয়া পড়িল। ইহার মধ্যে আরও অনেকে আসিয়া জুটিয়াছে নিশ্চয়ই। তাহাদের ফল খাওয়ার শব্দ, ডানা ঝাপটানোর শব্দ ও মাঝে মাঝে পরস্পর কলহের শব্দ শোনা যাইতেছে। পাড়ার কয়েকটা কুকুর একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া সুরের কারিগরি করিয়া চুপ করিল। হরিদাসী এতক্ষণ ধরিয়া কি করিতেছে? মাছ তো বাড়িতে মজুত আছে, এত দেরি হইবার কারণ কি? মনে মনে ভয় হইতে লাগিল। হরিদাসী বলিয়াছে, শহরের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের আনাগোনা আছে তাহার বাড়িতে। এ সময়ে কেহ আসিয়া পড়িয়া আমাকে এ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর যাহাই করুক, প্রশংসা করিবে না।

হরিদাসী ফিরিয়া আসিল। ডান হাতে একটি ডিবরি, বাম হাতে পাতায় সযত্নে মোড়া একটি মাছ। কাছে আসিয়া কহিল, থলির মুখটা একটু খুলুন, আমি রেখে দিই, আপনি আবার হাত দেবেন কেন? থলির মুখটা খুলিয়া হরিদাসীর সামনে ধরিতেই, সে থলির মধ্যে হাত ঢুকাইয়া মাছটি রাখিল। এই সময়ে তাহার হাতের সঙ্গে আমার হাত ঠেকিল। হাতটি বাহির করিয়া লইয়া হরিদাসী আমার মুখের দিকে তাকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

সেই স্পর্শে, সেই হাসিতে বুকের ভিতরটায় দাপাদাপি শুরু হইল। কণ্ঠে স্বর ফুটিতে চাহিল না; গলা ঝাড়িয়া কোনমতে কহিলাম, দাম? হরিদাসী মিষ্ট হাসিয়া কহিল, দাম তো জানেন, গোটা সাত সিকে সের, কাটা দু টাকা। বুকের দাপাদাপি এক মুহূর্তে বন্ধ হইয়া গেল; বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, সে কি! শুনেছি সস্তা। হরিদাসী গম্ভীর হইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ মৃদু কণ্ঠে কহিল, ভুল শুনেছেন, মাছ বোধ হয় অনেকদিন কেনেন নি। অপ্রতিভভাবে কহিলাম, বেশ, কত দাম হবে, বল? হরিদাসী কহিল, মাছটা এক সেরের চেয়ে কিছু বেশি, তা পুরনো খদ্দের আপনি; আপনার সঙ্গে চুল-চেরা হিসেব করা কি চলে, আপনি সাত সিকেই দিন।—বলিয়া বাম হাতটি পাতিল।

আমি টাকা দুইটি পকেট হইতে বাহির করিয়া হাতে দিলাম। সে টাকা-সুদ্ধ হাতটি সরাইয়া লইয়া কহিল, খুচরো পয়সা তো আমার কাছে নেই। আপনি যে দিন ইচ্ছে বাজারে এসে নিয়ে যাবেন। তারপর চোখ ঘুরাইয়া মনোমোহিনী হাসি হাসিয়া আবদারের সুরে কহিল, আর যদি বলি, এমন অসময়ে টাটকা মাছ দিলাম, বাকি পয়সাটা বকশিশ দিয়ে যান, আপনি কি না দিয়ে পারবেন?

পয়সা ফেরত পাইবার আশা ত্যাগ করিলাম। বুঝিলাম, হাসি চাহনি ও স্পর্শের দাম দিয়া হরিদাসী মাছের ন্যায্য দামের দ্বিগুণ এবং তদুপরি বাকি পয়সাগুলি আত্মসাৎ করিয়া লইল। তবু বদান্যতা দেখাইবার জন্য কহিলাম, বেশ তো, দিলাম বকশিশ। হরিদাসী এক গাল হাসিয়া কহিল, আপনাদের মত বাবু কি সহজে জোটে! আমার কত ভাগ্যি!

বুড়ী হাঁক দিল, এতক্ষণ কার সঙ্গে গ্যাজর গ্যাজর করছিস লা? হরিদাসী খনখন করিয়া কহিল, কার সঙ্গে আবার? মাছ কিনতে এসেছে, আমাদের সেই—(আমাদের পাড়ার নাম করিয়া)—পাড়ার বাবু; তোর মনে নেই?

বুড়ী কহিল, তা দিয়ে দে মাছ; এত গল্প কিসের? হরিদাসী চোখমুখ কুঁচকাইয়া রাগের ভঙ্গীতে কহিল, অ্যাঁ মরণ! আমার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া ফেলিয়া নাকী সুরে কহিল, দেখুন না! তারপর কণ্ঠস্বর তুলিয়া কহিল, গল্প কে করছে? দাম নেব না? বুড়ী বলিতে লাগিল, দাম নিবি বইকি। আজকালকার মাছ, হীরে-জহরতের চেয়েও বেশি, দাম নিবি না?

চলিয়া আসিবার সময়ে হরিদাসী দরজা পর্যন্ত পিছু পিছু আসিল, এবং রাস্তায় নামিতেই কহিল, দরকার হ'লেই আসবেন বাবু। ভুলবেন না।

২

বাড়ি ফিরিতেই গৃহিণী কহিলেন, হ্যাঁ গা? এত দেরি হ'ল? তিন বার চায়ের জল চড়ালাম, নামালাম; রুটি ঠাণ্ডা কাঠ হয়ে গেল; কোথায় গিছলে? মাছ পেয়েছ? জবাব দিলাম না। এমন একটা দুরূহ-কার্য-সিদ্ধির জমাট গাম্ভীর্যকে দুই-চারটা ফাঁকা কথায় হালকা করিয়া দিবার ইচ্ছা হইল না। গৃহিণী রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া পরদিন সকালের জন্য তরকারি কুটিয়া রাখিতেছিলেন; তাঁহার সামনে থলিটা নামাইয়া দিয়া মুখ ও চোখের ইঙ্গিতে জানাইলাম, আনিয়াছি, খুলিয়া দেখিতে পার। গৃহিণী কহিলেন, দেখে শুনে এনেছ তো? মেছুনীরা যা চোরনী, দরে বা ওজনে ঠকায় নি তো? অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিলাম, আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছ নাকি? বাজার যাই না তাই, না হ'লে বাজার যা করতে পারি, তোমাদের গজুবাবুও (গজুবাবু একজন প্রতিবেশী, ভাল বাজার করার জন্য পাড়ায় অত্যন্ত সুনাম) তা পারবেন না, কলেজের মেসে থাকতে আমার নাম ছিল। গৃহিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, ও তো অনেক বার শুনেছি, দেখে যাওয়া আর ভাগ্যে ঘটল না।

গৃহিণীর কথায় ও হাসিতে পিত্ত জলিয়া উঠিল। মেয়েদের কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না। ভাবিতেছে, বাজারে পা দিবামাত্র মাছ আপনা হইতে লাফাইয়া আসিয়া থলির মধ্যে ঢুকিয়াছে। এই অন্ধকার রাত্রে কেমন করিয়া যে মাছটি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, ফলাও করিয়া বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না; কহিলাম, বাজারে যা ভিড়, সেখানে নাক গলাবারও কারও সাধ্য নেই। এই প্রসঙ্গে মোক্তারবাবুর বর্ণনাটি নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলিয়া চালাইয়া দিয়া কহিলাম, বাজারে মাছ পাওয়া যায় নি; জেলে-পাড়ায় গিয়ে আনতে হয়েছে। গৃহিণী কৃত্রিম বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন, ওমা! তাই নাকি? মনে মনে কহিলাম, হ্যাঁ, তাই। বাড়িতে বসিয়া বসিয়া হুকুম করিয়া দিলেই

হয় না, হুকুম তামিল করা বড় শক্ত। তারপর জেলেপাড়ায় অভিযান সম্বন্ধে সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম। বলা বাহুল্য, হরিদাসীর কথাটা গোপন করিলাম। শেষে মোক্ষম মার দিয়া কহিলাম, তুমি যখন খেতে চেয়েছ, তখন মাছ যেমন ক'রে হোক আনবই, ঠিক করেছিলাম। গৃহিণীর মুখে সন্তোষের হাসি ফুটিয়া উঠিল, আমার মুখের দিকে এক চোখ চাহিয়া লইয়া কহিলেন, বল কি? শুনেও সুখ! তা মাছটা বার কর না, দেখি। কহিলাম, রেণুকে (বড় মেয়ে) ডাক, ওই বার করুক, আমি আর হাত দেব না, মানে, হাত ধুয়েছি কিনা! জেলেটি লোক ভাল; হাত ধুতে জল পর্য্যন্ত দিলে, ওর ছেলে আবার আমার স্কুলের ছাত্র।

গৃহিণী রেণুকে ডাক দিলেন। আমিও ডাক দিলাম এবং কহিলাম, মাছটা বার ক'রে দিয়ে যা তো। বাসনা, শুধু রেণু নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাই দুটিও আসুক এবং সকলে তাহাদের বাবার কৃতিত্ব দেখিয়া পিতৃভাগ্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠুক।

রেণু আসিল, ছেলে দুইটিও লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া হাজির হইল; মুখে হাসি আর ধরিতেছে না। মাছ, বিশেষ করিয়া, ইলিশমাছ, বাঙালীর বড় লোভের বস্তু। এ লোভ বাঙালীর মজ্জায় মজ্জায় জড়াইয়া আছে। বাঙালী সব ছাড়িবে, কিন্তু মাছ খাওয়া কখনও ছাড়িতে পারিবে না, তা যাহার নাসিকা যতই কুঞ্চিত হইয়া উঠুক। তাহা ছাড়া মাছের সঙ্গে বাঙালীর বাঙালীয়ানা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। যে বাঙালী মাছ খায় না, সে মহাপুরুষ হইতে পারে, কিন্তু বাঙালী নয়। যাহাদের কারসাজিতে এই মাছ বাংলা দেশে দুর্লভ ও দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা বাঙালীর শত্রু।

রেণু থলি হইতে মাছ বাহির করিতে লাগিল, ছেলে দুইটি ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া, দুই হাঁটুর উপরে হাত রাখিয়া একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল। ছোট ছেলেটি কহিল, বাবা, ডিম আছে? মোক্তারবাবুর কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম, হ্যাঁ, একেবারে টইটুম্বুর।

রেণু পাতায় মোড়া মাছটি থলি হইতে বাহির করিতেই গৃহিণী আগাইয়া আসিলেন। পাতার মোড়ক খুলিয়া ফেলিয়া রেণু মাছটি হাত দিয়া টিপিয়া কহিল, মাছটা তো ভাল নয় বাবা! গৃহিণী আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, তাই নাকি? আমার দিকে জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, তা আমি আগেই জানি। ছেলে দুইটিও মুখ শুকনা করিয়া আমার দিকে তাকাইল, দৃষ্টিতে ক্ষোভ ও ভর্ৎসনা। বলিয়া উঠিলাম, পাগল! টাটকা মাছ! রেণুর উদ্দেশে কহিলাম, কিছু জানে না! যা-তা ব'লে দিলেই হ'ল! রেণু মাছটি দুই হাতে তুলিয়া নাকের কাছে আনিয়াই মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, অ্যাঁ, একেবারে পচা! ভাইদের কহিল, তোরা শুঁকে দেখ্। ছেলে দুইটি হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া শুঁকিয়াই ছিটকাইয়া পড়িয়া কহিল, ওরে বাবা! যা গন্ধ!

গৃহিণীর মুখে কালবৈশাখীর মেঘ ঘনাইয়া আসিল। চাপা গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,

কত দাম দিয়েছ, শুনি ? ভয়ে ভয়ে কহিলাম, দু টাকা ; অনেকদূর থেকে আমদানি কিনা, একটু গন্ধ হয়তো হতে পারে ; পচা নয়, তুমি দেখো। গৃহিণী দুই ঠোঁট চাপিয়া, আর একটু আগাইয়া আসিয়া মাছটির গায়ে আঙুল দিয়া টিপিতেই আঙুল বসিয়া গেল। গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, একেবারে পচা থসথসে হয়ে গেছে। কতদিনের পচা মাছ, কে জানে! আমার দিকে তাকাইয়া ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, ছিঃ ছিঃ, দু টাকা খরচ ক'রে এই মাছ তুমি ঘরে নিয়ে এলে! মেয়েকে কহিলেন, একটু সর্। মেয়ে সরিয়া দাঁড়াইতেই মাছটি তুলিয়া উঠানে ফেলিয়া দিলেন।

আমার দেশী কুকুরটি সকলের কথাবার্তায় আকৃষ্ট হইয়া, অদূরে পিছনের পা দুইটির উপর ভর দিয়া বসিয়া, সোৎসুক নয়নে তাকাইয়া থাকিয়া এতক্ষণ লেজ নাড়িতেছিল। মাছটি তাহার সামনে পড়িতেই লাফাইয়া আসিয়া, মাছে দাঁত বসাইয়াই শশব্যস্তে ফেলিয়া দিল, এবং দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াই অপ্রতিভ মুখে আবার লেজ নাড়িতে শুরু করিল। গৃহিণী কহিলেন, কুকুরেও খাবে না ও মাছ। তারপর তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণার সহিত কহিলেন, ছিঃ ছিঃ, মানুষ, না কি!

বড় ছেলেটি মুরুব্বিয়ানার স্বরে কহিল, বাবার কাণ্ড তো! যা দিয়েছে ঢুকিয়ে নয়েছেন। একটু দেখতে শুনতে গেলেই তো ও গন্ধ নাকে ঢুকত। গৃহিণী নাকী স্বরে কহিলেন, তোরা দেখ্, বলিস যে সব। রেণুকে কহিলেন, সাবান দিয়ে হাতটা ধুয়ে ফল্‌গে যা। কিন্তু মাছটা উঠোনে প'ড়ে থাকলে দুর্গন্ধে ঘরে টেকা যাবে না যে! ওটা ফেলবে কে? ছোট ছেলেটি কহিল, বাবাই ফেলুন, উনি এনেছেন।

রেণু কহিল, আমিই ফেলে দিচ্ছি মা। গৃহিণী কহিলেন, তাই দে, ওঁকে আর কিছু করতে ব'লে কাজ নেই। আমারই ঘাট হয়েছে, ছিঃ ছিঃ, পুরুষমানুষ যে এমন অপদার্থ হয়, জানতাম না! ছেলেদের কহিলেন, যা পড়্‌গে যা, কি করবি? তোদের অদেষ্ট। যেমন লোকের ঘরে জন্মেছিস! ছেলেগুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরিয়া পড়িল। গৃহিণী কহিতে লাগিলেন, আর এখনই হয়েছে কি? আমি যদি চোখ বুজি, হাড়ীর হাল হবে তোদের, আমি ব'লে দিচ্ছি। তারপর, সেই পুরাতন খেদ, পূর্ব্বজন্মের বহু দুষ্কৃতির ফলে, আমার মত অকৃতীর হাতে পড়িয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; না মরিলে নিষ্কৃতি নাই, অথচ ছেলেমেয়েদের জন্যই মরিবারও উপায় নাই।

আমি প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া মনে মনে হরিদাসীর মুণ্ডপাত করিতে লাগিলাম। গৃহিণী কহিলেন, আর দাঁড়িয়ে থেকে কি কেতাত্থ করবে? হাত পা ধুয়ে ফেলে চা খাবার খাও, ঘাট হয়েছে আমার, আর কখনও কিছু আনতে বলব না।—বলিয়া হাত ধুইবার জন্য জলের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমি সরিয়া আসিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম, তারপর সন্তর্পণে বাড়ির বাহির হইয়া গেলাম।

৩

মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বিবাহের পর সংসার-আশ্রমের শুরু হইতেই গৃহিণীকে কোনদিন কোন কাজে প্রসন্ন করিতে পারি নাই। যাহাই করিয়াছি, তাহাতেই ত্রুটি বাহির করিয়াছেন। প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া টাকা রোজগার করিয়াছি, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছি, কিন্তু প্রশংসাবাদ কোনদিন পাই নাই। চিরদিন একই কথা শুনিয়া আসিয়াছি—অপদার্থ, অকর্মা। ছেলেমেয়েগুলিও মায়ের সুর ধরিয়াছে। উহারা কি আমাকে কোনদিন শ্রদ্ধা করিতে পারিবে? পৃথিবীতে সকলেই বিবাহ করিয়া সংসার করিতেছে, আমার মত নিত্য অপমান ও গঞ্জনা কয়জনকে সহ্য করিতে হয়?

অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, তৃষ্ণাও। হাতে পয়সা নাই যে, কোন দোকানে গিয়া চা-খাবার খাইয়া আসিব। একমাত্র ভরসা আছে, সুরেশের বাড়ি। সেখানে গেলেই সুরেশের স্ত্রী এক কাপ চা তো দেয়ই, সঙ্গে খাবারও থাকে।

সুরেশ আমার ছাত্রাবস্থার বন্ধু; একসঙ্গে বরাবর কলেজে পড়িয়াছি। এখন সে এই শহরে চাকুরি করিতেছে; একটি নামজাদা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। তাহার শ্বশুর কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি, ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার। কাজেই তাহার বেতন মাসে তিন শো টাকা, তদুপরি বাড়িভাড়া। সুরেশের স্ত্রী সুন্দরী ও শিক্ষিতা; বি. এ. পাস, সুশীলাও বটে। সুরেশ স্ত্রীর প্রশংসায় অহরহ পঞ্চমুখ। প্রশংসার যোগ্য বটে মহিলাটির যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনই সুমিষ্ট ব্যবহার। হাবে-ভাবে, কথাবার্তায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, সাজসজ্জায়, একটি উঁচু ধরনের সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। যাহার সহিত সংস্পর্শে আসে, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রভায় তাহার হৃদয়কে আলোকিত করিয়া তুলে স্বামী-স্ত্রীর মিলও খুব গভীর, দুইজন দুইজনকে দেখিতে দেখিতে গলিয়া যায়। দেখিয়া আনন্দ হয়, নিজেদের কথা ভাবিয়া ঈর্ষাও হয়।

সুরেশের বাড়ির সামনে আসিয়া হাজির হইলাম। বাড়িটি দোতলা; উপরে নীচে দুইটি করিয়া ঘর। উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। বাহিরের রোয়াকে ভৃত্য ভূতনাথ দাঁড়াইয়া। আমাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, নমস্কার বাবু, এমন সময়ে? কহিলাম, সাহেব বাড়িতে আছেন নাকি?

ভূতনাথ কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওপরে আছেন।

সহসা তীক্ষ্ণ মেয়েলী গলায় ক্রুদ্ধ চীৎকার শুনিতে পাইলাম, শাট আপ। একটি কথা বলবে না; তা হ'লে এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাব। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের কর্কশ কণ্ঠের ক্রুদ্ধ গর্জন, আই কেয়ার দিস মাচ। যেখানে ইচ্ছে যাও।

মেয়েলী কণ্ঠ তাহার পর্দায় উঠিয়া কহিল, কি? তা বলবে বইকি! ভ্যাগাবণ্ড থেকে ভদ্রলোক বনেছ কিনা, তাই এত মেজাজ! আন্‌গ্রেটফুল ডগ!

পুরুষ-কণ্ঠ প্রচণ্ড রোষে ফাটিয়া পড়িল, শাট আপ। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! মেয়েমানুষের আবার মেজাজ! ভিক্সেন, ভ্যাম্পায়ার, বিচ!

নারীকণ্ঠে সমান পর্দায় প্রত্যুত্তর দিল, সাস্‌পিসাস সোয়াইন! ডিলিফাইং ভিলেন।

পুরুষ-কণ্ঠ সগর্জ্জনে কহিল, ক্যাট! ভাইপার!

দুই ঘরে দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করার শব্দ। এক ঘরে ঝনঝন শব্দে কাচের গ্লাস ভাঙিল, আর এক ঘরে সশব্দে চেয়ার উল্টাইল। এক ঘরে মেয়েলী কণ্ঠের চাপা ক্রন্দন-ধ্বনি, আর এক ঘরে পুরুষ-কণ্ঠের চাপা তর্জ্জন।

আকাশ হইতে পড়িলাম। সুরেশ পুরুষমানুষ, ঝগড়া করা তাহার পক্ষে আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়, অশোভনও নয়। কিন্তু সুরেশের স্ত্রীর মত মহিলা, যাহাকে দেখিলে মূর্ত্তিমতী ছন্দোময়ী কবিতা বলিয়া মনে হয়, আলাপে আলোচনায় যাহার মৃদু মোলায়েম কণ্ঠস্বর হইতে মধু চোয়াইয়া পড়ে, যাহার হাসি হইতে মুক্তা ঝরে, যাহার গান শুনিলে ক্ষণিকের জন্য হৃদয় অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হয়, সেও ঝগড়া করে, এবং তূণ হইতে এমন বাছা বাছা চোখা চোখা শর বাহির করিয়া প্রতিপক্ষকে আঘাত করিতে পারে, নিজের কানে না শুনিলে বিশ্বাস করিতাম না। ফিসফিস করিয়া ভূতনাথকে কহিলাম, কি ব্যাপার? ভূতনাথ চাপাগলায় কহিল, ঝগড়া হচ্ছে দুজনে। আশ্বাসের সুরে কহিল, ও সব বাড়িতেই হয় বাবু। অনেক বাড়িতে চাকরি করলাম, কোথাও না-হওয়া দেখলাম না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, তা ঝগড়াটা মিটবে কখন? ভূতনাথ কহিল, আজ তো নয়ই, কালও সারা দিনরাত থমথমে থাকবে, পরশুদিন পরিষ্কার হবে।

তা ভাল। তা হ'লে চলি।—বলিয়া রোয়াক হইতে নামিয়া আসিলাম। ভূতনাথ আমার পিছু পিছু নামিয়া আসিয়া কহিল, নমস্কার বাবু, আসুন তা হ'লে। আলো-টালো আনেন নি, দোব একটা? বাধা দিয়া কহিলাম, না না, থাক্‌।—বলিয়া চলিবার উপক্রম করিয়াই, পরের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন তথ্য জানিবার জন্য মানুষের চিরন্তন দুষ্প্রবৃত্তির প্ররোচনায় আবার থামিয়া কহিলাম, হ্যাঁ হে, ঝগড়ার কারণটা কিছু জান? ভূতনাথ এতক্ষণ এই কথা বলিবার জন্যই উসখুস করিতেছিল, সাগ্রহে কহিল, জানি বাবু। শুনুন তবে। সাহেব তো ঘোষ সাহেবের বাড়ি রোজ বিকেলে টেনিস খেলতে যান, মেমসাহেবের তাতে আপত্তি, ঘোষ সাহেবের মেমসাহেব নাকি লোক ভাল নন। আর ইদিকে আমাদের মেমসাহেব রোজ হালদার সাহেবের বাড়ি বেড়াতে যান, হালদার সাহেবের বোন তাঁর বন্ধু। হালদার সাহেব তো বিয়ে-টিয়ে করেন নি, বাজারে সুনামও

বেশ নেই। আমাদের সাহেবের তাতেই আপত্তি। দুজন দুজনকে মানা করেন, কেউ কারও কথা শোনেন না। আজ আমাদের মেমসাহেব বাড়িতে ছিলেন, সাহেব গিয়েছিলেন খেলতে। কোন্ এক হাকিম সাহেবের মেমসাহেব এসে আমাদের সাহেবের সম্বন্ধে কি সব ব'লে গেছেন। সাহেব ফিরে আসবার পর, খাবার টেবিলে মেমসাহেব কথাটা পাড়লেন, সাহেবও কি বললেন, দু-চার কথার পরই তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। তারপর পরম পরিতোষের সহিত কহিল, অনেক বাড়িতে অনেক রকমের ঝগড়া দেখেছি বাবু, কিন্তু এমন কখনও দেখি নি।

বাড়ির দিকে চলিলাম। মনের জ্বালা প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে। কেমন করিয়া কোথা হইতে মন যেন সান্ত্বনা পাইয়াছে।

শ্রীঅমলা দেবী

বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট

শিক্ষার সেলামী

জানেন দুর্ভোগ? এবার ঘণ্টে আর খাঁদাকে পাস করিয়ে আনতে হ'ল, ছুটিতে একসঙ্গেই গাড্ডু দিয়েছিল কিনা! সব নম্বর পেয়েছেন কি রকম শুনবেন?

অঙ্কে ১৭, ইংরিজীতে ৩৩, বাংলায় ১৯, ইতিহাসে ৭, ভূগোলে—পৃথিবী গোল।

আমি জানি, এ নিয়ে খুঁচুলে দোষ হবে আমার. এখুনি বাড়িতে সবাই ব'লে উঠবেন, নিজে একটু ওদের দেখাশোনা করতে পার না?...ইত্যাদি।

অর্থাৎ চাকরি করা, বাজার করা, রেশনে কাপড়-চোপড় আনা, ডাক্তারের বন্দোবস্ত করা থেকে আরম্ভ ক'রে ছেলেমেয়েদের পাস করানোর ভারটাও আমার। কি ঝঞ্ঝাট বলুন তো? বোধ হয়, ইস্কুলে আপত্তি না করলে আমাকে এগজামিনটাও দিয়ে আসলে ভাল হ'ত, কারণ ছেলে-পুলেদের পড়ার টাইম কখন?

তারা মীটিং করবে, পিকেটিং করবে, শনি-রবিবারে সিনেমায় যাবে, ফুটবল-ম্যাচ দেখবে, ক্রিকেটের ফলাফলের জন্যে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করবে, বারোয়ারির চাঁদা তুলবে, সভায় গিয়ে মারপিট করবে, তাদের সময়টা কখন?

কিন্তু আমি যে গেলুম!

যদি বলি, ওরে বাবা, ওসব কর আপত্তি নেই, কিন্তু একটু তার সঙ্গে লেখাপড়াটাও কর।

তার উত্তর সব মুখে যোগানো, বলে, লেখাপড়া শিখেই জাতটা উচ্ছন্ন গেছে, এখন তাই ওসব না করাই ভাল।

অতএব চতুষ্পাঠী খালি। খালি ছুপাটি চটি প'রে বাবুরা বিকেল নাগাদ বেরিয়ে পড়লেন, নটার আগে কারুর টিকি দেখার জো নেই। বেশি কিছু বললে, ফট ক'রে মুখের ওপর ব'লে দিলে, 'জয় হিন্দ্!' প্রাণ যায় আর কি!

ভেবেছিলুম মরুকগে, এ বছরটা ওই ক্লাসেই থাকুক। তা' কি হবার জো আছে?

গিন্নীর তাগাদা, তুমি একটু ইস্কুলে ব'লে এস, ওদের যেন উঠিয়ে দেয়। শুধু শুধু এক বছর নষ্ট হবে?

আমি বললুম, হোকগে, আমি ও-রকম নির্লজ্জের মত কাউকে বলতে পারব না। তা ছাড়া ক্লাসে উঠিয়ে দিলে হবে কি, উঁচু ক্লাসে কিচ্ছু—একবর্ণও পারবে না।

অমনি তর্ক।—ঠিক পারবে। একটু পড়লেই ওরা সব পারে, ওদের ক্লাসেই তো কত ছেলে বাড়ি থেকে চিঠি নিয়ে নিয়ে এসে ক্লাসে উঠে গেল।

কি সর্ব্বনাশ! চিঠি নিয়ে নিয়ে আজকাল ছেলেপুলেরা পাস করছে নাকি?

শুনলুম, ও-স্কুলে তা করে। তা না হ'লে পাছে ছেলেরা ইস্কুল ছেড়ে দেয়, তাই মাষ্টার মশাইরা ভয়ে ভয়ে ছেলেদের গার্জেনদের চিঠি পেলেই পাস করিয়ে দেন। ভাবলুম, দেখ, পোড়া পেট কি রকম, মাষ্টারিতেও ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছে!

যাক, তবু হেডমাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলুম। তিনি গাঁইগুঁই ক'রে বললেন, আপনি বলেন তো উঠিয়ে দিই, তবে ভেবে দেখুন, কতদূর কি হবে!

আমি বললুম, দূর আর বেশি নেই, বুঝতে পারছি; তবে আপনারা যতদূর পারেন ঠেলে দিন, তারপর গড়াতে গড়াতে যেখানে গিয়ে ঠেকে।

তিনি হেসে বললেন, দেখুন, আমরা তো যতদূর পারি করি, তবে বাড়িতে আপনাদেরও তো কর্ত্তব্য আছে! সেখানে একটু পড়াশোনা যদি আপনারা নিজেরা না দেখেন, তা হ'লে কি ক'রে কি হয়?

বুঝুন। ইস্কুলে মাইনে দোব, পাংখা ফী দোব, স্পোর্টিং ফী দোব, তা ছাড়া লাইব্রেরি ফী, চড়াইভাতি ফী, মা সরস্বতীপূজো ফী—সব দিয়েও কর্ত্তব্য শেষ হ'ল না, আবার বাড়িতে তাদের নিয়ে উঠে প'ড়ে লাগো! যাঁদের পড়ানোর কথা, তাঁরা পড়াবেন না, পড়াব আমি, তাঁরা শুধু রোজ পড়া দেবেন, আর পড়া নেবেন। এতে তারা পাস করতে পারে ভাল, না পারলে ব'য়ে গেল। তুমি হাঁসফাঁস করতে করতে ইস্কুলে ছুটে এস, আর বুড়ো বয়সে হেডমাষ্টার মশাইয়ের পিছু পিছু, যেন তোমার নিজেরই প্রমোশন আটকে গেছে, এইভাবে আবেদন-নিবেদন জানিয়ে ঘোর।

আপনারা হয়তো আমাকেই দোষ দেবেন, সেটা আমি জানি। এক্ষুনি বলবেন,

তুমি একটা মাষ্টার রাখ নি কেন? মানে—মাষ্টার রাখলেই পাস হবে, আর লেখাপড়া শিখবে!

তা হ'লে ইস্কুলে যাঁরা বিদ্যের ভার নিয়েছেন, তাঁরা করবেন কি?

তারপর মাষ্টার পাই কোথা? পনরো টাকায় দু বেলা সাতজনকে অঙ্ক, বাংলা, ইংরিজী, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, ইংরিজী গ্রামার, ট্র্যান্সলেশন, রচনা—সব তিনি করিয়ে দেবেন?

হাতে থাকে তো, দেবেন না একটা পাঠিয়ে।

মশাই, অতগুলো বই, ওদের বাবা হয়ে আমি একবার ক'রে প'ড়ে ঠিক ক'রে দিতে পারলুম না, আর ওদের একজন মাষ্টার এলেই পারবে? সব কটাকে পড়াবার ঠিক বন্দোবস্ত করতে গেলে তো বাড়িতে আর একটা ইস্কুল খুলতে হয়। সেও তো আর এক ঝঞ্ঝাট!

তারপর মনে করুন, ইস্কুলে পড়াবে সব বাংলায়, কিন্তু প্রশ্ন করবে সব ইংরিজীতে। এ আবার কোন দিশী কথা? তার ওপর ইস্কুলে যা ইংরিজী শেখে, সে তো আমার চেয়ে খারাপ। আমি তবু সায়েবসুবো গালাগালটা দিলে বুঝতে পারি, কিন্তু ওরা বোধ হয় তাও পারবে না।

এর ওপর শুনছি আবার হিন্দুস্থানী ভাষা শিখতে হবে। কারণ ওইটেই পরে চলবে। দেখলুম, ছেলেমেয়ে তাতে উঠে প'ড়ে লেগেছে, পকেটে এক আধলা থাকবার জো নেই, প্রত্যেক শনি-রবিবারে একখানা ক'রে হিন্দী ছবি দেখে আসা চাই। বাধা দোব কি? রাষ্ট্রভাষা শিখতেই হবে।

তাও পড়াশোনা ক'রে নয়, ওই হিন্দী ছবি দেখে দেখে।

মানে, যা দেখলুম, বর্ত্তমানে ছেলেপুলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এক গুরুতর ঝঞ্ঝাট।

বই তো কিনে উঠতে পারি না, ওরাও প'ড়ে উঠতে পারে না। তারপর যদিও বা বেশি ক'রে পড়ে, তা হ'লেও আবার ভয় হয়, এই বুঝি যক্ষ্মা-হাসপাতালে পাঠাতে হ'ল।

আপনারা বলবেন, বেশি পড়লেই বুঝি তাই হয়? আমার তো মনে হয়, না খেয়ে বেশি পড়াশোনা করতে থাকলে হয় মানুষ বেভুল বকতে থাকে, নয় ধুঁকে মরে।

অতএব ছেলেপুলেদের 'বেশি পড়াশোনা কর' বলতেও ভরসা হয় না।

তাদের পড়ার ঝঞ্ঝাটটা না হয় কোনমতে সামলাতে পারি, কিন্তু এ-বাজারে তাদের বেশি খাওয়ার ঝঞ্ঝাট তো সামলে উঠতে পারব না দাদা।

বিরূপাক্ষ

জনপদ

দশ

দুপুরবেলা এবং সন্ধ্যাবেলা রাধাকান্তের অন্দরে একটি ছোটখাটো মজলিস বসে। রাধাকান্তের স্ত্রীর নাম কিরণবালা; সে নামটা কিন্তু চাপা প'ড়ে গিয়েছে, কিরণবালা নামটা অল্প কয়েকজন পাড়ার মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ জানে, সাধারণ্যে তিনি কাশীর বউ নামেই পরিচিত। কাশীর বউ ভাল লেখাপড়া জানেন, সেলাইয়ের কাজেও তাঁর হাত অতি চমৎকার। পাড়ার তরুণী মেয়েদের অনেকে তাঁর কাছে দুপুরে আসে চিঠি পড়াতে, চিঠি লেখাতে, এবং সংসার-জীবনের সমস্যায় উপদেশ নিতে, নিজেদের দুঃখের কথাও তাঁকে জানিয়ে তারা তৃপ্তি পায়, যেহেতু এই বুদ্ধিমতী মিষ্টভাষিণী মেয়েটি কথার মধ্যে দরদ মিশিয়ে সান্ত্বনা দিলে সত্যই যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলার মজলিসে তিনি কোনদিন বই পড়েন, কোনদিন গল্প বলেন। রাধাকান্তের নিজের ধর্মশাস্ত্রে অনুরাগ আছে, উপন্যাসও পড়েন, শুধু তাই নয়, বইও তিনি মধ্যে মধ্যে কেনেন। কাশীর বউ তাঁর বইগুলির যত্ন করেন, ঝাড়েন-মোছেন এবং সদ্ব্যবহারও করেন। রাধাকান্তও এতে আনন্দ পান। এর পূর্ব্বকালে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ ছিল না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাকে সমাজ সুচক্ষে দেখত না। অনেক ব্যক্তির সংস্কার এমনও ছিল যে, লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের অকালবৈধব্য ঘটে ব'লে বিশ্বাস করত। সে যুগটা পার হয়ে আসছে। কলকাতায় স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন পঞ্চাশ ষাট বৎসরে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে, অন্যান্য শহরেও সে আন্দোলন ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করছে, তারই ঢেউ ক্রমশ পল্লীতেও এসে লেগেছে, বিশেষ ক'রে নবগ্রামের মত গ্রামে। আশে-পাশে প্রায় আশি-একশোখানি গ্রামের কেন্দ্রস্থল নবগ্রাম। তাই বিয়ের সম্বন্ধের সময়, ভাবী বধূ লেখাপড়া জানে জেনে, রাধাকান্তের উকিল পিতা এবং রাধাকান্ত নিজেও খুশি হয়েছিলেন। কখনও কখনও রাত্রে কাশীর বউ বই প'ড়ে শোনান তাঁকে। শুনতে শুনতে রাধাকান্ত মনে মনে ভাগ্যদেবতাকে ধন্যবাদ দেন, পত্নীভাগ্যের জন্য।

আজ সন্ধ্যায় মজলিসে কাশীর বউ গল্প বলছিলেন। গল্পের মজলিসের প্রধান শ্রোতা তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে গৌরীকান্ত এবং গৌরীকান্তের খেলার সাথী চারু। রাধাকান্তের নিকট-আত্মীয়, সম্পর্কে এক ভাইপোর মেয়ে চারু। চারুর বাপ রাধাকান্তের সমবয়সী, বন্ধু এবং অনুগত জনও বটে। ভদ্রলোক বিদেশে থাকেন, সেখানে এম. ই. ইস্কুলে মাষ্টারি এবং সেখানকার এক্সপেরিমেণ্টাল পোষ্ট-আপিসে পোষ্টমাষ্টারি জুটে চাকরি করেন। চারুর মাও কাশীর বউয়ের অনুরক্ত ভক্ত। চারু গৌরীকান্তের চেয়ে এক বছরের বড়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংসার,—শ্বাশুড়, দেওর, জা, নিয়ে একান্নবর্ত্তী পরিবার, চারুর মায়ের কাজ অনেক। পালা ক'রে কাজ করতে হয়,

কোনদিন পড়ে বাসন-মাজা ঝাঁট-দেওয়া এঁটোকাঁটা-পরিষ্কার এই সবের কাজ, কোনদিন পড়ে রান্নার কাজ, কোনদিন পড়ে বাটনা-বাটা কুটনো-কোটা জল-তোলার কাজ। বিলেতেও ঘরের কাজে রবিবার নাই, এখানে তো নাই-ই। চারুর মা গৌরীকান্তের সঙ্গে খেলা করবার জন্তে মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়ে যায়। গৌরীকান্ত হুকুম করে, চারু শোনে, না শুনলে গৌরীকান্ত তাকে পিটি লাগায়। কাশীর বউয়ের চোখে পড়লে তিনি ছেলের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, গৌরীকান্ত তখন চারুকে আদর ক'রে ডাকে। চারু মায়ের একমাত্র সন্তান, তার উপর সাধারণত বাঙালীর মেয়ের যে বয়সে সন্তান হয়, সেই বিচারে চারুর মায়ের একটু বেশি বয়সেই চারু মায়ের কোলে এসেছে, তাই সে বেশ একটু আদরিণী মেয়ে এবং স্বাস্থ্যও তার ভাল। মারধোরের পর গৌরী তাকে আদর ক'রে ডাকলে সে বিদ্রোহিনীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যখন সে দেখে, গৌরীকান্তের মায়ের চোখে শাসনের দৃষ্টি রূঢ় থেকে রূঢ়তর হয়ে উঠছে, তখন সে হাসিমুখে গৌরীকান্তের কাছে এগিয়ে এসে বলে, না ভাই, আর আমি দুষ্টুমি করব না।

মধ্যে মধ্যে গৌরীকান্ত যায় বাপের কাছে বৈঠকখানায়। রাধাকান্ত পুত্রের সম্বন্ধে অনেক উচ্চাশা পোষণ করেন। এখন থেকেই তাকে অনেক বড় বড় কথা বলেন, কখনও কখনও মনের আবেগে ডায়েরির মধ্যেও পুত্রকে সম্বোধন ক'রে অনেক কথা লেখেন। গত বৎসর গৌরীকান্তের হাতে-খড়ি হয়েছে। এ বৎসর সরস্বতীপুজোর সময় ছেলেকে নিয়ে পূজাস্থানে গিয়েছিলেন। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, গৌরী বাপি, কি ব'লে মাকে প্রণাম করলে? গৌরীকান্তের বয়স মাত্র ছয়, কিন্তু বাপের বড় বড় কথাগুলি তাকে এদিক দিয়ে অনেকটা বেশি-বয়সী ছেলের মত পরিপক্ক ক'রে তুলেছে। ময়নাপাখির বুলি বলার মত, মানে না বুঝেও, বেশ ভাল ভাল কথা বলতে পারে। সে বাপের মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, মা, আমাকে খুব বিদ্যা দাও, আমি খুব ধুম ক'রে পুজো করব। ঢাক ঢোল দোব, যাত্রা করাব। পুজোর দালান করব। ঘটা ক'রে পুজো করার কথা, পুজোর দালানের কল্পনা মা-বাপ দুজনের কাছেই সে শুনেছে। রাধাকান্ত সে কথা তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন। ঘটনাটি লিখে তিনি নিজের মন্তব্য লিখেছেন, "বালকের মুখে এবম্বিধ উক্তি শুনিয়া পরমাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল. সঙ্গে সঙ্গে মহানন্দে ভাসিতে লাগিলাম। এ বালক অবশ্যই আমার কুল উজ্জ্বল করিবে। বাবা গৌরীকান্ত, তোমার কথা আমি লিখিয়া রাখিতেছি। মা সরস্বতীর কৃপায় বিদ্যালাভ হইলে (অবশ্যই হইবে) যেন তোমার এই কথা স্থির থাকে। কদাচ বিস্মৃত হইও না। ঈশ্বরের কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হও এবং ঈশ্বরের কার্য্যে এই অনুরাগ এবং দেবতার প্রতি ভক্তি তোমার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক; তাঁহার

কৃপায় গ্রামে দেশে তুমি সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা লাভ কর। গ্রামের ধনোদ্ধত ব্যক্তিদের দম্ভকে চূর্ণ করিয়া প্রমাণ কর—স্বদেশে পূজ্যন্তে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

রাধাকান্ত তাঁর নিজের জীবনের সকল ভরসায় আপনার অজ্ঞাতসারে হতাশ হয়েছেন, গোপীচন্দ্রের উন্নতির গতিবেগ হিসাব ক'রে নিজের চেষ্টায় প্রাধান্য লাভের ভরসা আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়েছে, তাই ছেলের উপর সকল আশা-ভরসা স্থাপন ক'রে, তার কানের কাছে সেই কথাগু'ল গুঞ্জন করেন। শখের পোষা-পাখির স্পষ্ট ভাষায় বুলি বলার মত গৌরীকান্ত তার পুনরুক্তি করলে হতাশার গ্লানি কাটিয়ে তাঁর অন্তর আশার আনন্দে ভ'রে ওঠে। সেই জন্য গৌরীকান্তকে মধ্যে মধ্যে যেতে হয় বাপের কাছে। বিজ্ঞের মত বাপের পাশে ব'সে থাকে।

গৌরীকান্ত যখন বৈঠকখানায় থাকে, তখন চারু একা পড়ে; বৈঠকখানায় সে যেতে চায় না, কারণ রাধাকান্ত তাতে বিরক্ত হন, চারু সেটা অনুভব করে। তাই কাশীর বউ তাকেও বৈঠকখানায় যেতে বললে সে বলে, বাবা! বাবুর যে চোখ! দেখলে ভয় লাগে! তা হ'লেও সে বাড়ি যায় না। কাশীর বউয়ের কাছেই সে ব'সে থাকে, অনর্গল বকবক ক'রে ব'কে যায়। ছড়া বলে, গান করে, ঝুমুর-নাচ দেখায়, নিজের বিয়ের গল্প বলে। দান (জান) আঙাদিদি (রাঙাদিদি), আমাল বিয়ে হবে, বল আসবে, গয়না পব্ব, চুড়ি বালা অনন্ত বাজু হার সাতনরী চিক ঝাপটা কান-মল তোড়া প'রে, ঝম্‌ঝম্ ক'রে চ'লে যাব শ্বশুরবাড়ি। গৌরীকাকা একলা ব'সে থাকবে ঘরে আ—র কাঁদবে, ঝরঝর ক'রে কাঁদবে। কার ছন্দে খেলা করবে তখন?

সন্ধ্যাবেলা গৌরীকান্ত এবং চারুকে নিয়ে কাশীর বউ গল্প করতে বসেন। সচ্ছল মধ্যবিত্তের সংসার, রাঁধুনী রান্না করে, ঝি সাহায্য করে, চাকর বাইরের বাড়ির বরাত যোগায়, প্রয়োজন হ'লে সেও এসে অন্দরের কাজ সেরে দিয়ে যায়; কাশীর বউকে ব'সে থাকতে হয়। গল্প ব'লে তাঁরও সময় কাটে আর কয়েকজন তাঁর সখী আসেন। ভাশুর শ্যামাকান্তের পুত্রবধূ, মণ্ডপ মহাদেবের স্ত্রী, চারুর মা, চারুর খুড়ী। আরও দুইটি নিয়মিত শ্রোতা আছে—প্রতিবেশী-কন্যা দুই বোন—সরো এবং নীরো; সরোজা এবং নীরজা পিতৃগৃহবাসিনী দুই কুলীনকন্যা। চুলের দড়ি, চিরুনি নিয়ে আসেন, এক দিকে গল্প শোনেন, অন্য দিকে চুল আঁচড়ান, বেণীরচনাপর্ব্ব শেষ করেন, পায়ে তেল মালিশ করেন, মধ্যে মধ্যে পান দোক্তা খান।

আজ গল্প হচ্ছিল,—এক ছিলেন রাজা। মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন তিনি। বহু রাজা তাঁকে কর দিত। সসাগরা ধরার অধীশ্বর বললেও চলে। রাজকোষ মণি মুক্তা হীরা জহরৎ সোনা রূপায় পরিপূর্ণ, সৈন্যশালায় রাজভক্ত সুশিক্ষিত বিক্রমশালী বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সেনাপতি, হাতিশালায় ঐরাবতের মত হাতি, অশ্বশালায় উচ্চৈঃশ্রবার

মত ঘোড়া, অসংখ্য দাসদাসী নিয়ে রাজার সৌভাগ্য বর্ষার নদীর মত কানায় কানায় পরিপূর্ণ। রাজা নিজেও খুব বিক্রমশালী পুরুষ। প্রজা থেকে, কর্মচারী থেকে মন্ত্রী পর্য্যন্ত রাজার মুখের দিকে চাইতে সাহস করেন না। সূর্য্যের দিকে যেমন চাওয়া যায় না, অমিততেজী সেই যে রাজাধিরাজ, তাঁর মুখের দিকেও তেমনই চাওয়া যায় না। কিন্তু রাজার একমাত্র দোষ—রাজা ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে মহা অহঙ্কারী। তিনি যখন চ'লে যান, তখন পায়ের শব্দে তাঁর সমস্ত লোকে অনুভব করে, রাজপ্রাসাদ যেন কাঁপে। রাজার পুত্র-সন্তান নাই, আছে দুটি কন্যা। বড়টির নাম মুক্তামালা, ছোটটির নাম কাজলরেখা। রাজার রানী নাই। মেয়ে দুটির শৈশবেই তিনি মারা গিয়েছেন। রাজা আর বিবাহ করেন নাই। মেয়ে দুটিকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন। তারা যা চায়, তাই দেন। মেয়েদের ধাইমা মেয়েদের মানুষ করে। তারা আপন মনে নিজের নিজের খুশিমত খেলা করে, গান গায়, হাসে, খায় দায়; রাজপণ্ডিত আসেন, তাঁর কাছে পাঠ নেয়, দিনে দিনে কুঁড়ি থেকে যেমন একটু একটু ক'রে পাপড়ি মেলে ফুল ফোটে, তেমনই ক'রে তারা বড় হয়ে ওঠে। এক বাপ-মায়ের দুই মেয়ে, কিন্তু আশ্চর্য্য রূপে গুণে দুই মেয়ে ঠিক বিপরীত। বড় মেয়ের রূপ দেখলে চোখ যেন ঝলসে যায়, আয়নাতে রোদের ছটা প'ড়ে তার আভা যেমন ঝকমক করে, তেমনই রূপ তাঁর। গুণেও ঠিক তাই। শানিত অস্ত্রের মত তাঁর স্বভাব। দাসদাসী সকলে তাঁর কাছে জোড়হাত ক'রে সশঙ্কিত হয়ে থাকে। আর ছোট রাজকুমারী কাজলরেখার রূপ শান্ত স্নিগ্ধ, দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়, পূর্ণিমারাত্রির জ্যোৎস্নার মত; স্বভাবও ঠিক তেমনই, মধুভরা ফুল যেমন মধুর ভারে নুয়ে পড়ে, মিষ্ট গন্ধে বুক ভরিয়ে দেয়, তেমনইধারা মধুর প্রকৃতি তাঁর, ঠোঁটের ডগায় হাসি লেগেই আছে, কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চাঁদের মত সে হাসিটুকু। বড় রাজকন্যা মুক্তামালা মেয়ে হ'লেও অস্ত্রশিক্ষা করেছেন, তিনি ঘোড়ায় চড়েন, শিকার করতে যান, তাঁর তীর ছোটে উল্কার মত। আকাশের বুক থেকে মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায় যেসব পাখি, তাঁর তীর তাদের বিঁধে মাটির বুকে নামিয়ে আনে ঝড়ে ঝ'রে-পড়া ফুলের মত। কাজলরেখাও রাজকন্যা, সেই হিসেবে তিনিও অস্ত্রশিক্ষা করেছেন, কিন্তু অস্ত্রের চেয়ে শাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ বেশি। তিনি ঘরে ব'সে নানা শাস্ত্র পাঠ করেন, পড়তে পড়তেই দিন শেষ হয়ে যায়, ঘরের আলো ক'মে যায়, তিনি গিয়ে বসেন তখন জানালার ধারে। আকাশের বুকে পাখির ঝাঁক উড়ে যায় গান ক'রে, তাদের গান শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে তাদের দিকে চেয়ে থাকেন। আঁচলে ক'রে নিয়ে যান পক্বশস্য, ছাদের উপর অঞ্জলি ভ'রে ছড়িয়ে দেন, ডাকেন তাদের—আয় আয় আয়! ওরে পাখিরা, তোদের আমি ভালবাসি, তোরা খেয়ে যা। তারা শনশন শব্দে পাক দিয়ে নেমে আসে, কেউ বসে তাঁর মাথায়, কেউ ব'সে কাঁধে, কে বসে হাতে, বসবার জায়গা

যারা না পায়, তারা পাক দিয়ে দিয়ে উড়তে থাকে ; যেমন ভ্রমরে ওড়ে ফুলের চারদিকে, মাছেরা ঘোরে জলবালার চারদিকে, তারার দল ঘোরে চাঁদের চারদিকে, তেমনই ভাবে তারাও কাজলরেখাকে প্রদক্ষিণ ক'রে উড়তে থাকে।

এইভাবে দিন যায়। ক্রমে মেয়েরা বড় হয়ে উঠলেন। একদিন রাজবাড়ির বৃদ্ধ কঞ্চুকী রাজাকে বললেন, মহারাজ, কন্যাদের এইবার বিবাহের কাল হয়েছে। মহারাণী নাই, থাকলে তিনিই রাজাধিরাজকে এ কথা বলতেন। তাঁহার অভাবে, কর্তব্য আমার, আমিই আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি।

রাজা সচেতন হয়ে উঠলেন। মনে মনে হিসেব ক'রে দেখলেন, হ্যাঁ তাই তো, মুক্তামালার বয়স হ'ল আঠারো, কাজলরেখার ষোল। তিনি ডাকলেন মেয়েদের। দেখলেন। চোখ জুড়িয়ে গেল। যেন সদ্যফোটা দুটি পদ্মফুল। বড় মেয়ে প্রণাম ক'রে বাপের বিছানার পাশে বসলেন, কাজলরেখা বাপকে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের কাছে বসলেন। রাজা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কাজলরেখাকে বললেন, এ কি, তুমি মাটিতে বসলে কেন? উঠে ব'স। কাজল বললেন, বাবা, শাস্ত্রে আছে, পিতা দেবতা, তাঁর সঙ্গে সমাসনে বসা উচিত নয়, তাঁর পায়ের তলাতেই বসা কর্তব্য। আর আসন হিসাবে মৃত্তিকাই হ'ল শ্রেষ্ঠ আসন। তবে আপনি যখন আদেশ করছেন, তখন তাই বসছি।

এ উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হলেন। তারপর কন্যাদের পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে প্রশ্ন করলেন, মা, তোমরা এইবার বড় হয়েছ। বিবাহের বয়স হয়েছে। বিবাহ দিতে হবে। কিন্তু পাত্র সন্ধান করবার পূর্ব্বে আমি জানতে চাই, তোমাদের কার কিরূপ আকাঙ্ক্ষা, কে কেমন স্বামী প্রার্থনা কর? মা মুক্তামালা, তুমি বড়, তুমিই বল আগে।

মুক্তামালা বললেন, আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার স্বামী হবেন তিনি, যিনি শৌর্য্যে বীর্য্যে তেজস্বিতায় হবেন আপনার যোগ্য জামাতা।' রূপে হবেন তিনি কন্দর্পের মত, বীর্য্যে হবেন তিনি ঝড়ের সদৃশ, পবনদেবতার মত।

রাজা হেসে কন্যার কথায় বাধা দিয়ে রহস্য করলেন, বললেন, তা হ'লে তোমার ছেলের একটি প্রকাণ্ড লেজ থাকবে মা। কেন না, পবননন্দন হলেন হনুমান। পিঠের উপর লেজ তুলে দিয়ে 'জয় রাম' ব'লে এক লাফে সাগর ডিঙিয়েছিলেন। জান তো?

মুক্তামালা একটু লজ্জিত হলেন। রাজা হেসে বললেন, বল বল।

মুক্তামালা বললেন, তিনি বীর্য্যে পবনের মত হবেন এইজন্য যে, শত্রুকুল তাঁর বীরত্বের সম্মুখে বড় বড় গাছের মত ভেঙে পড়বে। তেজে তিনি হবেন অগ্নির মত, তাঁর রক্তচক্ষুর দৃষ্টির উত্তাপে, যারা দুষ্ট, যারা হবে তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তারা অগ্নির সম্মুখে তৃণের মত ম্লান হয়ে শুকিয়ে যাবে ; তাতেও যারা সংযত না হবে, তারা সেই তেজে হবে ভস্মীভূত। তিনি হবে হবে খ্যাতিমান প্রাচীন রাজবংশের সন্তান।

যেহেতু না সকল গুণের আকরই হ'ল বীজ, অমৃতফলের বীজ হতে জন্মায় যে গাছ, সে গাছের ফল কখনও বিস্বাদ অথবা বিষাক্ত হয় না। সংসারে জন্মগুণই শ্রেষ্ঠ।

রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন কন্যার কথা শুনে। হ্যাঁ, তাঁর মত রাজাধিরাজের উপযুক্ত কন্যা। রাজকন্যার উপযুক্ত কথা বলেছে সে। কন্যার মাথায় হাত দিয়ে বাপ আশীর্ব্বাদ করলেন। বললেন, তুমি ইন্দ্রাণীর মত ভাগ্য লাভ কর। তোমাকে আমি আশীর্ব্বাদ করছি। তোমার মনোমত স্বামীই আমি অনুসন্ধান করব। পৃথিবীতে না পাই, দেবলোক গন্ধর্ব্বলোক পর্যান্ত অনুসন্ধান ক'রে অবশ্যই নিয়ে আসব। মুক্তামালার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তারপর রাজা ছোট মেয়ের দিকে ফিরে হাসিমুখে, অত্যন্ত আদরের সঙ্গে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, মা, এইবার তুমি বল তোমার মনের কথা।

কাজলরেখা চুপ ক'রে রইলেন। বাপকে নিজের বিয়ের কথা—বরের কথা বলতে লজ্জা হ'ল তাঁর।

রাজা হেসে আবার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, লজ্জাবোধ করছ? আচ্ছা, থাক্। আমি বুঝেছি, তোমার দিদি যা বলেছেন, তাঁর যেমন আকাঙ্ক্ষা, তোমারও কল্পনা তেমনই, বক্তব্যও তোমার তাই।

কঞ্চুকী বিনয় ক'রে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, অন্যপ্রকার বাসনা বা বক্তব্য থাকবে কেন? পর্ব্বতের কন্যা হ'ল নদী। নানা ধারায়, নানা দেশের মধ্যে দিয়ে তারা স্বয়ম্বর হবার জন্য ছুটে চলে। তাদের গুণও এক—দেশকে করে উর্ব্বর, আর তাদের লক্ষ্যও এক—মহাসাগরে মিলিত হবারই তাদের একমাত্র কামনা। সুতরাং মা কাজলরেখার বক্তব্যও ওই এক।

এবার কাজলরেখা ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে বললেন, না।

রাজা বিস্মিত হলেন। বললেন, তবে বল তোমার কামনার কথা।

কাজলরেখা মৃদুস্বরে বললেন, আমার যিনি স্বামী হবেন, তিনি যেন হন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি রাজপুত্রও হতে পারেন, আবার অতি সাধারণ, এমন কি দীনদরিদ্রের সন্তানও হতে পারেন। কান্তিতে তিনি কন্দর্পতুল্যও হতে পারেন, আবার মহর্ষি অষ্টাবক্রের মত রূপহীনও হতে পারেন। তিনি গুণে হবেন মহাজ্ঞানী। যেহেতু জ্ঞানই হ'ল প্রশান্তির একমাত্র আকর, এবং যেহেতু অন্তরের প্রশান্তির রশ্মিই হ'ল সৌম্যতা, সেইহেতু তিনি রূপহীন যদি হন, তবুও হবেন সৌম্যদর্শন এবং শান্তপ্রকৃতি। পুণ্যকর্ম্মই হবে তাঁর অস্ত্র, ক্ষমাই হবে তাঁর ধর্ম্ম। মানুষকে তিনি জয় করবেন না, মানুষের সেবায় তিনি তাদের সেবক হবেন, মানুষই তাঁকে স্বেচ্ছায় বরণ করবে বিজয়ী ব'লে। সাম্রাজ্য তিনি কামনা করবেন না, রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্যে তিনি মোহগ্রস্ত হবেন না,

সাম্রাজ্য উথলে উঠবে তাঁর পদক্ষেপে, রাজপ্রাসাদ কাঁদবে তাঁর পদধূলির জন্ম। তাঁর রক্ষী থাকবে না কেউ, যেহেতু জীবনই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় নয়, এবং সেইহেতুই তিনি হবেন মৃত্যুঞ্জয়। তিনি সামান্ত ব্যক্তির মতই সর্ব্বসাধারণের একজন হবেন, সেই-হেতুই তিনি হবেন অসামান্ত।

রাজা এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। তাঁর কন্তা হয়ে এ কি বলছে কাজলরেখা! তার কথার মধ্যে সে বার বার রাজত্বকে তুচ্ছ করছে, রাজাকে হেয় করছে! তিনি বাধা দিয়ে বললেন, তোমার মস্তিষ্কের বোধ হয় ঠিক নাই কাজলরেখা। তাই বরাবর তুমি অসম্ভব কথা বলছ। রাজপুত্রকে কামনা না ক'রে, সাধারণ মানুষকে বরণ করবার কথা বলছ।

কাজলরেখা বললেন, সাধারণের মধ্য থেকেই তিনি হবেন অসাধারণ।

রাজা বললেন, সাধারণ কখনও অসাধারণ হয় না। মুক্তামালার কথা সত্য। বীজই সকল গুণের আকর। সুতরাং জন্ম যার উচ্চকুলে নয়, সে কখনও মহৎ বা শ্রেষ্ঠ বা অসাধারণ হতে পারে না।

কাজলরেখা বললেন, কন্তার ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করবেন। আমি কিন্তু মনে করি অন্তরূপ। জন্ম থেকেও কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করি। কর্ম্ম থেকেই মানুষের প্রতিষ্ঠা, মানুষের প্রতিষ্ঠা থেকেই হয় একটি বংশের প্রতিষ্ঠা। আবার সেই বংশের বংশধরের অপকর্ম্মে হয় সেই বংশের অধঃপতন। আপনার এই মহৎ বংশ—এই বংশের মহিমা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করছে পুণ্যকর্ম্মী উত্তরাধিকারীর উপর। উদ্ধত উগ্র ক্ষমাহীন প্রেমহীন উত্তরাধিকারী আপনার দৌহিত্র, হোক না কেন মাতৃকুলের দিকে তার আপনার বংশে জন্ম, হোক না কেন পিতার দিক থেকে অন্ত কোন বড় রাজবংশে জন্ম, সে কখনও আপনার বংশমহিমা এবং কুলগরিমাকে অক্ষুণ্ণ অটুট রাখতে পারবে না। বিধাতার লিপিও খণ্ডিত হয় মানুষের কর্ম্মফলে, সুতরাং আপনার ইচ্ছা এবং আশীর্ব্বাদই আপনার উত্তরাধিকারীকে ভাবীকালে রক্ষা করতে পারবে না।

এই কথায় রাজা অত্যন্ত রুষ্ট হলেন কাজলরেখার উপর। কেন না তাঁর মনে হ'ল কাজলরেখা তাঁর অপমান করেছে। রাজার পুত্রকে কামনা না ক'রে, সাধারণ মানুষকে কামনা ক'রে সে বংশের অপমান করেছে। তাঁর আশীর্ব্বাদ তাঁর ইচ্ছা তাঁর উত্তরাধিকারীকে রক্ষা করতে পারবে না ব'লে, সে তাঁর অপমান করেছে। একবার তাঁর ইচ্ছা হ'ল, প্রহরীকে ডেকে এক্ষুনি এই হীনমতি কন্তাকে বন্দিনী ক'রে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। তারপরই একটা কথা তাঁর বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল। ভাল, তাই হবে। কাজলরেখা রাজ্যকে উপেক্ষা করে, সাধারণ মানুষকে বিবাহ করতে তার প্রবৃত্তি! তাই তিনি করবেন। সেই বিবাহই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি। রাজকন্তা

ক'রে দেখলেন। আবার দেখলেন। কন্যাদান শেষ ক'রে উঠে একবার ভাবলেন, তাদের ডেকে ধনরত্ন দিয়ে তাদের আদর ক'রে নিজের কাছেই রাখবেন। কিন্তু না। নিজেকে কঠোর ক'রে তুললেন। কর্তব্য করতেই হবে। মুখ ঘুরিয়ে বললেন, আজই রাত্রে তোমরা আমার রাজ্য থেকে চ'লে যাও। প্রভাতে যেন দেখতে না পাই। কেউ যেন জানতে না পারে। কাজলরেখার বিয়ের কথা কাউকে জানান নি তিনি। আলো জ্বলে নাই, বাজনা বাজে নাই, শুধু দুবার চারবার শাঁখ বেজেছিল। দুটি প্রদীপ জ্বলেছিল, তাও ঘর বন্ধ ক'রে। অন্ধকারের মধ্যে বর আর কনে—কবি আর কাজলরেখা হাত ধরাধরি ক'রে, পায়ে হেঁটে, রাজ্য থেকে চ'লে গেল। যাবার সময় রাজা কিছু ধনরত্ন দিতে চাইলেন জামাইকে। জামাই বললেন, আমাকে ওসবের বদলে কিছু চাল দিন, যা নাকি রান্না ক'রে দশজনকে ভোজন করিয়ে, অবশিষ্টাংশ আমরা ভোজন ক'রে তৃপ্তি পাব। ধনরত্ন অলঙ্কার—এর মূল্য আমি বুঝি না। কন্যা কাজলরেখা তাঁর গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলে বাপের পায়ের কাছে নামিয়ে দিলেন।

আবার বাধা পড়ল। খিড়কির দরজার মুখে দাঁড়িয়ে কে ডাকছে, রাঙাদি!

কে?

আমি কিশোর।

কিশোর? এস। কবে এলে তুমি কলকাতা থেকে?

খিড়কির দরজার ওপারের অন্ধকার থেকে একটি দীর্ঘাকৃতি তরুণ এসে উঠানে দাঁড়াল। দৃপ্ত এবং দীপ্ত চেহারার আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে। মেয়েরা যারা গল্প শুনছিল, তারা উঠে সংযত এবং সম্বৃত হয়ে বসল। চারু গৌরীকান্ত দুজনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিশোরের দিকে। ছেলেটি এই বাড়ির দৌহিত্র-বংশের ছেলে। কিশোরের পিতামহের কালে তারা এই বাড়িতেই বাস করত। এখনও তাদের বাড় এই বাড়ির পাশেই। এদের বাড়ির সকলেই চাকুরে। ছেলেটি এণ্ট্রান্স পাস ক'রে কলকাতায় পড়ে।

একজন গল্প-শ্রোত্রী বললে, ব'স ভাই, ব'স। গান শুনিয়ে যেতে হবে কিন্তু। বল ভাই কাশীর বউ, তুমি বল।

কিশোর জন্মগায়ক; মধুক্ষরা তার কণ্ঠস্বর, বাঁশী হার মানে। শুধু তাই নয়, সে কবিতা লিখতে পারে; খেলায় শক্তিতে সে নামকরা ছেলে।

মেয়েটির অনুরোধ শুনে কাশীর বউ হাসলেন। বললেন, শুনছ কিশোর?

কিশোর বললে, আজ নয় রাঙাদি, অন্য দিন। আজ আমি বিপদে পড়েছি, আপনাকে উদ্ধার করতে হবে।

কি হ'ল? বাড়িতে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

কিশোরদের বাড়িরও ওই চারুদের বাড়ির মত অবস্থা। একান্নবর্তী পরিবার। কিশোরের বাপের ছয় সহোদর, সাত বউয়ের বাড়ি; বাড়ির কর্ত্রী কিন্তু কিশোরের পিসীমা, তাঁর শাসনে মধ্যে মধ্যে কিশোরের মাকে কাঁদতে হয়, কিশোর বিদ্রোহ ক'রে। বিদ্রোহ দমন করেন কিশোরের এক কাকা, নির্মম হস্তে দমন করেন, এখনও কিশোরের পিঠে বেত পড়ে। কিশোরের বাপ ভাইদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ, তবু তিনি এর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন না; জ্যেষ্ঠ হয়েও তিনি অগ্রজভক্ত চারুর বাপের মতই অনুজভক্ত। ভক্তি বা প্রীতিই এখানে একমাত্র কারণ নয়, প্রধান কারণ—এই রীতিই হ'ল সমাজ-প্রচলিত প্রশংসিত রীতি এবং বিধান। কিশোর এক-একদিন রাগ ক'রে বাড়ি থেকে চ'লে আসে। কাশীর বউ বুঝলেন, আজ তার চেয়েও বেশি কিছু হয়েছে, নতুবা বাড়ি থেকে রাগ ক'রে চ'লে এসে কিশোর তো অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করবার ছেলে নয়; প্রয়োজন হ'লে সে গাছতলায় আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না।

আপনি একটু উঠে আসুন।

উঠে যেতে হবে? হাসলেন কাশীর বউ।

খিড়কির দরজার ওপাশে, অন্ধকারের মধ্যে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যেন কেউ দাঁড়িয়ে ছিল; কিশোর বললে, একে আশ্রয় দিতে হবে আপনাকে।

একটি মেয়ে। বিস্মিত হয়ে গেলেন কাশীর বউ। কিশোরের প্রতি একটা বিরূপতা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর অন্তরে মাথা ঠেলে জেগে উঠছিল। এ কে কিশোর?

একটি অনাথা মেয়ে রাঙাদি। গোয়ালপাড়া জানেন? গোয়ালপাড়া বাড়ি মেয়েটির, নাম ষোড়শী।

কাশীর বউ বললেন, ওর নাম আমি শুনেছি কিশোর। তুমি ওকে কোথায় পেলে?

কিশোর বললে, তা হ'লে তো আপনি অনেক কিছু জানেন রাঙাদিদি, গ্রামের লোকে ওর ওপর বিরূপ হয়েছে, ওকে সমাজে ঠাঁই দিতে চায় না। ও চ'লে এসেছে বাড়ি থেকে। কোথায় যাচ্ছিল, ওই জানে, 'কস্ত আমরা কজন বেড়িয়ে ফেরবার পথে দেখলাম, অমূল্য ভূপতি, আরও কজন চেলাচামুণ্ডা নিয়ে, ওকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। মেয়েটি আমাদের দেখে কেঁদে উঠল। আমরা ওদের সঙ্গে মারামারি ক'রে বেচারাকে উদ্ধার করলাম। এখন কি করব? গ্রামেও ফিরে যাবে না। বিদেশে গেলে ওর অবস্থা যে কি হবে, ভেবে দেখুন। আমার বাড়ির কথা তো আপনি জানেন। তাই নিয়ে এলাম আপনার কাছে। আমাদের দেশের এইসব হতভাগিনীদের দশা আপনি বুঝবেন। আপনি ওকে ঝি হিসেবে রাখুন। ও তা থাকতে চায়।

একটু চুপ ক'রে থেকে কাশীর বউ বললেন, আজ রাত্রির মত আশ্রয় আমি ওকে দিচ্ছি। বরাবরের কথা ওঁকে না জিজ্ঞাসা ক'রে তো বলতে পারব না ভাই।

কিশোর হেসে বললে, দাদাকে?

হ্যাঁ।

রাঙাদি, আপনাকে লোকে ডাকে কাশীর বউ ব'লে, কিন্তু আমরা ছেলের দল আপনার নাম দিয়েছি 'অন্নপূর্ণা'। রুদ্রদেবের মত রাধাকান্তদাদাকে আপনি ভিখিরী শিবের মত বশ মানিয়েছেন, শিবের রাজ্য কাশী, এই দাদার রাজ্যেই। ওটা আপনি আমাকে ছলনা করছেন।

কাশীর বউ হেসে বললেন, ও তোশামোদের চেয়ে একখানা গান শোনালে আমি বেশি তুষ্ট হতাম নাতি।

আর একদিন। কাল দুপুরে এসে পেট ভ'রে গান শুনিয়ে যাব। কিন্তু আশ্রয় দিলেন তো তা হ'লে?

ওঁকে জিজ্ঞেস না ক'রে নয় ভাই। শিবই যখন বললে তোমার দাদুকে, আমাকে বললে অন্নপূর্ণা, তখন দক্ষযজ্ঞের কথাটা মনে করিয়ে দি তোমাকে। জোর ক'রে শিবের অনুমতি আদায় করার ফলে শিবানীকে দেহত্যাগ করতে হয়েছিল, তার ফলে হয়েছিল দক্ষযজ্ঞ।

কিশোর বললে, দাঁড়ান দিদি, আপনাকে একটা প্রণাম করি।

কাশীর বউ হেসে বললেন, আশীর্ব্বাদ করছি, টুকটুকে একটি বউ হোক শিগগির।

কিশোর বললে, রাঙাদি বুঝি আমাদের দেশের রসিকতাগুলো শিখছেন?

না শিখলে চলে? তোমাদের দেশের অন্নজল যখন বরাদ্দ করলেন ভগবান, তখন এই দেশের সব কিছুই যে শিখতে হবে ভাই। জান, বিয়ের পর এখানে এলাম, স্নান করব, বাড়ির ঝিকে জিজ্ঞাসা করলাম, জল কোথায়? বলে, ঘাটে যাও। এই গোনে-গোনে আমার সঙ্গে এস, কেউ নাই এ গোনে, তবু সান কেড়ে লাও আমি গোন ও বুঝতে পারি না, সানও বুঝতে পারি না। তিনি হাসলেন। তারপর আবার বললেন, তখন তো ভাই তোমাদের এ কালের ছেলেদের মত শহরের ভাষায় এ কালের ভাবের কথা কেউ বলত না, তোমরাও তখন শেখ নি। কাজেই এ দেশের কথা শিখতে হয়েছে বইকি!

তা শিখুন। গোন শিখুন, সান শিখুন, সে কথা আমি বলি নি। আমি বলছি, এ দেশের ওই রসিকতা আর বঁড়শির মত পাঁজরা-বেঁধা বাঁকা কথাগুলো শিখবেন না রাঙাদিদি। আর গালাগালগুলো শিখবেন না।

ভিতর থেকে চারুর কান্না ভেসে এল। চারু কাঁদছে, বোধ হয় গৌরীকান্ত তাকে

মেয়েছে। কাশীর বউ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, আচ্ছা তাই, কাল দুপুরে এস, ওর পাকা ব্যবস্থা যা হয় হবে তখন। তারপর বোড়শীকে বললেন, এস গো মেয়ে, আমার সঙ্গে এস।

কিশোর সম্ভবত কলকাতায় গিয়ে ব্রাহ্মদের ছোঁয়াচ লাগিয়েছে। কাশীর মেয়ে তিনি, ব্রাহ্মদের শুদ্ধ রুচিবাতিকের কথা জানেন। টুকটুকে বউ হোক—এ পরিহাসও কিশোরের কাছে অরুচিকর ঠেকছে। তা ভাল, দেশের ছেলেদের মধ্যে হাওয়া ফিরুক।

চারু চীৎকার ক'রে কাঁদছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, কি হ'ল? গৌরী মেরেছে বুঝি? গৌরী!

গৌরীকান্ত বললে, না, আমি মা'র নি

শ্রোত্রীয়গুলীর অন্যতমা গ্রামের মেয়ে পুঁটি বললে, না মা, তুমি চ'লে গেলে, ও শুল। আমি তাই উঠিয়ে বসিয়ে দিলাম, ওঠ্, গৌরী, মা আসছে, গল্প বলবে, শুনবি। এই কান্না। কে জানে মা, এমন রঙ্গের বাধা তো আমি দেখি নাই। তা আবার শুইয়ে দিলাম বলি অবে শো, ঘুমো। তাও শোবে না। কাঁদছে। এ কি আদর মেয়ের মা। তা পরের ঘর করবে কি ক'রে এসব মেয়ে?

কান্নার মধ্যেই চারু ফোঁস ক'রে উঠল, বেশ, তা তোর কি ভাতারখাকী।

শুনলে, শুনলে? কাশীর বউ, তুমি শুনলে? কথা ধ'রে মাটিতে ঘ'ষে দিতে হয় না মেয়ের? সাঁড়াশি তাতিয়ে বাক্ত (জিভ) ছিঁড়ে নিতে হয় না? বল তুমি?

কাশীর বউ বিব্রত হলেন। বললেন, চুপ কর, চুপ কর ছোট ছেলে। যাকগে মরুকগে, গল্প শোন।

পুঁটি উঠে দাঁড়াল। বললে, অ। ভালবাসার লোক যে চারুর মা, তাই বুঝি তার বেটীর দোষ হয় না? দোষ বুঝি আমাদের? তা বেশ। চললুম ভাই, আর আসব না।

কাশীর বউ বললেন, না না বস পুঁটি, ব'স।

না।

শ্যামাকান্তের পুত্রবধূ মহাদেবের স্ত্রী সুলকাবা, সে নির্বিকারের মত শুয়ে ছিল, সে বললে, গল্পটা শুনে যাও ভাই। গল্প আধশোনা রাখলে আধকপালে হয়।

পুঁটি এবার থমকে দাঁড়াল। এটা এখানকার প্রচলিত বিশ্বাস। তার উপর মাথা তার মধ্যে মধ্যে ধরে। সে ফিরে এসে বসল। বললে, তাই বল, 'বলেছি শুধেকোর ব্যাটা আর তো ফেরে না'! আধখানা যখন শুনেছি, তখন গু খেয়েছি, তা বল, শেষ কর, গু খেয়ে শেষই করি।

কাশীর বউ আশ্বস্ত হলেন। পুঁটি কুলীনের ঘরের মেয়ে, বিয়ে হয়েছে নামে, স্বামীর

সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, বাপের ঘরেও ভ্রাতৃবধূর বিষদৃষ্টি তার উপর; পুঁটির উপর রাগ করতে গেলে ওই কথাগুলিই মনে হয় কাশীর বউয়ের, তিনি রাগ করতে পারেন না। মায়ায় তাঁর মন ভ'রে ওঠে। যাক, পুঁটি যখন ফিরে বসেছে, তখন আর ভাবনা নাই। গল্প শেষ হতে হতে তার সব রাগ জল হয়ে যাবে। চারুটাও আবার শুয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে। ওটার ওই রোগ। আর গল্প-পাগল যেমন তাঁর শ্রীমানটি! গল্প যতক্ষণ শেষ না হবে ততক্ষণ জেগে থাকবে। সস্নেহে ছেলেকে কাছে একটু টেনে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তারপর—। কতদূর বলেছি বল তো?

পুঁটি বললে, বিয়ে হ'ল গো ছোট রাজকন্মের। কি নাম যেন?

গৌরীকান্ত বললে, বর কনে রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেল অন্ধকারে। কাজলরেখা গয়না খুলে বাবার পায়ে নামিয়ে দিলে।

পুঁটি বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা তোতাপাখি ছেলে তোমার মা! ঠিক মনে রেখেছে। আমরা বুড়ো মাগী, আমাদের মনে নেই। বাবা আমাকে খ্যাপা বলে, তা মিছে নয় ভাই। কিছুই আমার মনে থাকে না।

শ্যামাকান্তের পুত্রবধূ বললে, বলুন খুড়ী, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে।

সত্য কথা। কাশীর বউয়েরও অনেক কাজ বাকি। রাধাকান্তের জন্ম তিনি নিজে হাতে রুটি তরকারি তৈরি ক'রে থাকেন। তারও সময় হয়ে এল। তিনি আরম্ভ করলেন, হ্যাঁ, তারপর—

তারপর কবি আর কাজলরেখা এলেন কবির ঘরে। গরিবের ঘর। কাজলরেখার তাতে কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। প্রসন্ন মনে সমস্ত করেন, ঝাঁট দেওয়া থেকে রান্নাবান্না, বিছানা-পাতা, জল-আনা সমস্ত। কবি কাব্য লেখেন। রাত্রে কাজলরেখাকে শোনান। কাব্যে কবি ভগবানকে স্তব করেন, প্রার্থনা করেন, হে ভগবান, তুমি মঙ্গলময়, তুমি দীনদরিদ্রের বন্ধু, তাদের দুঃখ তুমি দূর কর। সকল বিপদে তুমি তাদের রক্ষা কর। তাদের বড় কষ্ট, তুমি তাদের দিকে তাকাও। শুনতে শুনতে কাজলরেখার চোখ জলে ভ'রে ওঠে। কবি সকালে বার হন একতারা নিয়ে। গ্রামের পথে পথে গান গেয়ে চলেন, ধনী, তুমি অহঙ্কার ক'রো না, ধনসম্পদ হ'ল পদ্মপত্রের জল। দরিদ্র, তুমি দারিদ্র্যদুঃখে পরের হিংসা ক'রো না, অসৎ উপায়ে উপার্জ্জনের চেষ্টা ক'রো না; হিংসা হ'ল নিজের কাপড়ে ধরানো আগুন, তাতে তুমিই পুড়ে মরবে; অসৎ উপায়ে উপার্জ্জন হ'ল পাপ, পাপ তোমাকে ধ্বংস করবে। উপরের দিকে চাও, সেখানে আছেন সকল মানুষের পরম বন্ধু এবং সকল রাজার রাজা; তিনি তোমাদের রক্ষা করবার জন্ম, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবার জন্ম ব্যগ্র হয়ে ব'সে আছেন, সকল অবিচারের বিচার

করবার জন্য ন্যায়দণ্ড নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁর বারণ না হ'লে তিনি কি করবেন? তাঁর শরণ নাও, তাঁর শরণ নাও, তোমরা সকলে তাঁর শরণ নাও।

এদিকে, রাজা মুক্তামালার বরকে তাঁর প্রতিনিধি ক'রে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। মুক্তামালার বর মহাবীর মহাযোদ্ধা, তিনি মৃগয়ায় যান, পশুপক্ষী বধ করেন, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দেশ জয় করেন। রাজাদের বন্দী ক'রে এনে দাস করেন, রানী রাজকন্যাদের এনে মুক্তামালার দাসী ক'রে দেন। আবার তিনি কঠোর শাসক। সামান্য দোষও কেউ করলে তার নিষ্কৃতি নাই। চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করেছেন। কে কোথায় রাজার নিন্দা করছে, সন্ধান করে গুপ্তচরেরা। কে কোথায় রাজার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করছে, সে সন্ধান রাখে তারা। জামাই-রাজা কঠোর শাস্তি দেন।

প্রজারা সভয়ে সশঙ্কিত হয়ে দিন যাপন করে। কার কোন্‌দিন কি হয়! শস্য উঠলে সর্বাগ্রে রাজার কর আদায় দেয়, শস্য যদি নাও হয়, তবুও ঋণ ক'রে অথবা কিছু বিক্রি ক'রে, যেমন ক'রেই হোক, রাজার কর দিয়ে আসে।

ক্রমে দুই কন্যারই দুটি ছেলে হ'ল। ছেলে দুটি আপন আপন বাপ-মায়ের কাছে বড় হতে লাগল। মুক্তামালার ছেলে, ভবিষ্যৎ রাজা, রাজপ্রাসাদে সোনার ভাঁটা নিয়ে খেলা করে। তীর ধনুক নিয়ে পোষা-পাখি বিঁধে লক্ষ্যভেদ শেখে। কাজলরেখার ছেলে ভোরে উঠে জোড়হাত ক'রে বসে, কাজলরেখার সঙ্গে তার বাপের রচনা করা ভগবানের স্তব গান করে, আঙিনায় খেলা করে, পাথর নুড়ি কুড়িয়ে আনে। যেগুলি ময়লা মাটি লেগে থাকে, সেগুলিকে বলে, মা, এরা গরিব দুঃখী, নয়? গায়ে ময়লামাটি লেগে রয়েছে। তাদের সে স্নান করায়। বলে, এদের সেবা করছি। সন্ধ্যায় শাস্ত্র পড়ে বাপের কাছে—নানা শাস্ত্র।

এমন সময়, সেবার একবার দেশে এল মহা হাহাকার। একেবারেই বৃষ্টি হ'ল না। দারুণ অনাবৃষ্টি। বর্ষা না হ'লে শস্য হয় না। শস্য না হ'লেই দেশে হয় দুর্ভিক্ষ। দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'ল। লোকে অন্নের অভাবে, গাছের পাতা খেতে আরম্ভ করলে; স্ত্রীপুত্র বেচতে আরম্ভ করলে।

জামাই-রাজার কঠোর শাসন। রাজকর আদায়ের জন্য নায়েব-গোমস্তার সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত দেওয়া হ'ল।

কাজলরেখার স্বামী কবি, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে অবিরাম কাঁদেন। ভগবানকে ডাকেন, উপায় কর, প্রভু, তুমি উপায় ক'র। মানুষকে তুমি রক্ষা কর। কাজলরেখা জোড়হাত ক'রে ব'সে থাকেন স্বামীর পাশে। ছেলেটিও থাকে। রাত্রে কবিকে স্বপ্নাদেশ হ'ল। এক জ্যোতির্ময় পুরুষ এসে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ দেশে রাজা রয়েছে। তুমি প্রজাদের সঙ্গে ক'রে তাঁর দরবারে যাও। জানাও তাঁকে

তোমাদের দুঃখের কথা। তিনি যদি প্রতিকার না করেন, তখন আমার কাছে নালিশ জানালে তার প্রতিকার আমি করব।

সকালে উঠেই কবি কাজলরেখাকে সব বললেন। ব'লে বললেন, দেখ, তোমার দিদি মুক্তামালার স্বামীর যে প্রকৃতির কথা আমি শুনেছি, তাতে ভগবানের অভিপ্রায় যে কি, তা আমি বুঝতে পারছি না। তবু আমাকে যেতে হবে। সত্যপ্রিয় (ছেলের নাম সত্যপ্রিয়) তোমার কাছে রইল। আমি যদি না ফিরি, তবে তার ভার তোমার উপর রইল। তারপর তিনি দুঃখীদের নিয়ে রাজধানীতে গেলেন। যত যান, তত দলে দলে লোক তাঁর পাশে জমা হয়। এমনই ভাবে তারা প্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে জোড়হাত ক'রে ডাকলে, হে মহারাজ, আমাদের দয়া করুন, আমাদের অন্ন দিন।

মুক্তামালার স্বামী ঘুমুচ্ছিলেন। চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বেরিয়ে এলেন বারান্দায় রক্তচক্ষু হয়ে, ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে। বিছানা থেকে তরবারি হাতে নিতেই কিন্তু চীৎকার স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন, সম্ভবত তারা তাঁর তরবারি হাতে নেওয়া জানতে পেরেছে। কিন্তু তিনি বারান্দায় এসে দেখলেন, শক্তিপ্রিয় (তাঁর ছেলের নাম শক্তিপ্রিয়), তারই ভয়ে প্রজাদের চীৎকার স্তব্ধ হয়ে গেছে ; শক্তিপ্রিয় ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে বুক ফুলিয়ে, আর নীচে প্রজাদের সামনে, সর্ব্বাগ্রে একটি মানুষের দেহ প'ড়ে আছে। তার বুকে একটা তীর ব'সে রয়েছে। দেখেই ছেলেকে তিনি মহাগৌরবের সঙ্গে বুকে তুলে নিলেন। উপযুক্ত পুত্র। বিদ্রোহ দমন করতে সে পারবে।

ওদিকে প্রজারা কবির মৃতদেহ তুলে নিয়ে নীরবে কাঁদতে কাঁদতে চ'লে গেল। কবিই ছিলেন সকলের সম্মুখে, সর্ব্বাগ্রে, শক্তিপ্রিয়ের তীর তাঁরই বুকে এসে বিদ্ধ হয়েছিল।

কাশীর বউ একটু থামলেন।

তারপর মা? সত্যপ্রিয় কি করলে? মা, তাকেও মেরে ফেললে?—গৌরীকান্তের গলা কাঁপছে। কান্না এসেছে তার।

পুঁটি বললে, না ভাই, এ গল্প তোমার ভাল নয়। বিয়ে নাই, রাজকন্তে নাই। মারামারি কাটাকাটি। না ভাই।

চাকর বিষ্টুচরণ এসে দাঁড়াল। মা!

কাশীর বউ বললেন, ভাঁড়ারে ময়দা বের করা আছে বাবা, তুমি নিয়ে মাখতে আরম্ভ কর। আমার হয়ে গেছে।

কাশীর বউ গল্প বলার ভঙ্গীর ঈষৎ পরিবর্ত্তন করলেন। সংক্ষিপ্ত ক'রে ব'লে গেলেন। বললেন, ওদিকে কাজলরেখা স্বামীর দেহ নিয়ে নদীর ধারে দাহ করলেন। চিতার পাশে

মাত্তাপুত্রে হাতজোড় ক'রে ভগবানকে ডাকলেন। বললেন, প্রভু, তোমার আদেশে সে গিয়েছিল। তাকে রাজা বধ করেছে। তার প্রতিহিংসা আমরা চাই না, আমরা চাই, তুমি বলেছিলে রাজা প্রতিকার না করলে তখন তোমার কাছে নালিশ জানাতে। রাজা প্রতিকার করে নাই, তুমি এইবার প্রতিকার কর, দুঃখীদের বাঁচাও, ত্রাণ কর। এইবার ভগবানের আসন ট'লে উঠল। তিনি ডাকলেন ক্রোধকে। বললেন, যাও, তুমি গিয়ে প্রজাদের বুকের মধ্যে অধিষ্ঠান হও, দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠ, তারা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করে এমনভাবে তাদের ক্রুদ্ধ ক'রে তোল। ক্রোধ এল।

অনাহারে মানুষ পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল পেটের জ্বালায়। পথে প'ড়ে মরছিল। সেই সব মড়ার মাংস খাচ্ছিল। তারা দেখতে দেখতে অন্যরকম হয়ে উঠল। দক্ষযজ্ঞের সময় শিবের জটা থেকে জন্ম নিয়েছিলেন বিরূপাক্ষ, তেমনই মূর্ত্তি হ'ল তাদের। তারা ছুটল দলে দলে, মার্-মার্ শব্দে। মার্, ওই রাজাকে মার্! ওই রাজাকে মার্! রাজার পাপেই হয় অনাবৃষ্টি, রাজার পাপেই হয় দুর্ভিক্ষ, রাজার অত্যাচারেই আমাদের এই দশা। রাজাকে মার্!

সকলের নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে আসছিল।

গৌরী বললে, মা, কি করলে তারা?

তারা ছুটে গিয়ে পড়ল দলে দলে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে রাজধানীতে, রাজপ্রাসাদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা ক্ষেপে উঠল, হাতি খেপে উঠল, ঘোড়া খেপে উঠল, আকাশে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল বাজপক্ষী, শকুনি, গৃধিনী; সে এক প্রলয়ের মত ব্যাপার! ভেঙে পড়ল রাজার সিংহদ্বার। ছিঁড়ে পড়ল ঝাড়-লণ্ঠন। দাউদাউ ক'রে জ্বলতে লাগল কাঠের আসবাব। প্রজারা হুঙ্কার দিয়ে উঠতে লাগল উপরে। মুক্তামালার বর কিন্তু মহাবীর, শক্তিপ্রিয়ও বীর, মুক্তামালাও যুদ্ধ করতে জানেন। তাঁরা পালালেন না, যুদ্ধ করতে এলেন। কিন্তু এত মানুষের কাছে তাঁরা কি করবেন? কিছুক্ষণের মধ্যে তিনজন লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। প্রজারা তাদের দেহ মাড়িয়ে এর পর ছুটল—কোথায় সেই বুড়ো রাজা! এইবার তাকে আমরা বধ করব। কোথায়? অথর্ব্ব বৃদ্ধ রাজা ব'সে ছিলেন আপনার ঘরে। তিনি ইষ্ট স্মরণ করতে লাগলেন। কোলাহল এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু রাজা আশ্চর্য্য হলেন, হঠাৎ কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। বাঁশির আওয়াজের মত একটি মিষ্টি আওয়াজ তাঁর কানে এল—শান্ত হও, শান্ত হও, হিংসাকে সম্বরণ কর। বাঁশির আওয়াজ শুনে ছুটন্ত হরিণের দল যেমন থমকে দাঁড়িয়ে যায়, পাগলা হাতি যেমন শান্ত হয়ে দাঁড়ায়, তেমনই পাগল লোকেরা থেমে গেল। রাজার ঘরে এসে ঢুকল ষোল-সতেরো বৎসরের একটি ছেলে, সে যেন কুমার কার্ত্তিক।

কিন্তু তার হাতে ধনুর্ব্বাণ নাই, অঙ্গে রাজবেশ নাই। পিছনে পিছনে এসে ঢুকলেন বিধবা কাজলরেখা। বাবা! রাজা চমকে উঠলেন, মা কাজলরেখা?

হ্যাঁ, বাবা। এই আপনার দৌহিত্র।

জামাই?

তাঁকে তো বধ করেছে শক্তিপ্রিয়।

রাজা কাঁদতে লাগলেন। কাজলরেখা বললেন, বাবা, জন্ম থেকে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, তাই সেই কর্ম্মপুণ্যবলে মানুষের সেবার পুণ্যে উন্মত্ত মানুষ আজ সত্যপ্রিয়ের অনুগত সেই পুণ্যেই আপনাকে আজ রক্ষা করতে পেরেছি, এই আমার মহাভাগ্য।

রাজা উঠলেন, নিজের মাথার মুকুট খুলে পরিয়ে দিলেন সত্যপ্রিয়ের মাথায়। প্রজারা জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। রাজা বললেন, আমার নাতির বিবাহ দেব। সেই বিবাহে রাজকোষ রাজভাণ্ডার তোমাদের খুলে দিলাম।

* * * *

রাত্রে রাধাকান্ত খেতে বসেছিলেন। কাশীর বউ বললেন ওই ষোড়শী মেয়েটির কথা।

কে? চমকে উঠলেন রাধাকান্ত।

ষোড়শী, যার কথা সেদিন তুমি বলছিলে। গোয়ালপাড়ার রঙলাল, গ্রামের মণি দত্ত এসেছিল—যার কথা নিয়ে।

সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি।

হ্যাঁ, সেই। কাশীর বউ ব'লে গেলেন কিশোরের কথা।

রাধাকান্ত বললেন, কিশোর পাগল, তুমিও পাগল।

কেন?

ওকে উদ্ধার করতে যাওয়াও পাগলামি। ওকে আশ্রয় দেওয়াও পাগলামি।

কেন? একবার কেউ খারাপ হ'লে সে কি ভাল হয় না?

চুপ ক'রে রইলেন রাধাকান্ত।

কাশীর বউ বললেন, আমি অবশ্য আশ্রয় দিই নি। তোমার ঘর, তোমার অন্নতে আশ্রয় দোব কোন্ অধিকারে? রাত্রের মত থাকতে দিয়েছি। বলেছি সে কথা কিশোরকে। কিন্তু কিশোরের একটা কথা আমার প্রাণে বড় লেগেছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাধাকান্ত স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন।

কাশীর বউ বললেন, কিশোর বললে, আশ্রয় না পেলে ওর পরিণামটা ভেবে দেখুন। ভাবতে গিয়ে আমি শিউরে উঠলাম।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাধাকান্ত বললেন, ভাবনা তো শুধু ওর পরিণামই নয়। ভাবনার যে অনেক কিছু আছে কাশীর বউ।

এবার কাশীর বউ সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাইলেন।

রাধাকান্ত বললেন, ওর ভাবনা ভাববার আগে, আমার নিজের ভাবনা ভাবতে হবে।

কাশীর বউ হেসে ফেললেন, বললেন, বাঁশি শুনে এত, তা হ'লে না জানি তাকে দেখলে কি বলবে তুমি! কিন্তু তুমি এত দুর্ব্বল, তা জানতাম না।

রাধাকান্তও হেসে ফেললেন। বললেন, বাক্‌পটুতা পুরুষের পক্ষে ভাল লক্ষণ, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে ভাল নয়। তোমাকে আজ মুখরা বলতে হ'ল আমাকে। নিজের ভাবনা হ'ল—আমার ঘরের ভাবনা। জান, চরিত্রহীনা নারী যে সংসারে থাকে, সে সংসারে লক্ষ্মীর আসন টলে?

কাশীর বউ বললেন, তুমি আমাকে মুখরা বললে, আর আমার কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে না ব'লে পারছি না। তুমি তো শাস্ত্র অনেক পড়েছ। কোজাগরী লক্ষ্মীর কথায় আছে, আশ্রয় চাইতে আসায় অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এক ব্রাহ্মণ। তাতে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁকে। কিন্তু ধর্ম্ম তাঁর তাতে বলীয়ান হয়েছিলেন। লক্ষ্মীকে ফিরতে হয়েছিল সে বলে। এ মেয়েটিও তো আশ্রয়প্রার্থী তোমার কাছে।

রাধাকান্ত চুপ ক'রে রইলেন। তিনি ভাবছিলেন আরও অন্য কথা। ভাবছিলেন অমূল্য-ভূপতির কথা। স্বর্ণ অমূল্য-ভূপতির মামা, এবং স্বর্ণেরও এদিকে দুর্ব্বলতা আছে। এই মেয়েটিকে নিয়ে—

হঠাৎ একটা ডাক কানে এল। রাধাকান্তদা! রাধাকান্তদা!

খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে রাধাকান্ত উত্তর দিলেন, কে?

আমি স্বর্ণ। বাড়ির ছাদের উপর থেকে ডাকছি।

কি? কি হ'ল?

ধোঁয়াতে যে গ্রাম ভ'রে গেল! কিছু বুঝতে পারছ না?

ধোঁয়া?

কাশীর বউ বললেন, হ্যাঁ গো, তাই তো। কথার মধ্যে অন্যমনস্ক ছিলাম। সত্যিই তো ধোঁয়া এসে ঢুকছে ঘরে।

রাধাকান্ত উঠে পড়লেন। তাড়াতাড়ি মুখে হাতে জল দিয়ে, নিজের ছাদের উপর গিয়ে উঠলেন। দেখলেন, গ্রামের মাথার উপরে যেন কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে নেমেছে। আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে গ্রামের আকাশ। আকাশের গ্রহলোক পর্য্যন্ত অস্পষ্ট আবছা দেখাচ্ছে। চারিদিক চেয়ে দেখলেন, শুধুই ধোঁয়া, আগুনের আভাস কিন্তু কোথাও দেখা যায় না।

স্বর্ণ?

হ্যাঁ।

কি ব্যাপার ?

অন্ত একটি ছাদ থেকে কেউ ডাকলে, কে ? রাধাকান্তমামা ?

গোপীচন্দ্র ডাকলেন। তাঁরও ঘুম ভেঙেছে। রাধাকান্ত প্রশ্নের সঙ্গেই উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। গ্রাম ধোঁয়ায় ঢেকে গেল, দেখেছেন ? কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

গোপীচন্দ্র বললেন, ও ভয়ের কিছু নয়। ইটের ভাটার ধোঁয়া। ইস্কুল-ঘরের জন্ত ইটের ভাটায় আজই আগুন দেওয়া হয়েছে। তারই ধোঁয়া। শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

রাধাকান্ত স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। চিলে-কোঠার দরজা-বন্ধের শব্দে বুঝা গেল, গোপীচন্দ্র ছাদ থেকে নেমে গেলেন। স্বর্ণের আর সাড়া পাওয়া যায় না। সে নিঃশব্দে নেমে গিয়েছে নিশ্চয়। ইটের ভাটার ধোঁয়ার আচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। হ্যাঁ, ইস্কুল-ঘরের জন্ত ইট-পোড়াই শুরু হয়েছে বটে। খবরটা তিনি শুনেছিলেন। গ্রামে দিনমজুর পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। সকলেই ওখানে খাটতে যায়।

কাশীর বউ এসে ডাকলেন, কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে রাধাকান্ত বললেন, চল, যাই।

কি ভাবছ বল তো ?

ভাবছি ? চল যাই, শুই গিয়ে। আর একদিন বলব।

চল। গৌরী জেগে রয়েছে। গল্প শুনে ঘুম আসছে না তার। গল্প না শুনেও ছাড়বে না ; আবার শুনে ছেলের ঘুম আসবে না।

● * ● ●

সকালে উঠে রাধাকান্ত জানলার ধারে দাঁড়ালেন। গৌরী এখনও ঘুমুচ্ছে। বেচারা কাল রাত্রে বার দুই চেঁচিয়ে ঘুম ভেঙে উঠেছে। গল্পের কথা স্বপ্ন দেখেছে। সস্নেহ হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। তারপর তিনি চেয়ে দেখলেন জানলার বাইরে গ্রামের আকাশের দিকে। এখনও পর্য্যন্ত ধোঁয়ার স্তর পাতলা ছিলকে মেঘের মত গ্রামের মাথায় উড়ে চলেছে। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়ালেন। নীচে না নেমে, ছাদে উঠে গেলেন।

ছাদ থেকে গ্রামের পশ্চিম দিকের দিকে চেয়ে দাঁড়ালেন। পশ্চিম প্রান্তে একটি অনুর্ব্বর কাঁকর-বালি-মেশানো মাটির উঁচু প্রান্তর। মাটি এত অনুর্ব্বর যে, ওটা অনাবাদী হয়েই প'ড়ে আছে ; গোচারণের জন্তও কেউ ওদিকে যায় না। ওই যে বটগাছটা, ওটাতে, লোকে বলে, ভূত আছে। ওই প্রান্তরটার মধ্য দিয়ে চ'লে গিয়েছে এখান থেকে সাত মাইল দূরবর্ত্তী রেলষ্টেশন যাবার পাকা শড়ক, ডিষ্ট্রিক বোর্ড রোড। ওই

প্রান্তর কিনেছে গোপীচন্দ্র। ওই প্রান্তরে ইস্কুল হবে। ওই ইটের ভাটা পুড়ছে। একটা দুটো তিনটে। তিনটে ভাটার প্রায় সর্ব্বাঙ্গ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া বেরিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। আরও একটা দৃশ্য তিনি দেখতে পেলেন, পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর দিকে মাঠের পথ ধ'রে আসছে কালো পিঁপড়ের সারির মত মানুষের সারি। বুঝলেন, মজুরেরা আসছে খাটতে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে লাগলেন।

মাটি কাটছে, জল ঢালছে, কাদা ছাঁটছে পায়ের কৌশলে, ফর্মায় ফর্মায় ফেলে ইট পেড়ে যাচ্ছে। গাড়ি গাড়ি কয়লা আসছে। শুকনো ইট তুলে ভাটা সাজানো হচ্ছে। ইট পুড়ছে। কাঁচা ইট লাল হয়ে কালজয়ী শক্তি অর্জ্জন করছে। ঘুটিং আসছে। চুন হচ্ছে। ভিত খোঁড়া হচ্ছে। গাঁথনি গাঁথা হচ্ছে, গ'ড়ে উঠছে ইমারৎ। ইস্কুল-বাড়ি। তারপর আরও, আরও ইমারতে ভ'রে উঠল ওই প্রান্তর। গ্রামের লোক ছুটে চলছে ওই ওখানে। গ্রামান্তরের লোক আসছে ওখানে।

তিনি পূর্ব্ব দিকে একবার ফিরে চাইলেন। নদীর ধারে বলরটিপির জঙ্গল দেখা যাচ্ছে দূরে। গাছের মাথায় পাখিরা উড়ছে। নীচে? নীচে বেড়াচ্ছে সাপ। অসংখ্য কীটপতঙ্গ ঝিঁঝিঁ ডাকছে অবিরাম। নির্জ্জন স্তব্ধতার মধ্যে অবিরাম ডেকে চলেছে তারা।

ওই চণ্ডীতলা। ও পথে চলেছে কয়েকটি পুণ্যার্থিনী মেয়ে মাত্র। মাঠে কজন চাষী ঘুরছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরাও চ'লে আসবে। চণ্ডীতলার মাঠ খাঁ-খাঁ করবে।

উত্তর-পূর্ব্ব দিকে গন্ধবণিকপাড়া। ভাঙা দালানখানা দেখা যাচ্ছে শুধু। তিনি বেশ দেখতে পেলেন, ওখানে দুপাশে ছোটখাটো মুদীর দোকানের মাঝখানে রাস্তায় দু-চারখানি গাড়ি, দু-দশজন মানুষ শুধু ঘুরছে।

নিজেদের পাড়ায় অবশ্য কলরব উঠছে, গমগম করছে। তাঁর ওখানেই হয়তো পাঁচ-দশজন ব'সে আছে।

আবার তিনি চাইলেন পশ্চিম দিকে। উঃ, এখনও মানুষ আসছে! গ্রামান্তর, ওই ব্যাপারীপাড়া, গোগ্রাম, দেবীপুর, সজলপুর, মিলনপুর থেকে মানুষ আসছে। মাঠে-মাঠে চ'লে আসছে। ওই প্রান্তরে গোপীচন্দ্রের যে কীর্ত্তিপল্লী গ'ড়ে উঠছে, যেখানে একদা গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ আসবে, পদচিহ্নে পদচিহ্নে সেখানে আসবার পথ রচনা ক'রে আসছে তারা।

রাধাকান্ত কাল রাত্রি থেকেই ভাবছিলেন এই কথাটা। নবগ্রাম, এই অঞ্চলের সম্ভ্রম-রাশিখানা গ্রামের কেন্দ্রস্থল, জনপদতুল্য এই নবগ্রামের গ্রামলক্ষ্মী পার্শ্বপরিবর্ত্তন ক'রে ওই দিকে মুখ ফেরাচ্ছেন। একদা তিনি ছিলেন চণ্ডীতলা-অভিমুখিনী। দেশ-দেশান্তরের যাত্রী আসত। চণ্ডীতলায় ঘণ্টাধ্বনিতে মানুষের ঘুম ভাঙত। চণ্ডীতলায়

যেত মানুষ দলে দলে। শান্তি নিয়ে ফিরে আসত। তারপর গ্রামলক্ষ্মী মুখ ফিরিয়েছিলেন ঘাটবন্দরের দিকে। দেশান্তর থেকে নৌকা আসত। ঘাট থেকে গ্রাম পর্য্যন্ত গ্রামান্তর পর্য্যন্ত চলত বোঝাই গাড়ির সারি। মানুষ—মানুষ—মানুষ। তারা চলত পাশে পাশে। তারপর রেল হ'ল, নদী মজল। বন্দরটিপি জঙ্গলে পরিণত হ'ল। গ্রামলক্ষ্মী মুখ ফেরালেন তাঁদের পল্লীর দিকে। উকিল, জমিদার, চাকুরে এদের পল্লীর দিকে। মা আবার মুখ ফেরাচ্ছেন। ফেরাচ্ছেন ওই ধুধু-করা প্রান্তরের দিকে। চঞ্চলা! তুমি চঞ্চলা!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন রাধাকান্ত। 'চঞ্চলা' ব'লে মাকে দোষ দেওয়া কেন? কালের রথ চলেছে। সেই রথে গ্রামলক্ষ্মী পূর্ব্ব থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ, তার পর দক্ষিণ দিক দিয়ে চলেছেন, এইবার কিছুক্ষণের জন্য গিয়ে থামবেন পশ্চিমে। জনপদতুল্য নবগ্রামে লক্ষ্মীর রথ চলেছে। দিল্লী গিয়েছিলেন তিনি। দেখে এসেছেন—হস্তিনাপুরী থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হিন্দুদের দিল্লী, তারপর পাঠান, তারপর মোগলের দিল্লী, এই চক্রে রথে চ'ড়ে ঘুরেছেন সেখানকার লক্ষ্মী। দীর্ঘকাল তাঁর রথ থেমে আছে। হয়তো আবার চলবে তাঁর রথ কোনদিন, অকস্মাৎ নতুন দিকে মুখ ফেরাবেন। মনে পড়ল বাংলার কথা। গৌড়, গৌড় থেকে ঢাকা, রাজমহল, সেখান থেকে মুরশিদাবাদ, মুরশিদাবাদ থেকে কলকাতায় এসে থেমেছেন বাংলার লক্ষ্মী।

নবগ্রামের পল্লীলক্ষ্মীর রথ চলেছে। মানুষ বুঝতে পারে না, দেখতে পায় না। শতাব্দীতে শতাব্দীতে এক-একবার হয়তো বুঝা যায়, লক্ষ্মীর মুখ ফিরেছে। মা এবার ওই ইস্কুলের দিকে মুখ ফেরালেন।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ও থ্রেসদেশীয় দস্যুকে লইয়া একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এই থ্রেসদেশীয় দস্যুকে বন্দী করিয়া আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে উপনীত করা হইলে রক্তচক্ষু আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ীর উপযুক্ত সুরে ও ভঙ্গীতে তাহাকে নরঘাতক, দস্যু, দেশের শান্তির বিঘ্ন বলিয়া অভিহিত করেন। থ্রেসদেশীয় ব্যক্তিটি নির্ভয়ে বলিয়াছিল, আলেকজাণ্ডার, তুমি আজ বিজয়ী, আমি পরাজিত বন্দী, সুতরাং তোমার সমস্ত উক্তি আমার সহ্য না করিয়া উপায় নাই, যে হীন অভিধানে আমাকে অভিহিত কর না কেন, শৃঙ্খলিতহস্তপদ আমাকে সেও সহ্য করিতে হইবে।

সম্প্রতি বিশ্বকল্যলোক রাশিয়ার 'প্রাভদা' পত্রিকার একটি উক্তি পাঠ করিয়া ওই গল্পটি মনে পড়িয়া গেল। বিপ্লবী পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক, ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে 'প্রাভদা' পত্রিকার ডেভিস জ্যাসলাভস্কি নামক এক সাংবাদিক, আলেকজাণ্ডারের মত কটুকাটব্য করিয়াছেন; কুইস্লিং, বর্বর, ফাসিস্ত ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে নানা জনের পরস্পরবিরোধী উক্তি হইতে নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে এখানকার সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন এবং রাশিয়ার কোন স্থানে তিনি অবস্থান করিতেছেন। এই অনুমান প্রকাশিত হওয়ায় 'প্রাভদা' পত্রিকা ক্ষিপ্ত হইয়া অমার্জনীয় ঔদ্ধত্যে এখানকার সাংবাদিকদের প্রতি অপমানসূচক কটুকাটব্য করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ভারতের তারুণ্যের মূর্তিমান বিগ্রহ পরমপ্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্রকেও অভি-দম্ভসঞ্জাত ইতরতার সহিত জঘন্যভাবে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতের কুখ্যাত কুইস্লিং (যে প্রথমে হিটলারের বেতনভোগী ছিল, ও পরে জাপসাম্রাজ্যবাদীদের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য লাভ করিত) জাপানের আত্মসমর্পণের পর পলায়ন করিয়া এখন রাশিয়ায় অবস্থান করিতেছে।...এই দুর্বৃত্ত ফ্যাসিষ্ট নাকি সোভিয়েট দেশে ইচ্ছামত চলাফেরা করিতেছে।...সোভিয়েট গভর্মেন্টের দায়িত্বশীল প্রতিনিধিগণ এই ভারতীয় ফ্যাসিস্তের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহাকে কতকগুলি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।"

সাম্প্রতিক বিশ্বযুদ্ধে দক্ষিণ হাত ধনতন্ত্রবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মিলাইয়া এবং বাম হাতে ফ্যাসিস্ত জাপানের সঙ্গে মিতালী করিয়া যাহারা বিজয়ীর দলে ভাটিয়া পড়িতেছে, নিজেদের আদর্শবাদের সুকৌশল দোহাই পাড়িয়া ইউরোপের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে মার্শাল টিটো প্রমুখ ব্যক্তিদের সাহায্যে তাঁবেদার রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাদের প্রসারিত হস্ত লোলুপ নখর বিস্তার করিয়া পারস্য-তুরস্কের উপর এখনও উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের অন্যতম মুখপত্রের পক্ষে এই উক্তি যোগ্য উক্তিই হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোক

ইহাতে বিস্মিত হইবে না। হিংস্র পাশবশক্তির পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইতে দম্ভের জন্ম অবশ্যম্ভাবী। দম্ভের স্বভাবধর্ম হইল, মহিমা ও মাহাত্ম্যের মাথায় পদাঘাত করা; সর্ব প্রকার নীতিজ্ঞান, শীলতাবোধকে বর্জন করা; হিংস্র নখর দন্ত প্রকাশ করিয়া যাহার যাহা কিছু উত্তম বস্তু সেসব গ্রাসে উদ্যত হওয়া। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, বিজয়দম্ভে দৃপ্ত, হিংস্র পাশবশক্তিতে বলীয়ান রাশিয়ার আজ সব লক্ষণগুলিই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। মথুরার রাজাকে একদা বৃন্দাবনের গোপকুল প্রশ্ন করিয়াছিল, দেখ তো রাজা, তোমার মাথায় হাত দাও, দেখ তো নন্দ নামক কোন গোপের পাদুকা বহনের স্মৃতি মনে পড়ে কি না? অনুরূপ কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের মনে হইতেছে। 'প্রাভদা' পত্রিকার সম্পাদক এবং লেখক, ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া দেখ তো। মনে পড়ে কি, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালে মার্চ মাসে শ্রদ্ধাভাজন, বিশ্বপূজ্য লেনিন (সত্যই তিনি বিশ্বপূজ্য, আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র) ফ্রিজ প্ল্যাটেন নামক সুইস সোসালিষ্টের মধ্যস্থতায়, সম্রাট-শাসিত সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত দূতের সঙ্গে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন কি না, যাহার বলে তিনি তাঁহার অনুচরবৃন্দসহ রাশিয়ার শত্রু সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির মধ্য দিয়া রাশিয়ায় উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন? তাহার প্রতিদানে, এই শর্ত তিনি দিয়াছিলেন কি না—The travellers undertake to agitate in Russia for exchange of Astro-German prisoners interned in Russia? তাহাতে কি লেনিনকে বিপ্লবীর আদর্শচ্যুত বলা চলে? এই কারণে তাঁহাকে কি জার্মানির অনুচর বলা চলে? ইতিহাসের পাতা উল্টাইতে হইবে না, চেষ্টা করিলেই সেদিনের কথা মনে পড়িবে বলিয়া আশা করি। দেখ তো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে ষ্টালিন-হিটলারের আঁতাতের কথা মনে পড়ে কি না? দেখ তো ফ্যাসিস্ত শক্তি জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার চুক্তি ও আঁতাতের কথা মনে পড়ে কি না? ভাগ্য পাইবার আশায় ১৯৪৫ সালের সেদিন অ্যাটম-বমের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব পর্যন্ত সে চুক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন কি না? দেখ—মনে কর। মনে পড়ে?

* * * *

জানি, মনে পড়িবে না। মনে পড়িলে, বলিবে, লেনিনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের তুলনা? ষ্টালিনের রাজনৈতিক কুশলতার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের তুলনা? যদি ভারতবর্ষে তোমাদের কর্তৃত্ব থাকিত, তবে এই উক্তির জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অনুরূপ কঠোর হস্তে আমাদের কণ্ঠ রোধ করিবার চেষ্টা করিতে। হিংস্র পাশবশক্তির উগ্রতায়, বিজয়দম্ভের দাম্ভিকতায় এক কালের বিপ্লবশুদ্ধ রাশিয়া, তুমি আজ শুদ্ধ আত্মাকে বিসর্জন দিয়াছ। বিপ্লবের বহ্নিতপস্যায় আংশিক সিদ্ধি লাভ করিয়া তুমি তপোভ্রষ্ট হইয়াছ। তাই আজ তুমি সার্থকতার মাপকাঠিতে বিপ্লব-প্রচেষ্টার মহিমাকে মাপিতে বসিয়াছ।

সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, তাই তাঁহার সত্যকার রূপ জানিবার, সত্যকার মহিমা উপলব্ধি করিবার আগ্রহ তোমার হইবে না, তাহা জানি। আংশিক সিদ্ধিলাভে উন্মত্ত হইয়া তুমি তোমার পূর্ব বিপ্লবের আদর্শ হারাইয়াছ; নতুবা তুমি সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তন্ন-তন্ন করিয়া সন্ধান লইতে। আই. এন. এ.—ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি—আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক যে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, সকলের সহিত এক আহার্য গ্রহণ, অক্লান্তভাবে তাহাদের সঙ্গে ঘুরিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন, স্বাধীনতা-যুদ্ধের কর্মভারে বিনিদ্র রাত্রি যাপন, দেহের শেষ রক্তবিন্দু পাত করিয়া ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনপ্রয়াসের যে সমস্ত তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে—তাহার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিতে পাইতে তোমাদের দেশেরই এক মহামানবের, দেশের লোকের সঙ্গে এক আহার্য গ্রহণের জন্য যিনি কালো রুটির টুকরা টেবিলের উপর রাখিয়া বিনিদ্র চোখে রাশিয়ার পুনর্গঠন-কল্পনার কাজ করিয়া যাইতেন,* যিনি হঠাৎ ক্লান্তি আসিলে টেবিলের উপরেই দেহভার এলাইয়া দিতেন কিছুক্ষণের জন্য। তুমি জানিতে পারিতে, কোহিমা-ডিমাপুরে ভারতের মৃত্তিকায় আজাদ হিন্দ ফৌজের যে দল আসিয়া স্বাধীনতার পতাকা প্রোথিত করিয়াছিল, তাহাদের সংযমের কথা। তোমার দেশে জার্মান সৈন্যরা যে অত্যাচার করিয়াছিল, সেই অত্যাচারের প্রতিশোধে চোখের বদলে চোখ, নখের বদলে নখ লইবার প্রতিহিংসায় তুমি তোমার সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিলে; তাহাদের বীর্য, তাহাদের আত্মদানের প্রশংসা আমরা মুক্তকণ্ঠে করিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়াও উঠিয়াছি, চোখের বদলে চোখ, নখের বদলে নখ লইবার কাহিনী শুনিয়া। অসামরিক অধিবাসীবৃন্দের উপর তোমাদের কঠোর শাসনের কথাও শুনিয়াছি। সে-সব কথা তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জান। কিন্তু কোহিমা-ডিমাপুর অঞ্চল অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সেখানে এমন কাহিনী শুনিবে, যাহা তোমাদের কাছে বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়কদের বিচার হইতেছে। তাহাদের বিরুদ্ধে, মামলা রচনায় সবিশেষ পারদর্শী বলিয়া যে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের খ্যাতি আছে, তাহাদের মধ্যেও কোন বেসামরিক ব্রিটিশ-প্রিয় অধিবাসীর উপর প্রতিহিংসাত্মক নির্যাতনের অভিযোগ নাই। ব্রিটিশের অধীনে যাহারা যুদ্ধবিভাগে সৈনিক, তাহাদের বিরুদ্ধে বহু স্থানে বেসামরিক অধিবাসীদের উপর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ* এবং অত্যাচারের অভিযোগ শোনা যায়। খাস কলিকাতায় ঘটিয়াছে। গঙ্গার ওপারে হাওড়ায় নৌবিভাগের সৈনিকের প্রকাশ্য আদালতে বিচার হইয়াছে। কাঁথি, তমলুক—সমগ্র ভারতবর্ষে আগষ্ট-আন্দোলনের সময় সৈন্যদের অত্যাচারের তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, কোন অঞ্চল দখল করিবার অভিযানের প্রাক্কালে, সৈন্যদের কল্পনার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়—নারী, মদ্য এবং ধনরত্নের প্রলোভন। সেই সব সৈন্যদলের লোকই

আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়া কোহিমা-ডিমাপুরে অভিযান করিয়াছিল। জাপান-প্রভাবান্বিত হইলে জাপ সামরিক কার্যক্রমের প্রভাবের ছাপ থাকিত এই সৈন্যদলের উপর। চীন এবং বিস্তীর্ণ পূর্ব-এশিয়ার ভূখণ্ডে জাপানী সৈন্যের অত্যাচারের যে কাহিনী আজ সমগ্র পৃথিবীবিদিত, সামরিক আদালতে জাপ-সমরনায়কদের বিচারের সময় সেসব অভিযোগ আজ প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু শক্তিমত্ত দৃপ্ত নিষ্ঠুর বিজয়ীসুলভ প্রতিহিংসাত্মক মনোভাব হইতে সুভাষচন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত এই সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তাহারা ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিল অপূর্ব সংযত মূর্তিতে। কোন্ যাদুমন্ত্রে এমন হইল? কাহার বা কিসের স্পর্শে তাহারা এমন খাঁটি সোনায় পরিণতি লাভ করিল? বিপ্লববহ্নি-পরিশুদ্ধ আত্মা যদি আজ তোমার কলুষিত না হইত তবে বুঝিতে পারিতে, বিপ্লববহ্নিতে তাহারা শুদ্ধ হইয়াছে, দেশাত্মবোধের মর্মান্তিক বেদনায় তাহারা এই সংযম, এই শক্তি লাভ করিয়াছে। সেই বিপ্লবযজ্ঞে সাগ্নিক পুরোহিত সুভাষচন্দ্র। তিনি কুখ্যাত নন, তিনি বিভীষণ নন, তিনি দুর্বৃত্ত নন, তিনি ফাসিস্ত নন, তিনি চিরশুদ্ধাত্মা বিপ্লবী।

• • • •

আরও একটা তত্ত্ব ইহার মধ্যে আছে। সে তোমরা বুঝিবে না। কারণ তোমরা জড়বিজ্ঞানের উপাসক। জড়বিজ্ঞানের জন্ম এই সেদিন। শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া সে সবে বামাল ছেলের মত অবুঝ দুরন্তপনায় সমস্ত কিছু ভাঙিয়া চুরিয়া আনন্দ পায়। এই তত্ত্বটি হইল, অতি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির তত্ত্ব। তোমাদের দেশের কশাকদের মধ্যে যেমন ঘোড়ার শৌর্য, অশ্বপালকের নিপুণতা সহজাত, এ সংস্কৃতির ধারাও তেমনই ভারতীয়দের মধ্যে সহজাত। এ তত্ত্ব, মৃত্যুর সঙ্গে অমৃতের সমন্বয়। ভারতের বিপ্লবের প্রতীকের মূর্তি ভীষণ নয়, গলিত রুধিরধারার অবলেপনে সর্বাঙ্গ অবলিপ্ত, তবু তার রূপচ্ছটায় অনন্ত শান্তি ঠিকরিয়া পড়ে, তার এক হাতে খড়্গ অপর হাতে অভয়, এক হাতে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড অপর হাতে বর। এই তত্ত্বের প্রভাব ভারতীয়দের রক্তস্রোতে সহজাত ধারায় প্রবাহিত। এই তত্ত্ব, রক্তস্রোতে ইহার প্রভাব, একা হিন্দুরই নয়। হিন্দু মুসলমান সকল ভারতীয়েরই মধ্যে সঞ্চারিত। বহু শত বৎসর এই দেশে বাস করিয়া ভাবের আদান-প্রদানে, হিন্দু-মুসলমান সংমিশ্রণের ফলে, এ তত্ত্ব আজ ভারতের সার্বজনীন তত্ত্ব। এই তত্ত্বের সত্যতা ব্রিটিশ সমরবিজ্ঞানবিশারদগণ প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের অধিবাসী যুদ্ধ-বিভাগের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এককালে সমরবিজ্ঞানবিশারদদের এই মতামত আমাদের লজ্জা দিত; ভীরুতার অপবাদ আমাদের স্পর্শ করিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দুই মহাযুদ্ধে ভারতীয়েরা সে অপবাদ নিজেদের শৌর্যবলে অপনোদন করিয়াছে। তবু আমাদের অনুপযুক্ততা কোথায়? অনুপযুক্ততা ওই সংস্কৃতির প্রভাব। ইউরোপের এবং অপর

দেশের সৈন্যদলের মত কাঠিন্য ইহাদের নাই, দেশ জয় করিয়াও ইহাদের দ্বারা সে দেশকে বশ্যতা-স্বীকার করানোর কাজ ইউরোপীয় মতে সুসম্পন্ন হয় না। এমন কি ভারতের প্রত্যন্ত-সীমার অধিবাসী মঙ্গোলীয় রক্ত এবং প্রভাব সমন্বিত সৈন্যদল এদিক দিয়া ভারতীয় সৈন্যদল অপেক্ষা যোগ্যতর সামরিকগুণসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

এ তোমাদের বুঝিবার নয়। তবুও আশা ছিল, এশিয়ার সংস্কৃতির প্রভাব তোমাদের দেশেই ইউরোপের সকল দেশ অপেক্ষা অধিক, তাহার উপর বিরাট বিপ্লবের বিপুল যজ্ঞাগ্নি তোমাদের দেশে প্রজ্বলিত হইয়াছে, তোমরাই হয়তো বুঝিবে। কিন্তু সে যজ্ঞ তোমাদের দগ্ধ সমিধের ভস্মে বুঝি সমাহিত হইয়া গেল।

থাক্ এত কথা। পরাধীন দেশ, বিজয়দৃপ্ত তোমরা, তোমরা আজ আমাদের যাহা খুশি বলিতে পার। আজ আমরা যে উত্তরই দিই না কেন, সে তোমাদের গ্রাহ্যের মধ্যে আসিবে না। ইহার সম্পূর্ণ উত্তর দিন আসিলে দিব। ইংলণ্ডের এক দাম্ভিক রাজনৈতিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে Half-Naked Fakir—অর্ধ-উলঙ্গ ফকির বলিয়া অপমান করিয়াছে, আজ তোমরা ভারতের পরমপ্রিয় সুভাষচন্দ্রকে দুর্বৃত্ত, ফাসিস্ত, কুইস্লিং বলিলে, এসব কথা আমরা ভুলিব না। সুদিন আসিলে উত্তর দিব।

• • • •

সুদিন, সেদিন, ওই আগতপ্রায়।

এক বিরাট জাগরণের সাড়া, সমুদ্র-কল্লোলের মত জনজীবন-সমুদ্রে জাগিয়া উঠিয়াছে। বহু—বহু শতাব্দীর মধ্যে ভারতে এত বড় জাগরণের সাড়া এমন করিয়া কখনও জাগে নাই। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা, ব্রহ্মদেশ হইতে আরব-সমুদ্র পর্যন্ত এ এক বিস্ময়কর জাগরণ! এ জাগরণের মধ্যে মহাশক্তির আভাস জাগিয়া উঠিতেছে, অথচ ইহা উন্মাদের আত্মহারা উন্মত্ততায় উন্মত্ত নয়। সংকল্পে দৃঢ়, সংযমে স্থির, কল্যাণবোধে সচেতন। জাগ্রতদের মধ্যে ওই প্রাচীন সংস্কৃতির জাগরণের আভাস আমরা পাইতেছি। মৃত্যুকে ভয়শূন্যতাই এ জাগরণের চরম শক্তি নয়, মৃত্যুকে জয় করিবার মত শক্তির স্ফুরণ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি কলিকাতার রাজপথে। তোমাদের রক্তাক্ত রবিবারের সঙ্গে এই ঘটনা তুলনা করিয়া দেখিবার ধৈর্য তোমাদের নাই আমরা জানি, থাকিলে বিস্মিত হইতে, স্তম্ভিত হইতে। গুলিবর্ষণের মুখে অহিংস হইয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া ছিল এ দেশের হাজার হাজার তরুণ। ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে নাই, ব্যারিকেডের অন্তরালে আত্মরক্ষার প্রয়াস করে নাই, প্রতিহিংসা অথবা প্রতিশোধ লওয়ার বাসনায় তাহারা হাত পর্যন্ত তুলে নাই। অথচ তাহারা ব্যর্থ হয় নাই, জয়লাভ করিয়াছে।

• • • •

এই প্রসঙ্গে একটি পুরানো কথা মনে পড়িতেছে।

উনিশো একুশ সালের কয়েক বৎসর পর। কোন এক বাংলার প্রাদেশিক রাজনৈতিক

সম্মেলনে, সম্ভবত ফরিদপুরে, মহাত্মা গান্ধী বাংলার সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের এক আসরে এই আত্মিক শক্তির ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী, সে-কালের সন্ত্রাসবাদী কর্মী, তাঁহার স্মৃতি-কথায় এই প্রসঙ্গ লিখিয়া রাখিয়াছেন, মুখেও আমাদের বলিয়াছেন, সে কথা আমরা ভুলি নাই। মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন, অহিংসা আত্মিক শক্তি, ভীরুতা নয়। মৃত্যুর সম্মুখে ধীরস্থিরপদক্ষেপে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা ও শৌর্য লাভ করিবে তুমি এই শক্তিতে। কর্মী বলিয়াছিলেন, আমি মহাত্মাজীর মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, তাঁহার চোখে সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি! সে দৃষ্টি কাহারও মুখের উপর স্থাপিত নয়, প্রশস্ত সম্মেলন-স্থানের প্রান্ত-সীমায়, আধ-আলো আধ-অন্ধকারের শূন্যতার মধ্যে ভয়লেশহীন স্থির দৃষ্টিতে এমন কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছেন যাহা অন্যের নিকট অপ্রত্যক্ষ। মূহূর্তের জন্য যেন আমি উপলব্ধি করিলাম, সেখানে মহাত্মাজীর দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে মৃত্যু। তিনি তাহার চোখে চোখ রাখিয়া বলিতেছেন, মৃত্যুকে জয় করিবার শক্তি এই আত্মিক শক্তি।

* * *

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

'প্রাভদা' পত্রিকার এই নিবন্ধের পরিশেষে লেখা হইয়াছে, "দুর্ভাগ্যক্রমে জগতের জাতিসমূহের মন বিষাইয়া দেওয়ার কাজ আজও জগতের শান্তিকামী জাতিগুলির নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য নয়। তথাপি এ কথা আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই সমস্ত তস্কর সংবাদিকদিগকে জালিয়াতি ও মিথ্যাভাষণের জন্য আদালতে কঠিন বিচারের সম্মুখীন করা নিতান্ত আবশ্যক।"

শতছিদ্রময় চালুনির একদা ছিদ্রাপরাধের জন্য একছিদ্র সূচের নিন্দা করার কথা আমরা শুনিয়াছি। চালুনির স্বভাবই ওই। সে কথা থাক্। আমরা কিন্তু অন্য কথা ভাবিতেছি। 'প্রাভদা' পত্রিকায় প্রকাশিত শেষাংশ পড়িয়া একটা খটকা লাগিতেছে। ক্রোধটা কিসের জন্য? জগতের শান্তিকামী জাতিসমূহের (অর্থাৎ ইংলণ্ড ও আমেরিকার) মন বিষাইয়া দেওয়ার জন্য, না, যাহা সত্য নয় তাহাই প্রচারের জন্য অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠার জন্য? অনেক কথা মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া তাহাদের সন্তোষ-অসন্তোষের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যখন রাশিয়া পোলাণ্ডে তাহার তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করে, তখনকার কথা। সমগ্র যুদ্ধকালটা, রুজভেল্ট চার্চিলের মনঃক্ষুণ্ণতা, অসন্তোষ অগ্রাহ্য করিয়া জাপানের সঙ্গে মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখার কথা। পুঁথি ঘাটিলে আরও যেসব নজির বাহির হইতে পারে তাহার কথা। তখন এই সব শান্তিকামী, পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনার্থীর যাঁহারা মহামানবের ভূমিকায় অভিনয় করিলেন, তাঁহাদের প্রতি এই প্রেম ছিল কোথায়?

আজই বা হঠাৎ গজাইয়া উঠিল কেন? অনেকে বলিতে পারেন, সাদা ও কালায় তফাত আছে। কালা-দেশের কোন ব্যক্তির জন্ত তাঁহারা সাদার প্রেমভূমিতে সিঁধ পড়িতে দিবেন কেন? আমাদের কিন্তু অন্ত কথা মনে হইতেছে। গোপালদা মনে পড়াইয়া দিয়া গেলেন কথাটা। বলিয়া গেলেন, ভায়া, ওটা আণবিক-প্রেম সঞ্জাত। অ্যাটম-বোমার ভয়! আমি সঙ্গে সঙ্গে নয় তারিখের (জানুয়ারির) কাগজটা খুলিয়া লণ্ডনডেরীর বৈজ্ঞানিক ডাঃ ম্যাকেন্স ই. জি. আর্মাটোর বিবৃতিটা দেখাইয়া দিলাম। রাশিয়ার নূতন পরমাণু-বোমা আবিষ্কার। ব্রিটিশ ও মার্কিন বোমা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বিস্ফোরক। গোপালদা সঙ্গে সঙ্গে বগলের দপ্তর খুলিয়া দশ তারিখের কাগজ খুলিয়া দেখাইয়া দিলেন, প্রেস-সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের মন্তব্য। রাশিয়া আণবিক বোমার অধিকারী, এ কথা বিশ্বাস করিবার কারণ নাই।

মহা সংশয়ে পড়িলাম। সত্যই, এ সবই তো পরস্পরবিরোধী, অর্থাৎ একটা সত্য, একটা মিথ্যা নিশ্চয়! 'প্রাভদা' ঠিক লিখিয়াছে। এসবের একটা বিহিত হওয়া উচিত।

অনেক ভাবিয়া সত্য আবিষ্কার করিলাম। গোপালদা ঠিক বলিয়াছেন, শান্তিকামী জাতিসমূহের মন বিষাইয়া দেওয়ায় রাশিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কথাই সত্য। রাশিয়ার আণবিক বোমা আবিষ্কারের সংবাদটা নেহাতই ধাপ্পাবাজি।

* * *

সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীত্রয়—ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন ধীলন, ক্যাপ্টেন সায়গল—অপরাধী সাব্যস্ত হইলেও, ভারতের জনগণের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে ভারত-সরকার তাঁহাদের দণ্ড না দিয়া মুক্তি দিয়াছেন। ভারতব্যাপী জাগরণের ইহাই প্রথম ফল। মুক্তিপ্রাপ্ত সেনানীত্রয়কে আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি। জয় হিন্দ। ভারতের জয় হউক, স্বাধীন ভারতের জয় হউক।

—

সম্প্রতি আজ কয়েকদিন পূর্বে চট্টগ্রামের নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে সৈন্যদলের সিভিল পাইওনীয়ার কোরের কতকগুলি লোক যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার বিবরণ রাশিয়া পর্যন্ত পৌঁছিবে না জানি। পৌঁছিলেও ইহার গুরুত্ব বুঝিবার মত মানসিক অবস্থা পরিশুদ্ধ আত্মার সঙ্গে হারাইয়া ফেলিয়াছে সে। নতুবা বুঝিত এই অত্যাচার করিতে যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদেরই সহকর্মীরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিল। বিপ্লববহ্নি পবিত্রতম অগ্নি, এই আগুন যাহারা বা যাহাদের প্রাণে লাগে, তাহাদের জীবনের সকল কলুষ নিঃশেষে পুড়িয়া গিয়া আত্মশুদ্ধি হয়; পরিশুদ্ধাত্মার মহিমা লাভ করে তাহারা নবজীবনে। বুঝিতে পারিলে, বুঝিবার মত আত্মার পবিত্রতা এবং মনের উদারতা থাকিলে, সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কোন কটূক্তি করিবার পূর্বে সত্যের সন্ধান করিয়া সঠিক ইতিহাস জানিয়া তবে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিত।

চট্টগ্রামে এই অত্যাচার কেন হইয়াছে জান? সামরিক কর্মে বাধা দেওয়ার জন্য নয়; কোন প্রকার গুপ্ত ফ্যাসিস্ত শক্তির অস্তিত্বের জন্য নয়। এ অত্যাচার হইয়াছে এই সৈন্যদলের তিনজন সৈন্যের বলপূর্বক নারীদেহভোগ-বাসনায় গ্রামবাসীরা বাধা দিয়াছিল বলিয়া। সেই অপরাধে গ্রামখানা লুণ্ঠিত হইল, জ্বলিয়া গেল, পশুর মত কোপাইয়া গ্রামবাসীদের কয়েকজনকে হত্যা করা হইল, একজনের সর্বাঙ্গে পেট্রোল ঢালিয়া জীবন্তে দগ্ধ করিবার জন্য আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল। আর নারী! তাহারাই এ অভিযানের শ্রেষ্ঠ লুণ্ঠন-সামগ্রী।

রাশিয়াকে বলিতেছি না, বলিতেছি চট্টগ্রামের মা-ভগ্নীদের। তোমরা বেণী বাঁধিও না, তৈল বর্জন কর, কেশভার এলায়িত রাখ। তোমাদের বেণী রচনার দিন আগাইয়া আসুক, ভারতের অভিনব অহিংস সংগ্রামের সার্থকতায় শান্তির দিনের অরুণোদয়ে, স্বাধীন ভারতের নবপ্রভাতে। তাহার বিলম্ব নাই। ভারতের প্রাণে প্রাণে, বিপ্লব-বহ্নি সঞ্চারিত হইয়াছে। আমরা অনুভব করিতেছি, আমরা পুড়িতেছি। নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণার মধ্যে আমরা অভূতপূর্ব অনাস্বাদিত অনুভূতির আস্বাদ পাইতেছি। ভয় নাই।

—

সাহিত্য-বিভাগের সংবাদ-পরিবেশনে আমরা কৃপণ হইয়াছি, অনেকে বলিতেছেন। স্বীকার করিতেছি। উপায় নাই। কালের দাবি, তাহার আহ্বান শিরোধার্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু বাংলার সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিকগণ তাঁহাদের কর্তব্য অবহেলা করিতেছেন না। তাহার পরিচয় আমরা পাইতেছি। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে খানাপিনা, থিয়েটার-অটোগ্রাফ, বড় বড় হোমরা-চোমরা সরকারী চাকরে সাহিত্যিকদের সমাদরের কথা বলিতেছি না। গরিব শাখা-সভাপতিদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, খাওয়ার ডাক দিতে ভুলিয়া যাওয়ার মধ্যে প্রমাণিত সমারোহ প্রচণ্ডতার কথাও বলিতেছি না। আমরা বলিতেছি, প্রবীণ কবি পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বর্ধনার কথা। কবিকে বাংলার সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিকেরা আন্তরিক শ্রদ্ধাভরে সম্বর্ধনা জানাইয়াছে। কবিকে আমরাও শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানাইতেছি। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে এই নবচেতনাকেও সম্বর্ধিত করিয়া বলিতেছি, আমাদের জীবনে এই চেতনা প্রসার লাভ করুক, ক্রমবৃদ্ধি এবং ক্রমপুষ্টি লাভ করুক।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যাগ্রহ সাধনা

লবণ-আইন-অমান্যের একটি ঘটনা

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লবণ-আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের সময়ে বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলা হইতে কংগ্রেসকর্ম্মীগণ মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় সমবেত হন, এবং গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতে থাকে। সত্যাগ্রহীগণের উদ্দেশ্য ছিল তাঁহারা শুধু স্বয়ং লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, বরং গ্রামের জনসাধারণ যাহাতে সমবেতভাবে আন্দোলনে যোগ দেয়, সেই জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতেও বিশেষ চেষ্টা চলিতে লাগিল যেন আন্দোলন সাধারণ লোকের মধ্যে সংক্রামিত না হয়। কাঁথি মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্রে উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে, সেই সময়ের একটি কেন্দ্রে সত্যাগ্রহীগণের অভিজ্ঞতার বিষয় আলোচনা করিব।

যে সত্যাগ্রহশিবিরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেছি, সেখানে তখন প্রতিদিন প্রাতঃকালে জন দশেকের মত সত্যাগ্রহী মাথায় গান্ধী-টুপি পরিয়া হাতে জাতীয় পতাকা ধারণ করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করেন এবং যাত্রা শুরু হইতে না হইতে পুলিসের বাহিনী তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বেত, লাঠি, ঘুষি বা লাথির আঘাতে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে। অজ্ঞান অবস্থায় ক্ষতবিক্ষত দেহে সত্যাগ্রহীর দল পড়িয়া থাকে, তাহাদিগকে শিবিরে ফেরৎ আনিয়া সেবা শুশ্রূষা করা হয়। পরের দিন আবার এমনিভাবে নূতন দল বাহির হয়, আবার পুলিসের নির্যাতন চলিতে থাকে। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যহ এই নিষ্করুণ দৃশ্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে, শেষে বাড়ি ফিরিয়া যায়। বাঙলা দেশের বীর যুবকের দল গবর্মেণ্টের নিকট দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতেছে না, স্বীয় ব্রতে অটল হইয়া রহিয়াছে, ইহাতে সকলের শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠে, গ্রামের সকলে সত্যাগ্রহশিবিরে শ্রদ্ধাবশত চালকলা-তরি-তরকারি পৌঁছাইয়া দেয় বটে, কিন্তু নিজে ঐ সত্যাগ্রহীদলে যোগ দিবার বাসনা, অথবা লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার উৎসাহ, কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। গ্রামবাসীরা সত্যাগ্রহীগণকে যেন স্বতন্ত্র জগতের জীব বলিয়া মনে করে, তাঁহাদিগকে সম্মান করে, ভক্তি দেখায়, কিন্তু দূরে রাখে, নিজের জন অথবা স্বজাতি বলিয়া ভাবিতে পারে না।

এরূপ অবস্থায় সত্যাগ্রহীগণ ক্রমশ অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। নেতৃস্থানীয় দুই-একজন সত্যাগ্রহী যুবকগণের উপর নির্যাতন আর সহ্য করিতে না পারিয়া মনে করিলেন, প্রত্যহ নিষ্ফল নির্যাতন ভোগ করিয়া লাভ নাই, সত্যাগ্রহের বৃদ্ধি বা প্রসারের ত কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, অতএব সকলে মিলিয়া একসঙ্গে একদিন নির্যাতনের

মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়া যাক, তাহার পর যাহা হইবার হইবে। কিন্তু ইহার ফলেও যে জনসাধারণের নিশ্চেষ্ট ভাবকে ভাঙা যাইবে, এমন ভরসা কাহারও ছিল না।

যাহাই হউক, অবস্থা যখন এইরূপ সঙীন হইয়া উঠিয়াছে, তখন জনৈক সত্যাগ্রহীর মনে নূতন এক বুদ্ধির উদয় হয় এবং কর্মের ধারা পরিবর্তিত করার সঙ্গে সঙ্গে দুইদিনের মধ্যেই সেই কেন্দ্রের চারিপাশে অভাবনীয় উৎসাহসঞ্চারের ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে দেখিতে দেখিতে লবণ-সত্যাগ্রহের আন্দোলন আগুনের মত ছড়াইয়া পড়ে। কি কৌশল অবলম্বন করা হইল এবং কেমনভাবেই বা গ্রামবাসীগণের নিরুৎসাহ ও নিষ্ক্রিয়তা রূপান্তরিত হইল তাহা আমাদের সকলের প্রণিধানের যোগ্য, কেননা ইহার মধ্যে শিখিবার বস্তু অনেক আছে।

যে দিনের ঘটনা বলিতেছি, তাহার পূর্বাহ্ণে একজন সত্যাগ্রহীকে শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকার ফলে অসম্ভব প্রহার সহ্য করিতে হইয়াছিল। নির্যাতনের তাড়নায় শরীরের সর্বত্র কালশিটা পড়িয়া গিয়াছিল, এমন কি মুখের নানা অংশ ফুলিয়া চেহারা পর্যন্ত বিকৃত হইয়া যায়। ফোলার জন্য চোখ বুজিয়া গিয়াছিল এবং চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে চোখ মেলিতে হইতেছিল। পরদিন অবশ্য তাঁহার যাইবার কথা নহে, নূতন কয়েকজন সত্যাগ্রহীর, অথবা ইতিমধ্যে কয়েকদিন বিশ্রামের ফলে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের যাইবার কথা। যে সত্যাগ্রহী নেতার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তিনি সেদিন নূতন এক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন, কাল যে সত্যাগ্রহী সর্বাপেক্ষা অধিক জখম হইয়াছে, আজ তাহাকেই আবার শোভাযাত্রার সম্মুখে থাকিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সকলে এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, গত দিনের নির্যাতনের ফলে যে আজ উত্থানশক্তিরহিত হইয়া আছে, তাহাকে যদি আজ পুনরায় পুলিসবাহিনীর সম্মুখীন হইতে হয়, তবে তাহার মৃত্যু অবধারিত, এ বিষয়ে কাহারও সংশয় ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবকারী নেতা অটল। তখন আহত সত্যাগ্রহীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি দ্বিধাশূন্য মনে সম্মতি দিলেন এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ইতিমধ্যে বাহিরে দর্শকবৃন্দ সমবেত হইয়াছে, মুহূর্তে তাহাদের নিকট এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল; সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া আজিকার ঘটনা কি পরিণতি লাভ করে তাহা জানিবার জন্য শঙ্কায় উদ্বেলিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল। সত্যাগ্রহীর দল সেদিনও যথারীতি পতাকা হস্তে ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্মুখে সকলে দেখিতে পাইল পূর্বদিনের আহত যুবকটি চলিয়াছে, তাহার মুখ পূর্বদিনের প্রহারের ফলে ফুলিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার চলনে কোনও কুণ্ঠার চিহ্ন নাই। সকলে আগাইয়া চলিল; দর্শকগণ নিস্তব্ধ, কাহারও কণ্ঠে কোন শব্দ নাই। দূরে পুলিসের বাহিনীকে দেখা যাইতেছিল। এমন সময়ে সহসা গ্রামের কয়েকজন নারী পথের উপর আগাইয়া

আসিলেন এবং সত্যাগ্রহীদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা এ জিনিস চোখে দেখিতে পারিব না, আজ আপনারা ফিরিয়া যান, আমরা যাইতেছি।'

সত্যাগ্রহীগণ ফিরিলেন না। কিন্তু মায়ের দল তাঁহাদিগকে সম্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে ঘেরিয়া যেন স্বীয় কল্যাণময় পক্ষপুটের দ্বারা আবৃত করিয়া আগাইয়া চলিলেন। পুলিসের কর্মচারীগণও স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং সেদিন বিনা বাধায় লবণ-নির্মাণের যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। পরদিন হইতে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে নরনারীগণ উৎসাহভরে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পুলিসের প্রতিরোধচেষ্টা হয়ত পরেও সমানভাবে চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু জনসাধারণের সত্যাগ্রহ মনের দিক দিয়া সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হইয়া উঠিল।

ঘটনাটি সে-সময়ের ইতিহাসে হয়ত সামান্য হইতে পারে, কারণ বাঙলা দেশে এবং ভারতবর্ষের বহু স্থানে অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হয় নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে আমাদের পক্ষে যে শিক্ষণীয় বস্তু আছে, এবার তাহারই আলোচনা করা যাক।

একটি উপমা

সাধারণ মানুষ অনেক কাজকেই বুদ্ধির দ্বারা ভাল বলিয়া বুঝিতে পারে, চিনিতে পারে, এ কথা ঠিক। কিন্তু পুরাতন অভ্যাস মানুষের ত সহজে ভাঙিতে চাহে না। সমাজের মধ্যে চারিদিকে যদি নির্বীর্য ব্যবহার দেখা যায়, সকল ক্ষেত্রেই যদি আলস্য, নিশ্চেষ্টতা অথবা পরাজয়ের কালিমা মাখানো থাকে, তাহা হইলে হঠাৎ জীবনের কোনও নূতন ক্ষেত্রে, আচরণের ভিতর, মানুষ বীর্যের পরিচয় দিবে, ইহা আশা করা যায় না। কিন্তু সেই অবস্থার মধ্যেও অল্পসংখ্যক মানুষ নিজের মনের মধ্যে দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া সাহসের ভরে সমাজে নূতন আচরণের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হইলেই তাহা সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন জনসাধারণকে জাগাইয়া তোলে না। কাঠের উনানে আঁচ দিতে হইলে কিছু শুখনা পাতা বা খড়কুটার মত সহজ দাহ্য পদার্থের প্রয়োজন হয়। কাঠ যদি কাঁচা হয়, কুঁচর পরিমাণ যদি সামান্য হয়, তাহা হইলে উনান ধরিতে বিলম্ব ঘটিতে পারে, অধিক ধোঁয়া বাহির হইতে পারে, কিন্তু অধ্যবসায়ের সঙ্গে লাগিয়া থাকিলে শেষ পর্যন্ত উনান ধরিবেই। হয়ত তাহার জন্য কুঁচর পরিমাণ কিছু বাড়ানোর প্রয়োজন হইতে পারে, এবং দৃষ্টি রাখিতে হয় সেগুলি যেন ঠিকমত জ্বলে। অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সঞ্চারিত করিতে হইলে হয়ত সত্যাগ্রহীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু যদি তাঁহারা নির্যাতনে ধৈর্য না হারান, নির্যাতনের মাত্রা গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও যদি ব্রতে নিষ্ঠা অবিচল থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের চিত্তকে তাহা নিশ্চয়ই স্পর্শ করিবে। এবং

এই সম্ভাবনা যে কত দ্রুত, কোন্ অপ্রত্যাশিত পথে দেখা দেয়, তাহা মেদিনীপুরের আলোচিত দৃষ্টান্তের মধ্যে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সত্যাগ্রহীর সঙ্কল্প গ্রামের নরনারীর হৃদয়কে একদিন অকস্মাৎ বিদ্যুৎশিখার মত স্পর্শ করিল।

ধর্মতলায় ছাত্রগণের সত্যাগ্রহ

অতি অল্পদিন পূর্বেও কলিকাতার রাজপথে অনুরূপ একটি ঘটনায় অভিনয় হইয়া গিয়াছে। সেদিন কলিকাতার ছাত্রদল পথে পথে শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছে, এমন সময়ে ধর্মতলার পথপ্রান্তে পুলিস তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিল। তাহারা না ফিরিয়া সারা দুপুর পথের উপরে বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার পর হঠাৎ কয়েকজন পতাকা হস্তে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে জনতার উপর আক্রমণ শুরু হইল। প্রথমে ছাত্রদল কিছু বিক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু যে মুহূর্তে একজন গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হয়, সেই মুহূর্তে অপর সকলে সেই গুলির মধ্যেই অটল হইয়া দাঁড়াইয়া যায়। তাহারই ভিতর আহতগণকে সরাইয়া চিকিৎসার জন্য পাঠানোর আয়োজন চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী দর্শকবৃন্দ ক্ষিপ্ত হইয়া পুলিসের উপরে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতেছিল, ছাত্রগণ তাহাদিগকেও নিরস্ত করিবার চেষ্টা করে; দুই-এক জন পুলিসের কর্মচারী জনতার দ্বারা প্রহৃত হইতেছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া নিরাপদস্থানে প্রেরণ করা হয়। তখন ক্ষণে ক্ষণে গুলি চলিতেছিল, কিন্তু ধর্মতলার শোভাযাত্রাকারীগণ পিছন ফিরে নাই। সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি এবং পরদিবস বৈকাল পর্যন্ত অনাহারে অনিদ্রায় ছাত্রদল সেই স্থানে বসিয়া থাকে। অপরাহ্ণে আবার গুলি আরম্ভ হয়, হতাহতের সংখ্যা পূর্বরাত্রি অপেক্ষা অধিক হয়, তবু ছাত্রদের দল ফিরে নাই। অবশেষে পুলিস বাহিনী পথ ছাড়িয়া দেয়, এবং শান্ত দৃঢ়তার সহিত শোভাযাত্রাকারীগণ লালদীঘি পরিক্রমার পর স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। তাহাদের দাবি সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইল।

কে জানিত আমাদের প্রতিদিনের চেনা সাধারণ মানুষ এমনভাবে মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারিবে? প্রতিদিনের আচরণে বা চিন্তায় যেখানে আমরা সাহসের রশ্মিরেখা খুঁজিয়া পাই না; হয়ত সেখানেই এমনিভাবে অকস্মাৎ একদিন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্যের রশ্মি উষাকালের আলোকচ্ছটার মত দেখা দেয়, গগনে গগনে সেই আলো বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে, জাতির জীবনে নবপ্রভাতের উদয় হয়। যাহারা আজ শীর্ণ জীর্ণ, যাহাদের চরিত্র গ্লানিযুক্ত, উপযুক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শে সেই চরিত্রই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে, সে বিষয়ে সংশয় থাকে না। তাই আজ ভারতের গ্লানি যতই পুরাতন হউক না কেন, সত্যাগ্রহীর দল যদি স্বীয় চেষ্টার দ্বারা অন্তরের বহ্নিকে জাগ্রত করিতে

পারে, দুঃখবরণের দুর্গম পথে চলিয়া মৃত্যুর ভয়কে অতিক্রম করিতে পারে, তবে অবশিষ্ট মানুষ নিশ্চয়ই জাগিবে—এ ভরসা আমরা পাই।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে মহাত্মা গান্ধী যেদিন গ্রেপ্তার হন, তাহার পর সর্বত্র তাঁহার নামে একটি বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। গান্ধীজী স্বয়ং সেই বাণী লিখিয়াছিলেন কি না সাক্ষাৎ কোনও প্রমাণ নাই, পরবর্তী কালে তিনি এ বিষয়ে আর উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ভাষা অথবা ভাবের পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, সেই বাণী গান্ধীজীর মত সত্যাগ্রহীর পক্ষেই সম্ভব। সেই বাণীর মধ্যে ছিল—সত্যাগ্রহীগণকে অগ্রসর হইতে হইবে মরণের অভিমুখে, জীবনের অভিমুখে নয়। মানুষের পর মানুষ যেদিন মৃত্যুর সন্ধানে অগ্রসর হইবে, মৃত্যুর সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করিবে, সেই দিনই জাতি নূতন জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব তোমাদের সঙ্কল্প হউক, ব্রতে অবিরল থাকিয়া—

করিব, না হয় মরিব

উপমার পুনরুল্লেখ

পূর্বে একটি উপমার ব্যবহার করা হইয়াছে। সত্যাগ্রহী যেন উনানে আঁচ দিবার জন্ত নিযুক্ত ঘুঁটে বা কাঠের কুচির মত। কাঠের কুচিতে নিজের গুণে সহজে আগুন ধরে, এবং সেই আগুন পর্যাপ্ত হইলে বাকি কাঠেও আগুন ভাল করিয়া লাগিয়া যায়। কিন্তু কাঠ ভিজা হইলে রাঁধুনী আগে তাহাকে রৌদ্রে দিয়া শুখাইয়া লয়। ভারতবর্ষের সমাজ ও জীবন এমনই নিস্তেজ হইয়া আছে যে তাহা ভিজা কাঠের মত। হয়তো ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন বা ১৯৩০ সালের আইন-অমান্ত আন্দোলনের মত বিরাট মুহূর্তে তাহা অকস্মাৎ জলিয়া উঠে। আগুনের শিখার মত, নূতন জীবন গঠনের উৎসাহ অকস্মাৎ জাতির জীবনে দেখা দেয়। কিন্তু আবার দুই-এক বৎসরের মধ্যে শিখা নিবিয়া যায়, ভিজা কাঠ হইতে যেমন প্রচুর ধূমের উদ্‌গার হইয়া মানুষের চোখে জল আনে, এ ক্ষেত্রেই তেমনই ঘটিতে থাকে। দুই আন্দোলনের মধ্যবর্তী কালে জাতির জীবন পুনরায় ধূমের জাল বিস্তার করে, সময়ে সময়ে কণ্ঠরোধ হইয়া আসে। কিন্তু ধূম বাহির হইলেও আশার কথা হইল এই যে, নীচে তখনও আগুন জলিতেছে, আমরা এই আশ্বাস লাভ করিতে পারি। জাতি নূতন জীবনলাভের জন্ত আগ্রহান্বিত, কিন্তু নূতন সমাজ গঠনের চেষ্টায় পুরাতন অভ্যাসগুলি বা সংস্কারসমূহ নানাবিধ অন্তরায়ের সৃষ্টি করিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিলে আমাদের হতাশার আর কোনও কারণ থাকে না। কেবল সুদক্ষ রাঁধুনীর মত উনান ধরাইবার জন্ত অবশিষ্ট ভিজা কাঠকে রৌদ্রে দিয়া শুখাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

সমাজের তমোরাশিকে দূর করিবার চেষ্টা

অতএব জাতির জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্য আমাদের দশ বৎসর অন্তর একবার করিয়া সংগ্রামের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে পুরাতন আচরণের পরিবর্তে নূতন আচরণের প্রতিষ্ঠার দ্বারা পুঞ্জীভূত আলস্য, অবসাদ ও ভয় প্রভৃতি সর্ববিধ তামসিকতার নাগপাশকে শিথিল করিতে হইবে। তবেই সময়কালে আইন-অমান্যের মত সংগ্রাম সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

কিন্তু দৈনন্দিন যজ্ঞের দ্বারা সমাজদেহের তমোবন্ধনকে দূর করিবার সেই উপায় কী? গান্ধীজী মনে করেন, গঠনকর্মের আঠারো দফা কর্মের দ্বারা আমরা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারি। জাতির জীবনে যেখানে বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে ভেদের বৈতরণী সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে একজন মানুষের সঙ্গে একজন মানুষের বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা দ্বারা আমরা বৈতরণীর উপরে সেতু রচনা করিব। হিন্দুর সহিত মুসলমানের সম্প্রদায় হিসাবে প্রীতি বা সদ্ভাব নাই। সেখানে মানুষে মানুষে বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের বানরসেনার খণ্ডপাথরের দ্বারা সেতুবন্ধনের মত আমরা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতু রচনা করিব। তবেই হয়তো জাতির সংগ্রামের কোনও শুভমুহূর্তে হঠাৎ একদিন দেখা যাইবে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের আরও কাছে, ঐক্যের বন্ধনে ঘেঁষিয়া আসিয়াছে।

দামোদর নদের পাশে বাঁধের মধ্যে গ্রীষ্ম ও শীতকালে ইঁদুর গর্ত করে। প্রথমে সেই গর্ত দিয়া বর্ষার বন্যার সময়ে ক্ষীণধারায় জল চুয়াইতে থাকে; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিতে দেখিতে সেখানে একটি খাল কাটিয়া যায় এবং একদিন মুহূর্তের প্লাবনে সেই পথকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত দেশের মাঠ ঘাট ভাসাইয়া দামোদরের প্রবল বন্যা ছুটিতে থাকে। সমাজের সংস্কারের বন্ধনও মাটির বন্ধনের চেয়ে অধিক কঠিন নয়। দামোদরের বর্ষার স্রোতের কাছে যেমন মাটির বাঁধ তুচ্ছ হইয়া যায়, মানুষের প্রাণশক্তির প্লাবনের সম্মুখেও তেমনই পুরাতন সংস্কারের বন্ধনও তুচ্ছ হইয়া যায়। কেবল প্রয়োজন, প্রতিদিবসের আচরণের দ্বারা তাহাকে ক্ষীণ করা, শিথিল করা। কেমনভাবে সুকৌশলে আমাদের আলস্যের বন্ধনকে শ্লথ করা যায়, তাহার একটি উদাহরণ দিই।

ধরুন, সত্যাগ্রহী গ্রামে খাদি বা গ্রামশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। গ্রামে পুনরায় চরকা চলিলে বা অন্যবিধ ছোটোখাটো শিল্পের বিস্তার হইলে যে গরিব গৃহস্থ অবসর সময়ে কিছু রোজগার করিয়া বাঁচিতে পারে, ইহা সকলেই বুঝে। কিন্তু পারে না কেন? তাহারই সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া সত্যাগ্রহীকে নূতন ধারায় কর্মপ্রবর্তন করিতে হইবে। হয়ত দেখা যাইবে, কোনও গ্রামে টাকু হয় না, কামার নাই, বা যে আছে সে ভাল টাকু গড়িতে পারে না। তখন তাহার পিছনে লাগিয়া নিজে সাহায্য

করিয়া, হাতে কলমে শিখাইয়া, তাহাকে মানুষ করিতে হইবে। হয়ত গ্রামের ছুতার ভাল চরকা গড়িতে পারে না। তখন কোন্ ধরনের চরকা সহজে নির্মাণ করা চলে, অথচ যাহার দ্বারা দ্রুত সুতাকাটা যায়, সত্যাগ্রহী সেই বিষয়ে গবেষণা করিয়া সেইখানেই সিদ্ধিলাভ করিবেন। সুন্দর চরকা গড়া শেষ হইলে, তাহাতে ভাল সুতাকাটা সকলে শিখিলে, গাঁয়ের লোকে বুঝিবে, হাঁ, এইখানেই আমাদের সমস্যার সমাধান হইতে পারে, বাহিরের উপরে নির্ভর করিতে হয় না।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁতি সানা বদলাইয়া খাদি বুনিতেছে বটে, কিন্তু খাদির খরিদ্দার নাই; অথবা কাটুনি রাজি আছে, কিন্তু তাহার তুলা কিনিবার পয়সা নাই। তখন হয়ত কাটুনিকে এক সের তুলা দিয়া তাহার পরিবর্তে আধ সের সুতা লইতে হইবে, বাকি ছাঁটাই বাদে আধ সের তাহার বানি বলিয়া ধরা হইবে। সে দুই তিন খেপ সুতা কাটিয়া নিজের কাপড়ের জন্য যথেষ্ট সুতা রোজগার করিয়া লইবে, হয়ত তাঁতির বানিও সুতায় দিবে। এদিকে সত্যাগ্রহীর ঘরে যে সুতা সঞ্চিত হইতে থাকিবে, তাহা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িতে বেচিয়া আসিতে হইবে। তাহাদিগকে প্রথমে বুঝাইতে হইবে যে, তাহারা যদি দেশের দরিদ্র গৃহস্থের সঙ্গে খাদি পরিয়া নূতন সহযোগিতার সূত্র গড়ে, তবেই সমাজকে আবার নূতনভাবে গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে। মিলের কাপড় আপাতত সস্তা বটে, কিন্তু সব দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা মহার্ঘ হয়। কেন না মিলমজুর, অথবা যে মজুর কল নির্মাণ করিয়াছে বা কয়লার খাদে কাজ করিয়াছে, তাহারা কেহই পরিশ্রমের উচিত মূল্য পায় নাই। আবার যদি বা কিছু পাইয়া থাকে তাহাদের পাওয়ার ফলে কোথাও না কোথাও আজিকার আর্থিক ব্যবস্থার ফলে কোন না কোন শিল্পী বেকার হইয়া যায়। যে কাপড় সস্তা করিতে মজুরকে বঞ্চনা করিতে হয়, শিল্পীকে বেকার করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে ধনীর ভাণ্ডারে টাকা জমা হয়, এরূপ 'সস্তা' সামগ্রী ত অকল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সর্বজনের কল্যাণ তাহার দ্বারা কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। খাদি ও কুটীরশিল্পের মারফত আমরা যেমন সকলকে কাজ দিতে চেষ্টা করি, তেমনই সকলেই শারীরিক শ্রম করিয়া যথাসম্ভব সমান রোজগার করুক ইহাও চাই। সত্যাগ্রহী এইভাবে নূতন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ধনের সমবণ্টনের কথাও প্রত্যক্ষভাবে মানুষের মধ্যে প্রচার করিতে থাকিবেন।

প্রতি দিবসের নিরবচ্ছিন্ন সুকৌশল চেষ্টার দ্বারা দেশের পুঞ্জীভূত আলস্যকে কিভাবে ক্ষীণ করা যায়, তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। কিন্তু ইহার জন্য সত্যাগ্রহীর পক্ষে দুইটি বস্তুর প্রয়োজন আছে। তিনি কোনও দিন ব্যর্থতার দ্বারা যেন আক্রান্ত না হন। শ্রান্তি আসিলে বিশ্রাম লউন, কিন্তু বিশ্বাস তাঁহার যেন উজ্জ্বল থাকে, সর্বদা বুদ্ধিযুক্ত হয়।

অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা ভারতের সঞ্চিত তমোরাশিকে কখনই দূর করা যাইবে না, উনানে ধোঁয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে, আগুন জ্বলিবে না।

দ্বিতীয় প্রয়োজন, কাজ যতই মন্থর হউক না কেন, তিনি যেন বাহিরের সাহায্যের উপর পারতপক্ষে নির্ভর না করেন। টাকুর অভাব ঘটিলেই যদি কলিকাতায় ছুটিতে হয়, বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটিলেই যদি শহরবাসী ধনীর আশ্রয় লইতে হয়, তাহা হইলে আমাদের চেষ্টার দ্বারা খাদি উৎপন্ন হইবে সত্য, কিন্তু যে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন গান্ধীজী স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য মনে করেন, গঠনকর্মের সুচারু ব্যবস্থার দ্বারা যাহা সৃষ্টি করিতে চান, যাহার অভাবে পূর্বে ভারতবর্ষ চরকা কাটিলেও স্বাধীনতা হারাইয়াছিল, সেই মানস-বল এবং পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার সূত্র সৃষ্টি করা যাইবে না। তাহার জন্য আত্মনির্ভরশীলতার উদ্রেক করিতে হইবে এবং উৎপাদনব্যবস্থাকে যথোপযুক্ত মাত্রায় বিকেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। গ্রামের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তবে গ্রামের সহিত গ্রামান্তরের, দেশের সহিত দেশান্তরের, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রান্তরের স্বেচ্ছায় সহযোগিতা স্থাপনের সময় আসিবে। সে সহযোগিতায় অকল্যাণ নাই, কেননা তাহা পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

বুদ্ধিযুক্ত অনির্বাণ মঙ্গলকর্মের দ্বারা সত্যাগ্রহী ভিজা কাঠকে শুখাইবেন, তবেই সর্বসাধারণের মন সময়কালে প্রদীপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

রাজনৈতিক প্রচার

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি শুধু চরকা-খদ্দর করিলেই স্বরাজ আসিয়া যাইবে? রাজনৈতিক কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই, সেটি কেবল দশ বৎসর অন্তর একবার করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে দেখা দিলেই স্বরাজ আসিয়া যাইবে?

না, তাহা নয়। তবে আমরা সাধারণত রাজনৈতিক প্রচার বলিতে যাহা বুঝি, গান্ধীজী তাহা হইতে স্বতন্ত্র শিক্ষার এক পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং সেই উপায়ে ফল ভাল বই মন্দ হয় না। একটি বাস্তব ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষয়টির আলোচনা করা যাক। অতি অল্পদিনের ঘটনা বলিয়া নামধাম প্রকাশ করা গেল না, তজ্জন্য পাঠক মার্জনা করিবেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর বাঙলা দেশে তখন সবে খাদ্যশস্যের অনটন আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গের এক জেলায় চাষীদের মধ্যে অন্নাভাবের সূচনা দেখা গেল। জেলার সদরে সংবাদ আসার পর, বাঙলার সর্বত্র যেমন হয়, যাবতীয় সেবাসমিতির কর্মীগণ তৎক্ষণাৎ চাঁদা তুলিয়া রিলিফের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যাহারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে লাগিল, তাহারা আশ্চর্য হইল না, বিরক্ত বা অবমানিত বোধ করিল না,

স্বীয় দারিদ্র্য বা দুরবস্থার জন্য কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল না, স্বীয় চেষ্টার দ্বারা নূতন অন্ন উৎপাদনের উপায়ের বিষয় চিন্তা করিল না, শুধু ভিক্ষায় প্রাপ্তিতে কাহার কাহার কি পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন তাহারই খুঁটিনাটি বিচার করিতে লাগিল। রিলিফের কর্মীগণ তাহাদের প্রয়োজনমত চালডাল দিতে না পারিলে তাহারা অভিযোগ করিত, আবার মাঝে মাঝে সদরে হাকিমের নিকট নালিশ করিবে, এমন ভয়ও দেখাইত। চাষীদের ধারণা হইয়াছিল যে, রিলিফের অন্ন গবর্মেণ্টের প্রদত্ত সম্পত্তি, অতএব ভৃত্যগণ যথারীতি ভিক্ষা না দিলে মালিকের নিকট অভিযোগ করা চলিবে। কে ইহাদিগকে এরূপ সংবাদ দিয়াছিল জানা নাই। হয়ত কেহই দেয় নাই, তবু বহু বৎসরের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার নিষ্পেষণে এমনই একটি ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

এমন অবস্থার মধ্যে জনৈক কংগ্রেসকর্মী কোনও এক গ্রামে অনাহারজনিত মৃত্যুর এক সংবাদ শ্রবণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। মৃতদেহের তখনও সৎকার হয় নাই এবং সেদিন গ্রামে হাটবার ছিল বলিয়া বহু লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। কংগ্রেসের কর্মীটি পৌঁছিয়া মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, নূতন রিলিফের কেন্দ্র হয়ত খোলা হইবে এইরূপ অনুমান করিয়া অনেকে সমবেত হইল এবং স্বীয় দুঃখদুর্দশার নানাবিধ কাহিনী জ্ঞাপন করিতে লাগিল। কিন্তু কংগ্রেসের কর্মীটি জনতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের গ্রামে কাহারও ঘরে কি ভাত ছিল না? যদি একজনের ঘরেও খাদ্য থাকে, তাহা হইলে এই ব্যক্তি আপনাদের চোখের সামনে অনাহারে মরিল কেন? জনতা চুপ করিয়া রহিল। তখন তিনি তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, তাহাদের প্রত্যেকের যেমন এবিষয়ে দায়িত্ব আছে, গবর্মেণ্টেরও তেমনই দায়িত্ব আছে। তৎপরে তিনি জনতাকে পরামর্শ দেন, আপনারা চাঁদা তুলিয়া সদরে তার পাঠান, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট যেন মৃত্যুর যথাযথ কারণ সম্বন্ধে পত্রপাঠ অনুসন্ধান করেন। আপনারাও লাস লইয়া থানায় যান, এবং ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া মৃত্যু অনাহারজনিত কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষার দাবি করুন।

অতঃপর তদনুযায়ী ব্যবস্থা হইল। হাটতলায় এক পয়সা দুই পয়সা চাঁদা তুলিবার পর একটি কমিটি গঠন করিয়া তাহার হাতে ব্যয়ভার অর্পণ করা হইল এবং গবর্মেণ্টের বিভিন্ন কর্মচারীর নিকটে তার প্রেরণ করা হইল। মৃতদেহকে পরীক্ষার জন্য মহকুমার সদরে লইয়া যাওয়া হইল। প্রথমে কর্তৃপক্ষ মৃত্যু অনাহারের ফলে ঘটিয়াছে ইহা স্বীকার করিতে চান নাই, কিন্তু অবশেষে সরকারী ডাক্তার শবব্যবচ্ছেদ করিয়া যথাযথ রিপোর্ট দেওয়ার পর হাকিমমহলে রীতিমত সাড়া পড়িয়া গেল। ইহার অল্পকালের মধ্যে বাঙলা গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে সেই গ্রামে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে যথেষ্ট সরকারী রিলিফের আয়োজন হয়। শহরের পক্ষ হইতে ভিক্ষায় বিতরণের আর প্রয়োজন হয় নাই।

একজন কংগ্রেসকর্মীর সুচারু কর্মচেষ্টার ফলে লোকে নূতন শিক্ষা লাভ করিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া দারোগা, ডাক্তার, চৌকিদার প্রভৃতি যাবতীয় বেতনভোগী কর্মচারী যে প্রজার সুখসুবিধার আয়োজনের জন্ম আছেন, এই শিক্ষা তাহারা হাতে কলমে লাভ করিল। উপরন্তু আরও দেখিল যে, ন্যায্য দাবি আদায় করিতে হইলে স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে যেমন প্রত্যেককে সচেতন হইতে হয়, তেমনই আবার ঐক্যবদ্ধ হইয়া অধিকার আদায়ের জন্ম কিছু পরিশ্রমও করিতে হয়। নয়ত দাবি শুধু দা'বই থাকিয়া যায়, আদায় আর হয় না।

বাঙলা দেশেই হউক অথবা অন্যত্র যে কোন দেশেই হউক, কোন না কোন শাসনযন্ত্র সমাজে সর্বত্র বর্তমান। বাঙলা গবর্মেণ্টের অধীনে বহুসংখ্যক বিভাগ আছে, কৃষিবিভাগ, জলসেচের বিভাগ, গরুমহিষের চিকিৎসার বিভাগ, পথঘাট নির্মাণ বা সংস্কার করিবার বিভাগ ইত্যাদি। এগুলি যদি প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তবে প্রজার জীবনের অনেক দুঃখভার কমিয়া যাইবে। বিভিন্ন বিভাগগুলির কর্তব্য কি, সেই কাজে প্রজার পক্ষ হইতে সহযোগিতা কি উপায়ে সম্ভব, তাহা মানুষকে শেখানো প্রয়োজন। প্রজা বিভিন্ন বিভাগের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে, তাহার নির্দেশ মানিলে, অনেক ক্ষেত্রে সহজে লাভবান হইতে পারে।

কিন্তু যদি বার বার সহযোগিতা সত্ত্বেও বর্তমান অনুষ্ঠানগুলির সংস্কার সম্ভব না হয়, যদি গরিব প্রজার স্বার্থের জন্ম পরিচালিত না হইয়া সেগুলি ধনী বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থপুষ্টির জন্মই নিয়ত ব্যবহৃত হয়, তখন প্রজাসাধারণ সেরূপ অনুষ্ঠানকে শোধন করিবার জন্ম অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানকে শুধু অচল করিবার উদ্দেশ্যেই নয়। প্রজার লক্ষ্য হইবে, নিজেরা অসহযোগের ফলে নানাবিধ অসুবিধা অথবা নির্যাতন ভোগ করিয়াও ধৈর্য হারাইবে না। তাহার ফলে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্মচারীগণের হৃদয়কে স্পর্শ করা সম্ভব হইবে, আঘাত দিয়া নয়, আঘাত সহিয়া। তখন বর্তমান কর্মচারীগণ প্রজার দাস হইয়া যাইবে এবং আনন্দচিত্তে প্রতিষ্ঠানের রূপ বদলাইয়া প্রজার স্বার্থপুষ্টির উদ্দেশ্যেই তাহা পুনঃপ্রচলিত করিবে।

শেষ কথা

এইরূপ রাজনৈতিক শিক্ষা, মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে বোধ, স্বীয় পরিশ্রম এবং যথারীতি কর্তব্যসাধনের ফলে ন্যায্য অধিকার লাভের কৌশল, সত্যাগ্রহী ক্রমে ক্রমে জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শিখাইবেন। নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা এবং সুকৌশল কর্মপন্থা আশ্রয় করিয়া তিনি সমাজের মধ্যে সহযোগিতা, সম্পদে বিপদে এক হইয়া চলার অভ্যাস গড়িয়া তুলিবেন। পুরাতন অধিকার অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা

লাভই হউক, অথবা নূতন আর্থিক আদর্শ অনুযায়ী বৈষম্যশূন্য নূতন সমাজ রচনাই হউক, উভয় বিষয়ে সাফল্যই যে স্বীয় কর্মতৎপরতা এবং দুঃখবরণের প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করে, এই শিক্ষা লোকে স্বীয় অভিজ্ঞতার বশে প্রত্যক্ষভাবে অর্জন করিবে।

মানুষে এই শিক্ষা লাভ করিবে যে, অহিংস-বিপ্লবের জন্য, নিজের রক্তপাত করিতে হয় সত্য, কিন্তু শুধু রক্তপাতের মন্ত্রস্পর্শে সব কার্য সুসিদ্ধ হয় না। নিরবচ্ছিন্ন ঘর্মপাতেরও প্রয়োজন আছে। প্রতিদিবসের নিরবচ্ছিন্ন সুকৌশল কর্মচেষ্টার দ্বারা আমাদিগকে ভবিষ্যতে সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিতে হইবে, ধনসাম্য এবং রাষ্ট্রীয় সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন্ প্রতিষ্ঠানে কি কি পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন, তাহা বারংবার চিন্তা করিয়া, পরীক্ষা করিয়া, সমাজের সর্ববিধ ব্যবস্থার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

কিন্তু যদি আমরা ভাবি যে, একবার অকস্মাৎ বিপুল চেষ্টার প্রভাবে রাজশক্তিকে অধিকার করিয়া তৎপরে জনকয়েক বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপরে সমাজের পুনর্গঠনের যাবতীয় ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব, তবে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধন হইবে সত্য, কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তাহার জন্য অবিরাম জাগ্রত চেষ্টা এবং জাগ্রত দৃষ্টির প্রয়োজন। স্বরাজের জন্য উপযুক্ত মূল্য আমাদিগকে দিতেই হইবে। পাইকারী হারে দুঃখবরণের ভিতর দিয়া আংশিকভাবে সে মূল্য মেটানো যায় সত্য, কিন্তু বেশি দিতে হয়, দফায় দফায় প্রতিদিবসের জাগ্রত কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা।

আমাদের চেষ্টা যদি সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তবে আজ পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে যে সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্ষয় হইতে হইতে অবশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তাহার স্থানে নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিবে, যেখানে কেহ কাহারও উপর অন্যায় দাবি করে না, সকলে সকলের জন্য পরিশ্রম করে, সকলে সকলের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য ক্লেশ ভোগ করিতে প্রস্তুত থাকে।

কিন্তু গঠনকর্মের এমন নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা মানুষের সমাজে হয়ত কার্যত সম্ভব নয়। জগন্নাথের রথ যেমন থামিয়া থামিয়া আগাইয়া চলে, মানুষের মনও তমসার গাঢ় নিদ্রা হইতে জ্যোতির উদয়পথে আকস্মিক এবং অসমান বেগে আগাইয়া আগাইয়া চলিতে থাকে। তাই অহিংস সাধনায় গঠনকর্মের পরিপূরক হিসাবে সত্যাগ্রহ সংগ্রামেরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু সত্যাগ্রহ তখনই শুধু সার্থক হইতে পারে, যদি সংগ্রামের মধ্যবর্তী সমস্ত অবসরটুকুর মধ্যে সত্যাগ্রহীগণ নিরলস চেষ্টার দ্বারা সমাজে তমোরাশির বন্ধনকে যথেষ্ট শিথিল করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সংগ্রামের মাদকতা-শক্তি আছে সত্য, সংগ্রামের সংবাদ শুনিলে মানুষের উৎসাহ সহসা প্রদীপ্ত হয় সত্য। কিন্তু গঠনকর্ম পিছনে না থাকিলে অহিংস সত্যাগ্রহ অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবেই হইবে।

ক্রোপট্‌কিন এক স্থানে লিখিয়াছিলেন যে, ফরাসী দেশে বিপ্লব সাধিত হইল বটে, অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিকার হইতে রাজদণ্ড অকস্মাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়ত্তে আসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু তাহা ত বিপ্লবের আয়োজনমাত্র, বিপ্লব নয়। জনসাধারণ তখন বারম্বার নূতন শাসক সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তোমরা বল, আমরা এখন কি করিব, কেমনভাবে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিব, নূতন সমাজ কীভাবে রচনা করিব। কিন্তু এই আসল বিপ্লবের সম্বন্ধে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কোনই জ্ঞান ছিল না। পুরাতন জীবনধারার পরিবর্তে নূতন এক জীবনধারা রচনা করিতে হইবে, ইহা তাহাদের জানা ছিল না। রাজশক্তির হস্তান্তরকেই তাহারা বিপ্লব বলিয়া ভুল করিয়াছিল। কিন্তু বিপ্লব আসিবে মানুষের প্রতিদিবসের জীবনযাত্রার মধ্যে, তাহার খাওয়ায়, পরায়, কর্মে, পরস্পরের মধ্যে সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের সম্পর্কে। প্রতি ক্ষেত্রে পুরাতনের পরিবর্তে নূতন সুচিন্তিত ব্যবস্থার উদয় হইবে। রাজশক্তির হস্তান্তর প্রয়োজন; কিন্তু নূতন সমাজের রূপ যদি বিপ্লবীর অন্তরে স্পষ্ট না থাকে, তবে রাজশক্তির অধিকারও অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।' পুরাতন শোষণযন্ত্র নষ্ট হইয়া তাহার স্থানে নূতন শোষণযন্ত্রের আবির্ভাব হয়।

এই জন্য গান্ধীজী বারম্বার গঠনকর্মের ভিতর দিয়া প্রজাসাধারণের মধ্যে নূতন জীবন-গঠনের প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন। শুধু মৌখিক প্রচার নয়, অন্তবিধ শোষণশূন্য, সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ রচনার চেষ্টার ভিতর দিয়া মানুষকে নবজীবনে তিনি দীক্ষা দিতে চান। এই বুদ্ধি লইয়া যদি আমরা গঠনকর্ম অনুসরণ করি, তবেই আমাদের অহিংস অসহযোগ সময়কালে সার্থক হইবে। আমাদের চেষ্টা পর্যাপ্ত হইলে হয়ত আইন-অমান্যের প্রয়োজন পর্যন্ত হইবে না। ভিজা কাঠ শুখাইয়া উনানে ভাল অগ্নিশিখার সৃষ্টি হইবে, এবং সেই উত্তাপের প্রভাবে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র পৃথিবীর বঞ্চিত এবং নিষ্পেষিত নরনারী স্বীয় শক্তির প্রভাবেই মঙ্গলময় মুক্ত সমাজব্যবস্থা গঠনের এবং তাহা রক্ষা করিবার আশ্বাস লাভ করিবে।

নির্মলকুমার বসু

জীবন-চক্র

আমার প্রকৃতি প্রকাশ খুঁজিয়া মরে,
আপনার মাঝে আপনারি অন্তরে
রচে যে গহন অরণ্য পাকে পাকে,
তারি মাঝে মোর আমি যে লুকায়ে থাকে।
থাকে ভয়ে ভয়ে ধরা নাহি দিতে চায়,
জীবন-চক্র রচনা কে করে হায়!

মহাস্থবির জাতক

(দ্বিতীয় পর্ব)

সংসারে মনুষ্যকুলজাতি স্ত্রী-পুরুষমাত্রেই স্বপ্ন দেখে। বাস্তবের রূঢ় আলোকে কারুর স্বপ্ন ছুটে যায়, কারুর বা স্বপ্নবিলাসেই জীবন ভোর হয়।

আমিও একদিন স্বপ্ন দেখেছিলুম।

আমি স্বপ্ন দেখছিলুম, এই ভগ্নসার্থ, মন্দমতি, নির্বীর্য, স্বার্থান্ধ, মুমূর্ষু দেশবাসীকে মৃত্যুশয্যা থেকে ঝুঁটি ধ'রে তুলে তাদের দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করেছি। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা দেবতাজ্ঞানে আমার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে। আমার সতত-বিষণ্ণ গম্ভীর পিতার মুখমণ্ডল ঘিরে আনন্দের জ্যোতি ফুটে উঠেছে। তিনি বলছেন, তুমি আমাদের কুল পবিত্র করেছ। সংসার-ভারে জর্জরিতা আমার মার মুখে আর হাসি ধরে না। আনন্দাশ্রুবিগলিত-বয়ানে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলছেন, স্থবির, তোকে গর্ভে ধারণ ক'রে আমি কৃতার্থ হয়েছি।

স্বপ্ন দেখছিলুম, আমার রচিত সাহিত্য ধরণীর ভাবসমুদ্রে নূতন ভাগীরথী-ধারা যোজনা করেছে। অতি-অবজ্ঞাত পুরাতন প্রাচীকে যারা এতকাল অজ্ঞতাবশে অপমান করেছিল, তারা চমকে উঠেছে।

স্বপ্ন দেখছিলুম, আমার মানসগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অলৌকিক স্মিতহাস্যে আমার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দক্ষিণ হস্ত আমার মাথায় স্পর্শ ক'রে বলছেন, বৎস, তুমি ধন্য, তোমার লেখনী ধন্য হোক।

কিন্তু তবুও, সেই সাফল্যের আনন্দালোকের মধ্যেও একটি তীক্ষ্ণ বেদনার তিমিরধারা হিল্লোলিত হচ্ছিল, শীতারম্ভের প্রত্যূষে আলো ও কুয়াশায় যেমন জড়াজড়ি ক'রে থাকে। কোথা থেকে সেই বেদনার ধারা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, কোথায় তার উৎস, তাই নিয়ে স্বপ্নেও মনের মধ্যে আলোড়ন চলেছে। হঠাৎ মনে হ'ল, আমি ও আমার মন যেন দুটো পৃথক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছি। দেখতে দেখতে সেই আলো-আঁধারির মধ্যে ফুটে উঠল লতুর বিদায়োন্মুখ অশ্রুসজল মুখখানি। সমস্ত আনন্দ ও সাফল্য তার অশ্রুজলে মুছে নিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম তার সামনে, কিন্তু আমার অভিমানক্ষুব্ধ মন ছুটে চলল ভারতবাসীর চরম আশ্রয় হিমালয়ের গিরিকন্দরে। এই দুঃখ, এই অন্তর্দাহ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি যোগসাধনায় নিমগ্ন হলুম।

আমি স্বপ্ন দেখছিলুম, যোগবলে আমি মানসচারী হয়েছি, যখন যেখানে খুশি ইচ্ছামাত্র সেখানে উপস্থিত হতে পারি। সাধনাবলে আমি কালচক্রকে থামিয়ে দিয়েছি, আমার ইচ্ছাশক্তিতে অতীত ও বর্তমান স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। স্বপ্ন দেখছিলুম, আমি ভারতের অতীত ইতিবৃত্তের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি যেন মহারাজ দক্ষের দরবারে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি যজ্ঞে যোগ দেবার জন্যে, দেখলুম, বিপুলনিতম্বা পলাশনয়না চন্দ্রের মহিষীরা সব প্রাসাদের কক্ষ, অলিন্দ, উদ্যান কলহাস্যে মুখরিত ক'রে তুলেছে। কিন্তু সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপও নেই; কারণ নারীর দেহ-সৌন্দর্যের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণই নেই, আমি যে যোগী! আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি দক্ষের সেই দুহিতাকে, যে রাজার মেয়ে হ'য়েও ভিখারীকে স্বামিত্বে বরণ করেছে, প্রেমকে যে বংশমর্যাদার ওপরে স্থান দিয়েছে। তাঁরই পদধূলি আমি চাই।

আমি নিজের চোখে দেখেছি দেবীকে। তপক্লিষ্টা, তন্বী, উৎকণ্ঠায় গৌরবদন পাংশু। পদতলে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে বললুম, মাগো, সন্তানের প্রণাম লও। আমি ধন্য! সার্থক হয়েছে আমার তপস্যা!

আমি স্বকর্ণে শুনেছি গর্বোদ্ধত দক্ষের বদননিঃসৃত সেই শিবনিন্দা—

অপমান কার?
মান আছে যার!
ভিখারীর অপমান কি রে ভিখারিণী!

আমি দেখলুম, সতীর মৃত্যু! দেখেছি, তাঁর অন্তরের ক্ষোভ ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে প্রবাহিত হয়ে চলল দিগ্বিদিকে, ত্রিকাল ব্যেপে।

দেখলুম, মহেশ্বর এলেন তাঁর দলবল চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে। মুখে তাঁর আর ববম্ রব নেই, বুলি পাল্‌টে গিয়েছে। চোখ দুটি বাড়বানলের মত, তা থেকে একাধারে অশ্রু ও অনলের প্রবাহ ছুটেছে। ছোট ছেলের খেলনা ভেঙে গেলে যেমন সে বাড়িসুদ্ধ লোকের বিরক্তি উৎপাদন ক'রে চীৎকার করতে থাকে, তেমনই তিনি "সতী দে, সতী দে" চীৎকারে ত্রিলোক ফাটাতে আরম্ভ করলেন।

ছেলেবেলা আমাদের বাড়িতে একটা দল ছিল। এই দলের পাণ্ডা ছিল সেজদি, আমার পিসীমার মেয়ে। সেজদি, ছোড়দি, আমি আর অস্থির এই চারজন ছিলুম আমাদের দলে। কখনও কখনও কালেভদ্রে দাদাকেও এই দলে নেওয়া হ'ত। সেজদি ছিল দলের নেত্রী আর আমরা কজন ছিলুম

তার চেলা। আমরা পাঁচজনে একত্র জুটলে একেবারে গায়ে গায়ে লেগে থাকতুম। যতক্ষণ আমরা তাদের বাড়িতে থাকতুম অথবা তারা আমাদের বাড়িতে থাকত, এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ ছাড়াছাড়ি হতুম না—এক পাতে খাওয়া থেকে এক বিছানায় শোওয়া পর্যন্ত। সেজদির ডাকনাম ছিল সুখী। বাড়িতে ও পিসীমার বাড়িতে সুখীর দল নামে আমাদের অখ্যাতি ছিল। কোনও ঘরে কোনও কাচের জিনিস ভাঙা কিংবা কোথাও ঘড়া উলটে জলে মেঝের বিছানাপত্র ভেসে-যাওয়া ইত্যাদি দেখলেই বাড়ির সবাই তখুনি ধ'রে নিত, এ সুখীর দলের কাজ।

সেজদি মাঝে মাঝে চড়ুইভাতি করত। দেশলাইয়ের বাক্সের মত ছোট ছোট কাগজ কেটে সে পাঁচটা নিমন্ত্রণ-পত্র লিখে আমাদের মধ্যে বিতরণ করত ও নিজে একটা রাখত। ছোট্ট একটি উনুন, তাতে সরু সরু কাঠের আগুন দিয়ে, ছোট্ট কড়া চাপিয়ে নতুন টাকার মতন ঝকঝকে ছোট ছোট লুচি ভাজা হ'ত। সেজদি সে লুচির নাম দিয়েছিল চাঁদির চাকতি। ছোট্ট বঁটিতে সরু সরু আলু কুটে তাই ভেজে চাঁদির চাকতি দিয়ে আমাদের ভোজ হ'ত।

রান্না সেজদিই করত, আমরা তিন ভাই আর ছোড়দি যোগান দিতুম মাত্র।

তখন আমরা একটু বড় হয়েছি। দাদা আমাদের দল থেকে বেরিয়ে গেলেও আমাদের চারজনের মধ্যে গোষ্ঠীগত একতার কোনও ব্যতিক্রমই হয় নি। আমার বয়েস আট, সেজদির বয়েস সতেরো, এমনই এক সময়ে চড়কের দিনে সেজদি দুটো বড় পুতুল কিনেছিল। একটা পুলিস-কন্‌স্টেব্‌ল আর একটা কেঁড়ে কাঁখে গয়লানী। পুতুল দুটো দেখেই আমি আর অস্থির বায়না ধরলুম, ও দুটো দাও, দিতেই হবে।

সেজদি কিছুতেই দেবে না। আমরাও ছাড়ব না। শেষকালে সে হাসতে হাসতে বললে, দেখ্, আমি ম'রে গেলে পুতুল দুটো দুই ভাইয়ে নিয়ে যাস।

যাক। তবু একটা আশ্বাস পেয়ে সেদিনকার মত বাড়ি ফিরলুম।

তারপর রোজই উৎসাহ ক'রে পিসীমার বাড়ি যাই। কিন্তু হায়! গিয়ে দেখি, সেজদি তখনও মরে নি। সেজদি মরতে অনেক দেরি করছে দেখে একদিন অস্থির ব'লে ফেললে, সেজদি, তুমি কবে মরবে ভাই?

সেজদি হাসতে হাসতে বললে, শিগগিরই মরব, একটু সবুর কর্ না।

হাসতে হাসতে সে কথাগুলো বললে বটে ; কিন্তু দেখলুম, সঙ্গে সঙ্গে তার দুই চোখ জলে ভ'রে উঠল।

সেজদিকে আমি ও অস্থির বড় ভালবাসতুম। সে একাধারে আমাদের বন্ধু, দিদি ও জননী ছিল। আমরা শুনেছি, আমাদের শিশু-অবস্থায়—সে তখন বালিকা মাত্র—নির্বিকারচিত্তে আমাদের মলমূত্র পরিষ্কার করত। সামান্য দুটো পুতুলের জন্যে সেই সেজদির চোখে জল দেখে আমরা কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললুম, তুমি ম'রো না দিদি, পুতুল আমাদের চাই নে।

অস্থির উঠে গিয়ে পেছন থেকে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে গালে চুমো খেতে লাগল। আমি তার একখানা বাহু প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে ব'সে রইলুম।

সেজদি বলতে লাগল, জানিস ভাই, আমি জানতে পেরেছি, মহেশ্বর আমাকে মেরে ফেলবে। এই ব'লে সে করুণ কণ্ঠে কামিনী রায়ের "আছে এ জগৎ মাঝারে গোপনে এক সে সুন্দর সিদ্ধিস্থান" গানটা গাইতে লাগল।

অতীতের গর্ভ থেকে সেই করুণ কণ্ঠ আজ আমার কানে এসে বাজছে আর ঈশ্বরের করুণাময়ত্ব সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হচ্ছি।

বোধ হয় পনরো-ষোল দিন বাদেই একদিন ছোড়দি আমাদের বললে, সেজদির ভয়ানক অসুখ, তাকে মধুপুরে নিয়ে যাওয়া হবে।

সেজদি মধুপুরে চ'লে গেল, কিন্তু মাস দুয়েক যেতে না যেতেই তাকে ফিরিয়ে আনা হ'ল—অসুখ বেড়েছে।

আমরা রোজই যাই সেজদিকে দেখতে। অসুখ তার বেড়েই চলল। তার বিছানায় উঠে বসলে বাড়ির সবাই তুলে নিয়ে আসে। বলে, রুগীর বিছানায় বসতে নেই। তার গায়ে হাত দিলে সবাই হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠে। বলে, অসুখ বেড়ে যাবে।

এই রকমই চলছিল। একদিন সন্ধ্যেবেলা ঘরে কেউ নেই দেখে আমরা দু ভাই টপ ক'রে তার খাটে উঠে দু পাশে দুজনে ব'সে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। সেজদির নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল, তবুও হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, আমার জন্যে মহেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবি, আমি যেন শিগগিরই সেরে উঠি।

সেদিন থেকে ঘুমোবার আগে দুই ভাই মিলে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা

করতে লাগলুম, হে মহেশ্বর! তুমি সেজদিকে মেরো না। তাকে বাঁচিয়ে দাও, তাকে শিগগির ভাল ক'রে দাও।

আর একদিন সকালে বাবা আপিসে না গিয়ে গাড়ি ক'রে মাকে নিয়ে চ'লে গেলেন সেজদিকে দেখতে, তার অসুখ বেড়েছে। সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, তবুও তাঁরা ফিরলেন না। আমরা রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লুম।

গভীর রাত্রে মা এসে আমাদের ঘুম থেকে তুলে বললেন, চল্, তোদের সেজদি ডাকছে।

ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লুম, দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। পিসীমার বাড়িতে গিয়ে দেখি, অত রাত্রেও ঘরে আলো জ্বলছে, অনেক অচেনা লোক এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে, ব্যাপারটা তখনও ভাল ক'রে বুঝতে পারি নি। সেখানে গিয়ে শুনলুম, সেজদি আমাদের দেখতে চাইছে।

আমাদের দুই ভাইকে ধ'রে সেজদির খাটের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল। দেখলুম, যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। তার কপালে ও মুখময় বিন্দু বিন্দু ঘাম, একটুখানি নিশ্বাস নেবার সে কি প্রাণপণ চেষ্টা! আমরা এসে দাঁড়াতেই সে স্থির হয়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না। আমি মনে মনে বলতে লাগলুম, মহেশ্বর, দয়া কর, সেজদিকে বাঁচিয়ে দাও, দয়া কর, দয়া কর।

মনে মনে বলতে বলতে অস্ফুট আওয়াজ মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল। আমার দেখাদেখি অস্থিরও আরম্ভ করলে, মহেশ্বর, দয়া কর, দয়া কর।

খাটের চারিদিকে অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি গুমরে উঠছিল। মুখ তুলে দেখি, সবাই কাঁদছে। সেই দৃশ্য দেখে আমাদের চোখও জলে ভ'রে উঠল। সেই বিশাল অশ্রু-পারাবারের ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট আলোকে দেখতে পেলুম, সেজদির চোখ দুটোও অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

এক মুহূর্ত্ত পরেই সে চোখের দৃষ্টি নিবে গেল।

আমাদের দুজনকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হ'ল।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে সেজদির ঘরে গিয়ে দেখি, তার খাটখানা হা-হা করছে। তার ওপরে সেজদিও নেই, বিছানাও নেই।

জীবন-যুদ্ধ ঘোষিত হবার বহু পূর্বেই অতর্কিত অস্ত্রাঘাতে আমাকে কাবু করবার সেই যে চেষ্টা, সে কথা আমি ভুলি নি। তাই সেই মহেশ্বরকে

এতদিন পরে এমন প্যাঁচে পড়তে দেখে খুশিতে মন ভ'রে উঠল। মনে মনে বলতে লাগলুম, বেড়ে হয়েছে, বেড়ে হয়েছে মহেশ্বর! তোমার বাপ নেই, মা নেই, ভাই-বোন-বন্ধু কেউ নেই, তাই তুমি বেপরোয়া দুনিয়ার বুকে শোকের আগুন জ্বালিয়ে ঘুরে বেড়াও। প্রিয়বিচ্ছেদের মজা কতখানি, তা একবার নিজেও উপভোগ কর।

বেশ চলছিল, হঠাৎ মহেশ্বরের চেলার দল বে-রসিকের মত সবাই বিকট চীৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বাপ রে বাপ! সে কি ভীষণ আওয়াজ! তারপরেই শুরু হ'ল দক্ষযজ্ঞ-পণ্ড! মার মার কাট কাট শব্দ!

ব্যাপার দেখে তো দক্ষরাজ আত্মরক্ষার জন্যে মারলেন রাম-দৌড়। যজ্ঞের পুরোহিতেরা কাছা আঁটতে আঁটতে লুকোতে লাগলেন আড়ালে আবডালে। আগুন ছুটল চারিদিকে।

মহেশ্বর চীৎকার করতে লাগলেন, দে সতী, দে সতী, দে সতী। আর ওদিকে ঘুরন্ত লাট্টুর মাথায় জল পড়লে সে জল যেমন চারদিকে ছটকে পড়তে থাকে, দক্ষের চেলারা মহেশ্বরের চেলাদের তাড়নায় তেমনই ছটকে পড়তে লাগল।

ওদিকে যক্ষরক্ষদের চীৎকার ও মালসাটের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ধুলো ও ধোঁয়ায় দেখতে দেখতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে উঠল। সেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে মহারাজ দক্ষ ছুটলেন প্রাসাদের অন্তঃপুরে আত্মগোপন করতে।

প্রাসাদের মধ্যে দক্ষের বড় জামাই অর্থাৎ মহেশ্বরের ভায়রাভাই লোচ্চাকুলচূড়ামণি শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী চন্দ্র আমন্ত্রিতা মেয়েদের মধ্যে জমাট হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন, হঠাৎ শ্বশুরমশায়কে ওই রকম মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটতে দেখে বাইরে বেরিয়ে এসে ব্যাপার দেখে চট ক'রে আকাশে চ'ড়ে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলেন হ্যা হ্যা ক'রে।

অন্ধকারে মহেশ্বরদলের গুণ্ডামি একটু মন্দা পড়েছিল। কিন্তু চাঁদ আকাশে উঠতেই চারিদিক আলোয় আলো হয়ে গেল। তারা আবার হৈ-হৈ ক'রে যজ্ঞপণ্ডের কাজ শুরু ক'রে দিলে। তখন—

হাস্যতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পুরি পুরি মূতিছে।
পাদঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পুঁতিছে॥

চন্দ্রালোকে আবার চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল দেখে দক্ষরাজ চন্দ্রের উদ্দেশে

চেঁচাতে লাগলেন, ওহে বিমানবিহারী, ওহে বাবাজীবন! ডুবে যাও, ডুবে ডুবে যাও। কিন্তু অবাধ্য চন্দ্র সে কথা না শুনে আরও হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। দক্ষ মহারাজ তখন পাগলের মতন এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে করতে একবার জামাই বাবাজীবনের সামনে পড়ায় তাঁর মুণ্ডুটি উড়ে গেল।

আমি এক দিকে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি, সমস্ত ব্যাপারটা লাগছে মন্দ নয়। এমন সময়—

রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
হুল থূল কূল কূল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে ॥

বাস্! ষোলো আনা পূর্ণ হতে এইটুকুই বাকি ছিল। অধুনা-আবিষ্কৃত অ্যাটমিক বোমার পূর্বপুরুষ সেই ব্রহ্মডিম্ব দুটি ফাটতেই স্রেফ বায়ুর চাপে সারা কন্‌খল সমভূমি হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, ইট-পাটকেল, স্থাবর। জঙ্গম সব কিছুর সঙ্গে আমিও উড়তে লাগলুম আকাশে। উড়তে উড়তে একেবারে বুঁদ হয়ে গেলুম। বাপ রে বাপ, সেখানে কি শীত! ঠকঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে আবার বোঁ-বোঁ ক'রে নীচের দিকে নামতে নামতে ধড়াস ক'রে এক জায়গায় এসে পড়তেই স্বপ্ন ছুটে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, মহেশ্বরের খাস আস্তানা কাশীধামের রাজঘাট ইষ্টিশানে পাষাণশয্যায় প'ড়ে রয়েছি, পাশে বন্ধু পরিতোষ আপাদ-মস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে আছে। ব্যোম্ মহাদেব—জয় জয় মহেশ্বর রবে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ।

শিলাশয্যা থেকে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলুম। দেহ অসম্ভব ভারী ব'লে মনে হতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলুম, হিম লেগে চোখ-মুখ ফুলে উঠেছে। ভয়ানক দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছিল, দেখলুম, মাড়ি ফুলে উঠেছে আর প্রত্যেকটি দাঁত নড়ছে। পরিতোষকে ঠেলে তুললুম। সে বললে, কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

একটু ধাতস্থ হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখি, আমাদের চার পাশে গোল হয়ে একদল মোটা মোটা লোক ব'সে রয়েছে, দৃষ্টি তাদের আমাদের দিকে স্থির-নিবদ্ধ। সে দৃশ্য দেখে আমার রাজা রবি বর্মার অশোকবনে চেড়ী-পরিবৃতা সীতার ছবির কথা মনে পড়তে লাগল।

ট্রেনে আসবার সময় সহযাত্রীদের মুখে কাশীর গুণ্ডা-পাণ্ডাদের অত্যাচার ও অনেক রকম বিভীষিকার কথা শুনে মনে মনে এদের সম্বন্ধে খুবই সাবধান হয়েছিলুম। কাশী পৌঁছবার বোধ হয় পঞ্চাশ মাইল আগে থেকে প্রতি ইষ্টিশানেই পাণ্ডাদের আক্রমণ শুরু হয়েছিল। সকলের মুখে একই প্রশ্ন—কাশী যাচ্ছ বাবু, কে তোমাদের পাণ্ডা?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চুপ ক'রে থাকি, কথা বাড়িয়ে লাভ কি? নেহাত বিরক্ত করলে ব'লে দিই, আমাদের পাণ্ডার নাম রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ স্বামী। কোথাও বলি, রবি ঠাকুর। তারা অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, ইতিমধ্যে ট্রেন ছেড়ে দেয়।

এমনই করতে করতে কাশী ষ্টেশনে এসে পৌঁছেছিলুম। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে নিজেদের এই পাণ্ডাব্যূহের মধ্যে অবস্থিত দেখে এবার দস্তুরমতন ভড়কে গেলুম।

বোধ হয় মিনিট পাঁচেক পরেই চারিদিক থেকে প্রশ্নবৃষ্টি শুরু হ'ল।

বাবুদের বাড়ি কোথায়?

আকাশের নীচে।

কোথায় থাকা হয়?

রাজঘাট ইষ্টিশানের প্ল্যাট্‌ফর্মে।

পরিতোষ চুপ ক'রে ব'সে আছে, কারণ সে কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। আমার জীবন ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একজন জিজ্ঞাসা করলে, বাবুদের নাম কি?

স্থবির শর্মা, পরিতোষ রায়।

তারপরে সেই এক প্রশ্ন, কে পাণ্ডা? কেন পূজো দেবে না? কাশীতে এসে বাবার পূজো দেবে না, এটা কি ভাল কথা হচ্ছে, ইত্যাদি।

ক্রমে দু-একটি ক'রে লোক উঠতে আরম্ভ ক'রে দিলে। শেষকালে এক ব্যক্তির সঙ্গে ভাব জ'মে গেল। তাকে আমরা বুঝিয়ে বললুম, দেখ বাপু! বাড়ি থেকে ত্রিশটি টাকা গ্যাঁড়া মেরে বাবার স্থানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। তা থেকে রেল-কোম্পানিকে দিতে হয়েছে আট টাকা, পথে পুরী মিঠাই মেরেছি দু টাকা, আর আছে মোটে কুড়িটি টাকা। এর মধ্যে থেকে বাবার পূজোর জন্যে যদি খরচা করতে হয় তো অদূরভবিষ্যতেই বাধ্যতামূলক

প্রায়োপবেশনের মহলা শুরু হবে। অতএব দয়া ক'রে আমাদের রেহাই দাও।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! লোকটা তবুও ঘ্যানর-ঘ্যানর করতে লাগল। বললে, বছর দু-তিন আগে দুজন বাঙালী ছেলে তোমাদেরই মতন বাড়ি থেকে পালিয়ে আমার আশ্রয়ে এসে পড়েছিল। তারাও তোমাদেরই মতন প্রথমে বলেছিল, কাছে একটি পয়সাও নেই। শেষকালে পুজো-টুজো দেওয়ার পর রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বললে, দাদা, আমাদের কাছে এই চারশো টাকা আছে, এটা তোমার কাছে রেখে দাও, আমাদের দরকার-মতন চেয়ে নোব। তারা তিন মাস আমার কাছে থেকে মৌজ ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেল। যাবার সময় আমায় একশোটি টাকা দিয়ে বললে, তোমার মতন বিশ্বাসী লোক আমরা আর দেখি নি।

মনে মনে সেই বাঙালী ছেলেদের মুণ্ডপাত ক'রে তাকে বললুম, আমরা তোমায় পূজোর জন্যে একটি টাকা দিতে পারি, দেখ, এতে যদি তোমার পোষায় তো বল।

লোকটা কিছুক্ষণ গুম হয়ে ব'সে রইল। তারপরে বললে, আচ্ছা, চল, বিশ্বনাথের যা মর্জি তাই হবে, জয় বাবা বিশ্বনাথ।

উঠে পড়া গেল। দেহ অসম্ভব ভারী, দাঁতের যন্ত্রণা অনেক কম পড়লেও তখনও বেশ কটকট করছে। পরিতোষের কানটা একটু সাফ হয়েছে বটে, কিন্তু চীৎকার ক'রে না বললে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, তার দৈহিক অবস্থাও তদ্রূপ। পাণ্ডা একখানা গাড়ি করতে বললে বটে, কিন্তু ট্যাঁকের অবস্থা বিবেচনা ক'রে হেঁটে যাওয়াই সাব্যস্ত করা গেল।

প্রথমেই বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা করা চাই, পূজো তারপরে হবে। পাণ্ডা মহারাজ আশ্বাস দিলে, কোনও ভয় নেই, সব ব্যবস্থা বেশ ভালভাবেই হয়ে যাবে।

তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাঙালীটোলায় এসে পৌছনো গেল। কাশীর যে বাঙালীটোলার কথা শৈশব থেকে শুনে আসছি, সেই বাঙালীটোলা! পাণ্ডা মহারাজ গলির গলি তস্য গলির মধ্যে একটা বাড়িতে আমাদের নিয়ে উপস্থিত হ'ল। বাড়ির মালিক বাঙালী, জাতিতে ব্রাহ্মণ, চট্টোপাধ্যায়। পুরো নামটা এতদিন পরে ঠিক মনে হচ্ছে না, বোধ হয় মহেন্দ্রনাথ চাটুজ্জে।

আমরা যখন তার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলুম, তখন সে ছোট কলকেতে বড় তামাক টানছিল। আমাদের দেখে এক হাতে কলকেটা নামিয়ে ধ'রে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার ?

পাণ্ডা আমাদের দেখিয়ে বললে, বাবুরা কলকাতা থেকে এসেছেন বিশ্বনাথ দর্শন করতে। এখানে ঘর-টর খালি আছে ?

চাটুজ্জে হাতের কলকেটা তুলে একটি দম লাগিয়ে বললে, ঘর খালি আছে বইকি। ঘরের অভাব কি ?

তারপরে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, বাবাজীদের বাড়ি কি খাস কলকাতায় ?

বললুম, হ্যাঁ।

বাপ-মা আছেন ?

আছেন।

তা বাপু, বাপ-মাকে কাঁদিয়ে এ রকম ক'রে পালিয়ে এসে কি লাভ হয় তোমাদের বলতে পার ?

বলতে বলতে কলকে তুলে আর এক টান—বাপ রে বাপ, সে কি টান !

আবার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমাদের পাণ্ডাকে সম্বোধন ক'রে চাটুজ্জের পো বলতে আরম্ভ করলে, কলকাতার ছেলে, বুঝলে পাণ্ডাজী, সে এক সাংঘাতিক চীজ ! মায়ের দুধ ছাড়তে না ছাড়তে ব্যাটারা মাল টানতে শুরু ক'রে দেয়।

কলকেটা উলটে ছাইয়ের ভেতর থেকে ঠিকরেটা তুলে নিয়ে আঙুলের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে চাটুজ্জে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, বাবাজীরা মাল-টাল টানতে শুরু করেছ তো ?

আমরা নিরুত্তর। চাটুজ্জে ব'লে যেতে লাগল, বছর দু-তিন আগে গোটা তিনেক ছোঁড়া, বুঝলে পাণ্ডাজী, বছর তেরো-চোদ্দ বয়েস তাদের, বাড়ি থেকে টাকা ভেঙে এখানে এসে উঠেছিল। ভাল ঘরের ছেলে, দেখতে এক এক ব্যাটা যেন কন্দর্প। সারাদিন কি মিষ্টি কথা, শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। কিন্তু সন্ধ্যে হ'লেই একেবারে অন্য লোক। রোজ সন্ধ্যেবেলায় এক বোতল মাল এনে তিনটেতে মিলে টেনে সে কি হুড়োপাকাটি ! দু দিনে ঘরের মেঝেটাকে একেবারে চ'ষে ফেললে হে ! নেহাত অসহ্য হওয়ায় একদিন বললুম, বাবাজীরা, এই কচি বয়েসে এত মাল টেনে কেন মিছে দেহ নষ্ট করছ ?

তা একজন জবাব দিলে, কাশীতে সস্তা মাল, তাই খেয়ে নিচ্ছি, চিরকাল তো আর খেতে পাব না।

যাক। ছেলেমানুষ, দু দিন ফুর্তি ক'রে নিক ভেবে আর বেশি কিছু বললুম না।

একদিন, রাত তখন দশটা হবে, শীতকাল, গ্যাস-ট্যাস টেনে লেপ-মুড়ি দিয়ে শুয়েছি, হঠাৎ ছোঁড়ারা চীৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে, ওহে চাটুজ্জে, ও চাটুজ্জের পো, ঘুমুলে নাকি হে ?

ডাকের রকম দেখে তো আমার সর্ব্বাঙ্গ একেবারে জ্ব'লে উঠল। বোঝ একবার! আমি একটা বুড়ো মিন্‌ষে, তোদের বাপের বয়েসী, তায় ব্রাহ্মণ, আমাকে কিনা ওহে চাটুজ্জে, ওহে চাটুজ্জের পো! তোরা নয় মালই টেনেছিস, কিন্তু আমার পেটও গ্যাসে ভর্তি! কি বল গিরিধারী, বল তুমি।

পাণ্ডা মহারাজ বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে, সো তো ঠিক কথা আছে। মানী ব্যক্তির মান রাখাই চাহিয়ে।

চাটুজ্জে এবার কলকেটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে বলতে লাগল, আরে, তোরা নয় কলকাতার ছেলেই আছিস, আমিও বাবা কাশীর ছেলে! আমিও বেরিয়ে এলুম বালাপোশখানা গায়ে দিয়ে। বুঝলে, তখনও ছোঁড়ারা চেঁচাচ্ছে—ওহে চাটুজ্জের পো!

আমিও বেরিয়ে শুরু ক'রে দিলুম, হ্যাঁ হে ছোকরারা! ওহে তোহে করছ কাকে হে ? বলি, ওহে মানে কি হে ? বলি, ওহের ব্যাটা ওহে, ওহে মানে কি হে ? হ্যাঁ হে ওহে ওহে ওহে, বলি ওহে মানে কি হে ?

খানিকক্ষণ ওহে-তোহে করতেই, বাস্, ছোকরারা একদম চুপ। মুখে আর বাক্যি নেই।

আমাদের পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করলে, এতো রাত্রে হাঙ্গামা কিসের লেগে তা কিছু বললেন তাঁরা ?

তা বললে বইকি, তা আর বলে নি! কি বললে জান গিরিধারী ? সে কথা শুনলে চমকে উঠবে। তোমার এই কলকাতার যজমানদের ফেলে কাছা আঁটতে আঁটতে মারবে দৌড় বাড়ির দিকে।

আমাদের পাণ্ডা হ্যা-হ্যা ক'রে খানিকটা হেসে বললে, কি কোথা বললেন তাঁরা ?

এবার চাটুজ্জে কয়েক পা এগিয়ে এসে একেবারে গিরিধারীর গা ঘেঁষে বলতে লাগল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট্টটা, বুঝলে, গোঁফের রেখা পর্যন্ত দেয় নি, দুধের ছেলে হে, কি বললে জান ? বললে, রাগ করছ কেন ভাই চাটুজ্জে ? আজ রাস্তায় ভাগ্যক্রমে একটা বহুৎ আচ্ছা মেয়েমানুষ মিলে গিয়েছে, তাকে ধ'রে নিয়ে এসেছি, তোমার একটা ঘর খুলে দাও, এক দিনের ভাড়া দিয়ে দোব।

কথাটা শুনে আমাদের পাণ্ডা একেবারে লাফিয়ে উঠে বলতে আরম্ভ ক'রে দিলে, সীতারাম, সিয়ারাম, এ বড় খারাব কাম আছে। তিরথ করতে এসে এসব কাম বড় খারাব আছে, ছি ছি ছি ছি !

চাটুজ্জে ব'লে যেতে লাগল, আরে সে ব্যাটারা কি তীর্থ করতে এসেছিল ! অমন সব ছেলে জন্ম দেওয়ার জন্যে তীর্থ করতে আসা উচিত ছিল তাদের বাপ-মায়ের, বুঝলে গিরিধারী ?

গিরিধারী গম্ভীরভাবে বললে, এ কোথা ঠিকই বললেন আপনি।

চাটুজ্জে তখন ক্ষিপ্তপ্রায়। উত্তেজিত স্বরে সে ব'লে যেতে লাগল, কলকাতার লোক দেখে দেখে সর্ব্বাঙ্গের চুল পেকে গেল আমার। সেখানে বড়লোক গরিবলোক সব্বারই মেয়েমানুষ একটা ক'রে রাখা চাই, তা ঘরের বউ পরমাসুন্দরীই হোক আর যাই হোক।

গিরিধারী গম্ভীরভাবে বললে, হাঁ, তা রাজধানীর নাগরিক, সো একটু বিলাসী হোবেই। তবে মায়েরা খুবই ভাল আছেন। কলকাতার অনেক লোক হামার যজমান, হামি জানি। তিরথমে এলে তাঁদের মেজাজ একেবারে রাজরানীর মতন হোইয়ে যায়, সে আমি জানি।

চাটুজ্জে হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে দুই হাত যুক্ত ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বলতে লাগল, ওরে বাবা ! তাঁরা সাক্ষাৎ দেবী। ওরে বাবা, তাঁদের পুণ্যের জোরেই তো এ ব্যাটাদের এত লপচপানি চলে। নইলে কবে বংশলোপ হয়ে যেত সব ব্যাটার।

চাটুজ্জের পো চেঁচিয়েই চলল। এদিকে ক্লান্তি ও ক্ষুধায় আমাদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে চলেছে, আর দাঁড়াতে পারি না এমন অবস্থা। কলকাতার সেই মহাত্মা বালকদের মনে মনে প্রণাম ক'রে চাটুজ্জেকে ব'লে ফেললুম, তা

কলকাতার লোককে ঘর ভাড়া দিতে ইচ্ছে যদি না থাকে তো সোজাসুজি ব'লেই দিন না, আমরা অন্যত্র চ'লে যাই।

আমার কথা শুনে চাটুজ্জে এমন শিউরে উঠল যে মনে হ'ল, তার মারাত্মক ফিকবেদনা ধরেছে। সে বললে, সে কি কথা, সে কি কথা বাবাজী! তোমরা খদ্দের, আমার মাথার মণি। তবে বলছিলুম কি, মাল-টাল খাও তোমরা খাবে, তাতে আমার বলবার কি থাকতে পারে? কি বল গিরিধারী? তবে ঘরটা আমার কিনা! এই মাগ্‌গিগণ্ডার দিনে আমার ঘরখানা যদি বাসের অযোগ্য ক'রে ফেল, তাই একটু সাবধান ক'রে দিচ্ছিলুম। তা কিছু মনে ক'রো না, বুড়ো মানুষের কথায় রাগ ক'রো না বাবা। যাও গিরিধারী, তুমি বাবাজীদের ওপরে নিয়ে যাও, আমি চাবি নিয়ে আসছি।

জিজ্ঞাসা করলুম, ঘরের কি রকম ভাড়া লাগবে?

সব জায়গায় যা নেয় তাই দেবে। আমি কি তোমাদের কাছে বেশি নোব? জনপ্রতি দৈনিক এক পয়সা।

অর্থাৎ দুজনে চোদ্দআনা মাসে একখানা ঘর—দোতলায়।

আমি উনচল্লিশ বছর আগেকার কথা বলছি। এই উনচল্লিশ বছরের মধ্যে কাশীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধার্মিক ও নৈতিক জীবনে যে পরিবর্তন জোর ক'রে ঘটানো হয়েছে, অতি-প্রগতিশীল ন্যু-ইয়র্ক বা লণ্ডন নগরীতেও তা হয় নি। শীতকালে তুলোর জামার বদলে জনকয়েক লোকের অঙ্গে সার্জের জামা চড়েছে বটে, কিন্তু দেশসুদ্ধ লোক বস্ত্রহীন হয়েছে। অর্থনৈতিক জলসায় ঐন্দ্রজালিক কায়দায় বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, ফলে দেশের চার ভাগের তিন ভাগ লোক আজ দু-বেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না। আমাদের জীবনধর্মের মর্মমূল দংশন করেছে শ্বেত-উপদংশ, বিষ প্রায় মাথায় চড়েছে, এ বিষ ঝাড়তে পারে এমন ওঝা কি দেশে জন্মাবে?

যাক, এক পয়সা ঘর-ভাড়া থেকে অনেক কথা এসে গেল।

চাটুজ্জে এসে তো ঘর খুলে দিলে। পুরনো দিনের ঘর, অর্থাৎ একেবারে সিন্দুকের মত। ঘরের একটিমাত্র দরজা, এক দিকের দেওয়ালের ওপর দিকে একটি বড় ঘুলঘুলি, যার নাম গবাক্ষ। দরজা বন্ধ থাকলে ওই ঘুলঘুলি দিয়ে

আলো বাতাস ঘরে ঢোকে। ঘরের মেঝে মাটির, যদিও দোতলায়, তাতে দুটো তিনটে বড় বড় ইঁদুরের গর্ত।

ঠিক হ'ল, এবেলায় আমরা চাটুজ্জের ওখানেই আহার করব, খরচ পড়বে জনপ্রতি তিন আনা। দরজায় তালাচাবি লাগিয়ে আমরা পূজো দিতে বেরিয়ে গেলুম।

পাণ্ডার সঙ্গে এক টাকা দর ঠিক হয়েছিল, কিন্তু এখানে দু আনা ওখানে চার আনা এমনই ক'রে প্রায় আড়াই টাকা গচ্চা দিয়ে বিশ্বনাথের হাত থেকে তখনকার মতন রেহাই পেয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। পাণ্ডা তখনও সঙ্গ ছাড়ে নি, কারণ তার পাওনা তখনও বাকি। ভদ্রলোক সে, বললে, আপনারা খাওয়া-দাওয়া করিয়ে লিন, হামার পাওনা সে এক সময়ে লিহিয়ে লিব, কুছু চিন্তা নেই।

খাবার ডাক পড়ল। গিরিধারীই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল খাবার ঘরে। চাটুজ্জে তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুম দিচ্ছে। লাল চালের আধসেদ্ধ ভাত, থালার এক কোণে ভাতের মধ্যে খোঁদল ক'রে হাতা-দুয়েক কলায়ের ডাল আর এক কুচি ধুঁতুল-ভাজা, এই খাদ্য কোন রকমে দু-চার গ্রাস খেয়ে তো উঠে পড়লুম। পাণ্ডা বললে, এখানে আর খেও না। তিন আনায় কাশীতে রাজভোগ মিলে, লোকটা ঠিক লোক নাহি আছে।

এবার পাণ্ডা বিদায় করার পালা। শঙ্কিতচিত্তে একটি টাকা বের ক'রে তার দিকে এগিয়ে দিলুম। কোন আপত্তি না ক'রে প্রশান্ত-হস্তে টাকাটি নিয়ে বললে, কিছু যদি মনে না করিস তো একটা কথা বলছি বাপ।

বল বাবা।

তোদের কাছে কত টাকা আছে?

আমাদের তহবিলে তখন আর মাত্র পনরো-ষোলটি টাকা অবশিষ্ট ছিল। আমরা সে টাকাগুলি বের ক'রে তার সামনে রেখে দিয়ে বললুম, এই আছে আমাদের কাছে।

গিরিধারী বললে, দেখ্, হামি তোদের বড় ভাই আছে। তোদের টাকাকড়ি কাপড়-চোপড় খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট হ'লে হামাকে বলবি, হামি সব ব্যবস্থা করিয়ে দেব। তোদের কোন ভয় নেহি আছে। কাশীধামে মৌজ করিয়ে থাক্ তোরা, হামি আছে।

গিরিধারীর আশ্বাসবাণীর কোন উত্তর দিতে পারলুম না। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর সে বললে, সন্ধ্যের সময় কোথাও যাস নি। তোদের মন্দিরে নিয়ে যাব আরতি দেখতে।

আধ-ভিজে ধুতি দুখানা মাটির মেঝেতে পেতে, দুখানা শুকনো ধুতি পাকিয়ে বালিশ ক'রে আমরা শুয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, দরজা-ধাক্কার আওয়াজ পেয়ে উঠে পড়লুম। উঠে দেখি, গিরিধারী দরজা ঠেলছে, তার সঙ্গে একটা লোক, লোকটার কাঁধে একটা শতরঞ্চি, দুটো বালিশ আর দুটো দিশী কালো কম্বল। আমাদের সঙ্গে বিছানাপত্তর নেই দেখে সে নিয়ে এসেছে।

তখন প্রকৃতির চোখে সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে, আলোর প্রয়োজন। চাটুজ্জেকে সে কথা বলতেই সে বললে, দৈনিক এক পয়সা দিলে বাতির ব্যবস্থা হতে পারে।

তখুনি রেড়ির তেলের প্রদীপ ও মাটির পিলসুজ এসে গেল। তখনকার মতন বাতি নিবিয়ে আমরা গিরিধারীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম মন্দিরের উদ্দেশ্যে। ঘণ্টা দুয়েক এ-মন্দির সে-মন্দির ঘুরিয়ে গিরিধারী আমাদের নিয়ে গেল তার নিজের বাড়িতে। সেখানে তার বৈঠকখানায় বসিয়ে সে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে, তোরা বাড়ি থেকে কেনো ভাগিয়েছিস?

আমরা বললুম, দাদা, আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই, বাড়ির গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না। জীবনে উন্নতি করতে চাই। তা ছাড়া বিশ্বনাথ টেনে এনেছেন, এতে আমাদের হাত নেই।

গিরিধারী সব শুনে বললে, ঠিক আছে। বিশ্বনাথের আশ্রয়ে যখন এসেছিস, তখন সবই ঠিক হয়ে যাবে।

গিরিধারী আরও আশ্বাস দিলে, আজকাল এখানে অনেকে তেজারতির কারবার লাগিয়েছে, তাদের কারুর না কারুর দপ্তরে তোদের ঠিক্ বসিয়ে দোব, জয় বাবা বিশ্বনাথ!

ঠিক হ'ল, চাটুজ্জের ওখানে আর আমরা খাব না। সকালবেলা বাজারে কোথাও খেয়ে নোব, আর রাত্রে গিরিধারীর ওখানে খাব।

সে রাত্রে গিরিধারীর ওখানে আটার লুচি, কুমড়ো আর কাঁচা-তেতুলের ছক্কা, করলার আচার আর রাবড়ি ভক্ষণ ক'রে বাসায় ফিরে এসে দু দিন বাদে গা ঢেলে শুয়ে বাঁচা গেল। [ক্রমশ] "মহাস্থবির"

শরৎ-সাহিত্য-পরিচয়

ও

রেঙ্গুনের পত্র

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন হইতে আত্মীয়-বন্ধুকে যে-সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলি বিশেষ-ভাবে তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে আলোকপাত করে। এই সকল পত্রের কিছু কিছু সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

আমরা নিম্নে শরৎচন্দ্রের কতকগুলি রেঙ্গুনের পত্র মুদ্রিত করিলাম। শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল ও বন্ধু শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদিগকে লিখিত শরৎচন্দ্রের মূল পত্রগুলি আমাকে দেখিতে ও ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। উপেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রগুলি এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত পত্রগুলি 'পাঠশালা' পত্রিকা (কার্ত্তিক ১৩৪৫) হইতে, ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত পত্রগুলি 'যমুনা' (বৈশাখ—ভাদ্র ১৩৩৪) ও 'যুগান্তর' (৩ মাঘ ১৩৪৪) হইতে, এবং শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারকে লিখিত পত্রগুলি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (৮ মাঘ ১৩৪৪) হইতে গৃহীত। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত অধুনা-বিলুপ্ত 'প্রবাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি পত্রও পুনর্মুদ্রিত হইল।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত]

10. 1. 13
D. A. G's Office Rn.

প্রিয় উপীন,—তোমার পত্র পেয়ে দুর্ভাবনা গেল। দু'দিন পূর্ব্বে ফণীন্দ্রের পত্র ও চরিত্রহীন পেয়েছি। তোমাদের ওপরে বেশ দিন রাগ করে থাকা সম্ভব নয়, তাই এখন আর রাগ নেই, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে সত্যই অনেকটা রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। আমি কেবলি আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবতাম এরা করে কি? একখানা চিঠিও যখন দেয় না, তখন নিশ্চয়ই এদের মতিগতি বদলে গেছে। তোমাকে একটা কথা বলে রাখি উপীন, আমার এই একটা ভারী বদ্ স্বভাব আছে যে একটুতেই মনে করি লোকে যা করে তা' ইচ্ছে করেই করে। ইচ্ছা না করেও যে কেউ কেউ অভ্যাসের দোষে আর একরকম করে, আমার নিজের সম্বন্ধে সে কথা মনে থাকে না। Sensitive বলে একটা কথা যে আছে আমার সেটা অপর্য্যাপ্ত রকম বেশি। সুরেনকে আজ হপ্তা দুই একখানা চিঠি দিয়েছিলাম আজ পর্য্যন্ত তার জবাব পেলাম না। এরা কেনই বা লেখে কেনই বা লেখা বন্ধ করে! তুমি 'কাশিনাথ' সমাজপতিকে দিয়ে ভাল করনি। ওটা 'বোঝার' জুড়ি, ছেলে বেলার হাত পাকানর গল্প। ছাপান ত দূরের কথা, লোককে দেখানোও উচিত

নয়। আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা যেন না ছাপা হয়। আর আমার নামটা মাটি কোরো না, একা 'বোঝাই' যথেষ্ট হয়েছে।

আমি যমুনার প্রতি স্নেহহীন নই। সাধ্যমত সাহায্য করব, তবে ছোটো গল্প লিখতে আর ইচ্ছে হয় না—ওটা তোমরা পাঁচ জনেই কর। প্রবন্ধ লিখব এবং পাঠাবও। চরিত্রহীন কবে সম্পূর্ণ হবে বলতে পারি না। প্রায় অর্দ্ধেকটা হয়েছে মাত্র। হলেও যে সমাজপতির কাছেই পাঠিয়ে দেব তাও বলা ঠিক হয় না। এক তুমি যদি কলিকাতায় থাকিতে, তোমার কাছে পাঠাতাম। ইতিমধ্যে তুমি সমাজপতিকে লিখে দিয়ো 'কাশিনাথ' যেন প্রকাশ না করে। যদি করে ত আমি লজ্জায় বাঁচব না। তুমি দু'একটা গল্প লিখতে বলেচ এবং পাঠাতেও লিখেচ যদি লিখিই কাকে পাঠাব? তোমাকে না ফণিকে?...

এ কথাটা শুধু গোপনে তোমাকেই লিখচি। গিরীন তখন ছোটো ছিল, যখন আমি সংসারের বাইরে চলে আসি। এত বৎসরের পরে আমাকে বোধ করি তার মনেও নেই। উপীন, আর একটা কথা বলি তোমাকে—একদিন তার একখানা বই কিনতে চাই—তুমি নিষেধ করে বলো যে শুনলে সে দুঃখ করবে। আজ পর্য্যন্ত আমি সেই কথা মনে করেই কিনিনি। একখানা স্পষ্ট করে চেয়েও ছিলাম—অথচ, সে পাঠালে না। ছেলেবেলায় তার অনেক চেষ্টা সংশোধন করে দিয়েচি—আমি লিখতাম বলেই তারাও লিখতে সুরু করে। ও বাড়ীর মধ্যে আমিই বোধ করি প্রথমে ওদিকে নজর দিই। তার পরে ওরা চাঁচল থেকে হাতে লিখে মাসিক পত্র বার করত। আজ সে আমাকে একখানা পড়তেও দিলে না! সে হয়ত মনে করে, আমার মত নির্ব্বোধ মূর্খ লোকে তার লেখা বুঝতেও পারে না! যাক এজন্য দুঃখ করা নিষ্ফল। সংসারের গতিই বোধ করি এই। আমার শরীর আজকাল ভাল। আমাশা সেরেচে। আজকাল পড়াটা প্রায় বন্ধ করেচি। আমার অসমাপ্ত মহাশ্বেতা (*oil painting*) আবার সমাপ্ত হবার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্চে। তোমার সেই বড় উপন্যাস লেখার মতলব এখনো আছে ত? যদি না থাকে ত ভারী খারাপ। ওকালতিও করা চাই এটাকেও ছাড়া চাই না।

আমার কলিকাতা যাওয়া—(এদেশ ছেড়ে) বোধ করি হয়ে উঠবে না। শরীরও টিকবে না বুঝচি কিন্তু না টিকাও বরং ভাল কিন্তু ওখানে যাওয়া ঠিক নয় এই রকমই মনে হচ্চে। আমার ফাউনটেন পেন তোমার হাতে অক্ষয় হোক্—ও কলমটা অনেক জিনিসই লিখেচে—খাটিয়ে নিলে আরও লিখবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। যদি 'চন্দ্রনাথ' পাঠান সম্ভব হয় এবং সুরেনের যদি অমত না থাকে, তা হলে যা সাধ্য সংশোধন করে ফণিকে পাঠাব।

চিঠির জবাব দিয়ো। শরৎ

26. 4. 13
Rangoon
14, Lower Pozoungdoung Street

শ্রীচরণেষু—তোমার চিঠি পাইয়া যতটা আশ্চর্য্য হইয়াছি তাহার শতগুণ ব্যথিত হইয়াছি। তুমি আমাকে দ্বেষ করিবে, এই কথাটা যদি আমি নিজেও বলি, তাহা হইলেই কি তুমি বিশ্বাস করিবে? আমার কলিকাতার স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে জাজ্বল্যমান আছে—আমি অনেক কথাই ভুলি বটে, কিন্তু, এসব কথা এত শীঘ্র ত নয়ই, বোধ করি কোন দিনই ভুলি না। যাই হোক, এ লইয়া আমি জবাবদিহি করিব না। আমি বেশ জানি একবার যদি তুমি নিভৃতে আমার মুখ এবং আমার কথা মনে করিয়া দেখ, তখনই বুঝিতে পারিবে—আমাকে তুমি বিদ্বেষ করিবে এ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে না। এ কথা আমি ত উপীন, কল্পনা করিতেও পারি না। তবে, এই বলি তোমার যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করিতে পার, আমি তোমাকে আমার তেমনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ আত্মীয় এবং সম্পর্কে মান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করিব এবং ইহা চিরদিনই করিয়াছি। তোমাদের আপোষের মধ্যে কলহ বিবাদ হইতে পারে, তাই বলিয়া আমি কি তার মধ্যে যাইব? তুমি বিশ্বাস করিয়াছ আমি বলিয়াছি তুমি আমাকে দ্বেষ কর। কি করিয়া আমার সম্বন্ধে তুমি ইহা বিশ্বাস করিলে? আমার অনেক রকম দোষ আছে। তাই বলিয়াই আজ তুমি এই কথা বিশ্বাস করিলে এবং আমাকে তাহা লিখিতে সাহস করিলে। আমি মন্দ বলিয়া কি এত অধম? আমি মনে জ্ঞানে এমন কথা কল্পনা করিতে পারি এই আজ নূতন শুনিলাম। আমাকে তুমি গভীর আঘাত করিয়াছ। যদি বেশী দিন আর না বাঁচি, এটা তোমার মনেও একটা দুঃখের কারণ হইয়া থাকিবে যে আমাকে তুমি নিরর্থক দুঃখ দিয়াছ। তোমার চিঠি পাইয়া অবধি কেবলি ভাবিয়াছি তুমি আমাকে না জানি কত নীচই না মনে কর। আমি বোধ করি মূর্খ এবং নীচ বলিয়াই তুমি আমার সম্বন্ধে (সম্প্রতি কলিকাতায় এত ঘনিষ্ঠতা এত কথাবার্ত্তা হইয়া যাইবার পরেও) এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছ। না হইলে মনে করিতে না এমন হইতেই পারে না। আমার শপথ রহিল উপীন, আমাকে পত্র পাইবামাত্রই লিখিবে তুমি আর এ কথা বিশ্বাস কর না। আমি সুরেনকে কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম আমার মনে হয়, আমাকে বিদ্বেষ করিয়াই যেন এসব ছাপা হইতেছে। তার কারণ, আমিও সমাজপতিকে লিখি ওগুলো আর ছাপাইবেন না—তথাপি আমাকে কোন উত্তর না দিয়াই ছাপা হইতে লাগিল। যাই হোক এখন ভিতরকার কথাটাও জানিতে পারিলাম। তুমিও যে ওই কথা সমাজপতিকে বলিয়াছিলে তাহা এখন আরো জানিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলাম। তুমি যে আমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাও যদি না

বুঝিতাম.উপীন, এমন করিয়া আজ গল্প লিখিতেও পারিতাম না। আমি মানুষের হৃদয় বুঝি। তুমি যেমন তোমার অন্তর্যামীর কাছে নির্ভয়ে অসঙ্কোচে বলিতে পার "আমি শরতকে সত্যই ভালবাসি।" আমিও ঠিক তেমনি জানি এবং তেমনি বিশ্বাস করি।

যাক এ কথা। শুধু একটা চন্দ্রনাথ লইয়াই এত হাঙ্গামা। অথচ, সেটা যে কি রকম ভাবে ফণী পালের কাগজে বার হবে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

তোমরা সব দিক্ না বুঝিয়া, সব দিক্ না সামলাইয়া হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন দিয়া অনেকটা নির্ব্বোধের কায করিয়াছ। এবং তাহারি ফল ভুগিতেছ। দোষ তোমাদেরি—আর বড় কারু নয়। ফণী পালের জন্য তুমি কতকটা যে false position-এ পড়িয়াছ তাহা প্রতি পদে দেখিতে পাইতেছি।

আমি আরো বিপদে পড়িয়াছি, একে আমার একেবারে ইচ্ছা নয় 'চন্দ্রনাথ' যেমন আছে তেমনি ভাবে ছাপা হয়, অথচ, সেটা খানিকটা ছাপা হয়েও গেছে আবার বাকিটাও হাতে পাই নাই। সুরেনের বড় ভয়, পাছে ও জিনিসটা হারিয়ে যায়। ওরা আমার লেখাকে হৃদয় দিয়া ভালবাসে—বোধ করি তাই তাদের এত সতর্কতা।

আর একটা কথা উপীন। 'ভারতবর্ষ' কাগজের জন্য প্রমথ চরিত্রহীন বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে কি আর বলিব। সে আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু এবং বন্ধু বলিলে সত্য যাহা বুঝায় তাহাই। সে জাঁক করিয়া সকলের কাছে বলিয়াছে চরিত্রহীন দিবই এবং এই আশায়...প্রভৃতির লেখা চার পাঁচটা উপন্যাস অহঙ্কার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই হইতেছে "ভারতবর্ষের" মোড়ল। এখন, দ্বিজবাবু প্রভৃতি, (হরিদাস গুরুদাসের পুত্র) তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এদিকে 'যমুনাতেও' বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ঐ কাগজে চরিত্রহীন ছাপা হবে সমাজপতিও registery চিঠি ক্রমাগত লিখচেন কোন দিকে কি করি একেবারে ভেবে পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম—সে বলে, এটা সে না পেলে আর তাহার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। এমন কি পুরাতন বন্ধু বান্ধব club প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে। কি করি? একটু ভাবিয়া জবাব দিবে। তোমার জবাব চাই, কেন না, একা তুমিই এর সুরু থেকে history জান।

বড় ভাল নই ৭।৮ দিন প্রায় জ্বর জ্বর কচ্চে—অথচ স্পষ্ট জ্বরও হচ্চে না। যদি আবশ্যক বিবেচনা কর এই পত্র সুরেনকে দেখাইয়ো। তোমরা আপোষে যত পার ঝগড়া করিয়া মর কিন্তু আমি যে তোমাদের এক সময়ে শিক্ষক ছিলাম—বয়সের সম্মানটাও অন্ততঃ দিয়ো।

সেবক শরৎ

ফণীবাবু উপীনকে এই পত্রখানা আপনি পড়িয়া পাঠাইয়া দিবেন।

10. 5. 1913.
14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon

প্রিয় উপেন, আজ তোমারও চিঠি পাইলাম, প্রমথরও চিঠি পাইলাম। তুমি যে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছ ইহাতে যে কত তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে যাওয়া পাগলামি। তুমি যে আর মনে ক্লেশ পাইতেছ না কিম্বা দুঃখ করিতেছ না ইহা ইহাতেই বুঝিলাম যে অতি সহজভাবে আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছ। আমি নিজেকে মূর্খ বলিয়াছিলাম—সেটা কি মিছে কথা? তোমাদের কাছে আমি কি পণ্ডিত বলিয়া নিজেকে মনে করিব, আমি কি এত বড় আহাম্মক? না হয়, বানাইয়া গল্প লিখিতে পারি—এতে পাণ্ডিত্য কোথায়? যাক্। B.A.,M.A., B.L., এ টাইটেল-গুলোকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি তাহাই জানাইলাম। প্রমথ লিখিতেছে গল্পগুলো তাদের Evening Club এ অত্যন্ত সম্মান পাইয়াছে। D. L. Roy এত প্রশংসা করিয়াছেন যে তাহা বিশ্বাস হইতে চায় না। দিদির নারীর মূল্য নাকি "অমূল্য" হইয়াছে। দ্বিজু-বাবু বলেন, এ রকম গল্প রবি বাবুরও বোধ করি নাই। [এমন] প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় আর কখন পড়েন নাই। সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন। ফণীর কাগজখানা ছোট বটে, কিন্তু তার মত ভাল কাগজ বোধ করি আজকাল আর একটাও বাহির হয় না। ঈশ্বর করুন ফণী এই ভাবে পরিশ্রম করিয়া তাহার কাগজ সম্পাদন করুক—দুদিন পরে হোক দশ দিন পরে হোক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য্য। তবে চেষ্টা করা চাই—পরিশ্রম করা চাই। আর আমার কথা। আমি তাকে ছোট ভায়ের মতই দেখি। তার কাগজ থেকে যদি কিছু বাঁচে, তবে অন্য কাগজ। তবে, আজকাল এত বেশী অনুরোধ হইতেছে যে, আমার দশটা হাত থাকিলেও ত পারিয়া উঠিতাম বলিয়া মনে হয় না। 'চরিত্রহীন' তার কাগজে বার হবে না। এ কথা কে বলিয়াছে? আমি প্রমথকে পড়িতে দিয়েছি। তবে, সে যদি ধরিয়া বসিত যে সেই প্রকাশ করিবে তাহা হইলে আমাকে হয়ত মত দিতে হইত, কিন্তু, তাহারা সে দাবী করে না। বোধ করি manuscript পড়িয়া কিছু ভয় পাইয়াছে। তাহারা সাবিত্রীকে "মেসের ঝি" বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত, এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কি ভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য হীরা মাণিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না। শেষে হয়ত একদিন আপশোষ করিবে কি রত্নই হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে; আমার কাছে সে উপসংহার কি হইবে জানিতে চাহিয়াছে। আমার উপরে যাহার ভরসা নাই অবশ্য সে ওরকম প্রথম নভেল প্রথম কাগজে বাহির করিতে দ্বিধা করিবে আশ্চর্য্যের

কথা নয়, কিন্তু, নিজেই তাহারা বলিতেছে চরিত্রহীনের শেষ দিক্‌টা (অর্থাৎ তোমরা যতদূর পড়িয়াছ তার পরে আর ততটা) রবিবাবুর চেয়েও ভাল হইয়াছে (style এবং চরিত্র বিশ্লেষণে) তবুও তাদের ভয় পাছে শেষটা বিগড়াইয়া ফলি। তারা এটা ভাবে নাই যে লোক ইচ্ছা করিয়া একটা "মেসের ঝি"কে আরম্ভেই টানিয়া আনিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা জানিয়াই করে। তাও যদি না জানিব তবে মিথ্যাই এতটা বয়স তোমাদের গুরুগিরি করিলাম। আর এক কথা—প্রমথ বলিতেছে, ভারতবর্ষকে আমি যেন নিজের কাগজ বলিয়া মনে করি—এবং সেইরূপ করি। আমি প্রমথকে কথা দিয়াছি আমার সাধ্যমত করিব, কিন্তু সাধ্য কতটুকু তাহা বলি নাই। আরো এক কথা—তাহারা দাম দিয়া লেখা ক্রয় করিবে—তখন তাহাদের অভাব হইবে না কিন্তু দাম দিলেই যে সকলের লেখাই পাওয়া যায় না এইটা তাহারা আমার সম্বন্ধে এইবার বোধ করি বুঝিয়াছে। যাই হোক—চরিত্রহীন আমার হাতে আসিয়া পড়িলেই ফণীকে পাঠাইয়া দিব। আমার হাতে আর রাখিব না। তবে প্রমথ ফণীর হাতে সেটা দিবে না কেন না, ফণীর উপর তাহারা কিছু রাগিয়া গিয়াছে। তা হয়। কারণ, মাসিক পত্রের পরিচালকেরা পরস্পরকে দেখিতে পারে না। আর কিছু নয়। তবে, প্রমথ লোকটি শুধু যে আমার বাল্যবন্ধু তা নয়, আমার পরম বন্ধু এবং অতি সৎ লোক। সত্যই ভদ্রলোক। তাকে আমি বড় ভালবাসি। সেই জন্যই ভয় করিয়াছিলাম তাহার জোর জবরদস্তিকে আমি পারিয়া উঠিব না। এ বিষয়ে সঠিক সম্বাদ পরে দিব।

তুমি লিখিতেছ আমরা যমুনাকে বড় করিব। আমরাটা কে? তুমি যে যমুনার পরম বন্ধু এবং নিস্বার্থ বন্ধুত্ব করিতে গিয়াই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছ তাহা আমি বিশেষ জানি বলিয়াই তোমার সম্বন্ধে যত কিছু শুনিয়াছি একটাতেও বিন্দুমাত্রও কান দিই নাই। হইতে পারে কিছু diplomatic চাল চালিয়াছ—তা বেশ করিয়াছ। যাকে ভালবাসিবে, তাকে এমনি করিয়াই সাহায্য করিবে। ফণীকে তুমিই ভালবাস কিন্তু তা ছাড়া "আমরা" কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। এবারে বুঝাইয়া বলিবে। 'পথ নির্দ্দেশ' এবং 'রামের সুমতি' সম্বন্ধে আমার অভিমত 'পথ নির্দ্দেশ'টাই ভাল। তবে এ গল্পটা একটু শক্ত। সবাই ভাল বুঝিবে না। আমিও অনেকের অনেক রকম মত শুনিয়াছি। যাহারা নিজে গল্প লেখে তাহারা ঠিক জানে, রামের সুমতি যদিও বা লেখা যায় পথ নির্দ্দেশ লিখিতে কিছু বেশী বেগ পাইতে হইবে। হয়ত সবাই পারিবে না। ও রকম গোলযোগ circumstance এর ভিতরে খেই হারাইয়া একটা হ-জ-ব-র-ল করিয়া তুলিবে। হয়ত ধৈর্য্যের অভাবে শেষ হবার পূর্ব্বেই শেষ করিয়া ফেলিবে। আর নিজের সমালোচনা নিজে কি করিয়াই বা করিব? তবে কলিকাতা এবং এদেশের লোকের মত দুটো গল্পই

superlative degreeতে Excellent! দ্বিজুবাবু বলেন গল্পের আদর্শ! ফণীর কাগজে প্রতি মাসেই যাতে এই রকম একটা কিছু বার হয় তার চেষ্টা সবিশেষ করা উচিত। তবে, আমি আর বড় ছোট গল্প লিখিতে ইচ্ছা করি না। একটু বড় হয়েই যায়। তোমাদের মত বেশ ছোট করে যেন লিখতেই পারি না। তা ছাড়া আর একটা কথা এইখানে আমার বলবার আছে। আমি ত চন্দ্রনাথকে একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালবার চেষ্টায় আছি অবশ্য গল্প (plot) ঠিক তাই থাকবে। তার পরে হয় চরিত্রহীন, না হয় ওর চেয়েও একটা ভাল কিছু যমুনার বার করা চাই। আর প্রবন্ধ। এটাও খুব প্রয়োজন। ভাল প্রবন্ধের বিশেষ দরকার। তা না হলে শুধু গল্পেতেই কাগজ যথার্থ "বড়" বলে লোকে স্বীকার করে না। আমাকে যদি তোমরা ছোট গল্প লিখবার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পার ত আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি। বোধ করি গল্পের মত সরল এবং সুপাঠ্য করেই। এ বিষয়ে তোমার অভিমত জানাবে। যদি গল্প লেখার কাযটা তোমরা চালিয়ে নিতে পার, আমি শুধু novel ও প্রবন্ধ নিয়েই থাকি। তা না হইলে দেখ'চ রাত্রেও খাটিতে হয়। আমার শরীর ভাল নয়, রাত্রে লিখিতে পারি না এবং পড়াশুনারও ক্ষতি হয়। সমালোচনা, প্রবন্ধ, নভেল, গল্প, সব লিখলে আবার লোকে হয়ত সব্যসাচী বলে ঠাট্টা করবে। আবার অন্য কাগজেও কিছু কিছু দিতে হবে।

'দেবদাস' ও 'পাষাণ' পাঠিয়ে দিয়ো আমি re-write করবার চেষ্টা দেখব। আচ্ছা, ফণী ৩০০০ কপি ছাপিয়ে টাকা নষ্ট করচে কেন? তার গ্রাহক কি কিছু বেড়েচে? আমার বোধ হয় না। তবে খুব ভরসা আছে আসচে বছরে ওর কাগজ একটি শ্রেষ্ঠ কাগজের মধ্যেই দাঁড়াবে।

ফণীর ক্রমাগত আশঙ্কা হয় আমি বুঝি তাকে ছেড়ে আর কোথাও লিখতে সুরু করব। কিন্তু এ আশঙ্কার হেতু কি? সে আমার ছোট ভায়ের মত—এ কথাটা কেন যে সে বিশ্বাস করতে পারে না তা সেই জানে। আমি জানি না।

তোমার ক্রয় বিক্রয় গল্পটা সত্যই ভাল। কিন্তু, আরো একটু বড় করা উচিত ছিল। এবং শেষটা সত্য সত্যই শেষ করা উচিত ছিল। অমন গল্পটি কেন যে তুমি অত তাড়াতাড়ি করে শেষ করলে জানি না। একটা কথা মনে রেখো গল্প অন্ততঃ ১২।১৪ পাতা হওয়া চাই এবং conclusionটা বেশ স্পষ্ট করা চাই।

সুরেন আমাকে চিঠির জবাব দিলে না কেন? তাকে আমার হাতের কলম দিয়েচি, কেন না এর চেয়ে ভাল জিনিস আর আমার দিবার নাই। সে তার কি সদ্ব্যবহার কচ্চে জিজ্ঞাসা করে লিখো। আমার কলমের যেন অসম্মান না হয়। আর চারটে কলম

দেওয়ার বাকী আছে। যোগেশ মজুমদার কোথায়? পুঁটু, বুড়ি এবং সৌরীন এদের জন্যও আমার কলম ঠিক করে রেখেচি একদিন পাঠিয়ে দেব।

গিরীন কি বাঁকিপুরে ফিরেচে? তাকে জবাব দিতে পারিনি সে কোথায় আছে জানিতে পারি নাই বলিয়া। ফটো.ত আমার নাই—কোন দিন ও কথা মনেও হয়নি। আচ্ছা।

আজ এই পর্য্যন্ত।

হাঁ আর এক কথা। সুধাকৃষ্ণ বাগচি একটা written statement পাঠিয়েছে। সে বলে সমস্ত কথা মিথ্যা। ভালই। আমি জানি কোন্‌টা মিথ্যা। যাই হোক লোকটা যখন deny কচ্চে তখন ঐখানেই শেষ করা উচিত। তা ছাড়া বুড়ো মানুষ!

ফণীন্দ্রবাবু, আপনার তার পাইয়া জবাব দিই নাই। কারণ জবাব দিবার ঠিক জিনিসটা আমার হাতছাড়া। তবে আশা করি শীঘ্র হাতে আসিবে।

আগামী মেলে সমালোচনা, নারীর মূল্য পাঠাইব। পরের মেলে চন্দ্রনাথ ও একটা যা হয় কিছু। চরিত্রহীন যাতে যমুনার বার হয় তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই হবে। নিশ্চিন্ত হোন্। তবে শুনিতেছি, ওটাতে 'মেসের ঝি' থাকাতে রুচি নিয়ে হয়ত একটু খিটমিটি বাধিবে। তা বাধুক। লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না যারা যত নিন্দা করিবে, তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা artএর ধার ধারে না তারা হয়ত নিন্দা করবে। কিন্তু, নিন্দা করলেও কাজ হবে। তবে ওটা psychology এবং analysis সম্বন্ধে যে খুব ভাল তাতে সন্দেহই নেই। এবং এটা একটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical Novel! এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না।

আঃ শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street
২২শে আগষ্ট ১৩, Rangoon

প্রিয় উপীন, অনেক দিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তুমিও অনেক দিন আমাকে কোন সম্বাদই তোমার দাও নাই। নাই দাও, সে জন্য দুঃখ করিতেছি না বা অনুযোগ করিতেছি না। ২।৩ মাস পরে সম্ভবতঃ আবার আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইবে, তখন সে সব কথা হইতে পারিবে।

এ মাসের যমুনা পাইয়া তোমার 'লক্ষ্মীলাভ' পড়িলাম। এ সম্বন্ধে আমার মত তুমি বিশ্বাস করিবে কি না, তোমার কথাতেই প্রকাশ করিতেছি "বাপের মুখে ছেলের সুখ্যাতি শুনে কায নাই—"। আমার যথার্থ মত, এমন মধুর গল্প অনেক দিন পড়ি নাই। হয়ত তোমার best এটি। অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই, লোকের দোষ দেখানো, সংসারের

দুঃখের দিক্‌টা তুলিয়া ধরা ইত্যাদি কিছু নেই—শুধু একটি সুন্দর ফুলের মত নির্ম্মল এবং পবিত্র! মধুর, অতি মধুর! এই আমি চাই। পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে তবে আর সে গল্প কি? বড় ভালো হয়েচে উপীন, আমি আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি। যেন মাঝে মাঝে এমনি গল্প পড়তে পাই। অবশ্য আমাকে খুসী করা শক্ত, কিন্তু এমন পেলে আমি আর কিছু চাই না। আমার এতবড় সুখ্যাতিতে হয়ত তুমি একটু সঙ্কুচিত হবে এবং সবাই হয়ত আমার সঙ্গে একমতও হবে না, কিন্তু, আমার চেয়ে ভাল সমজদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। মনে কোরো না গর্ব্ব করচি—কিন্তু, আমার আত্মনির্ভরই বল, আর prideই বল, এই আমার নিজের ধারণা। এমন গল্প অনেক দিন পড়িনি। শুনেচি, তোমার আর একটি বড় এবং ভালো গল্প ভারতবর্ষে বেরিয়েচে। ভারতবর্ষ এখনো এসে পৌঁছেনি, বলিতে পারি না সেটি কেমন, কিন্তু যদি ভাবে মাধুর্য্যে এমনটি হয়ে থাকে তা হলে সেও নিশ্চয় খুব ভাল গল্পই হয়েচে।

তা ছাড়া তোমাদের লেখার styleটি বড় সুন্দর। আমি যদি এমনি সুন্দর ভাষা পেতাম, ভাষার ওপর এমনি অধিকার থাকত তা হলে বোধ করি আমার গল্প আরো ভাল হত। অবশ্য আমি নিজের সাহত তোমার তুলনা করচি না, তাতে তুমিও লজ্জা বোধ করবে, কিন্তু খুসী হলে আমি আর রেখে ঢেকে বলতে পারিনে।

কেমন আছ আজকাল? আমি বড় ভাল নই—এই বর্ষা কালটা আমার বড় দুঃসময়। ১০।১২ দিন জ্বর হয়েছিল দুদিন ভাল আছি। আমার ভালবাসা জেনো। ইতি শরৎ

[প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত]

D. A. G's Office, Rangoon
22. 3. 12.

প্রমথ,—তোমার পত্র পাইয়া আজই জবাব লিখিতেছি। এমন ত হয় না। যে আমার স্বভাব জানে তাহার কাছে নিজের সম্বন্ধে এর বেশি জবাবদিহি করা বাহুল্য।...

...আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ। তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

(১) সহরের বাহিরে একখানা ছোটো বাড়িতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।

(২) চাকরি করি। ৯০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং ১০৲ টাকা allouance পাই। একটা ছোটো দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয় কোনো মতে কুলাইয়া যায় এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

(৩) Heart Disease আছে। যে-কোনো মুহূর্ত্তেই—

(৪) পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology,

Biology & Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

(৫) আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript; "নারীর ইতিহাস" প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম, তাও গেছে।

ইচ্ছা ছিল যা হোক একটা এ বৎসরে publish করিব। আমার দ্বারা কিছু হয় এ বোধ হয় হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিব এমন উৎসাহ পাই না। "চরিত্রহীন" ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল। সবই গেল।···

···আর একটা সংবাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন Heart disease এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া oil-painting সুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি oil-painting সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও ত তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি। Novel, History, Painting—কোনটা? কোনটা আবার সুরু করি বলত? তোমার স্নেহের শরৎ।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—তোমার আগেকার চিঠিরও এখনো জবাব দিইনি ভাবছিলাম—তুমি কেন যে আমাকে চিরকাল এত ভালবাস। আমি এ কথা অনেক দিন থেকেই ভাবি।···প্রমথ, একটা অহঙ্কার করব, মাপ করবে?

যদি কর ত' বলি। আমার চেয়ে ভাল novel কিম্বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখ্‌তে পারবে না, যখন এই কথাটা মনেজ্ঞানে সত্য বলে মনে হবে সেই দিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো। তার পূর্ব্বে নয়। এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপরে রইল। এ বিষয়ে আমি অসত্য খাতির চাই না, আমি সত্য চাই।···

১৭ই এপ্রিল, ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—তোমার পত্র কাল পাইয়াছি, আজ জবাব দিচ্ছি···তোমাকে অন্ততঃ পড়িবার জন্যও 'চরিত্রহীন'-এর যতটা আবার লিখিয়াছিলাম (আর অনেক দিন লিখি নাই) পাঠাইব মনে করিয়াছি। আগামী মেলে অর্থাৎ এই সপ্তাহের মধ্যেই পাইবে। কিন্তু, আর কোনও কিছু বলিতে পারিবে না। পড়িয়া ফিরাইয়া দিবে। তাহার প্রথম কারণ, এ লেখার ধরণ তোমাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। Appreciate করিবে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। তাই এটা ছাপিয়ো না। সমাজপতি মহাশয়

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, কেন না তাঁহার সত্যই ভাল লাগিয়াছে।...আমার এসব বকাটে লেখা—এর যথার্থ ভাব কেই বা কষ্ট করিয়া বুঝিবে, কেই বা ভাল বলিবে!...তুমি যদি সত্যই মনে কর এটা তোমাদের কাগজে [ভারতবর্ষ] ছাপার উপযুক্ত, তা' হলে হয়তো ছাপিতে মত দিতেও পারি, না হলে তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলের দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয় এই চেষ্টা করিবে তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না। তা ছাড়া তোমাদের দ্বিজুদা [দ্বিজেন্দ্রলাল রায়] মত করিবেন কি না বলা যায় না। যদি আংশিক পরিবর্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না। তবে একটা কথা বলি, শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়াই চরিত্রহীন মনে করিয়ো না। আমি একজন Ethics এর Student, সত্য Student. Ethics বুঝি, এবং কাহারও চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না। যাহা হউক পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়ো এবং তোমার নির্ভীক মতামত বলিয়ো। তোমার মতামতের দাম আছে। কিন্তু মত দিবার সময় আমার যে গভীর উদ্দেশ্য আছে সেটাও মনে করিয়ো। ওটা বটতলার বই নয়।... যদি ছাপাবার উপযুক্ত মনে হয় তাহা হইলেও বলিয়ো। আমি শেষটা লিখিয়া দিব। শেষটা আমি জানিই। আমি যা' তা' যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না। গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য করে লিখি এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না। বৈশাখের যমুনা কেমন লাগল? 'পথনির্দেশ' বুঝতে পারলে কি? শীঘ্র জবাব দিয়ো।—

২৪শে মে, ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—দ্বিজুদার মৃত্যুসংবাদ Rangoon Gazette-এ পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি যে কম জানিতাম তাহা নহে, অবশ্য তোমাদের মত জানিবার অবকাশ পাই নাই, কিন্তু যেটুকু জানিতাম, আমার পক্ষে তাহা বড় কম ছিল না।...

তাঁহার মান রক্ষা করিবার জন্য যাহা আমার সাধ্য নিশ্চয় করিতাম,...তিনি সাহিত্যিক এবং যোদ্ধা ছিলেন। তিনি আমার মূল্য বুঝিতেন এবং না বুঝিলেও তাঁর কাছে আমার অপমান ছিল না। সেই জন্য মনে করিয়াছিলাম লিখিয়া পাঠাইব। তিনি ভাল বুঝিলে প্রকাশ করিবেন, না ভাল মনে করিলে প্রকাশ করিবেন না। তাহাতে লজ্জার কোন কারণ ছিল না, অভিমানও হইত না। কিন্তু, এখন যে সে আমার দাম কষিবে! হয়ত বলিবে প্রকাশ করার উপযুক্ত নয়, হয়ত বলিবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও বা file কর। সুতরাং আমাকে ভাই ক্ষমা কর। তুমি আমার কতবড় সুহৃৎ তাহা আমি জানি। সে কথাটা একদিনের তরেও ভুলিব না, তুমি আমাকে ভুল বুঝিলে বা

আমার উপর রাগ করিলেও আমার মনের ভাব অটল থাকিবে, কিন্তু এ অন্য কথা। অপরের কাগজের জন্য আমি নিজের মর্যাদা নষ্ট করিব না। আমি ছোট কাগজে লিখি ভাই, আমার পক্ষে তাহ'ই যথেষ্ট। আমি সেখানে সম্মান পাই, শ্রদ্ধা পাই, এর বেশি আর কিছু আশা করি না। আর একটা কথা—চরিত্রহীন সম্বন্ধে।...লিখিয়াছেন,... বাবুও তাঁহাকে জানাইয়াছেন—ওটা এতই নাকি immoral যে, কোনও কাগজেই বাহির হইতে পারে না। বোধ হয় তাই হইবে, কারণ তোমরা আমার শত্রু নও যে মিথ্যা দোষারোপ করিবে, আমিও ভাবিতেছি ওটা লোকে খুব সম্ভব এই ভাবেই প্রথমে গ্রহণ করিবে।...

...আমার নিজের নামের জন্য আমি এতটুকুও মনে ভাবি না। লোকে যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করুক।—যাক এ কথা। 'কাল'ই আমার বিচার করিবে। মানুষ সুবিচার অবিচার দুই-ই করিবে, সে জন্য দুর্ভাবনা করা ভুল।...আমি শুধু পদ্য লিখিতেই পারি না, তা' ছাড়া সব রকমই পারি।...আমি সম্পাদকের কাছে নিজের লেখা যাচাই করিতে পারিই না। সেটা আমার পক্ষে অসাধ্য। অবশ্য রবিবাবু ছাড়া।

[ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত]

S. Chatterji
D. A. G's Office, Rangoon
[জানুয়ারি ১৯১৩]

ফণীবাবু,—আপনাদের সম্বাদ কি? সদাসর্ব্বদা চিঠি দিতে ভুলবেন না। আমার দ্বারা যা সম্ভব আমি করব। উপীন কোথায়? ভবানীপুরে কবে আসবে? আমাকে 'চন্দ্রনাথ' কবে পাঠাবে? আমাকে আপনি যা করতে হবে বলবেন। না বললে আমার দ্বারা বিশেষ কোনো কাজ হবে না। এসে পর্য্যন্ত আমি আমাশা ও জ্বরে ভুগচি না হ'লে এত দিনে হয়ত কিছু লিখতাম। যা হোক একটা চিঠি দেবেন। সৌরীনকে আমার কথা মনে করিয়া দিবেন। শরৎ

রেঙ্গুন, [মার্চ] ১৯১৩

প্রিয় ফণীন্দ্রবাবু,—'রামের সুমতি গল্পটার শেষ' পাঠালাম এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। গল্পটা কিছু বড় হয়ে পড়েছে, বোধ করি একবারে প্রকাশ হ'তে পারিবে না, কিন্তু হ'লে ভাল হয়। একটু ছোট টাইপে ছাপালে এবং দুই একখানা পাতা বেশী দিলে হ'তে পারে। ছোট গল্প, খণ্ডশঃ প্রকাশ করায় তেমন সুবিধা হয় না, বিশেষ আপনার কাগজের এখন একটু পসার হওয়া উচিত। যদিও আমার ছোট গল্প লেখার অভ্যাস আজকাল কিছু কমেছে, তবে আশা করি দু এক মাসের মধ্যেই অভ্যাস

ঠিক হয়ে যাবে। আমি প্রতি মাসেই গল্প ছোট করে (১০।১২ পাতার মধ্যে) এবং প্রবন্ধ পাঠাব। গল্প নিশ্চয়ই কেন না, আজকাল ঐটার আদর কিছু অধিক।...

আগামী বারে গল্প যাতে ছোট হয় সে দিকে চোখ রাখব। আর এক কথা আপনি সমাজপতির সহিত সদ্ভাব রাখবেন। তাঁর কাগজে যদি আপনার কাগজের একটু আধটু আলোচনা থাকতে পায় সুবিধা হয়। এবারের সাহিত্যে আমার নাম দিয়ে কি একটা ছাইপাঁশ ছাপিয়েছে। ও কি আমার লেখা? আমার ত একটুও মনে পড়ে না। তা ছাড়া যদি তাই হয়, তা হলেই বা ছাপান কেন? মানুষ ছেলেবেলা অনেক লেখে সেইগুলো কি প্রকাশ করতে আছে? আপনি 'বোঝা' ছাপিয়ে আমাকে যেমন লজ্জিত করেচেন, সমাজপতিও তেমনি ঐটে ছাপিয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েচেন। যদি উপীনকে চিঠি লেখেন এই অনুরোধটা জানাবেন যেন আমার অমতে আর কিছুই না প্রকাশ হয়। আবশ্যক হ'লে গল্প আমি ঢের লিখতে পারি—আপনার কাগজ ত এক ফোঁটা, ওরকম ৩৪ গুণ কাগজও একলা ভরে দিতে পারি। তা ছাড়া আমার আর একটা সুবিধে আছে। গল্প ছাড়া সমস্ত রকম subject নিয়েই প্রবন্ধ লিখতে পারি তা যদি আপনার আবশ্যক থাকে লিখবেন। যে কোন subject—তাতেই আমি স্বীকার আছি। 'রামের সুমতি' ক'বারে ছাপাবেন, কিম্বা একেবারে ছাপাবেন আমাকে লিখে জানাবেন: তা হ'লে চৈত্রের জন্য আর লিখবার আবশ্যক হবে না।

চরিত্রহীন প্রায় সমাধার দিকে পৌঁচেচে। তবে সকালবেলা ছাড়া রাত্রে আমি লিখতে পারিনে। রাত্রে আমি শুয়ে শুয়ে পড়ি।...

আর একটা কথা—আপনি যমুনা ছাপাতে দেবার আগে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আমাকে একবার যদি দেখাতে পারেন, বড় ভাল হয়। এই ধরুন চৈত্রের জন্য যে সব ঠিক করেছেন সেইগুলো এখন অর্থাৎ মাসখানেক আগে আমাকে পাঠালে—একটু নির্ব্বাচন করে দিতেও পারি। পৌষের যমুনা বড় ভাল হয় নি। শেষের গল্পটা সুবিধের নয়। অবশ্য এতে খরচ আপনার পড়বে (ডাক টিকিট) কিন্তু কাগজ ভাল হয়ে দাঁড়াবে। আমার এদিক্ থেকে ফেরৎ পাঠাবার খরচ আমি দেব, কিন্তু প্রবন্ধগুলি ডাকে পাঠালে আমি একটু দেখে দিই এমনি ইচ্ছে করে। আগেই বলেছি আমি সুধু গল্পই লিখিনে। সব রকমই পারি শুধু পদ্য পারিনে। আচ্ছা আপনি সৌরীনবাবুকে দিয়ে, কিম্বা উপীন, সুরেন, গিরীনকে দিয়ে 'নিরুপমা দেবী'র রচনা—কবিতা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন না কেন? তাঁর বড় ভাই বিভূতিকে বোধ করি আপনিও চেনেন। তাঁকে লিখলে নিরুপমার রচনা (রচনা না হয় কবিতা) বোধ করি পেতেও পারেন। অনেকের চেয়ে তাঁর কবিতা এবং রচনা ভাল।

আমাকে দিয়ে যতটুকু উপকার হ'তে পারে আমি তা নিশ্চয় করব। কথা দিয়েছি

সেই মত কাজও করব। সাহিত্যের মধ্যে যতটা নীচতাই প্রবেশ করুক না, এদিকে এখনও এসে পৌঁছায়নি। তা ছাড়া এ আমার পেশা নয়; আমি পেশাদার লিখিয়ে নই এবং কোন দিন হতেও চাই না।

আমি একটু কাছে থাকিতে প্যারলে আপনার সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু এদেশ আমি বোধ করি কোন মতেই ছাড়তে পারব না। আমি বেশ আছি, অনর্থক মুস্কিলের মধ্যে যেতে চাই না এবং যাবও না। আমার কথা এই পর্য্যন্ত—

আগামী বৎসর থেকে আপনি কাগজখানা যদি একটু বড় করতে পারেন, কিছু মূল্য বৃদ্ধি করে, সে চেষ্টা করবেন। প্রতি সংখ্যায় পড়বার উপযুক্ত জিনষ থাকবে এ কথা প্রকাশ করে জানাবেন। সেই জন্যেই বলি গল্পগুলো এক সংখ্যাতেই প্রকাশ করা ভাল—একটু ক্ষতি স্বীকার করেও তাতে অনেকটা advertisement এর মত হবে।

উপেন আমাকে অনেক বার লিখলে সে 'চন্দ্রনাথ' পাঠাচ্চে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পেলাম না। বোধ করি সে হাতে পাচ্চে না তাই। তবে আপনি যদি 'চন্দ্রনাথটা' ক্রমশঃ প্রকাশ করতে চান, আমি নূতন করে লিখে দেব। ভবানীপুরে সৌরীনের মুখে জিনিষটা যে কি শুনে নিয়েছি। আমার কতক মনেও পড়েচে—সুতরাং, নূতন করে লিখে দেওয়া বোধ করি শক্ত হবে না। আপনি যদি এই রকম নূতন লেখা চান আমাকে জানাবেন।...আঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রেঙ্গুন, ১২।২।১৩

প্রিয় ফণীবাবু,—এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। ১ম কথা 'বঙ্গবাসীর' ক্রোড়পত্র প্রভৃতি করে অর্থশূন্য বাজে খরচ ভাল হয় নাই। আপনি একেবারে ব্যস্ত হবেন না। আপনার কাগজের মধ্যে যদি ভাল জিনিষ থাকে দুদিনে হোক দশ দিনে হোক সে কথা আপনি প্রচার হয়ে যাবে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। আপনার কোন ভয় নেই। ক্যানভাস করে গ্রাহক জোগাড় করা ক্রোড়পত্র দিয়ে টাকা নষ্ট করার চেয়ে ঢের ভাল।.

দ্বিতীয় কথা—'রামের সুমতি' ছোট টাইপে ছাপিয়ে একেবারে বার করতে পারলেই বড় ভাল হোতো—কেন না, এ রকম ছোট ধরণের গল্প "ক্রমশঃ" বড় সুবিধে হয় না। যা হোক যখন হয়নি তার জন্যে আলোচনা বৃথা। আমি দু একদিনের মধ্যে আর একটা গল্প পাঠাব (আপনার জবাব পেলে পাঠাব), এ গল্পটা আমার বিবেচনায় 'রামের সুমতি'র চেয়ে ভাল তবে দুঃখের বিষয় এই যে প্রায় ঐ রকম বড় হয়ে পড়েচে। এত চেষ্টা করেও ছোট করা গেল না। ভবিষ্যতে চেষ্টা করে দেখি কি হয়।

৩য় কথা—'চন্দ্রনাথ' নিয়ে কি একটা বোধ করি হাঙ্গামা আছে। তাই বলি ওতে আর কাজ নেই। 'চরিত্রহীন' বার করা যাবে। অবশ্য সে জন্য কাগজ কিছু বড় করা

চাই—কিন্তু মূল্য কত এবং কবে থেকে বাড়াবেন এটা লিখবেন। দাম না বাড়ালে কিছুতেই কাগজ বড় করে গচ্ছা দেওয়া উচিত নয়।

৪র্থ কথা—সমাজপতির সঙ্গে অসদ্ভাব করবেন না এইটাই বলেচি, তাকে খোষামোদ করতে বলিনি। ফণীবাবু, আপনার দোকানের মাল যদি খাঁটি হয়, একদিন পরে হোক পাঁচ দিন পরে হোক খদ্দের জুটবে। মাল ভাল না হলে হাজার চেষ্টাতে দোকান চলবে না—দু চার দিনে হোক মাসে হোক ফেল হ'তে হবে।

আমার ছেলেবেলার ছাই-পাঁশ ছাপিয়ে আমাকে যে কত লজ্জা দেওয়া হচ্চে এবং আমার প্রতি কত অন্যায় করা হচ্চে তা আমি লিখে জানাতে পারিনে। সমাজপতি সমজদার লোক হয়ে কেমন করে যে ঐ ছাই ছাপালেন আশ্চর্য্য!

৫ম কথা—সৌরীনবাবুর সঙ্গে আপনার আজকাল মিল কেমন? তিনি আমার দিদির লেখা সমালোচনাটা দেখেছেন কি? বোধ হয় খুব রাগ করেচেন না? কিন্তু আমার দোষ কি? যিনি লিখেচেন তিনিই দায়ী। তা ছাড়া এ সব লেখা ছোট টাইপে ছেপেচেন ত?

৬ষ্ঠ—আমার নূতন গল্পটা (যেটা দু একদিনের মধ্যেই পাঠাব) কোন মাসে ছাপাবেন? চৈত্রে 'রামের সুমতি' শেষ হবে, সুতরাং সে মাসে আর কাজ নেই, বৈশাখে দেবেন। কিন্তু যাতেই দিন, ছোট টাইপে ছাপালে কম জায়গা লাগবে, অথচ গ্রাহক অনেকটা জিনিষ পড়তে পাবে।

৭ম—বৈশাখ থেকে কাগজখানি যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। ছবির পেছুনে মেলাই কতগুলো টাকা নষ্ট না করে, ঐ টাকা যাতে অন্য কোন রকমে কাগজের পিছনে লাগান যায় তাই ভাল। অবশ্য আমি জানি না, গ্রাহক ছবি চায় কি না, যদি ঐ ফ্যাসান হয় তা হলে নিশ্চয় দিতে হবে। আপনি আমাকে প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি selection-এর মধ্যে একটু স্থান দিলে এই ভাল হয় যে, আমও দেখে শুনে দিতে পারি। খাতিরে পড়ে ছাই মাটি দেওয়া কিম্বা 'নাম' দেখে ছাই মাটি দেওয়া দুই মন্দ।

৮ম—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী যদি তাঁর লেখা দয়া করে, আপনাকে দেন, সে ত নিশ্চয়ই ভাল, তাঁর কবিতা লেখবার ক্ষমতাও খুব বেশী। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর লেখা বোধ করি পাওয়া দুঃসাধ্য। তিনি ভারতীতে লেখেন আপনার এতে লিখবেন কি না বলা যায় না। লিখলেও হয় ত অশ্রদ্ধা করে যা তা লিখবেন। এঁরা সব বড় লেখিকা এঁদের হয় তো যমুনার মত ছোট কাগজে লিখতে প্রবৃত্তি হবে না। তবে একটু চেষ্টা করে দেখবেন। পাওয়া যায় ভালই না যায় সেও ভাল।

আমার তিনটে নাম।

সমালোচনা প্রবন্ধ প্রভৃতি—অনিলা দেবী।

ছোট গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টো।

বড় গল্প—অনুপমা।

সমস্তই এক নামে হলে লোকে মনে করবে, এই লোকটি ছাড়া আর বুঝি এদের কেউ নেই।

আমার এখানে একজন বন্ধু আছেন তাঁর নাম প্রফুল্ল লাহিড়ী B. A. তিনি অতি সুন্দর দার্শনিক। প্রবন্ধ লেখেন খুব ভাল, অবশ্য নাম নাই, কেন না কোন মাসিক পত্রের লেখক নন। আমি এঁকে অনুরোধ করেছি—আমাদের যমুনার জন্য লিখতে। লেখা পেলে আমি পাঠিয়ে দেব।

অসুবিধা এই যমুনা আকারে ছোট। বেশী প্রয়াস এতে চলে না। দামও কম। হঠাৎ দাম বাড়াবার চেষ্টা কি রকম সফল হবে বলা যায় না। যদি একান্তই সম্ভব না হয়, কিছুদিন পরে, অর্থাৎ আশ্বিন মাস থেকে (গ্রাহকের মত নিয়ে, এবং প্রমাণ করে যে তাঁহারা বেশী দাম দিলেও ঠকবেন না—) মূল্য এবং আকারে আরও বড় করলে কি হয় না? আপনি নিজে একটু ঢিলা লোক, কিন্তু সে রকম হলে চলবে না। রীতিমত কাজ করা চাই। আপনি যখন আর অন্য কিছু করবেন না মৎলব করেচেন, তখন এই জিনিষটাকেই একটু বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখবার চেষ্টা করবেন। এবং যাকে 'বিষয়-বুদ্ধি' বলে, তাও অবহেলা করবেন না। প্রবাসী প্রভৃতি এক সময়ে কত ছোট কাগজ এখন কত বড় হয়ে গেচে। আপনি আমাকে পুরুষ লেখকদের সমালোচনা লিখতে বলেছেন কিন্তু আমার বাঙ্গলা বই নাই। মাসিক পত্রও একটাও লই না—আমি কোথায় কি পাব যে সমালোচনা লিখব। লিখলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিশ্চয় এবং একটা বাদানুবাদ হবার উপক্রম হয়। আমি এটা জানি যদি তাই হয়, তা হলেও চিন্তার কথা কিছু নাই—আমার সমালোচনায় ভুল থাকে আর তা যদি প্রমাণ করতে পারেন (পারা শক্ত যদিও) সেও ভাল কথা।

এইখানে আমার আর একটা বলবার জিনিষ আছে। আমার পড়াশুনার কিছু ক্ষতি হচ্চে। সমস্ত সকালটা কোন দিন বা আপনার জন্য কোন দিন বা চরিত্রহীনের জন্য নষ্ট হচ্চে। রাত্রিটা অবশ্য পড়তে পাই, কিন্তু নোট করা প্রভৃতি হয়ে উঠ্চে না। আর একটা কথা আমি কয়েক দিন ধরে ভাবছি—এক একবার ইচ্ছা করে, H. Spencer-এর সমস্ত Synthetic Philo: একটা বাঙ্গলা সমালোচনা—সমালোচনা ঠিক নয়, আলোচনা—এবং ইউরোপের অন্যান্য Philosopher যাঁরা Spencer-এর শত্রু মিত্র তাঁহাদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি। আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া দ্বৈত আর অদ্বৈত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না। তাই মাঝে মাঝে এই ইচ্ছাটা হয়—কি করি বলুন

ত? যদি আপনার কাগজে স্থান না হয় (হওয়া সম্ভব নয়) অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশ করে এ রকম জোগাড় করে দিতে পারেন কি?

আপনি আমাকে সর্ব্বদা চিঠি লিখবেন। না লিখলে আমারও যেন আর তেমন চাড় থাকে না। এটাও একটা কাজ বলে মনে করবেন। লেখা Registery করেই পাঠাব। খরচ আপনি দেবেন কেন? আমার অত দৈন্য দশা নয় যে এর জন্যে খরচ নিতে হবে। এসব কথা আর লিখবেন না।

আশীর্ব্বাদ করি আপনার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক—সেই আমার পারিতোষিক হবে।

চন্দ্রনাথ আর চাইবেন না। যদি দরকার হয় আমি আবার লিখে দেব। সে লেখা ভাল বই মন্দ হবে না।

আমার তিন রকমের নাম গ্রহণ করা সম্বন্ধে আপনার মত কি? বোধ করি এতে সুবিধে হবে। এক নামে বেশী লেখা ভাল নয়, না?

উপেন কি বলে? সে ত চিঠি পত্র লেখবার লোক নয়। সে থাকলে ঢের সুবিধে ছিল—না থাকে বোধ করি বেশ অসুবিধে হচ্চে। সে লোকটার আপনার প্রতি ভারী স্নেহ ছিল—যদি তার নিকট থেকে কাজ আদায় করতে পারেন সে চেষ্টা ছাড়বেন না।

যাই হোক আর যেমনই হোক ব্যস্তও হবেন না, চিন্তিতও হবেন না। আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিম্বা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব এমন কথা কোন দিন মনেও করবেন না।···আমার সমস্তটাই দোষে ভরা নয়।

আপনি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে চিঠিতে লিখতেন—অন্য কাগজওয়ালারা আমাকে অনুরোধ করবে। করলেই বা, charity begins at home, সত্যি না? একটু শীঘ্র জবাব দেবেন। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি শরৎচন্দ্র চট্টো।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাদপূরণে

(এক)

পথের বাধা যতই হ'ল দূর
রথের চাকা ততই নাহি চলে;
মনে যতই ঘনিয়ে উঠে সুর
কণ্ঠ ততই রুদ্ধ নয়ন-জলে।

(দুই)

স্বর্গের অমৃতধারা বন্দী হয়ে আছে আজো সঙ্গীতে ও সুরে,
মাটির বন্ধন ছেড়ে তাই মোরা যেতে পারি দূরে—বহু দূরে।

বিরূপাক্ষের ঝঞ্চাট

জিনিস কেনার দিক্‌দারি

শুনেছেন?—ক্ষেন্তি, খেঁদি আর পটকা তিনটেতেই নীচু ক্লাসে বেশ পটপট ক'রে পাস ক'রে গেছে। কিন্তু ফলে হয়েছে কি? এদের জ্বালায় যে ভাল ক'রে একটু পাশ ফিরে ঘুমুব তার জো নেই।

দিনরাত তাগাদা—আমাদের বই কিনে দাও, সব্বার বই কেনা হয়ে গেছে, আমাদেরই কেনা হ'ল না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যত বলি, ওরে বাবা, থাম্। মাইনে পাই, তবে তো দোব? তা কে বা শোনে কার কথা! আর তেমনই অবুঝ ওদের মা। এরা যদি একগুণ বলে, তিনি পাঁচগুণ ব'কে যাবেন।

কেন, ওদের ক খানা বই কেনবার আর তোমার পয়সা নেই? জান তো, ওরা এবার ক্লাসে উঠবে, আগে থেকে একটা তার হিসেব থাকে না?

বুঝুন। গাধাবোট টেনে নিয়ে চলেছি; এর ওপর যদি আবার ডিঙ্গি-নৌকোগুলোকে একসঙ্গে টানতে না পারি, তা হ'লেও সে আমার দোষ! আমি বে-হিসেবী! কিন্তু এটুকু বোঝেন না যে, আর হিসেবের কিছু নেই, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ধার চাইতে শুরু করেছি, তাঁরা আমাকে দেখে এখন পালাতে শুরু করেছেন। কিন্তু কি বলব বলুন? তর্ক করা মানে তো আরও হাঙ্গামা বাধানো।

সুরটা বেশ নরম ক'রেই বললুম, আহা, বই নয় দুদিন পরেই আসবে, এখন তো ছুটি আছে, এক্ষুনি তো আর পড়তে বসছে না?

তার স-জোর উত্তর এল, হ্যাঁ, পড়বে। ইস্কুল খুললে ওরা পড়বার সময় পায়? এখন থেকে পড়লে, তবে তো ওরা একটু পড়াশোনা এগিয়ে রাখতে পারে।

শুনলেন? ইস্কুল খুললে ছেলেপুলেদের পড়াশোনা হয় না, ইস্কুল বন্ধ থাকলে তবু কিছু হয়! তবু ইস্কুল যেতে হবে, আর আমি বেটা মাইনে, পাংখা-ফী, কিৎ-কিৎ-ফী এইসব বছর-ভোর গুনে যাব! কি ঝঞ্চাট বলুন তো?

আমি জানি, আমার ছেলেপুলের কিছু হবে না। কারণ, তাদের বাপের যে কিছু হয় নি। কিন্তু আমার গিন্নীর ধারণা, ঠিক তার উল্টো। তাঁর কল্পনায় ছেলেরা আইনষ্টাইন, আর মেয়েরা ম্যাডাম কুরী হ'য়ে ব'সে আছে। অথচ তাদের রিপোর্টে লিখছে—অঙ্কয় এগারো, বিজ্ঞানে জিরো!

এসব বোঝাই কাকে? বোঝাতে গেলেই তো আমার ওপর চাপ পড়বে উল্টে, কেন, নিজের ছেলেপুলেদের সকাল-বিকেল একটু দেখতে পার না? সব্বাই দেখে।

সব্বাই যে এত রকম বায়নাক্কা সামলে কি ক'রে এত দেখে, সেটা তো আমার মাথায়

আজ পর্য্যন্ত ঢুকল না মশাই! আপনারা সত্যিই মহাপুরুষ লোক। দয়া ক'রে খামে একটু পায়ের ধূলো ভ'রে পাঠিয়ে দেবেন, তাই ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে তার ওপর একটু গড়াগড়ি খাব। উঃ, জ্বালাতন!

যাক্‌গে, ধুত্তোর ব'লে গোটা বারো টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম এদের বই কিনতে, কিন্তু দোকানে গিয়ে দেখলুম, সব্বাই অন্তত একসঙ্গে বই কিনতে বেরিয়ে পড়েছেন বটে। উঃ, কি ভিড়!

মনে হ'ল, সমস্ত বাংলা দেশ একসঙ্গে পণ্ডিত হবার সঙ্কল্প ক'রে বসেছে। বই যে কিনতে পারব তার ভরসা নেই।

কলেজ ষ্ট্রীট থেকে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত, বেলা সাড়ে দশটা থেকে রাত সাড়ে আটটা অবধি ঘুরলে তবে যদি কিছু পাওয়া যায়—তাও অর্দ্ধেক বই ছাপা নেই, নয় কিছু ছাপা হচ্ছে, এগজামিনের কাছ-বরাবর বেরুবে। দু-চারখানা যাও বা ছিল, তাও আবার আমার মাথা খেতে অপর লোকের বাবারা কিনে নিয়ে গেছে। আমার মাথায় বজ্রাঘাত আর কি!

আপিস থেকে খেঁদী-পটকার বই কেনবার জন্যে একদিন ছুটি নিলুম মশাই, কিন্তু তাও সব পেলুম না, মাঝ থেকে বইয়ের দোকানের কয়েকটি বাবুর মুখ-ঝামটা খেয়ে মলুম।

ছোট ক্লাসের বই অর্দ্ধেক দোকানে চাওয়া যেন অপরাধ! যেন যারা চাইছে তারাও ছোটলোক! কি মুশকিল বলুন তো?

একজন খিঁচিয়ে উঠলেন, হবে না, হবে না মশাই, এখানে ওসব বইয়ের জন্যে এসেছেন কেন? এখানে পাঠশালার বই পাওয়া যায় না।

যাক, বেরিয়ে প'ড়ে পাশের দোকানে গেলুম। সেখানে দেখি, দু-একজন নীচু ক্লাসের বই কিনেছেন। দেখে ভরসা হ'ল, তাই ভিড়ের ভেতর থেকে অপরাধের মধ্যে দোকানীর দৃষ্টি আকর্ষণের অভিপ্রায়ে একটু জোরে জিজ্ঞাসা করেছি, হ্যাঁ মশাই, পঞ্চম মানের গোবর চক্রবর্ত্তী প্রণীত স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে?

তিনবার ডাকে তিনি সাড়া দিলেন না, আর আমিও সমানে মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে, হ্যাঁ মশাই, গোবর চক্রবর্ত্তীর স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে?—আউড়ে যেতে লাগলুম।

অতবার বলাতে তিনি দয়া ক'রে একবার আমার মুখের দিকে এমনভাবে চাইলেন যে, পেটরোগা লোক হ'লে আমার স্বাস্থ্য তখুনি খারাপ হবার সম্ভাবনা ছিল।

আমি আকৃতি দেখেই সুরটা নরম ক'রে তাঁর চোখের দিকে চোখ রেখে আর একবার গোবর চক্রবর্ত্তীর খোঁজ নিতেই তিনি হুঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন, চেঁচাবেন না।

তবু বলতে পারলেন না, বইটা আছে কি নেই। একটু রাগ হ'ল, বললুম, সাধ ক'রে কি চেঁচাই মশাই? আপনি যে কোন কথাই বলছেন না!

তিনি আরও ক্ষেপে গেলেন, ব'লে উঠলেন, সাড়া দোব কি ? আমি দাঁড়িয়ে খেলা করছি ? দেখছেন, আর পাঁচজনের বই দেখছি। আপনি যেন একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছেন ! অত তাড়া থাকে তো অপর দোকানে যান। খদ্দের যারা আগে এসেছে তাদের তো আগে দোব, না কি ?

নিন। আমি যেন সব্বার আগেই সেটা আমাকে দিতে বলেছি ?

তবু তিনি কৃপা ক'রে একবারটিও বললেন না যে, বইখানা তাঁর দোকানে কোনমতে পাওয়া যাবে কি না ! দেখলুম, ছ আনার বই কিনতে এসে এখন ছ শো কথার সৃষ্টি হবে। বিরক্ত হয়ে দোকান থেকে চ'লে যেতে যাব, ঠিক এমনই সময় একটি তরুণীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, শিশুদের নব-ধারাপাত পাওয়া যাবে ?

দোকানী তড়িৎস্পৃষ্টের মত লাফিয়ে ব'লে উঠল, আজ্ঞে যাবে। গোবিন্দ, একখানা নব-ধারাপাত আগে দাও। আমার সঙ্গে এতক্ষণ যে দোকানী কথা কচ্ছিল, এ যেন সে লোকই নয়, তার কণ্ঠে মধুর স্বর, চোখের চাহনি—আহা, সেও কি চমৎকার !

গোবিন্দ দূরে একটা মইয়ের ওপর চ'ড়ে কার বই বাছছিল, সে পেছন ফিরে না দেখেই উত্তর দিলে, একটু দাঁড়াতে হবে।

আর যায় কোথা ? দোকানী চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, ওসব রেখে দাও। আগে নব-ধারাপাত নিয়ে এস। ব'লেই একেবারে গলার স্বরটা, তাঁর গলায় যতটা মিষ্টি হয়, সেইভাবে তরুণীর দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আর কি দোব বলুন ?

তরুণীটি মৃদু হেসে বললেন, আর কিছু নয়, কত দাম ? তিনি বললেন, আজ্ঞে ছ পয়সা। বলতেই তরুণীটি একখানি দশ টাকার নোট বার ক'রে তাঁর হাতে দিলেন। তিনি তখন তার ভাঙানি কি ক'রে দেবেন, তারই আয়োজনে টেবিলের ওপর ক্যাশ-বাক্স উপুড় ক'রে ফেলেছেন।

আমার আর সেখানে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হ'ল না, মনে হ'ল, ছেলে-মেয়েরা পারে নিজেরা এসে বই কিনে নিক, আমার আর দরকার নেই।

আপনারা হয়তো বলবেন, মেয়েদের ওপর তোমার অকারণ এরকম হিংসে কেন ?

তার উত্তরে আমি বলব যে, হিংসে আমার কারুর ওপর নেই মশাই, সামান্য একটু মাছ-মাংসের ওপর ছিল, তাও তিন টাকা চার টাকা সের হওয়ার পর থেকে ঘুচে গেছে, এখন আমি সম্পূর্ণ নিরামিষ ও অহিংস। তবে কি জানেন, এ-যুগে মেয়েদের যখন সমান অধিকার, তখন আমাদের অধিকারে হাত পড়লে একটু লাগে বইকি।

এই দেখুন না কেন, বছর দুয়েক আগে একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকে প্রায় ষাট-বাষট্টি টাকার কাপড় কিনতে গেলুম, পছন্দমত কাপড় দিতে দোকানীর যেন বিরক্তি। দুটো গাঁটরি নামিয়ে দুখানার দর জিজ্ঞেস করেছি, তাতে বলে, আগে বাছুন না, তারপর

দর বলব'খন। কিছুতেই তিনি বুঝবেন না যে, দরের সঙ্গে পছন্দর সম্পর্কটা কতখানি। তা নয়, বোঝেন সবই, কিন্তু ভালমাফিক আমার পছন্দর ওপর তবে তো কোপ দেবেন, এই আর কি।

যাই হোক, অতি বিরক্তির সঙ্গে তিনি অন্যমনস্কভাবে আমাকে কাপড় দেখাতে লাগলেন, ঠিক এমনই সময় একটি মেয়ে এসে দোকানে ঢুকতে দোকান শুদ্ধ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়লেন। কি চাই? না, সিল্কের ফিতে।

তিনি দোকানের সমস্ত সিল্কের ফিতে আধ ঘণ্টা ধ'রে পরীক্ষা ক'রে আনা ছয়েক দিয়ে এক গজ নিয়ে গেলেন। আমি হাঁ ক'রে ব'সে, কারণ আমাকে দেখবার জন্যে আর আগ্রহ কার? আধ ঘণ্টা পরে আমার জিনিস-বিক্রেতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এসে আমার কাছে পুনরায় ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন, এইবার বলুন, আপনার কি চাই?

সেই থেকে আমি জানি যে, কাপড়ের দোকানে আমাদের না ঢোকাই ভাল, কিন্তু বইয়ের দোকানেও দেখি তাই। শেষে বিরক্ত হ'য়ে চ'লে গেলুম এক মনিহারির দোকানে। মেজবউমা তাঁর খোকার জন্যে একটা মোজা কিনে নিয়ে যেতে বলেছিলেন, তাই কিনে নিয়েই বাড়ি ফেরবার ইচ্ছে হ'ল। গেলুম একটি দোকানে। দেখলুম, ভিড় নেই। মনটা বেশ খুশি হ'ল, কিন্তু আমার বরাত তো! সেখানেও ঠায় পনরো মিনিট দাঁড়িয়ে। দোকানী তাঁর কোন আলাপী লোকের সঙ্গে কথা কইছেন, খদ্দের যে একজন দাঁড়িয়ে, সে হুঁশই নেই। বহুক্ষণ পরে পাশের দিকে একটু ঘাড় ফিরিয়ে তিনি দয়া ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কি চাই?

বললুম, একজোড়া ছোট ছেলের মোজা হবে?

ছোট ছেলের মোজা শুনে তিনি যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে নেহাত খদ্দেরকে ফিরিয়ে দেবেন এই ভাব দেখিয়ে একটি বদ্দি মাল আমার হাতে দিলেন।

অপরাধের মধ্যে আমি বলেছি, এঃ, এগুলো যে বড্ড ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে!

বলতে না বলতে সেগুলি বাক্স বন্দী হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, যেখানে ভাল পান দেখুন। পুনরায় তিনি তাঁর পরিচিত ব্যক্তিটির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন।

আমি তো হতভম্ব! ভাবলুম, একই দোকানীর ভায়রাভাই শহরের সর্ব্বত্র দোকান খুলে ব'সে আছে, নিজের দেশের লোকের কাছ থেকে রীতিমত পয়সা খরচ ক'রে নির্ব্বিবাদে জিনিস কিনব তারও জো নেই—সেখানেও দেখুন, কি ঝঞ্ঝাট!*

"বিরূপাক্ষ"

---

* রেডিওতে পঠিত এই "ঝঞ্ঝাট"গুলি ধারাবাহিকভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইতেছে।

পদচিহ্ন

(জনপদ)

এগারো

রাধাকান্ত ছাদ থেকে যে দৃশ্য দেখলেন, গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ পিঁপড়ের সারির মত প্রান্তর এবং ক্ষেত্তের মধ্য দিয়ে পায়ে পায়ে নতুন পথ রচনা ক'রে গোপীচন্দ্রের ইটখোলা এবং ইস্কুল-ইমারতের কাজে আসছে, সে দৃশ্য স্বর্ণবাবুও দেখলেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন গ্রামপ্রান্তে তাঁর কলমের আমবাগানের মধ্যে। কলমের গাছের শাখাপল্লবের আড়াল পড়ায় দেখতে অসুবিধা অনুভব করলেন তিনি। বাগান থেকে বেরিয়ে এসে স্বর্ণবাবু খোলা মাঠের উপর দাঁড়ালেন।

এত লোক? এত লোক কত কাজ করছে? কি এত কাজ? গুড়ের সন্ধান পেয়ে চারিদিকের গর্ত্ত থেকে পিঁপড়ে ছুটে আসে। কিন্তু গুড়ের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের সংখ্যার তারতম্য হয়। এক ফোঁটা গুড় পড়লে, পিঁপড়ে খুব বেশি আসে না। গুড়ের হাঁড়ি ভেঙে গেলে, এক বেলার মধ্যেই উঠোন ভ'রে যায় অসংখ্য পিঁপড়েতে। বোলতা আসে, আরও অনেক পোকা আসে। একটা ইস্কুলের ইমারত, এক ফোঁটা গুড়ের চেয়ে আর কত বেশি? বাঁ হাতে গোঁফে এবং ডান হাতে টিকিতে পাক দিতে শুরু করলেন স্বর্ণবাবু। নিশ্চয়ই অনেক কিছু আয়োজন করছেন গোপীচন্দ্র। কি করছেন, সেটা জানাব প্রয়োজন হয়েছে তাঁর। গ্রামের উন্নতি, দেশের উপকার, কীর্ত্তিতে অনুরাগ, যে যাই বলুক, স্বর্ণবাবু জানেন, গোপীচন্দ্রের সকল আয়োজন, তাঁর প্রতিষ্ঠা তাঁর সম্মানকে ক্ষুণ্ণ ক'রে খর্ব্ব করে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জ্জনের জন্য। স্বর্ণবাবুর পক্ষে এ এক রকম জীবনমরণ-সমস্যা। একরকম কেন, একেবারে সঠিক, স্থির।

তিনি ডাকলেন মালীকে, তিতুয়া! সহিসকে টমটম জুততে বল।

* * *

নবগ্রামের বাজারের মধ্য দিয়ে চ'লে গিয়েছে পাকা সড়ক, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা পাকা সড়ক জেলার সদর-শহর থেকে বেরিয়ে এ জেলা অতিক্রম ক'রে পূর্ব্বদিকে অন্য জেলায় গিয়ে ঢুকেছে। গিয়ে থেমেছে গঙ্গার, তটভূমি, প্রাচীন-কালের প্রসিদ্ধ একটি বন্দরতুল্য স্থানে। স্বর্ণবাবুর টমটম বাজারের পাকা সড়কে এসে পশ্চিমমুখে মোড় ফিরল।

---

* আমি জানিতাম না যে 'জনপদ' আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই ঐ নামে একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। প্রধানত সেই কারণে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'পদচিহ্ন' নাম রাখিলাম।

বাজারে বিকিকিনি শুরু হয়েছে। দোকানগুলির সামনে খরিদ্দারেরা দাঁড়িয়ে আছে। পথে লোক চলছে। স্বর্ণবাবুর টমটম দেখে দোকানীরা দোকানের বারান্দার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালে। খরিদ্দারেরাও অধিকাংশ স্থানীয় লোক, তারাও ঘুরে দাঁড়িয়ে ঈষৎ হেঁট হয়ে নমস্কার করলে। পথের লোকেরা নমস্কার ক'রে পথ ছেড়ে একপাশে দাঁড়াল। স্মিতমুখে স্বর্ণবাবু মাথা নুইয়ে প্রত্যভিবাদন জানালেন।

হাজার হ'লেও নবগ্রাম শহর নয়; বাজারের পথের পাশে যাদের বাড়ি, তাদের মেয়েরা পথে বের হয়; মেয়েরা ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

এ সম্মান স্বর্ণবাবুর পৈতৃক। তিনি এ সম্মানকে জন্মগত ভাগ্যফল ব'লে জানেন। গ্রামে আরও বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি আছেন, তাঁরাও জমিদার; প্রাচীন সরকার-বংশের মধ্যে অবস্থাশালী বংশলোচন আছেন; রাধাকান্তের জাঠতুতো ভাই শ্যামাকান্ত আছেন, সম্পদ এবং সম্পত্তির দিক দিয়ে তিনি স্বর্ণবাবুর চেয়েও সমৃদ্ধিসম্পন্ন; রাধাকান্ত আছেন, তিনি অবশ্য জমিদার নন, জোতজমাসম্পন্ন গৃহস্থ তবু তাঁরও সম্মান আছে; কিন্তু প্রতিষ্ঠায় তাঁর সমকক্ষ কেউ নন, এবং গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা এই ভাবে প্রণাম জানিয়ে সকলকে সম্মান জানালেও, তাঁর ধারণা, তাঁকে যতখানি হেঁট হয়ে তারা প্রণাম জানায়, অন্য কাউকে ততখানি নত হয়ে প্রণাম জানায় না। এই শ্রেষ্ঠ প্রণাম কেড়ে নেবার জন্য গোপীচন্দ্র আয়োজন করছেন। এ তাঁর জীবনমরণ-সমস্যা। এ সম্মান হানি হওয়ার চেয়ে, সত্য সত্যই মৃত্যু শ্রেয়। কানের দুই পাশ তাঁর গরম হয়ে উঠল, ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ঘোড়াটা বেশ দ্রুতগতিতেই চলছিল, তবু স্বর্ণবাবু মনের অধীরতায় চাবুকটা তুলে নিয়ে সপাসপ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন ঘোড়াটার পিঠে। লাফিয়ে উঠে ঘোড়াটা দুলকি চাল ছেড়ে ছাউকে লাফিয়ে চলতে লাগল। স্বর্ণবাবু ক'ষে লাগাম টেনে ধরলেন দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ ক'রে, নিষ্ঠুর আনন্দে। দুর্দান্ত জানোয়ারটাকে বাগ মানিয়ে মন তাঁর ঈষৎ তৃপ্ত হ'ল, সুস্থ হ'ল।

বাজার পার হয়ে সড়কটা চ'লে গিয়েছে। প্রথমেই খানিকটা ধানক্ষেত দু ধারে। তারপর একটা মজা দিঘির বুকের মধ্যে দিয়ে। দিঘিটার সীমানা পার হয়ে ওই উষর প্রান্তর, যে প্রান্তরে গোপীচন্দ্র ইস্কুল প্রতিষ্ঠার আয়োজন করছেন।

মজা দিঘিটার মুখে এসেই তিনি ঘোড়ার রাশ টেনে ধ'রে ঠোঁটে শব্দ ক'রে থামবার ইঙ্গিত করলেন। পিছন থেকে সহিসটা ছুটে এসে ঘোড়াটার সামনে দাঁড়াল, ঘাড়ে আদর ক'রে দুটো চাপড় দিয়ে মুখে হাত বুলিয়ে দিলে।

এখানে মজুর জমায়েৎ হয়েছে অনেক। পাকা সড়কটা থেকে একটা নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে। মজা দিঘিটার মাঝামাঝি চ'লে গিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক; এই

সড়কটাকে ধনুকের জ্যায়ের মত রেখে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেঁকিয়ে ধনুকের দণ্ডের মত নতুন সড়কটা তৈরি হচ্ছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ারও দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

স্বর্ণবাবুর বিষয়বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। অনুমানে তিনি বুঝে নিলেন ব্যাপারটা। মজা দিঘিটা গোপীচন্দ্রের সম্পত্তি। মজা পুকুরটাকে কাটিয়ে পঙ্কোদ্ধার করার পথে একমাত্র বাধা দিঘির মাঝের এই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক। দিঘিটায় জলকর পাশে রেখে সড়কটাকে এই ভাবে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেঁকিয়ে দিতে পারলে, সে বাধা থাকবে না।

গাড়িটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বর্ণবাবু এক হাতে ঘোড়ার রাশ ধ'রে, অন্য হাতে গোঁফে তা দিতে আরম্ভ করলেন। একজন মজুরকে বললেন, এরে, এই! ওভারসিয়ার-বাবুকে ডাক্ তো।

মজুরেরা প্রায় সকলেই কাজ বন্ধ ক'রে সভয় সম্ভ্রমে স্বর্ণবাবুকে দেখছে; মজুর-মেয়েদের চোখে অপরূপ বিস্ময় ফুটে উঠেছে। এটুকু স্বর্ণবাবুর বড় ভাল লাগে।

ওভারসিয়ারবাবু এগিয়ে এলেন। স্বর্ণবাবুকে তিনি চেনেন। তাঁর দায়িত্ব এই রাস্তা-মেরামতের কাজের জন্য তাঁকে স্বর্ণবাবুর মত বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিদের চিনতে হয়; তাঁদের সহায়তা ভিন্ন মজুর এবং গরুর গাড়ির সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না।

ধন্য দেশ! এ দেশকে ওভারসিয়ারবাবু ধন্য ধন্য করেন। বিংশ শতাব্দী নাকি পৃথিবীতে কলকারখানার যুগ। দুনিয়া ভ'রে গেল কলে আর মজুরে। কিন্তু এই উনিশ শো ছ সালে এ দেশে লোকে চাষ ছাড়া অন্য কিছুতে মজুর খাটবে না; তাও চালের মন পাঁচ সিকে থেকে দু টাকা। টাকায় তেরো সের চাল, অর্থাৎ তিন টাকা মণ হ'লে, দেশে আকাড়া অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হয়েছে ব'লে হাহাকার ওঠে; চাষ ছাড়া মানুষ কিছু বুঝে না। চাষের কাজে স্থায়ী কৃষাণ জীবিকা যাদের নাই, তারা শ্রমিক হিসেবে ওই চাষেই খাটে। আর আছে বছরে একবার খ'ড়ো ঘরের চাল ছাওয়ানোর কাজ। তাও তারা আপন আপন গ্রামের মধ্যেই মজুর-খাটার গণ্ডি সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে চায়। কেবল স্বর্ণবাবুর মত ব্যক্তিদের হুকুমে, গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে আসতে বাধ্য হয়। কারণ তাঁরা জমিদার; জমিদারদের হুকুম অমান্য করতে নাই, এইটাই চলিত শিক্ষা, এবং অমান্য করবার মত সাহস, সাহস দূরের কথা কল্পনাও, তারা করতে পারে না। তা' ছাড়া নিজেদের গ্রামের গৃহস্থদের চাপ থেকে, অত্যাচার অবিচার থেকে বাঁচবার একমাত্র আশ্রয়স্থল এই জমিদার। তাই ওভারসিয়ারবাবুর রাস্তা-মেরামতের কাজের প্রয়োজন হ'লে, ঠিকাদারকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হয় এঁদের কাছে। স্বর্ণবাবুর কাছে প্রতিবৎসরই তিনি আসেন। ঠিকাদার কখনও সদর শহর থেকে ভাল তামাক এনে দেয়, কখনও আনে গড়গড়া-ফুরসির নল, তাওয়াদার কলকে কখনও আনে মোরব্বা, মনই অল্পস্বল্প উপঢৌকন। এ ছাড়া বছরে লাগে একটা খাওয়া-দাওয়ার খরচ—একটা পাঁঠা,

পোলাওয়ের চাল, ঘি, মিষ্টি। নুন তেল মসলার খরচ দিতে চাইলেও স্বর্ণবাবু প্রত্যাখ্যান করেন, ওগুলো ছোট জিনিস। আর লাগে 'কারণ', অর্থাৎ মদ। ওভারসিয়ারবাবুরাও এ প্রীতিভোজনে নিমন্ত্রণ পান। সেসব এক একটা মাইফেলি, অর্থাৎ মহফিলের কাণ্ড।

ওভারসিয়ারবাবু একটু চিন্তিত হয়েই এগিয়ে এলেন। এবার লোকজনের সাহায্যের জন্য স্বর্ণবাবুর কাছে তিনি যান নাই। প্রয়োজনও হয় নাই, অবকাশও ছিল না। কিন্তু না-যাওয়াটা অন্যায় হয়েছে। এতকাল পর্যন্ত স্বর্ণবাবুই এ বিষয়ে সাহায্য ক'রে এসেছেন, সে হিসেবে এটা তাঁর অকৃতজ্ঞতার কাজ হয়েছে। নৈতিক অপরাধ অন্যায় চুলোয় যাক, তাঁর পক্ষে এটা বিপদের কথা। স্বর্ণবাবুরা যত উদার, তত ভয়ঙ্কর। এঁদের দ্বারস্থ হ'লে এঁরা মাথায় করেন, কিন্তু দ্বারস্থ না হয়ে দরজার সামনের রাস্তা দিয়ে চ'লে গেলে ধ'রে এনে লাথি মারেন। তিনি তো সামান্য ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ার, পুলিসের দারোগা পর্যন্ত এ বিষয়ে সাবধান হয়ে চলেন। বেশি দিনের কথা নয়, মাস কয়েক আগে স্বর্ণবাবুদের শ্রেণীর এক জমিদারের হাতে এই নবগ্রাম থানার দারোগার লাঞ্ছনার কথা মনে পড়ল। দারোগাবাবু এক ফেরারী আসামীর সন্ধানে দূর পল্লী-অঞ্চলে যাচ্ছিলেন। পথে পড়ে ওই জমিদার-বাড়ির দেউড়ি। দেউড়ি মানে পলকা কাঠের আগড়। জমিদার খুব উল্লাস প্রকাশ ক'রে দারোগাকে আহ্বান করলেন। ফেরারী আসামী পালিয়ে যেতে পারে আশঙ্কায় ব্যস্ত দারোগাবাবু সে আহ্বান না রেখেই চ'লে যান। ফলে আসামী তো ধরা পড়লই না, উপরন্তু দারোগাবাবু নাজেহাল হয়ে যখন ফিরলেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। দারোগা ফেরার পথে সরল বিশ্বাসে আশ্রয় নিলেন ওই জমিদারের বাড়িতেই। জমিদার খাওয়ালেন প্রচুর—মদ্য মাংস মৎস্য পোলাও ইত্যাদি এবং শীতের রাত্রে পাকা-মেঝে ঘরের মধ্যে পুরু বিছানা পেতে শোওয়ার ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন। ক্লান্ত দারোগা এবং তাঁর সিপাহীরা শীতের রাত্রে বেশ আরামেই ঘুমুচ্ছিলেন। কিন্তু মধ্যরাত্রে প্রচণ্ড শীত বোধ হওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন, বিছানাপত্র সব ভিজে সপসপে হয়ে উঠেছে। ঘর অন্ধকার, আলোটা কখন তেলের অভাবে নিবে গিয়েছে। দেশলাই জ্বেলে দেখলেন, ঘরের মেঝেতে জল। ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, জল নির্গমের নর্দমার মুখও বন্ধ; জানলার একখানা পাল্লায় ছিদ্র করে একটা টিনের নল পরিয়ে কেউ বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে জল ঢালছে। ভদ্রলোক দরজায় ধাক্কাধাক্কি ক'রে চীৎকার আরম্ভ করলেন। কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিলে না। ভদ্রলোককে সমস্ত রাত্রি ঘরের কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েই কাটাতে হয়েছিল। সকালে জমিদারবাবু ফেরারী আসামীটিকে দারোগার হাতে সমর্পণ ক'রে বললেন, দিনের বেলা যখন আমি বলেছিলাম, তখুনি যদি কষ্ট ক'রে এইখানে উঠতেন, তবে ব্যাটাকে কালই ধ'রে এনে দিতাম। রাত্রেও

আপনাকে এত কষ্ট পেতে হ'ত না। নিয়ে যান ব্যাটাকে। লোকটাকে বললেন, যা ব্যাটা, ঘুরে আয় দিন কতক। তোর ছেলেপুলে পরিবার রইল, আমি রইলাম। তারপর দারোগা-সিপাহীদের আবার একবার সদ্দির ওষুধ খাইয়ে শরীর তাজা ক'রে বিদায় দিয়েছিলেন।

মাত্রাতিরিক্ত বিনয়সহকারে নমস্কার ক'রে গভীর সসম্ভ্রম প্রীতি ব্যক্ত করবার চেষ্টা ক'রে ওভারসিয়ারবাবু বললেন, ভাল আছেন ?

প্রতিনমস্কারে স্বর্ণবাবু মাথাটা একটু নোয়ালেন মাত্র। গোঁফে তা দিতে দিতেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার ? কি হচ্ছে এসব ?

আজ্ঞে, রাস্তা।

হ্যাঁ, রাস্তা তো বটেই। কিন্তু পাশেই যেন ঘাট হবার আয়োজন হচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে ?

ওভারসিয়ার কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না, তিনি হাসতে লাগলেন ; এমন রসিকজনোচিত উক্তি যেন তিনি এর পূর্ব্বে আর কখনও শোনেন নাই।

স্বর্ণবাবু প্রশ্ন করলেন, রাস্তাটা যাবে কোথায় ? স্বর্গে, না নরকে ?

আজ্ঞে, সড়কটাকে বেঁকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানে—

মানে, গোপীবাবু মজা দিঘিটা কাটাবেন. তাঁর সুবিধার জন্য দিঘির মাঝখানের রাস্তার অংশটা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে রাস্তাটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আজ্ঞে, গোপীবাবুই সমস্ত খরচ বহন করছেন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেও রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য—

কত ? কত টাকা দিয়েছেন ? দানই বা কত, দক্ষিণাই বা কত ? মানে আপনারা কে কি পেলেন ?

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না স্বর্ণবাবু, হাতের ঝাঁকিতে ঘোড়ার পিঠে রাশের আছাড় দিয়ে চলবার ইঙ্গিত জানালেন। গাড়ি ছুটল।

ক্ষোভে দাঁতের উপর দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন ওভারসিয়ারবাবু। তারপর হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি মজুরদের উপর।—হারামজাদা ব্যাটারা, ছুঁচো শুয়োরের দল, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছে সব ! ঠাকুর উঠেছে যেন ! এতেও তাঁর ক্ষোভের নিবৃত্তি হ'ল না, সকলের চেয়ে কাছে ছিল যে লোকটা, তার গালে তিনি বসিয়ে দিলেন এক চড়। —চালাও, কাম চালাও, শালা, শূয়ারকি বাচ্চা। চালাও। দশ পয়সা মজুরি, চৌদ্দ পয়সা হয়েছে, তবু ফাঁকি, তবু ফাঁকি ?

• • • •

গোপীচন্দ্র দশ পয়সা মজুরির রেট বাড়িয়ে চৌদ্দ পয়সা করেছেন। গ্রামে গ্রামে

লোক পাঠিয়ে তিনি দীন-দরিদ্রদের দৈনন্দিন জীবনের চার পয়সা মূল্যবৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন। জমিদারের প্রতিষ্ঠা এখনও তিনি অর্জ্জন করতে পারেন নাই; নিজে ব্যবসায়ী ব্যক্তি, কয়লার খনির মালিক, শুধু মালিকই নন, খনির সামান্য কাজ থেকে সকল কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে, এককালে চাষ-জীবিকা ছাড়িয়ে সাঁওতাল ও বাউড়ীদের পয়সার খেলা দেখিয়ে কি ভাবে খনির কাজে আনতে হয় তাও তিনি জানেন, তাই তিনি পাইক পেয়াদা পাগড়ি লাঠি উপেক্ষা ক'রে চার পয়সার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। এর ফল যে সুদূরপ্রসারী, তাও তিনি জানেন। প্রয়োজন হয় চৌদ্দ পয়সাকে চার আনা করবেন তিনি।

ইট-পাড়াইয়েই রেট বাড়িয়েছেন দু আনা। ভাটা-সাজাইয়ের রেটও বেড়েছে। গাড়ির ভাড়া, তাও বাড়িয়েছেন। দু পয়সা থেকে দু আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। রাজমিস্ত্রীর মাইনে বেড়েছে একেবারে চার আনা—ছ আনা থেকে দশ আনা। আবার মুরশিদাবাদ বেলডাঙ্গা থেকে রাজমিস্ত্রী আসছে, তাদের মাইনে বারো আনা।

গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মজুরেরা এসেছে দলে দলে। এ অঞ্চলের মধ্যে জনপদতুল্য গ্রাম—নবগ্রাম। জমিদার এইখানে বাস করেন—স্বর্ণবাবু, শ্যামাকান্তবাবু, সরকার-বংশীয় বংশলোচনবাবু এবং আরও ছোটখাটো কয়েকজন; তাঁদের বাড়িতে তারা পালে-পার্ব্বণে বেগার দিতে আসে, উৎসবে সমারোহে রবাহূত এসে উৎসবক্ষেত্রের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করে উৎসবের আনন্দ, জমিদারের নির্দ্দেশমত প্রয়োজনে মজুর খাটতেও আসে; এইখানেই অর্থশালীদের বাস, তাঁরাই মহাজন, তাঁদের কাছে অল্পস্বল্প প্রয়োজনে যেতে পারে না, যায় তাঁদের অন্দরের দরজায়, বাড়ির মেয়েরা এসব 'পেটী' মহাজনি করেন, থালা ঘটি বন্ধক রেখে টাকা ধার দেন, সুদ টাকায় মাসিক দু পয়সা থেকে চার পয়সা, অনেক ক্ষেত্রে নেপথ্যে গাই গরু বন্ধক দেয়, অর্থাৎ গরু থাকে খাতকের বাড়িতেই, সেই খাওয়ায় পালন করে, সুদ বাবদ দুধের একটা অংশ দিতে হয়, গাই যখন দুধ বন্ধ করে তখন সুদ চলে পয়সার চাকায়; এই নবগ্রামেই এ অঞ্চলের বাজার-হাট, এখানে তারা কাপড় কিনতে আসে, হাটে ঘরের তরিতরকারি বেচতে আসে, মসলাপাতি কিনে নিয়ে যায়; দেশে আকাড়া হ'লে তারা এখানে প্রসাদের জন্য আসে; রোগে অথবা বয়সে যারা জীর্ণ হয় তারা এখানে নিত্য আসে ভিক্ষার জন্য, উচ্ছিষ্টের জন্য। কিন্তু এমন ভাবে চারিদিকের গ্রাম থেকে সকলে একসঙ্গে কখনও এই ভাবের মজুরি খাটতে আসে না। এ অঞ্চলে এমন বিপুল খরচের ক্ষেত্র কেউ কখনও খোলে নাই; এই ভাবে ষোল আনা মজুরি, ষোল আনা কাজ, এ রেওয়াজ কেউ প্রবর্ত্তন করে নাই। ইচ্ছা হয় কাজ কর, অনিচ্ছা থাকে এসো না, জবরদস্তি নাই, এমন সম্মানজনক শর্ত্তও কখনও তারা শোনে নাই।

পুরুষেরা এসেছে টামনা ফাওড়া নিয়ে; মেয়েরা নিয়ে এসেছে ঝুড়ি বিঁড়ে। খড়ের পাকানো বিঁড়ের উপর এরই মধ্যে তারা ন্যাকড়ার ফালি জড়িয়ে মনোহর ক'রে তুলেছে। পুরুষরা টামনা-ফাওড়ার বাঁট কাচভাঙা দিয়ে চেঁচে চিকন ক'রে তুলেছে।

পথের পাশে কয়েকটা গাছ। গাছগুলির তলায় বিভিন্ন গ্রামের, বিভিন্ন জাতি ও দলের ছোট ছেলেমেয়েরা ব'সে আছে, খেলা করছে এবং ন্যাকড়ায় বাঁধা খোরাবাটিতে আনা খাবার পাহারা দিচ্ছে।

ওরা কাজ করছে, সে কাজ করার মধ্যেও যেমন একটি নতুন ধরনের শৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, তেমনই চালে চলনেও দেখা দিয়েছে একটা নতুনতম ভাবভঙ্গী; স্বর্ণবাবুর মনে হ'ল, এটা উচ্ছৃঙ্খলতা; পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হ'ল, না, এ তার চেয়েও বেশি, বেয়াদপির চাল। পুরুষগুলো হি-হি ক'রে হাসছে দাঁত মেলে, মেয়েগুলো চলছে হেলে দুলে।

স্বর্ণবাবু ঘোড়ার রাশ আবার টেনে ধরলেন। পায়ের নখ থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা শিহরণ ব'য়ে গেল। কে? কে? কে এই মেয়েটা?

পনরো-ষোল বছরের মেয়ে একটা। নিপুণ ভাস্করের হাতে তৈরি কষ্টিপাথরের বাসুদেব-মূর্ত্তির পাশে চামরধারিণী ক্ষীণকটি নিটোলদেহ দেবদাসীর মত অবয়ব; এক হাতে মাথার ঝুড়ি ধ'রে মেয়েটা ঈষৎ হেলে দাঁড়িয়েছে; ওর দেহে কটিতটে ফুটে উঠেছে সেই দেবদাসীর মতই বাঙ্কম ভঙ্গিমা—সেই লাস্য। আর একজনের সঙ্গে মাথার বোঝাই ঝুড়ি বদল ক'রে খালি ঝুড়িটা হাতে নিয়ে সে ফিরল। কালো নিটোল মুখে বড় বড় দুটি চোখ। আঁট-সাঁট ক'রে পরা কাপড়খানা, দেহের খাঁজে খাঁজে ভাঁজে ভাঁজে বসেছে। মাথায় কাপড় নাই মেয়েটার, ঝিউড়ি মেয়ে নিশ্চয়। মাথার চুলগুলি ভ্রমরের মত কালো এবং কোঁকড়ানো।

কে এ মেয়েটা?

পিছন থেকে সহিসটা মৃদুস্বরে বললে, ও আমাদের গাঁয়েরই। সাতকড়ে বাউড়ীর বুন—পরী।

হুঁ।

তাই বটে। মেয়েটা সত্যই তো চেনা। ছোট অবস্থায় দেখেছেন। দু-তিন বৎসর দেখেন নাই, সম্ভবত শ্বশুরবাড়িতে ছিল। মেয়েটা অনেক বড় হয়ে উঠেছে এই দু-তিন বৎসরের মধ্যে। ওই যে সাতকড়ের মা রয়েছে এদের মধ্যে। আরও অনেককে চিনলেন, কুলীন বাউড়ী, বাঁকা বাউড়ী, বৃন্দাবন, সাতকড়ে, নকড়ে, যগন্দ, কালাচাঁদ, অটল, সব এসেছে খাটতে। গোষ্ঠবালা, সত্যদাসী, সুরধুনী, ভজুদাসী, ললিতে, গোপালীবালা, সিধুবালা, মধুমতী, ময়না, বাকি আর কেউ নাই। সব এসেছে। সামনে একসারি গাড়ি আসছে। গাড়োয়ানদের সহজে চেনা যায় না, কালিতে সর্ব্বাঙ্গ

ভ'রে গেছে। সম্ভবত কয়লা ঢালাই করছে; সাত মাইল দূরবর্ত্তী রেল-ষ্টেশন থেকে ইট পোড়াবার জন্ম কয়লা ব'য়ে আনছে। ক্রমে তাদের চিনলেন স্বর্ণবাবু। পাশের মুসলমানের গ্রাম—ব্যাপারীপাড়ার অধিবাসী এরা। ব্যাপারীপাড়ার জমিদারির অংশ তাঁরই সবচেয়ে বেশি এবং প্রতাপে তিনিই প্রায় একছত্র। এই যে, দিলদার সেখ সর্ব্বাগ্রে। দিলদার—দিলুই ওদের মাতব্বর। দিলদারের পিছনে নাদের, তারপর গফুর, ফাজিল, ইদু, মাতাহর, ওসমান, বাহারুদ্দিন, হোসেনী—প্রত্যেককে তিনি চেনেন।

দিলু সেখ গাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি নেমে, কালিমাখা কালো মুখে সাদা দাঁত বার ক'রে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলে, সালাম হুজুর।

দিলুর পিছনে পিছনে সকলে নামল গাড়ি থেকে। গাড়ির সারিটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল। ইঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে স্বর্ণবাবু স্তব্ধভাবে টমটমের উপর ব'সে রইলেন। ওদিকে ওরা কারা? ওই দূরে, যেখানে পাশাপাশি তিনটে প্রকাণ্ড ইট-ভাটার সর্ব্বাঙ্গ থেকে মাটির প্রলেপের ফাটল দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে, তার পাশেই যেখানে ইটের জন্ম মাটি কাটা হচ্ছে, সেখানে ইট-পাড়াইয়ের কাজে পারদর্শী সেখের পাড়ার হাবু সেখ, হেদায়েৎ, রহমৎ, হাফিজ, এদের তিনি ধোঁয়ায় আবছায়ার মধ্যেও চিনতে পারছেন। তার পাশে? মাটির কাজে ওস্তাদ, দেবীপুরের বাগদীর দল নয়? হ্যাঁ, ওই যে, বিরাট চেহারার লোকটা নাচের ভঙ্গীতে পায়ে পায়ে মাটি ছাঁটছে, ওই তো নকুড় বাগদী।

স্বর্ণবাবুর চারিদিকে সেলাম পড়ছে, সেলামির মত।

সালাম হুজুর।

সালাম গো বাবু।

সালাম কর্ত্তা।

সালাম।

সালাম।

সালাম হুজুর। সকালবেলা কোথা যাবেন বাবু?

সালাম মালিক। হাওয়া খেতে বেইরেছেন হুজুর?

পেনাম বাবুমাশায়।

পেনাম।

মুসলমান গাড়োয়ানদের দেখাদেখি, বাউড়ী হাড়ী ডোম মজুরের দল এগিয়ে এসে প্রণাম জানাচ্ছে।

একটু দূরে পাশাপাশি তিনটে লম্বা খড়ের চালা তৈরি হয়েছে। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একজন মুসলমান। এই—এই কয়লার গাড়ি, এখানে, এই—এখানে ঢাল

সব। ওখানে ওই ইট-খোলায় যাবে না। এইখানে—। লোকটি স্বর্ণবাবুকে দেখে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল। —আদাব বড়বাবু।

লোকটির আপাদমস্তক ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন স্বর্ণবাবু। এখানকার সালেবেগ মের্জ্জা। জোতজমাসম্পন্ন চাষী গৃহস্থ। হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় প'রে, গায়ে একখানা চাদর দিয়ে, একজোড়া খসখসে বহুকালের পুরনো চটি পায়ে দিয়ে, নবগ্রামের দক্ষিণ-পাড়ায় আসত খাজনা দিতে, খাতকের কাছে ধান টাকা আদায়ের নালিশ নিয়ে, জমি কিনে বিক্রেতার নাম খারিজ ক'রে নিজের নামে দাখিলা নেবার আর্জ্জি নিয়ে। তার গায়ে আজ পিরান, পায়ে একজোড়া ক্যাম্বিসের জুতো।

ত'বয়ৎ ভাল হুজুরের? কোথায় যাবেন?

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি এখানে সালেবেগ?

হেসে মের্জ্জা বললে, গোপীবাবু অনেক ক'রে বুললেন, কাজ-কাম আমার অনেক হবে, মের্জ্জা, তুমাকে দেখে শুনে দিতে হবে।

হুঁ। অনেক কাজ হবে, না?

আজ্ঞা হাঁ। এলাহি কাণ্ড-কারখানা। ছ-সাত লাখ ইটা হবে। তাও আপনায় পগমিল বসিয়ে, মাটি বানিয়ে, বাকস ফর্মায় পাড়াই হবে। ইস্কুল হবে, বোর্ডিং হবে—

পুকুর কাটাই হচ্ছে না?

আজ্ঞা হাঁ।

মজা পুকুরের মধ্যে দিয়ে এই যে নালাটা চ'লে গিয়েছে, এটা থাকবে তো?

আজ্ঞা, তা ঠিক—

সারি সারি চালার ওপাশ থেকে এই মুহূর্ত্তেই বেরিয়ে এলেন গোপীচন্দ্র, তাঁর সঙ্গে সরকার-বংশীয় লচুকাকা, বংশলোচনবাবু। স্বর্ণবাবু ঘোড়ার পিঠে রাশের আছাড় দিলেন।

গোপীচন্দ্র তাঁকে সম্ভাষণ জানাবার পূর্ব্বেই ঘোড়াটা চলতে আরম্ভ করল। বংশলোচন উচ্চকণ্ঠে বললেন, আরে—আরে, স্বর্ণভূষণ যে! দাঁড়াও হে, দাঁড়াও হে, থাম। বলি, আজকাল কি দৃষ্টি খারাপ হয়েছে, না দৃষ্টি আজকাল উচ্চমার্গে, মানে—আকাশে চোখ তুলে চলছ? মাটির মনুষ্যকে দেখতেই পাও না?

স্বর্ণবাবু টেনে ধরলেন একটা রাশ, ঘোড়াটার মুখ বেঁকে গেল, সে ঘুরল গাড়ি নিয়ে। তিনি হেসে বললেন, তুমি এখানে লচুকাকা? ঘোড়ার রাশ সহিসের হাতে দিয়ে তিনি নামলেন।

গোপীচন্দ্র বললেন, এস এস। লচুকাকা এসেছিলেন এই ইস্কুলের সব ব্যবস্থা দেখতে। তোমরা সকলে না এলে, আমি একা কি করব বল? দশজনের কাজ—

লচুকাকা বললেন, নিশ্চয়, 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'। তা আমাদের এ গ্রামে তো দশের সে প্রবৃত্তি নাই। হিংসা—হিংসা—হিংসা—কেবল হিংসা। পুড়ে খাক হয়ে গেল সব।

স্বর্ণবাবু গোঁফের সঙ্গে আবার টিকিতে পাক দিতে শুরু করলেন। হেসে বললেন, তুমি পণ্ডিত লোক লচুকাকা। ঠিক ধরেছ।

বংশলোচন বললেন, বাবু আমাদের চিমটি কাটতে সিদ্ধহস্ত। স্বর্ণ, তুমি ভাল ক'রে নখ কেটো বাবা।

স্বর্ণবাবু বললেন, গুরুর দিব্যি লচুকাকা, এ যদি তোমার চিমটি মনে হয় তো নখ আমার নয়, এ নখ আমাদের রাধাকান্তদাদার। আমি তো এত শাস্ত্র-টাস্ত্রর ধার ধারি না, তুমি জান। রাধাকান্তদাদাই সেদিন বললে, পণ্ডিতের লক্ষণই হ'ল, স্বর্ণ, 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু', সমস্ত জগৎকেই তারা নিজের মত দেখে।

বংশলোচন বললেন, তার মানে, হিংসে আমারই। তাই আমি দুনিয়া-জোড়া কেবল হিংসেই দেখছি। তা বেশ, উত্তম কথা, ভাল কথা। কিন্তু তুমি এমন ক'রে পলায়ন করছিলে কেন? তোমার পালানো দেখে আমার রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা মনে প'ড়ে গেল। রামের বাণে রাবণের মুকুট কাটা গেলে রাবণ অমনই ক'রে পালিয়েছিল।

সেইজন্যেই বুঝি তুমি লাফ দিয়ে আমাকে ধরবার চেষ্টা করছিলে?

বা—বা—বা! বলিহারি—বলিহারি—বলিহারি! এই না হ'লে আক্কেল! কাকাকে তো হনুমানই বলতে হয়!

গোপীচন্দ্র মনে মনে ব্যাপারটা উপভোগ করছিলেন না এমন নয়, কিন্তু তবু তিনি অস্বস্তিও অনুভব করছিলেন। এই নবগ্রাম-সমাজের শিক্ষা-সংস্কারের মধ্যেই তাঁর জীবন গণ্ডিবদ্ধ নয়, নবগ্রামের বাইরে সুবিস্তৃত দেশব্যাপী ক্ষেত্রে তিনি ঘোরাফেরা করেন; ব্যবসাসূত্রে দেশ থেকে দেশান্তরে, ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মদেশ আফ্রিকা ইংলণ্ড পর্য্যন্ত তাঁর জীবনক্ষেত্র পরোক্ষভাবে প্রসারিত। এই ধারার বক্রোক্তির মধ্যে তাঁর নবগ্রাম-সমাজ-পীড়িত মন তৃপ্তিলাভ করলেও, তাঁর বৃহত্তর জীবন এবং মানসিকতা এতে অস্বস্তি বোধ না ক'রে পারলে না। গোপীচন্দ্র উভয়ের মধ্যে এগিয়ে এসে বললেন, এস এস ভাই স্বর্ণ, আসুন লচুকাকা, ইস্কুলের জায়গাটা আর প্ল্যানটা স্বর্ণ-ভায়াকে দেখাই। ওসব কথা মজলিশে ব'সে হবে। পথের মধ্যে—দশজন ইতরে শুনবে, ওরা আবার গিয়ে এই নিয়ে পাঁচ কথা কইবে।

স্বর্ণবাবু বললেন, আজ থাক দাদা। আজ আমার বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে। নেহাত লচুকাকা পেছনে কামড় দিয়ে ডাকলে।

বংশলোচন বললেন, লচুকাকার পেছনে কামড়ানো অভ্যেস নাই হে, লচুকাকা কুকুর

নয়। পেছন ফিরে পালাচ্ছিলে, পেছনে হাত দিয়ে ডাকলাম, তা পাছায় যে তোমার ঘা আছে, সে আমি কি ক'রে জানব?

স্বর্ণবাবু ও-কথায় কোন জবাব না দিয়ে গোপীচন্দ্রকে বললেন, আচ্ছা, আমি চলি এখন গোপীদা।

বংশলোচন ছাড়লেন না, প্রশ্ন করলেন, যাবে কোথায় শুনি? যাবে তো বাড়ি, তা এত তাড়াতাড়ি কিসের? এসেছিলে তো কাণ্ডকারখানা দেখতে, তা দেখেই যাও ভাল ক'রে।

নিজেকে সংযত ক'রে স্বর্ণবাবু বললেন, সিদ্ধিলাভ কবে করলে বল দেখি? মানুষের মুখ দেখেই সব ব'লে দিচ্ছ দেখছি। আমি কিন্তু বাড়ি যাচ্ছি না। যাব মামুদপুর ষ্টেশন।

মামুদপুর ষ্টেশন? কোথায় যাবে? মালপত্র কই?

এই দেখ। ষ্টেশনে গেলেই যে আমাকে কোথাও যেতে হবে, তার মানে কি? কেউ আসতেও তো পারে?

সে তো গাড়ি পাঠালেই পারতে,' এমন কে লাটসাহেব আসছেন যে, স্বয়ং হুজুর চলেছেন আগু বাড়িয়ে আনতে?

স্বর্ণবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, লাটসাহেবকে আনতে যাচ্ছি না, লাটসাহেবের কাছে তার করতে যাচ্ছি। এই 'লদ্ভিয়া' পুকুর কাটানো হচ্ছে, এর মধ্যে দিয়ে যে নালা রয়েছে সে বন্ধ হ'লে অনেক জমির চিরস্থায়ী ক্ষতি হবে।

গোপীচন্দ্র বললেন, আধা সিচ আমি বজায় রাখব স্বর্ণভূষণ।

স্বর্ণ বললেন, তা ছাড়া, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তা এই ভাবে ঘুরিয়ে দেওয়াতে আমাদের আপত্তি আছে, তাও জানাব।

তোমাদের মানে? তুমি আর কে কে হে? রাধাকান্ত?'

রাধাকান্তের কথা ব্রজবাসীরা মানে বৈষ্ণবেরা জানেন। তার অর্দ্ধেক কথা আমি বুঝতেই পারি না। বরং তুমি পার, কারণ তোমার বৈষ্ণব মন্ত্র। 'ক' বলতে কেষ্ট মনে প'ড়ে তোমার চোখে জল আসে দেখতে পাই। গ্রামে রাধাকান্ত ছাড়াও লোক আছে লচুকাকা।

স্বর্ণবাবু গাড়িতে উঠে ঘোড়ার পিঠে শিথিল রাশের আছাড় দিয়ে ইঙ্গিত দিলেন। পিছনের সহিসটা লাফিয়ে উঠে বসল। গাড়িটা মসৃণ গতিতে বেরিয়ে গেল।

* * *

পাকা সড়কের ধারেই ইস্কুলের বনিয়াদ কাটা হচ্ছে। গাড়ি থামিয়ে দেখবার ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করলেন স্বর্ণবাবু। চলন্ত গাড়ি থেকেই দেখলেন। বড় ইমারৎ হবে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে তিনি পারলেন না। মনে মনে নিজের

ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রীকে স্মরণ ক'রে বললেন, মা, তোমার পূজায় তো এতটুকু অঙ্গহানি আমি করি না। জীবনে তো কোনদিন তোমাকে স্মরণ না ক'রে জলগ্রহণ করি না। তবে ?

সবই ভাগ্য। মনে হ'ল, রাধাকান্তদা প্রায়ই বলেন, ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। বিদ্যা পুরুষকার সবাই হার মানে ভাগ্যের কাছে। পুরাণে আছে, শ্রীবৎস রাজার হাতের পোড়া শোল মাছ জীবন্ত হয়ে জলে পালিয়েছিল। শনিপূজার ব্রতকথায় আরও বিচিত্র কথা রয়েছে, কাঠের ময়ূরে সোনার হার গিলে ফেলেছিল, যার জন্য রাণীকে পেতে হয়েছিল চোর-অপবাদ, আশ্রয়চ্যুত হতে হয়েছিল। তাঁর নিজের কোষ্ঠীর কথা মনে হ'ল। পাপগ্রহের দশা চলছে এখন। এর চেয়েও খারাপ অবস্থা আসবার কথা আছে। ত্রিপাপের বৎসর আসবে। গোপীচন্দ্রের কোষ্ঠীর কথা তিনি শুনেছেন। শনি এবং মঙ্গল তুঙ্গী আছে গোপীচন্দ্রের। পাপগ্রহের সাহায্যে গোপীচন্দ্রের এই বৃদ্ধি। তা হোক। যত পাপ সহায়তা করুক গোপীচন্দ্রের, এবং তাঁর নিজের সময় যত খারাপই হোক, তিনি কাপুরুষের মত ঘরে ব'সে বৃথা আক্ষেপ করতে পারবেন না। বাধা তিনি দেবেনই। যে দিক থেকে হোক, যেমন ভাবে হোক, বাধা দিতেই হবে।

চাবুকটা তুলে তিনি ঘোড়াটার পিঠে বসাতে উদ্যত হলেন। গাড়িটা একটা বাঁকে মোড় ফিরছিল, সেই কারণেই নিজের অধীরতাকে দমন করলেন। আকস্মিকভাবে বাঁকের মুখে গতিবৃদ্ধির ফলে গাড়িটা উল্টে যেতে পারে। বাঁকটা ঘুরেই কিন্তু চাবুকটা রেখে দিয়ে ঘোড়ার রাশ টেনে ধ'রে গাড়ি থামাতে বাধ্য হলেন। সামনেই চারজন লোক মারামারি করছে। দুজন আর দুজনকে আক্রমণ করেছে। আক্রমণকারীদের তিনি এক নজরেই চিনতে পারলেন। তাঁর নিজের ভাগ্নে ভূপতি এবং জ্ঞাতি-ভাগ্নে অমূল্য। আক্রান্তদের একজন মণি দত্ত। অপর জনকে ঠিক চিনতে পারলেন না, তবে বেশভূষা দেখে মনে হ'ল, সে চাষীভূষির ঘরের ছেলে। স্বর্ণবাবুর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, অনুমানশক্তি প্রখর ; কয়েকদিন পূর্ব্বের কথা স্মরণ ক'রে মুহূর্ত্তে তিনি অনুমান করলেন, এ ছোকরা রঙলাল ঘোড়লের কেউ হবে—অন্তত তার স্বগ্রামবাসী।

ভূপতি এবং অমূল্যকে নিয়ে গ্রামে অভিযোগের আর অন্ত নাই। উদ্ধত মদ্যপ অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর চরিত্রহীন। প্রকাশ্য রাস্তায় মাতলামি ক'রে ফেরে, রাত্রে বাউড়ীপাড়া-ডোমপাড়ায় অত্যাচার করে। বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে এতটুকু চৈতন্য নাই। এ কাজগুলি গোপনীয়তায় যে সংযমের সঙ্গে করা প্রয়োজন, স্থান সম্বন্ধে নিজের এলাকায় এর গণ্ডি আবদ্ধ রাখার যে মর্য্যাদাবোধের প্রয়োজন, সে শিক্ষা এদের একেবারে নাই। ইতরতার নিম্নতম স্তরে নেমে গিয়েছে। চাবুকটা হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে তিনি নেমে পড়লেন।

ভূপতি এবং অমূল্য মুহূর্ত্তে যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালাল।

প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ, গোপীচন্দ্রের হিংসায় জর্জ্জর স্বর্ণবাবু ক্রোধে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নেমেছিলেন, ভূপতি এবং অমূল্যকে আঘাত করবার জন্ত। তাদের আঘাত করার পর তিনি কি করতেন, সে কেউ জানে না, তিনিও জানতেন না। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তকে অতিক্রম ক'রে তিনি কি করবেন, সে চিন্তা করবার মত মনের অবস্থাই তাঁর ছিল না। চাবুক মারতে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি ঘোড়াটাকে, পরমুহূর্ত্তে বর্দ্ধিততর ক্রোধ ভূপতি এবং অমূল্যকে চাবুক মেরে তাঁর প্রতিশোধস্পৃহা শান্ত করতে চেয়েছিলেন, তাদের মেরে সে স্পৃহা শান্ত হ'লে, ফিরে গিয়ে গাড়িতে চড়তেন তিনি। শান্ত না হ'লে তিনি যা করতেন, তাই ক'রে বসলেন। ভূপতি এবং অমূল্যকে না পেয়ে তাঁর আক্রোশ গিয়ে পড়ল মণি দত্তের উপর। মুহূর্ত্তে মনে প'ড়ে গেল, বড়দিদির কথা, রজনীদিদির অভিযোগ—আমাদের বাপ-পিতামহের ইজ্জৎ কি সব গিয়েছে? তোমরা কি সব মরেছ? উনিশ শো ছ সালের জমিদারের ছেলে জমিদার স্বর্ণবাবু। ইতিহাস বলে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়, জমিদারির জমির মালিকানা-স্বত্বের পুষ্টিতে তাদের রক্তধারার মধ্যে জন্মেছিল, দম্ভোদ্ধত শাসকজনোচিত নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি।

স্বর্ণবাবু কোন কথা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন না, বিনাবাক্যব্যয়ে তিনি হাতের চাবুক চালালেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, মণি দত্তের উপর নয়, চালাতে এসে চালালেন তাকে ছেড়ে তার সঙ্গীর উপর। সেই মুহূর্ত্তে পিছনে বেজে উঠল বাইসিক্লের ঘণ্টা। স্বর্ণবাবুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার কথা নয়। এ অঞ্চলে কোন ব্যক্তিকে কোন কাজে তিনি সঙ্কোচ করেন না। তিনি চাবুক চালালেন। আবার হাতের চাবুকটা উদ্যত করলেন, এবার তিনি অনুভব করলেন, পিছন থেকে কেউ তাঁর চাবুকটা চেপে ধরেছে।

নিষ্ঠুরতম ক্রোধে তিনি পিছন ফিরলেন, কে? কে? কে? কার এতবড় স্পর্দ্ধা? কে?

কিশোর বললে, এ কি? এ কি করছেন আপনি?

ক্রোধে স্বর্ণবাবু কোন কথা বলতে পারলেন না, থরথর ক'রে কাঁপছিলেন তিনি। রাধাকান্তবাবুদের ভাগিনেয়-বাড়ি, নিতান্ত গৃহস্থ ঘর, চাকুরি যাদের জীবিকা, তাদের বাড়ির ছেলে এই কিশোর, তার এতবড় স্পর্দ্ধা!

কিশোর হ্যাঁচকা টানে স্বর্ণবাবুর হাতের চাবুকটা কেড়ে নিয়ে ভেঙে দু টুকরো ক'রে ফেলে দিয়ে বললে, জানোয়ারকে মারেন যে চাবুক দিয়ে, সেই চাবুক চালাচ্ছেন আপনি মানুষের ওপর? আপনিও মানুষ, এঁরাও মানুষ।

স্বর্ণবাবুর কাছে এমন ধারা কথা কেউ কখনও বলে নাই। স্বর্ণবাবুরাও মানুষ, মণি দত্ত এবং চাষীর ছেলেও মানুষ—এ কথা স্বর্ণবাবুর কাছে নতুন। কিন্তু সে নতুন কথাকে

নতুন ব'লে চিনবার মত মনের অবস্থা স্বর্ণবাবুর ছিল না। নিরুপায় ক্রোধে তিনি দ্রুতপদক্ষেপে গিয়ে গাড়ির উপর উঠলেন।

খানিকটা গিয়ে তাঁর মনে হ'ল, তাঁর ভাগ্যাকাশে দুষ্টগ্রহের মত একা ওই গোপীচন্দ্রই উদিত হয় নাই, এই কিশোরও উদিত হচ্ছে; কিশোর একা নয়। গৃহস্থঘরের কোন্ কোন্ ছেলে, কলেজে পড়ছে, তিনি মনে করতে চেষ্টা করলেন।

তবু গোপীচন্দ্রই তাঁর প্রধান শত্রু। কলেজের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছুবার পথ ওই বানিয়ে দিচ্ছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে তাঁর দুর্নিবার আক্ষেপ হ'ল মনে মনে। মণি দত্তকে একটা আঘাতও করতে পান নি তিনি। ওই চাষার ছেলেটাকে চাবুক মেরে বরং হাত তাঁর কলুষিতই হয়েছে। ছি—ছি-ছি! ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উপনিষদ*

ঈশ

যা কিছু জগতে আছে সকলি চঞ্চল
ঈশ দিয়া কর আচ্ছাদন
ত্যাগ দ্বারা ভোগ কর, লোভ করিও না
অপরের ধন ॥ ১ ॥

শতায়ু হইতে চায় জগতে যে জন
কর্ম্ম তার অবলম্বন
ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই
কর্ম্ম যেন না হয় বন্ধন ॥ ২ ॥

অন্ধকার অন্ধ-লোক নাহি সূর্য্য-ভাতি
দেহান্তে গমন করে সেথা আত্মঘাতী ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা অচল এক-স্বরূপ
মনের চেয়েও সচল তবু
অগ্রগামী তাঁহার নাগাল
ইন্দ্রিয়েরা পায় না কভু।

* অনুবাদ করিয়াছি।

স্থির থাকিয়া সবায় তিনি
অতিক্রমি গমন করেন
তিনিই আবার কর্ম্মে নানা
অন্তরীক্ষে মূর্ত্তি ধরেন ॥ ৪ ॥

সচল তিনি, অচল তিনি, সুদূর তিনি, তিনিই নিকট
সবার মাঝে তিনিই আছেন, বাহিরেতেও তিনিই প্রকট ॥ ৫ ॥

সবার মাঝারে যিনি প্রত্যক্ষ করেন বিশ্ব লীন
ঘৃণা তাঁর চিত্ত কভু না করে মলিন ॥ ৬ ॥

যে জ্ঞানীর জ্ঞান-চক্ষে আত্মবৎ হ'ল সর্ব্ব-লোক
সে একত্বদর্শীর নাহি মোহ নাহি কোন শোক ॥ ৭ ॥

সর্ব্ব-ব্যাপী শুক্র-শুভ্র অশরীরী অক্ষত অশিরা
বিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ যিনি
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিয়ামক শাশ্বত কালের
কবি ও মনীষী জেনো তিনি ॥ ৮ ॥

কর্ম্মে অনুরক্ত যিনি অন্ধলোকে প্রবেশ তাঁহার
জ্ঞানেতে হইলে রত আরও অন্ধকার ॥ ৯ ॥

আমাদের জ্ঞানদান করেন যাঁহারা
সেই সব বিচক্ষণ জ্ঞানী
শুনিয়াছি বলেছেন বাণী
"জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল পৃথকই তো জানি" ॥ ১০ ॥

জ্ঞান ও কর্ম্মের যিনি করেছেন একত্ব বিধান
কর্ম্মবলে মৃত্যু লঙ্ঘি' জ্ঞানে তিনি অমরত্ব পান ॥ ১১ ॥

প্রকৃতির উপাসক অন্ধলোকে প্রবেশ তাঁহার
ব্রহ্মেতে হইলে রত আরও অন্ধকার ॥ ১২ ॥

শুনিয়াছি ধীরগণ বলেছেন বাণী
"ব্রহ্মা ও প্রকৃতি পূজা এক নহে জানি" ॥ ১৩ ॥

প্রকৃতি ও ব্রহ্মকে যে সাধক দেখেছেন একত্র করিয়া
প্রকৃতি সহায়ে তিনি অমরত্ব পান ব্রহ্মবলে মৃত্যু উত্তরিয়া ॥ ১৪ ॥

হিরণ্ময় পাত্র দিয়া আবরিয়া রেখেছ স্বরূপ
হে পূষণ, খোল খোল দেখি তব কিবা সত্য-রূপ ॥ ১৫ ॥

সংহরণ কর রশ্মি-জাল তেজঃপুঞ্জ সম্বরণ কর
প্রজাপতি-পুত্র হে পূষণ, হে নিয়ন্তা, এক ঋষি-বর,
তোমার কল্যাণতম রূপ কৃপা করি দেখাও আমারে
তোমার আমার মাঝে যে পুরুষ এক নেহারিব তারে ॥ ১৬ ॥

প্রাণ-বায়ু লীন হোক অমৃত আকাশ মাঝে
দেহ হোক ভস্মীভূত ধূলি
হে মন স্মরণ কর, হে মন স্মরণ কর
জীবনের কৃত কর্ম্মগুলি ॥ ১৭ ॥

হে অগ্নি, লইয়া চল সুপথে আমারে
কর্ম্মফল অভিমুখে মম
তুমি জান সকলই আমার
দূর কর চিত্ত হতে পাপ তাপ তম
তোমারেই নমি বারম্বার ॥ ১৮ ॥

"বনফুল"

শাশ্বত

দুখের সায়রে আনন্দ-শতদল
রসিক বিধাতা ফোটায় যে বার বার।
আলোক-বন্যা হেসে উঠে খলখল
নয়নে যখনি ঘনায় অন্ধকার।

সংবাদ-সাহিত্য

২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারি, সোমবার ফাল্গুনের "সংবাদ-সাহিত্য" লিখিতে বসিয়াছিলাম। কবি নবীনচন্দ্র সেনের জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠান আজ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নবীনচন্দ্র ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আজ তাঁহার জন্মের শতবর্ষ আরম্ভ, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি শতবর্ষ সম্পূর্ণ হইবে। জন্মশতবার্ষিক উৎসবের উদ্যোক্তাদের ইচ্ছা, পূর্ণ এক বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশের সর্বত্র তাঁহারা বিবিধ উপায়ে বিস্মৃত নবীনচন্দ্রের স্মৃতিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবেন। চট্টগ্রাম নয়াপাড়ায় এবং কলিকাতায় মহাসমারোহে প্রদর্শনী ও সভা অনুষ্ঠিত হইবে। বাংলা দেশের কবি ও সাহিত্যিকেরা অগ্রজকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করিবেন।

আমরাও প্রস্তুত হইতেছিলাম। যে স্বদেশপ্রেমিক কবি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর আম্রকাননে বাঙালীর চরম পরাজয়ের গ্লানি, ভবিষ্যতের বাঙালীজাতিকে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দান করিবার জন্য খণ্ডকাব্যে ধারণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, ইংরেজের চাকর হইয়াও সাম্রাজ্যলোলুপ বাণিয়া ইংরেজের চাতুরী যিনি কবিদৃষ্টির সাহায্যে নিজে দেখিয়া স্বদেশবাসীকে মর্মান্তিকভাবে দেখাইতে পারিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার দায় আমরা সহজে মুক্ত হইতে পারি না। নবীনচন্দ্রের সেই ব্যথিত আর্তনাদ—

'কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি !
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির-বিষাদ রজনী !
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্মম অন্তরে,
ডুবায়ে ভারতভূমি যেও না তপন ;
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে,
কি দশা দেখিয়া, আহা ! ডুবিছ এখন ;
পূর্ণ না হইতে তব অর্ধ আবর্তন,
অর্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন !"

আজও মুহুর্মুহু সমগ্র ভারতের মর্মমূল মথিত করিয়া উত্থিত হইতেছে, সেদিনের পরাধীনতার কলঙ্ক আমরা আজও মুছিতে পারি নাই। নবীনচন্দ্র তাঁহার 'অবকাশরঞ্জিনী'তে মুক্তির উপায়ও নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হে ভারতবাসী, "শবসাধন" কর, প্রায়শ্চিত্ত কর। বলিয়াছেন—

নিবেছে অনল ?—নিবে নি এখন,
কে নিবাবে বল,—নিবিবে কেমনে ?
সপ্তশত বর্ষ জ্বলিছে এমন,
কত শত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে ?
যেই দিকে দেখি,—এই মহানল !
কোথায় ভারত ?—অনন্ত শ্মশান !
শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান কেবল !
রাবণের চিতা, লঙ্কার প্রমাণ !

না পার,—বসিয়া এ মহাশ্মশানে
বিংশতি কোটিক শবের উপর,
উগ্র উদ্দীপনা-মহাসুরা-পানে,
সাধ মহামন্ত্র অভয় অন্তর।
ঘোর অমাবস্যা প্রগাঢ় তিমিরে,
আচ্ছন্ন ভারত, নীরব এখন ;
শ্মশান-অনল গর্জিছে গম্ভীরে,
হাহাকার শব্দে স্বনিছে পবন।

প্রতি ঘরে ঘরে—শ্মশানে, শ্মশানে,
মহাবিষ্ণু দিনে, মহাশক্তি ওই
নাচিছে রঙ্গিণী সকর-কৃপাণে,
গর্জিছে সাধক মাভৈর্মাভৈঃ।
নিবিড় নিশীথে ঘোর অন্ধকারে
ধূমপুঞ্জ মাঝে নাচে ভয়ঙ্করী,
ত্রিনেত্র হইতে অনল হুঙ্কারে,
মহাকালী মূর্তি, ভীমা দিগম্বরী !

কি ভয় !—আবার হৃদয় ভরিয়া,
কর উদ্দীপনা-মহাসুরা-পান ;
করতালি দিয়া, নয়ন মুদিয়া,
কর বীরাচারে মহাশক্তি ধ্যান ;—
করাল-বদনা, নৃমুণ্ড-মালিনি,
লেলিহান জিহ্বা রুধিরে লোহিত,
উর মা শ্মশানে শ্মশান-বাসিনি,
সৃক্ক-দ্বন্দ্ব-গলদ্রুধির চর্চিত।

ভারত-সন্তান ! দেখ না মাতার
লোলজিহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধার,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারংবার ;
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি বিদারণ
করে, জননীর পিপাসা নিবারি,
ভারত-শ্মশানে শক্তি আরাধন ?

* * *

আপনার বক্ষ বিদারণ করিয়া তপ্ত শোণিত-নিবেদনে জননীর পিপাসা নিবারণ করিতে পারে, ভারতে কি এমন বীরাচারীদলের এখনও আবির্ভাব ঘটে নাই ? প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয় নাই ? আমাদের এই সুজলাসুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাংলা দেশের মহাশ্মশানে এই তো গত নবেম্বর মাসের ২১ তারিখেই দেখিলাম, বীরাচারীর দল অবাধে এবং নির্ভয়ে বুকের রক্ত দান করি মহোৎসাহে শক্তি-আরাধনা করিল ! মহানগরীর রাজপথে—

রক্তাক্ত ও উত্তেজিত নন্তু প্রবেশ করিল।· পিছনে ছিন্নভিন্ন বিপর্যস্ত তাহা দলটি ! তাহাদের মূর্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। বাক্‌স্ফূর্তি হইল না কাতর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলাম।

নন্তু যাহা বলিল, তাহা খবরের কাগজের রিপোর্টেই আছে। মাত্র একশো দেড়শো লোকের একটি প্রতিবাদ-শোভাযাত্রা কলিকাতার রাজপথে যানবাহন চলাচলের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে অথবা যে অঞ্চল মাত্র আড়াই মাস পূর্বে দেড় লক্ষ লোকের সম্মিলিত পদধূলিতে পবিত্র হইয়াছে, নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়

তাহার মর্যাদাহানি ঘটিয়াছে বলিয়া পাশবিক শক্তির পৈশাচিক প্রয়োগ পলাশীর বিজয়ী বীরেদের বংশধরদের পক্ষে মোটেই অভাবনীয় নয়। বীর ব্যাঘ্র নিরীহ মেষশাবকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য অধিকতর হাস্যকর যুক্তির অবতারণা করে নাই। নীরবে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম হইল, এখনও প্রায়শ্চিত্ত পর্যাপ্ত হয় নাই।

* * *

তাহার পর তিন দিন তিন রাত্রি ধরিয়া কলিকাতা এবং আশেপাশের শহরতলি অঞ্চলে শিক্ষিত বেতনভোগী পশুশক্তির যে তাণ্ডবলীলা চলিল, তাহাতে নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' সহ চাপা পড়িয়া গেলেন, ধর্মতলা, জগুবাবুর বাজার এবং গিরিশ পার্কের যুদ্ধ আমাদের শব-সাধনার অসম্পূর্ণ ইতিহাসকে পূর্ণতর করিয়া রামেশ্বর, আলম, দেবব্রত, মোহিত, কদম রসুলকে আমাদের দৃষ্টি ও চিন্তার পুরোভাগে স্থাপন করিল, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়া গেল, সাহিত্যের আশ্রয়ে সংবাদ-সাহিত্য রচনা সম্ভবপর হইল না। রসিক পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন।

—

ঝড় প্রশমিত হইয়াছে, হাসপাতালগুলিতে রক্তের দাগ রাখিয়া বন্যা নামিয়া গিয়াছে। বসিয়া বসিয়া গত কয় দিনের শোণিত-সিক্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করিতেছিলাম। আজাদ-হিন্দ-ফৌজে সুভাষচন্দ্রের সর্বোত্তম কীর্তি, সকল সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা বর্জন করিয়া একজাতীয়তার সূত্রে তিনি সকলকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের মাটিতে খিলাফৎ-আন্দোলনের ঘুষ দিয়াও যাহা সম্ভব হয় নাই, ভারতের বাহিরে সুভাষচন্দ্র স্বীয় নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও উদারতার গুণে অত্যল্পকালমধ্যে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতীয় জাতীয়বাহিনীর এই দিকটা তাহাদের শোচনীয় আপাতপরাজয় সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আশায় ও স্বপ্নে আমাদিগকে বিভোর করিয়াছিল। তাই লীগ-বিভ্রান্ত আব্দার রসীদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিপ্রসূত উক্তি আমাদিগকে ব্যথিত ও পীড়িত করিয়াছিল। শাহ নওয়াজের মুক্তিতে সারা ভারতব্যাপী যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, সত্য কথা বলিতে কি, আব্দার রসীদের শাস্তিতে সেই অনুপাতে আমরা বেদনা বোধ করি নাই। আমাদের এই মানুষসুলভ প্রবৃত্তিগত পক্ষপাতিত্বের অপরাধ

আরও একটি কারণে প্রশ্রয়লাভ করিয়াছিল—মিঃ জিন্না-প্রমুখ-মুসলিম-লীগের প্রধানেরা ২১ নবেম্বরের অন্দোলন হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের কম্যুনিস্টপন্থী বন্ধুরা সামান্য কয়জনে মিলিয়া শোভাযাত্রা করিয়া আমাদের উপেক্ষা ও বিমুখতাজনিত অপরাধ ক্ষালন করিতে চাহিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারা সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। লীগপন্থীরা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রবৃত্তিতে স্বভাবতই তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই উভয় সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া সেদিন যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহার মূলে হঠকারিতার ভ্রান্তি ছিল, এ কথাও আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের জাতীয় নেতাদের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন তাঁহারা অনুভব করেন নাই; অথচ তাঁহারা জানিতেন, উত্তেজিত দেশবাসীকে দুরূহ দুর্গম পথে শান্ত ও সংযত ভাবে পরিচালনার শক্তি তাঁহাদের নাই। সক্ষম নেতৃত্বে শুরু হইতেই অভিযান পরিচালিত হইলে বহুমূল্য রক্তপাতে কলিকাতার রাজপথ এ ভাবে আর্দ্র হইত না।

* * *

রাজশক্তি ইচ্ছা করিলেই এই সঙ্কট এড়াইতে পারিতেন। বাংলার বিদায়ী গবর্নর মিঃ কেসী সম্ভবত শেষ অক্ষয় কীর্তি অর্জনের লোভ দমন করিতে পারেন নাই। প্রথম দিনের দুর্ঘটনার পর দ্বিতীয় দিনে যখন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও মিঃ সুরাওয়ার্দি শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতেছিলেন, পুলিস-কমিশনরের পূর্বপ্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তখন কেন যে শোভাযাত্রাকারীরা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সামান্য ক্রটিস্বীকারের দ্বারা সে কারণ চাপা দিবার নয়। শুষ্ক খড়ের চালে আগুন দিয়া 'সরি' বলিলে লঙ্কাকাণ্ডের পাপ ক্ষালন হয় না। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবেই হিংস্রতা ও রক্তপাত রোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, অহিংসামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ শান্ত নির্ভীক মানুষের শোভাযাত্রা তিনি নিয়ন্ত্রণ করিতে নামেন নাই। বহুমতের এবং বহুমতলবের লোক স্বভাবতই একত্র সমবেত হইয়াছিল। অকারণ মার খাইয়া এইরূপ মিশ্র জনতা যদি ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ন হইয়া বিপর্যয় ঘটাইয়া থাকে, তাহা হইলে আজ অনুশোচনা করা ছাড়া উদ্যোক্তাদের আর কিছুই করিবার নাই। রাজশক্তির প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তাঁহারা পূর্বাহ্নে সাবধান হইলে ভাল করিতেন।

সম্ভবত মিঃ কেসীর আত্মাভিমানে ঘা লাগিয়াছিল, নবেম্বর-বিদ্রোহে

কংগ্রেসশক্তির কাছে তাঁহার রাজশক্তি লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইয়াছিল। জাতীয় নেতারা শুধু মুখের কথায় সেদিন শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহার পুলিসবাহিনীকে অন্তরালে সরাইতে হইয়াছিল—এই লজ্জাকর স্মৃতি তাঁহাকে মনে মনে পীড়া দিয়া থাকিবে। সেই ভুল সংশোধনের এমন চমৎকার সুযোগ তিনি আর পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, কারণ তাঁহার হাতে আর সময় ছিল না। দেশীয় নেতারা যাহা বিনা রক্তপাতেই করিতে পারিতেন, তিনি সামরিক বিভাগের বহুকাল-অব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের মারাত্মক এফিকেসির উপর তাহার গুরুভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, হয়তো বা আত্মপ্রসাদও লাভ করিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের মধ্যেও যে লৌহ-নালিকা-পথ শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ ছিল, প্রতিহিংসায় আত্মবিস্মৃত নিরীহ জনপদবাসীর শাসনে তাহাই ধূম্রকলঙ্কিত হইতে লাগিল। কলিকাতার বেতারযোগে মহামান্য গবর্নর বাহাদুর নগরবাসীর উপর চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন, ভদ্রজনকে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করিবার সৎপরামর্শও তিনি দান করিলেন। কিন্তু পরদিন বিস্মিত ও বিহ্বল নাগরিকেরা প্রত্যক্ষ করিল, গিরিশ পার্কের দক্ষিণে একটি বাড়ির চারতলার এক কক্ষে চতুর্দশবর্ষবর্ষীয়া জনৈক পাঞ্জাবী বালিকা এবং তাহার একাদশবর্ষীয় ভ্রাতা গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হইয়াছে; শ্যামবাজারে নিক্ষিপ্ত একটি গুলির আঘাতে মাইলখানেক দূরে নিহত একটি আড়াই বছরের বালকের ছবিও দৈনিক সংবাদপত্র মারফৎ তাহারা দেখিল। গৃহের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিয়াও যে অনেকে আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে সে সংবাদও গোপন রহিল না।

*　　*　　*

তাহার পর, সমস্ত শহর জুড়িয়া ওল্ড টেস্টামেণ্ট-বর্ণিত সেমেটিক নীতির অবাধ প্রয়োগ চলিতে থাকিল। চক্ষুর বদলে চক্ষু এবং দন্তের বদলে দন্ত উৎপাটিত হইতে লাগিল। উত্তেজনার মুখে জনতা যে সকল আতিশয্যে মত্ত হইয়াছে, কোনও শিক্ষিত ভদ্র ভারতবাসীই তাহার সমর্থন করিবে না, কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই প্রসঙ্গে ভারতীয়দের যথার্থ মনোভাব দৃঢ়কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু গভর্মেণ্টের যে নীতি এই সকল আতিশয্য ডাকিয়া আনিয়াছে, সর্বাগ্রে তাহারই নিরপেক্ষ বিচার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বারম্বার দেখিয়াছি, শুধু কলিকাতাতেই নয়,

বোম্বাইয়ে এবং অমৃতসরে—ভারতবর্ষের সর্বত্রই সরকারী দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশবাসীর ন্যায্য বিক্ষোভ যেখানেই পুলিসী জুলুমের দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে, সেখানেই রক্তপাত অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। জনতা নিজেদের দাবি সম্বন্ধে আজ সচেতন হইয়া উঠিতেছে ; আইন এবং শৃঙ্খলার নামে অকারণ চোখ রাঙাইয়া তাহাদিগকে ভীত চকিত ও সন্ত্রস্ত রাখা আর সম্ভব নয়। মৃত্যুকে যে আর কলিকাতার জনতা ভয় করে না, তাহার পরীক্ষা বহুবার হইয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে গিয়া সামরিক শক্তি নিয়োজিত করিয়া গবর্মেণ্ট যদি মনে করেন—বিজয়ী হইলাম, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা ভুল আর কিছু হইতে পারে না। ১৪৪ ধারার প্রবর্তন সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় নেতারাই যে এবারকার বিদ্রোহও শান্ত করিয়াছেন, তাহা কলিকাতার নাগরিক মাত্রেই অবগত আছেন। কলিকাতার দুর্ধর্ষ জনতা লুকাচুরি খেলায় প্রবৃত্ত হইলে মুষ্টিমেয় সশস্ত্র বাহিনী লইয়া একদিনের মধ্যে তাহাদিগকে দমন করা গবর্মেণ্টের পক্ষে কখনই সম্ভব হইত না। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, তাঁহার খাদি গ্রুপ ও গান্ধী সেবাদলের উদ্যম ও অধ্যবসায় স্মরণীয়। মিঃ সুরাওয়ার্দীও জনতার বহুলাংশকে সংহত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, যাঁহাদের উপর আমাদের সর্বাধিক ভরসা, সেই সকল জননেতাদের কেহ কেহ এবারেও অভিমানভরে দূরে ছিলেন, এই কারণেই রক্তমোক্ষণের পরিমাণ এত অধিক হইয়াছে।

* * *

একটা কথা গবর্মেণ্ট স্মরণ রাখিলে ভাল করিবেন যে, এই আন্দোলন কয়েকজন দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তির প্ররোচনায় মাত্র উদ্বুদ্ধ নয়। প্রথম দিনের ব্যাপার যাহারা যে উদ্দেশ্যই করিয়া থাকুক, পুলিসের অহেতুক অত্যাচারে ইহা অচিরাৎ সর্বজাতীয় এবং সর্বদলীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছিল—আব্দার রসিদের মুক্তি জাতীয় পরাধীনতা হইতে মুক্তির সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল ; গুণ্ডাদের আতিশয্য ইহাকে স্থানে স্থানে কলঙ্কিত করিলেও তাহাই ইহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। মৃত এবং আহতদের নামের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে, ইহার পশ্চাতে সমস্ত কলিকাতাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল। পরে শহরতলির অধিবাসীরাও এই স্বাধীনতা-আন্দোলনে আপনা হইতেই যোগ দিয়াছিল। মুসলিম-লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির মাত্র কয়েকজন যে খেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন,

তাহাই সমগ্র দেশের জীবন-মরণ-সংগ্রাম হইয়া উঠিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই—ইংরেজের কুশাসনে দেশের অবস্থা এমনই শুষ্ক এবং খর হইয়া আছে! এই বিপুল রক্তপাত এবং প্রাণবলির একটিমাত্র সুফল এই দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ মুসলমানেরা সাধারণ হিন্দুদের সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাঁহাদের নেতারা অসময়ে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিলেও জাতীয় মুক্তির আহবে হিন্দু ভ্রাতারা তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে কখনই ইতস্তত করিবেন না। হিন্দুরা প্রভূত রক্তমূল্যে এবার সেই বিশ্বাস ক্রয় করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছেন যে, স্বাধীনতা-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কোন সম্প্রদায়ের নেতাই সাম্প্রদায়িক ধুয়া তুলিয়া দেশের মানুষকে দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারিবেন না— প্রাণের আবেগেই তাহারা ইহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

* * *

রাজা যেখানে কর্মচারীদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদনে শৈথিল্য করেন অর্থাৎ প্রজার ন্যায্য স্বাধীনতা যখন অকারণে বারম্বার ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে, তখন শান্ত নিরীহ ভদ্র প্রজারাও বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হয়। উত্তেজনা মনের মধ্যে পাক খাইতে খাইতে একদিন বিপ্লবের আকারে দেখা দেয়, আইনের ভয়ে ভীত মানুষেরা তখন মৃত্যুর ভয়কেও উপেক্ষা করে। ভারতবর্ষে বর্তমানে এইরূপই হইতেছে। উত্তেজনার মুখে যুক্তি বড় জটিল পথ ধরে—সাম্রাজ্য-বাদীদের অব্যবস্থায় পীড়িত ভারতবাসীর যুক্তিও আজ স্থির নাই। তাই সাম্রাজ্য-বাদীদের প্রতি বিরাগ ইংরেজ জাতির প্রতি বিরাগ হইয়া দাঁড়াইতেছে। শেষ পর্যন্ত সাদা চামড়া এবং তাহাদের সঙ্কর সন্তানদের প্রতি ক্ষোভ এবং ক্রোধ অদম্য হইয়া উঠিতেছে। এই ক্রোধের প্রকাশ এইবারের বিদ্রোহে সাংঘাতিক মূর্তিতে দেখা গেল। এখন উভয়পক্ষের সরল যুক্তির প্রয়োগে হৃদয়ের পরিবর্তন না ঘটিলে আগামী বিদ্রোহ যে অতিশয় ভয়াবহ হইয়া উঠিবে, তাহার আভাসও পাওয়া গেল। "এলোমেলো ক'রে দে মা"র দল এবারেও অতিশয় অবাঞ্ছিত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হইয়াছে—সমগ্র সাধু আন্দোলন ইহাদের সংস্পর্শে কলঙ্কিত হইবার আশঙ্কা আছে। সাধারণ মানুষ অর্থাৎ জনতাকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার এখনও অনেক অবকাশ আছে। কংগ্রেস কর্তৃক আন্দোলন পরিচালিত হইলে নারী ও ধর্মমন্দিরের উপর হস্তক্ষেপ কখনই সম্ভব হইত না। নেতাদের

অভাবেই দুর্বৃত্তেরা এই জাতীয় ব্যসনে লিপ্ত হইয়াছে, ইহার জন্য সকলকেই যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, সে কথা রাষ্ট্রপতি আজাদ ঘোষণা করিয়াছেন।

* * *

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত সম্প্রদায় কখনও ভারতবাসীর সহিত আত্মীয়তাবোধ করেন নাই—ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বরঞ্চ ইংরেজের পদলেহী সম্প্রদায়রূপে ইঁহারা নানাপ্রকারে ভারতীয় নির্যাতনে যোগ দিয়াছেন। অনেক দিনের অনেক অবিবেচনা পুঞ্জীভূত হইয়া ইঁহাদের প্রতি সাধারণ ভারতবাসীর মন বিষাইয়া দিয়াছে। এতদিনে সেই বিষের প্রতিক্রিয়া হইতেছে। তাঁহারা যে আসলে ভারতবাসী এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন যে তাঁহাদেরও মুক্তি-আন্দোলন, দেশীয় খ্রীষ্টানদের মত তাঁহাদিগকেই সর্বাগ্রে তাহা মনে করিতে হইবে, নিজেরা ভারতবাসী বনিয়া ভারতবাসীর আশা-আনন্দ দুঃখ-দুর্দশা অন্তরে অনুভব করিলে তবেই তাঁহারা বহু অবাঞ্ছিত লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা পাইবেন। না ঘাট্‌কা না ঘরকা হইয়া থাকিবার দিন আজ চলিয়া গিয়াছে। নিতান্ত সাময়িক প্রয়োজন ছাড়া ইংরেজ কখনও তাঁহাদিগকে বুকে জড়াইয়া ধরে নাই, কখনও ধরিবে-না। এই সহজ সত্যকে মানিয়া লইয়া ইঁহারা ভারতীয় দরগায় মাথা মুড়াইয়া লইলে ভাল করিবেন। ফেব্রুয়ারি-বিদ্রোহের ইহাও আর একটি শিক্ষা।

* * * *

নৃশংস হইবার জন্যই যাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহাদের নৃশংসতা লইয়া কাঁদুনি গাহিয়া কি হইবে? অ্যাটমিক বোমার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সকলবিধ আইন তথাকথিত সভ্য সমাজ হইতে লোপ পাইয়াছে। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, কলিকাতার উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করিবার জন্য দমদম-বুলেট-জাতীয় গুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, অধিকাংশ গুলি উত্তমাঙ্গ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। একজনকে মারিয়া অজ্ঞান করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করিবারও চেষ্টা যে কেসী-নিযুক্ত শূরেরা করিয়াছিল তাহাও প্রমাণ হইয়াছে; একটি এগারো বৎসরের বালককে গুলি করিয়াই ইহারা ক্ষান্ত হয় নাই, বেয়নেটের সাহায্যে তাহার পেট চিরিয়া দিয়া তবে তৃপ্ত হইয়াছে। তালিকা আরও অনেক বাড়ানো যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ফল কি! ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ আগস্ট হইতে আজ পর্যন্ত ব্রিটিশশাসন আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছে তাহাতে—

গোপালদা ছুটিতে ছুটিতে ঘরে প্রবেশ করিয়াই দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন এবং ধপ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। আমি বিস্মিত ব্যাকুলতা লইয়া তাঁহার কাছে উঠিয়া গেলাম। গোপালদা কাতরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া এক গ্লাস জল প্রার্থনা করিলেন। জল দিলাম। ঢক ঢক করিয়া সমস্ত গ্লাসটি একনিশ্বাসে নিঃশেষ করিয়া গোপালদা বলিলেন, আঃ, বাঁচালে ভাই। দেখছি শেষ পর্যন্ত পাড়ার ছোঁড়াগুলোই আমাকে বধ করবে।

প্রশ্নাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। গোপালদা ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, দেখ তো ভাই, তোমাদের এই ১৪৪ ধারার ভয়ে তো কদিন ঘর থেকেই বের হতে পারি নি। প্রাণ যায় আর কি! আজ অনেক কষ্টে পথঘাট দেখে তো বেরিয়েছি। ছোঁড়ারা মোড়ে দাঁড়িয়ে গুলতানি করছিল, আমাকে দেখেই 'গোপালদা, গোপালদা' ব'লে হল্লা ক'রে ছুটে এল। চেয়ে দেখি, রীতিমত একটা জনতা দাঁড়িয়ে গেছে আমার পেছনে। ছোঁড়াদের এড়িয়ে ছুটে চ'লে আসছি—এই বপু নিয়ে ছোটা কি সহজ ব্যাপার! ভাগ্যিস মিলিটারির দল আশেপাশে ছিল না!

আমি হাসিলাম। গোপালদা বলিলেন, যাকগে, তা এবারে নিচ্ছ তো খুব একহাত সরকার বাহাদুরকে! অত্যাচার, নিপীড়ন, বিদ্রোহ, বিপ্লব—খুব চালাচ্ছ বুঝি?

বলিলাম, তা একটু আধটু—

গোপালদা গম্ভীর গলায় বলিলেন, ওইটি তোমাদের ভুল। বরঞ্চ আমি এই সব-কিছুর মধ্যে একটি অদৃশ্য মঙ্গল হস্তের স্পর্শ ই দেখতে পাচ্ছি। না না, তোমাদের ভগবান-টগবান নয়। কোনও সুকৌশলী দেশপ্রেমিক পলিটিশিয়ান খুব কায়দা ক'রে গবর্মেণ্টের হাতে তামাক খেয়ে যাচ্ছেন, তিনি না থাকলে এসব করবার সুযোগই তোমরা পেতে না। আমি সেই অলক্ষ্য মহাপুরুষকে অহরহ মনে মনে নমস্কার নিবেদন ক'রে যাচ্ছি। সরকারী মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হোক।

গোপালদার হেঁয়ালি বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কৌতুকহাস্যে তাঁহার মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, ও হরি, এই বুদ্ধি নিয়ে এডিটারি ক'রে থাক বুঝি! দেখতে পাচ্ছ

না? একটু অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত কর। মনে ক'রে দেখ, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকের অবস্থা। সব স্তিমিত, নির্বাণোন্মুখ হয়ে আসছিল। গান্ধীজী হিন্দুস্থানী মায় উর্দু হরফ চালাবার খেয়ালে মত্ত, জওহরলাল যাত্রার দলের ভীমের মত 'হেই মারেঙ্গা হোই মারেঙ্গা' ক'রে গদা ঘুরিয়ে এ-আসর ও-আসর ক'রে বেড়াচ্ছেন, সুভাষচন্দ্রের অপঘাত-মৃত্যুর সংবাদ দেশের বুকে চরম আঘাতের মত এসে বাজল। একটু চাঞ্চল্য। বাস্, সবাই মুহ্যমান হয়ে যেন শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়েই পড়ল। বার্মার নো-ম্যানস্-ল্যাণ্ডে আজাদ হিন্দ ফৌজের আসামীদের ধ'রে ধ'রে এক এক ক'রে কোতল করলে কেউ জানতেও পারত না, জানতেও পার নি তোমরা অনেক দিন। তখন এই কূটকৌশলী দেশপ্রাণ ব্যক্তিটি লাগিয়ে দিলেন আই-এন-এ ট্রায়াল, আসামী করালেন তিনি ভারতবর্ষের তিনটি বৃহত্তম এবং শক্তিশালী সম্প্রদায় থেকে বাছাই ক'রে—হিন্দু, মুসলমান আর শিখ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক-একজনকে। কৌশলে সংবাদপত্রে সুভাষচন্দ্রের মহত্তম কীর্তি আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ গবর্মেণ্ট সম্বন্ধে দীর্ঘদিন ধ'রে প্রচারকার্য চলতে লাগল, প্রকাশ পেল সুভাষচন্দ্রের এক অপরূপ মহনীয় রূপ, সারা ভারতবর্ষ, মুক্তিকামী ভারতবর্ষ একটা আশ্রয় পেয়ে মেতে উঠল। 'জয় হিন্দ' এবং 'দিল্লী চলো' ধ্বনি দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা গ্রহণ করল। যে লালকেল্লা অধিকারের স্বপ্ন সুভাষচন্দ্র দেখেছিলেন, এদের বিচার চলল সেই লালকেল্লায়—সোনায় সোহাগা যোজিত হ'ল। তারপর এই বিচারের প্রহসন থেকে ভারতবর্ষ কি লাভ করলে, তা তো চোখেই দেখতে পেলে। আসমুদ্র হিমাচল এক সুভাষচন্দ্রের নামে এক ধ্যান এক লক্ষ্যের পথে কতখানি এগিয়ে গেল, গত ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সেটা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে থাকবে। বোম্বাইয়ের সেদিনের ব্যাপারে বেশ ভাল ক'রেই বোঝা গেল, কংগ্রেস-মনোভাবাপন্ন শা নওয়াজকে মুসলমান সমাজ হৃদয় মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করলে না। অর্থাৎ তারা এই উত্তেজনার বাইরে থেকে গেল। তখন ভারতীয় রক্তকরবীর এই রাজাটি ভারতসরকারকে দিয়ে একটি মোক্ষম চাল চালালেন। আব্দার রসীদের লীগ-আনুগত্যের এবং কংগ্রেস-বিমুখতার ঘোষণা একদিন সংবাদ-পত্রে বেরিয়ে গেল। তার পরেই জঙ্গীলাটবাহাদুরকে দিয়ে এই আজাদ হিন্দ ফৌজীকে দেওয়ানো হ'ল সাত বছরের জেল। শান্ত এবং নির্লিপ্ত মুসলমান সমাজেও আগুন ধ'রে গেল। তার ফল কি দাঁড়াচ্ছে, তা

তো চোখেই দেখতে পেলে সেদিন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নি বা হবেন না। অরুণা আসফ আলি, অচ্যুৎ পটবর্ধন, জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং রামমনোহর লোহিয়া—দাবার চালের মুখে এদেরও তিনি গুটির মতন ব্যবহার করবেন ব'লে আমার, কেন জানি না, বিশ্বাস হচ্ছে; শেষ-মেষ দাবার চাল অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের চাল তো আছেই। এই চালেই রাজা মাত হবেন ব'লেই আমার মনে হচ্ছে। এখন দেখা যাক। ফলেন পরিচীয়তে।

গোপালদা চুপ করিলেন। প্রাকৃত ভাষা এবং মুখের শান্ত হাসি দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছিলাম। মস্তিষ্কবিকৃতির কোনও লক্ষণই নাই। আমার বিস্ময় গোপালদা লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন, এই ১৪৪ ধারাও একটা চাল হতে পারে, বুঝলে? তোমরা মন্ত্রগুপ্তি জান না, সব কাজই হাট বসিয়ে পণ্ড ক'রে বস। এবার বিকেন্দ্রীকরণ অভ্যাস কর। এঁরা তারই সুযোগ দিচ্ছেন।

সত্য সত্যই একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। গোপালদাকে আর ঘাঁটাইতে সাহস হইল না। চুপচাপ খবরের কাগজের পাতা উলটাইতে লাগিলাম। গোপালদা হঠাৎ বলিলেন, দেখ, আমার মাথাটা যেন ঘুরছে, একটু জল দিতে পার? ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি জল লইয়া তাঁহার মাথায় দিতে লাগিলাম। সহসা অনুভব করিলাম, গোপালদা পরিবর্তিত হইতেছেন। তাঁহার মধ্যে সেই আবেশ আসিল, যাহা তাঁহাকে এই ধূলিমাটির পৃথিবী হইতে দূরে লইয়া যায়। তিনি সেই আসনপিঁড়ি অবস্থায় দুলিতে লাগিলেন, হঠাৎ দূরে অঙ্গুলিনির্দেশ করিতে করিতে প্রায় আর্তনাদের মত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, দেখ, ওই দেখ। মুখ তুলিয়া সেইদিকে চাহিলাম। কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

—দেখিতেছ না, মাতঙ্গিনী হাজরার পিছনে পিছনে রামেশ্বরের দল এবং তারও পিছনে দেবব্রতের দল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িতেছে, উহাদের দৃঢ়মুষ্টি একটুও শিথিল হয় নাই। আহা-হা, ওই এগারো বৎসরের অপোগণ্ড বালক দেবব্রত দাস। বুকে গুলিবিদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে চৌরঙ্গী সাকুলার রোডের মোড়ে যখন সে ছটফট করিতেছিল, তখন সঙ্গিনের খোঁচায় তাহার উদর ছিন্নভিন্ন করিয়াও কি উহারা উহাকে দমাইতে পারিয়াছে? শুনিতে পাইতেছ না, হাসপাতালের বেয়ারাকে তাহার জন্য কাঁদিতে দেখিয়া মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে সে হাসিমুখে বলিতেছে, আমি দেশের জন্য

মরিতেছি ভাই, এখন চোখের জল ফেলিতে নাই, তুমি হাস, আনন্দ কর। শুধু একা কি উহারাই? আমি দেখিতে পাইতেছি মাতঙ্গিনী-রামেশ্বর-দেবব্রতেরা দলে দলে অগ্রসর হইতেছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে। মৃত্যুকে উহারা ভয় করে না, পরাধীনতার কলঙ্ক আর উহারা সহিতে পারে না। মুক্তি চাই, বন্ধনশৃঙ্খল ভাঙিতেই হইবে।

গোপালদা থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বোধ হইল, প্রদীপ্ত দীপশিখা সহসা নির্বাপিত হইল।

—

সমস্ত পৃথিবীতে এবং বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে আসন্ন দুর্ভিক্ষের ডামাডোল বাজিয়া উঠিয়াছে। বাংলা দেশের ঘরপোড়া গরু আমরা, সর্বত্র সিঁদুরে মেঘের ঘোষণা শুনিয়া অত্যন্ত আতঙ্কিত হইতেছি। কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষে অন্নাভাব ও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যখন রব উঠিয়াছিল, দুই-একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন দেখিয়াছিলাম। তাহার পর সরকারী নীতির পরিবর্তন হইয়া থাকিবে, বেসরকারী নেতাদের সঙ্গে সরকারী নেতারাও এখন উচ্চকণ্ঠে দুর্ভিক্ষের উদ্বোধন-সঙ্গীত গাহিতেছেন। স্মরণ হইতেছে, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট-আন্দোলনের পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার একজন নাকি ভারতসরকারকে গোপন ইস্তাহারে আদেশ করিয়াছিলেন, কুকুরদের ক্ষুধার্ত রাখো, তাহা হইলেই তাহারা আর চেল্লাচেল্লি করিতে পারিবে না। আহার্যের দিকে কুকুরদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবার জন্যই ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ সৃষ্ট হইয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু দেখিয়াছি বাংলা দেশের কুকুরেরা ক্ষুধায় ধুঁকিতে ধুঁকিতেও চেল্লাচেল্লি করিতে ছাড়ে নাই। তাই আশা হইতেছে, এবারে ঠিক এক উদ্দেশ্যেই দুর্ভিক্ষ সৃষ্ট হইবে না। ভারতের বড়লাটবাহাদুর এবার শুরু হইতেই হাল ছাড়িয়া দিয়া দেশীয় নেতাদের হাতে সেটি তুলিয়া দিবার আয়োজন করিতেছেন। নেতারা স্ব স্ব বুদ্ধি এবং অভিপ্রায় মত পরামর্শ দিতেছেন, শর্ত দাখিল করিতেছেন। শেষ পর্যন্ত কে বা কাহারা আমাদের মুদ্দোফরাস হইবেন তাহা বুঝিতে না পারিলেও একটা বিষয়ে নিঃসংশয় হইতেছি যে, দুর্ভিক্ষ অনিবার্য এবং এই দুর্ভিক্ষ শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া ইহার প্রকোপ দেখা দিবে অর্থাৎ ভারতবর্ষের বাহির হইতে দুর্ভিক্ষকালীন কোনও সাহায্যের আশা ভারতবর্ষের নাই।

বড়লাটের শাসন-পরিষদের সংবাদ-বিভাগের কর্তা সার্ আকবর হায়দরী গত ১৭ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সম্পাদক-সম্মেলনে জানাইয়াছেন, গত কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষে ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইতেছে, এবারে শস্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়াতে আশঙ্কা করা যাইতেছে, আরও ৪০ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি হইবে। অর্থাৎ ৭০ লক্ষ টন আহার্যের অভাব ঘটিবে। সরকারের তরফ হইতে প্রতিকারের বহুবিধ চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না; বাহির হইতে আমদানির আশাও নাই। মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টত ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে জাতীয় শাসন প্রবর্তিত হইলে সহজেই দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইবে। অর্থাৎ বৈদেশিক শাসনের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও বণ্টনের যে সকল অন্তরায় ঘটিতেছে, তাহা অচিরাৎ দূর করিতে না পারিলে এরূপ ঘটিতেই থাকিবে। ইহা একপ্রকার চ্যালেঞ্জ। আমাদের বিশ্বাস, এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলে বর্তমান ভারত গবর্মেণ্ট মান বাঁচাইতে পারিবেন। বিপদের সুযোগ লইয়া গান্ধীজী এইরূপ দাবি জানাইতেছেন বলিয়া ভারতে মিঃ জিন্না এবং ভারতের বাহিরে কোন কোন ব্রিটিশ সাময়িক পত্র অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। ভারতের দশ কোটি মুসলমানের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের দাবিদার মিঃ জিন্না ভদ্রলোক, তিনি সেই এক কথাই কপচাইতেছেন—এই দুঃসময়ে গবর্মেণ্টের সহযোগিতা করিতে হইবে। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, ১৩৫০-এর মন্বন্তরে তিনি এবং তাঁহার দলীয় লোকেরা গবর্মেণ্টের সহযোগিতা করিয়াও বাংলা দেশের অর্ধকোটি লোকের অপমৃত্যু রোধ করিতে পারেন নাই; ভুলিয়া গিয়াছেন, এই অর্ধকোটির অর্ধেকেরও বেশি তাঁহারই স্বধর্মাবলম্বী ছিল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং সদ্যমুক্ত শ্রীমতী অরুণা আসফআলি ভারতবর্ষের জনসাধারণের বুকে আশার সঞ্চার করিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, এবারে রক্তমূল্যে তাঁহারা সাধারণের জন্য আহার্য সংগ্রহ করিবেন, গতবারের মত নিশ্চেষ্ট অবস্থায় কাহাকেও মরিতে দিবেন না। তাঁহাদের কথার গূঢ় অর্থ এই যে, আহার্যের ঘাটতি হইবে না, মজুতদারেরা অথবা গবর্মেণ্ট তাহা গোপনে সংরক্ষিত করিয়া রাখিবে। শান্ত ও অহিংসভাবে লুটতরাজ চালাইতে পারিলেই সকলের আহারের ব্যবস্থা হইবে।

এই ধরনের বিবিধ ঘোষণার মধ্যে আমরা—সাধারণ মানুষেরা—সত্য সত্যই

বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। মহাত্মা গান্ধী, সার্ আকবর হায়দরি সকলেই আহার্যের পরিমাণ কম করিতে উপদেশ দিতেছেন। এদেশে সৌভাগ্যবান হাজার-করা পাঁচ জন মাত্র প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহারের সুযোগ পায়, বাকি ৯৯৫ জন যাহা খায়, তাহা ভারতবর্ষের বাহিরে 'আণ্ডারফিডিং' বলিয়া গণ্য হইবে। এদেশের অধিকাংশ লোকই যে প্রয়োজনের অনেক কম খাইতে পায়, তাহার প্রমাণ ম্যালেরিয়ার আত্যন্তিক বিস্তারের মধ্যেই পাওয়া যায়। যাহারা পারে, নিজেদের কল্যাণের জন্যই আহার্যের পরিমাণ তাহাদের কমানো উচিত, কিন্তু তাহারা কয় জন? একমাত্র তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমাজের কথা বলিতে পারি, যাঁহারা অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্য এবং সামাজিকতা ও লৌকিকতা পরিহার করিয়া এখনও কিছু পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে পারেন। ধনী ব্যক্তিরা তথাগতের মত সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সমাজের উপকার সাধন করিতে পারেন বটে, তাঁহারা তাহা করিলে আমরা প্রয়োজনের সময় লুঠ করিব কি? সুতরাং আমরা দুর্ভিক্ষের এবং তাহার চরম পরিণাম অকাল-মৃত্যুর প্রতীক্ষাই শুধু করিতে পারিব এবং এইমাত্র ভরসা লইয়া মরিতে পারিব যে, আমরা মরিয়া গেলে আমাদের কঙ্কালের বিনিময়ে সদাশয় গবর্মেণ্ট কয়েক সহস্র মুদ্রা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে পারিবেন। ১৩৫০-এর মন্বন্তরের এই কল্যাণকর পরিণাম সংবাদপত্র মারফৎ জ্ঞাত হইয়াই পুলকিত হইয়া উঠিয়াছি।

—

বাংলা দেশে সেল-ট্যাক্স প্রায় জিজিয়া করের সামিল হইতে চলিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্য বহু প্রদেশ যখন এই কর হইতে মুক্ত ছিল, তখন আমাদিগকে বাধ্য করিয়া এই কর আদায় করা হইয়াছে, এবং এক পয়সা হইতে দুই পয়সা এবং দুই পয়সা হইতে তিন পয়সায় ইহার দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। বাংলা দেশের অপরাধ—যুদ্ধ এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহাকে ব্যবসায়গত সহস্রবিধ অসুবিধার, সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, যানবাহন আমদানি-রপ্তানির গোলযোগে ব্যবসাবাণিজ্য ঠিকমত চলিতে পায় না, সামরিক প্রয়োজনে বাংলা দেশের বহু চাষের জমি পতিত রাখিতে হইয়াছে; বাংলা দেশের অপরাধ—এখানে মনুষ্য-নির্মিত দুর্ভিক্ষে অর্ধকোটি লোকের জীবনাবসান ঘটিয়াছে। যাহারা এত বোঝাই সহ্য করিতেছে, তাহাদের উপর শাকের আঁটি এই সেল-ট্যাক্স ততটা অসহ্য হইবে না—সম্ভবত কর্তাদের ইহাই ছিল যুক্তি। ভাল যুক্তি।

সম্প্রতি তিন পয়সাকে চার পয়সায় পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার সরকারী আদেশ জারি হইয়াছে, ফলে বাংলা দেশের সর্বত্র যে প্রতিবাদ ও হরতালের ঢেউ উঠিয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে, এই চার পয়সার শেষ পয়সাটি উঠের পিঠ ভাঙিবার শেষ খড়গাছা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সকল ব্যবসায়ী প্রতিবাদ করিতেছেন, তাঁহারা দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষ লইয়া লড়িতেছেন বলিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

—

ব্যক্তিগত ভাবে যাহা পাপ, নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয়, সমবেত ও সম্মিলিত ভাবে তাহাও সমর্থনযোগ্য ও প্রশংসার্হ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ব্যক্তিগত নরহত্যা পাপ—যুদ্ধক্ষেত্রে দল বাঁধিয়া নরহত্যায় লিপ্ত হইলে বীরখ্যাতি লাভ হয়। বলাৎকার ও নারীধর্ষণ ব্যক্তিগত ভাবে পাপ তো বটেই, কোনও মেয়েকে প্রলোভন দেখাইয়া ঘরের বাহির করিয়া লইয়া গেলেও সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধানে দণ্ডনীয় হইতে হয়। ব্যাপকভাবে মেয়েদের ফুসলাইয়া লইয়া গিয়া নষ্ট বা জখম করিলে পাপ হয়, না, পুণ্য হয়—ইহা লইয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষে এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে। ভারতে এবং বৃহত্তর ভারতে নিয়োজিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বেতনভোগী সৈন্যদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য এখানে যে নারী-ফালতুবাহিনী গড়িয়া তোলা হইয়াছিল, 'ওয়াকি' নামে তাহা এই দেশের সর্বত্র যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। এদেশীয় মেয়েদের এই বাহিনীতে আকর্ষণ করিবার জন্য সরকার বাহাদুর বহু চটকদার বিজ্ঞাপনে, পোস্টারে ও প্রচার-পুস্তিকায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। অনেক দেশপ্রেমিক লণ্ঠন-বক্তাকেও তাঁহারা এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় খ্যাত এইরূপ একজন দেশপ্রেমিক বক্তাকে আমরা গড়ের মাঠে এই সকল মেয়েদের ভবিষ্যৎ সোনার রঙে চিত্রিত করিয়া বক্তৃতা দিতেও দেখিয়াছি। একটি পলিটিকাল পার্টিও এই ব্যপদেশে প্রভূত প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন। করাচীতে অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল কর্তৃক কয়েকজন ভারতীয় মহিলার সম্ভ্রমহানি ঘটিলে ভারতের উচ্চপদস্থ একজন রাজকর্মচারী মানবতার দোহাই পাড়িয়াছিলেন, এ কথাও আমাদের স্মরণ আছে। এই 'ওয়াকি'দের একশো জনে মিলিয়া সুবিচারপ্রার্থী হইয়া একটি আবেদন-পত্র বোম্বায়ের 'ব্লিৎস' নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই আবেদন-পত্রে প্রকাশ, সমষ্টিগত ভাবে

বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। মহাত্মা গান্ধী, সার্ আকবর হায়দরি সকলেই আহার্যের পরিমাণ কম করিতে উপদেশ দিতেছেন। এদেশে সৌভাগ্যবান হাজার-করা পাঁচ জন মাত্র প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহারের সুযোগ পায়, বাকি ৯৯৫ জন যাহা খায়, তাহা ভারতবর্ষের বাহিরে 'আণ্ডারফিডিং' বলিয়া গণ্য হইবে। এদেশের অধিকাশ লোকই যে প্রয়োজনের অনেক কম খাইতে পায়, তাহার প্রমাণ ম্যালেরিয়ার আত্যন্তিক বিস্তারের মধ্যেই পাওয়া যায়। যাহারা পারে, নিজেদের কল্যাণের জন্যই আহার্যের পরিমাণ তাহাদের কমানো উচিত, কিন্তু তাহারা কয় জন? একমাত্র তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমাজের কথা বলিতে পারি, যাঁহারা অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্য এবং সামাজিকতা ও লৌকিকতা পরিহার করিয়া এখনও কিছু পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে পারেন। ধনী ব্যক্তিরা তথাগতের মত সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সমাজের উপকার সাধন করিতে পারেন বটে, তাঁহারা তাহা করিলে আমরা প্রয়োজনের সময় লুঠ করিব কি? সুতরাং আমরা দুর্ভিক্ষের এবং তাহার চরম পরিণাম অকাল-মৃত্যুর প্রতীক্ষাই শুধু করিতে পারিব এবং এইমাত্র ভরসা লইয়া মরিতে পারিব যে, আমরা মরিয়া গেলে আমাদের কঙ্কালের বিনিময়ে সদাশয় গবর্মেণ্ট কয়েক সহস্র মুদ্রা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে পারিবেন। ১৩৫০-এর মন্বন্তরের এই কল্যাণকর পরিণাম সংবাদপত্র মারফৎ জ্ঞাত হইয়াই পুলকিত হইয়া উঠিয়াছি।

—

বাংলা দেশে সেল-ট্যাক্স প্রায় জিজিয়া করের সামিল হইতে চলিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্য বহু প্রদেশ যখন এই কর হইতে মুক্ত ছিল, তখন আমাদিগকে বাধ্য করিয়া এই কর আদায় করা হইয়াছে, এবং এক পয়সা হইতে দুই পয়সা এবং দুই পয়সা হইতে তিন পয়সায় ইহার দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। বাংলা দেশের অপরাধ—যুদ্ধ এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহাকে ব্যবসায়গত সহস্রবিধ অসুবিধার, সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, যানবাহন আমদানি-রপ্তানির গোলযোগে ব্যবসাবাণিজ্য ঠিকমত চলিতে পায় না, সামরিক প্রয়োজনে বাংলা দেশের বহু চাষের জমি পতিত রাখিতে হইয়াছে; বাংলা দেশের অপরাধ—এখানে মনুষ্য-নির্মিত দুর্ভিক্ষে অর্ধকোটি লোকের জীবনাবসান ঘটিয়াছে। যাহারা এত বোঝাই সহ্য করিতেছে, তাহাদের উপর শাকের আঁটি এই সেল-ট্যাক্স ততটা অসহ্য হইবে না—সম্ভবত কর্তাদের ইহাই ছিল যুক্তি। ভাল যুক্তি।

সম্প্রতি তিন পয়সাকে চার পয়সায় পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার সরকারী আদেশ জারি হইয়াছে, ফলে বাংলা দেশের সর্বত্র যে প্রতিবাদ ও হরতালের ঢেউ উঠিয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে, এই চার পয়সার শেষ পয়সাটি উঠের পিঠ ভাঙিবার শেষ খড়গাছা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সকল ব্যবসায়ী প্রতিবাদ করিতেছেন, তাঁহারা দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষ লইয়া লড়িতেছেন বলিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

—

ব্যক্তিগত ভাবে যাহা পাপ, নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয়, সমবেত ও সম্মিলিত ভাবে তাহাও সমর্থনযোগ্য ও প্রশংসার্হ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ব্যক্তিগত নরহত্যা পাপ—যুদ্ধক্ষেত্রে দল বাঁধিয়া নরহত্যায় লিপ্ত হইলে বীরখ্যাতি লাভ হয়। বলাৎকার ও নারীধর্ষণ ব্যক্তিগত ভাবে পাপ তো বটেই, কোনও মেয়েকে প্রলোভন দেখাইয়া ঘরের বাহির করিয়া লইয়া গেলেও সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধানে দণ্ডনীয় হইতে হয়। ব্যাপকভাবে মেয়েদের ফুসলাইয়া লইয়া গিয়া নষ্ট বা জখম করিলে পাপ হয়, না, পুণ্য হয়—ইহা লইয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষে এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে। ভারতে এবং বৃহত্তর ভারতে নিয়োজিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বেতনভোগী সৈন্যদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য এখানে যে নারী-ফালতুবাহিনী গড়িয়া তোলা হইয়াছিল, 'ওয়াকি' নামে তাহা এই দেশের সর্বত্র যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। এদেশীয় মেয়েদের এই বাহিনীতে আকর্ষণ করিবার জন্য সরকার বাহাদুর বহু চটকদার বিজ্ঞাপনে, পোস্টারে ও প্রচার-পুস্তিকায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। অনেক দেশপ্রেমিক লণ্ঠন-বক্তাকেও তাঁহারা এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় খ্যাত এইরূপ একজন দেশপ্রেমিক বক্তাকে আমরা গড়ের মাঠে এই সকল মেয়েদের ভবিষ্যৎ সোনার রঙে চিত্রিত করিয়া বক্তৃতা দিতেও দেখিয়াছি। একটি পলিটিকাল পার্টিও এই ব্যপদেশে প্রভূত প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন। করাচীতে অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল কর্তৃক কয়েকজন ভারতীয় মহিলার সম্ভ্রমহানি ঘটিলে ভারতের উচ্চপদস্থ একজন রাজকর্মচারী মানবতার দোহাই পাড়িয়াছিলেন, এ কথাও আমাদের স্মরণ আছে। এই 'ওয়াকি'দের একশো জনে মিলিয়া সুবিচারপ্রার্থী হইয়া একটি আবেদন-পত্র বোম্বায়ের 'ব্লিৎস' নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই আবেদন-পত্রে প্রকাশ, সমষ্টিগত ভাবে

তাঁহাদিগকে ফুসলাইয়া লইয়া গিয়া সকল প্রকারে নষ্ট করা হইয়াছে, আজ তাঁহারা সকলেই এই মহাপাপের বিরুদ্ধে প্রতিকার দাবি করিতেছেন।

কে এই প্রতিকার করিবে? সরকারী প্রচারকেরা ইহাকে পুণ্যকার্য বলিয়াই প্রমাণ করিয়া দিবেন। "ক্ষুধিতেরে অন্নদানসেবা, তোমরা লইবে বল কেবা" বলিয়া নব-নগরলক্ষ্মী কবিতাও হয়তো কোনও কবি কাঞ্চনমূল্যে রচনা করিয়া দিয়া সরকারী প্রশংসা লাভ করিবেন; ভারতীয় নারীদের সুমহৎ অতিথিপরায়ণতার কথাও হয়তো অতঃপর লণ্ঠন-বক্তাদের মুখে শুনা যাইবে। সুতরাং এইসব ভ্রান্ত মেয়েদের সর্বনাশের কোনও প্রতিকারই হইবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার বহু জয়তিলকই আমরা সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি, এই কলঙ্কতিলকও আমাদিগকে বৈষ্ণবীমতে বহন করিতে হইবে। ভবিষ্যতের জন্য আমরা শিক্ষালাভ করিলেই এতখানি আত্মবলিদান সার্থকতা লাভ করিবে। আবার যখন প্রয়োজন হইবে, তখন বাহিনীর নাম এবং ফুসলাইবার পদ্ধতির হয়তো বদল হইবে; কিন্তু এই মহাফাঁদে ভারতীয় অবলারা যাহাতে না পড়েন, ভারতীয় মহিলাসঙ্ঘগুলি সে বিষয়ে সচেতন ও অবহিত হইবেন।

---

৭ ফাল্গুন মঙ্গলবারের দৈনিক পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"অদ্য গবর্মেণ্ট-হাউসে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে বিদায় লইবার সময় মিঃ কেসী 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দ্বারা সম্বর্ধিত হন এবং প্রত্যুত্তরে তিনিও 'জয় হিন্দ' ধ্বনি করেন।"

মিঃ কেসী ঠিকই করিয়াছেন, বিদায়ের কালে গরু মারিয়া জুতা দান করিয়া গেলেন। কিন্তু কলিকাতার হতভাগ্য আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন সাংবাদিকের দল যে সেই জুতা গলায় পরিয়া আসিয়া ঘটা করিয়া তাহা সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করিলেন, ইহাতেই আমরা মরমে মরিয়া যাইতেছি। কলিকাতার রাস্তার রক্ত এখনও শুকায় নাই। ইহারা এমনই দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, যে-মুখে সেদিন কলিকাতায় সামরিক শাসন ঘোষিত হইয়াছে, সেই মুখে উচ্চারিত হইয়া 'জয় হিন্দ' ধ্বনি যে কলঙ্কিত হইয়াছে, এইটুকু বোধশক্তিও ইহারা হারাইয়াছেন। ইহারাই দেশের জনমত গঠন করিয়া থাকেন! দুর্ভাগ্য আমাদের।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫২

গান্ধীজী কি চান

প্রায় বারো বৎসর পূর্বে গান্ধীজীর লেখা হইতে আমি একখানি ক্ষুদ্র সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করি। সেই বইখানির নূতন সংস্করণ যাহাতে গান্ধীজীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নবজীবন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া কয়েক মাস পূর্বে সেবাগ্রামে জনৈক বন্ধুকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাই যে, গান্ধীজী বাংলা দেশে আসিলে আমি যেন নিশ্চয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেইজন্য সোদপুরে অবস্থানকালে সংবাদ দেওয়ার পর একদিন গান্ধীজী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সেদিন তারিখ ৪ঠা নভেম্বর ১৯৪৫ সাল। বেলা ৪টা ১৫ মিনিটের সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। সোদপুরে খাদি-প্রতিষ্ঠানের আশ্রমে একটি খোলা বারান্দায় গান্ধীজীর খাট পাতা ছিল, সারাদিন সেইখানে বসিয়াই তিনি কাজকর্ম করিতেন, কখনও বা পাশে ঘরের মধ্যে বসিয়া লেখাশুনা বা কথাবার্তার কাজ করিতেন। সেদিন যেখানে খাট পাতা ছিল, তাহার কাছেই উপরে পরিপাটিভাবে একটি মশারি টাঙানো ছিল। মশারিটির বৈশিষ্ট্য আছে, ইহার চারটি খুঁট নয়, মাত্র দুইটি খুঁট, দোচালা ঘরের চালের মত খাটের উপরে খাটানো হয়। গান্ধীজী পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় উপরে বসিয়া ছিলেন, নিকটে একটি ছোট টুলের উপর দুই-একটি ধাতুপাত্র ছিল, এদিকে ওদিকে কয়েকখানি বেতের মোড়া পাতা ছিল।

নিকটে যাইবার পর আমাকে একটি মোড়ায় বসিতে বলিলেন এবং নিজেই কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। সেই কথাবার্তার মধ্যে সামান্য অংশ বাদ দিয়া নীচে প্রকাশ করিতেছি। বাদ দিবার কারণ, কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছিল, তদ্ভিন্ন আলোচনার বাহিরেও দুই একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লইয়াও কথা হইয়াছিল। সেগুলি মনে আছে, কিন্তু লিপিবদ্ধ করি নাই, প্রয়োজন ছিল না।

গান্ধীজী আরম্ভ করিলেন, তুমি শুধু যে আমার লেখা হইতে সংকলন কর, তাহা নয়, ব্যাখ্যাও করিবার চেষ্টা কর। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমি যাহা লিখি, কাজে পরিণত করিবার সময়ে তাহা হইতে ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব আমি চাই যে, যখন আমি কাজে ব্যাপৃত থাকি, অথবা দেশের মধ্যে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করি, তখন তোমার পক্ষে সঙ্গে থাকিয়া সকল বিষয় দেখা দরকার। কয়দিন পূর্বে আমি মেদিনীপুরে নাড়াজোলের মহারাজার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সেখানে সোনার পাত্রে আমাকে খাইতে দেওয়া হয়। যদিও সোনার থালে খাওয়া আমার পক্ষে

বিরুদ্ধ কাজ, তবু আমি তখন খাইতে ত অস্বীকার করি নাই। সেইরূপ আর একবার রেলে ভ্রমণকালে আমি আঙুর খাইতেছিলাম। জনৈক সহযাত্রী তাহা দেখিয়া আমাকে তিরস্কার করেন যে, এত দামী ফল আমার পক্ষে খাওয়া উচিত নয়।

আমি—তিনি হয়ত কোথাও শুনিয়া থাকিবেন, আপনি দৈনিক ছয় পয়সার মত আহার করেন।

গান্ধীজী—তুমি ঠিক বলিয়াছ, তাঁহার সেইরূপ ধারণাই ছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, ভালই হইয়াছে। আপনি আমাকে আঙুর খাইতে দেখিলেন। আপনার উচিত, ইহা প্রকাশ করা যে গান্ধী যদিও দরিদ্রের সঙ্গে এক হওয়ার আদর্শ প্রচার করে, কিন্তু কার্যত সে এখনও সিদ্ধিলাভ করে নাই। কিন্তু ভদ্রলোক অকারণে লজ্জিত হইয়া উঠিলেন।

আমি—বাপুজী, এ বিষয়ে আমরা আপনাকে ভুল বুঝিব কেন?

গান্ধীজী—কিন্তু আদর্শ এবং সাধনার মধ্যে যে ব্যবধান কার্যত আসিয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাবে তোমার জানা দরকার। আমি যাহা লিখি, তুমি তাহা হইতে আমার সমগ্র রূপ পাইবে না। কারণ লেখায় আদর্শ সম্বন্ধে আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠে, আমি বাস্তবে যেখানে পৌঁছিয়াছি তাহার প্রতিচ্ছবি ত থাকে না। অতএব শুধু লেখার বিচার করিলে তুমি আমার সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করিতে পারিবে না। আমার দৈনন্দিন আচরণ, এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান আদর্শকে রূপ দিবার জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলির সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ-পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

দক্ষিণ-আফ্রিকার জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'গান্ধী, তুমি ভাল, কিন্তু যাহারা তোমার সঙ্গে কাজ করে তাহারা ভাল নয়'। আমি উত্তর দিয়াছিলাম, 'যাহাদের লইয়া আমার কাজ, যাহাদের সহযোগিতায় অহিংসার আদর্শকে রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছি, তাঁহারা যদি অক্ষম হয় তবে সে অক্ষমতা আমার নিজের; স্বতন্ত্রভাবে আমি ভাল হই কেমন করিয়া? ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু ঘটিলে, তাহার মূল নিশ্চয় আমারই মধ্যে নিহিত আছে, আদর্শটিকে কার্যকরীভাবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব আমিই লইয়াছি।

আমি—বাপুজী, এজন্যও আমার পক্ষে আপনার কাজ পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা ভারতবর্ষে যে সকল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, আপনার আদর্শ কার্যে যে রূপ লইতেছে, তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ-সংযোগ ত রহিয়াছে।

গান্ধীজী—সে কথা ঠিক হইতে পারে। রোম্যাঁ রোলাঁর সহিত আমার আলাপ হইবার পূর্বেই তিনি আমার একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মত প্রতিভাশালী লেখকের কথা স্বতন্ত্র।

আমি—কিন্তু বাপুজী, রোলাঁ আপনার প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার করিয়াছিলেন বলিয়া

আমার মনে হয় না। অহিংস অসহযোগের বীর্যের দিকটি তাঁহার দৃষ্টিতে ঠিকই ধরা পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতের সমগ্র আন্দোলনকে তিনি নেতিধর্মী মনে করিয়াছিলেন, ইউরোপের সংস্কৃতি বা সাধনাকে অস্বীকার করাই যেন তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতের অহিংস আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে এরূপ মত পোষণ করা ঠিক হয় নাই।

গঠনকর্মের ভিতর দিয়া যে নূতন জীবন আপনি গড়িয়া তুলিতে চান, তাহার প্রভাবে বিরুদ্ধ শক্তি ক্ষীণ হইয়া অবশেষে নিঃশেষ হইয়া যায়; অবহেলা এবং উপেক্ষার আঘাতে, সাক্ষাৎ-আক্রমণের ফলে নয়। এবং আপনার ভাঙা নূতন জীবন-গড়ার ভিতর দিয়াই সাধিত হয়। এদিকটির প্রতি রোলাঁ সুবিবেচনা করেন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র। সমগ্র দেশময় আপনার আদর্শের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করিতে পারি—নিজের জীবনের মধ্যে এবং সমাজের জীবনের মধ্যে। সেইজন্য আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু আপনার গড়া প্রতিষ্ঠানের কথা স্বতন্ত্র। সেগুলির সম্বন্ধে আমার একটি স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা আছে।

গান্ধীজী—রোলাঁর সম্পর্কে তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা অংশত সত্য এবং সেইজন্য আমি সাক্ষাতের পর তাঁহাকে ভারতবর্ষে আসিয়া সব বস্তু নিজে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁহার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সৌভাগ্য আমাদের আর ঘটিয়া উঠিল না।

কিন্তু আমি যে বিষয়ে বলিতেছিলাম। কেহ কেহ মনে করেন, অহিংসার আদর্শকে পালন করা সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত। যাঁহারা আপাতত অহিংস-সাধনার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাও আমার ব্যক্তিগত প্রভাবের যাদুমন্ত্রের দ্বারা চালিত হইতেছেন। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া আমি মনে করি না। অহিংস আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার বশে তাঁহারা চলিয়াছেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সেই চলার মধ্যে পদে পদে ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। আমি চাই, অহিংসার আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় আমাদের গতির সম্বন্ধে সংস্কারশূন্য মন লইয়া লোকে দৃষ্টিপাত করুক, বৈজ্ঞানিকের সুস্পষ্ট দৃষ্টি লইয়া পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে বিচার করুক এবং অহিংসাকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার দ্বারা উত্তরোত্তর কতদূর পর্যন্ত রূপ দেওয়া যায় তাহার যথাযথ বিচার করুক। পরীক্ষার মধ্যে যদি পূর্বাহ্নে আমাদের ধারণা থাকে যে, অহিংস-সাধন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে সেরূপ লোকের বিচার কখনও সঠিক হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকের মুক্ত সত্যদৃষ্টি সাধনের প্রয়োজন আছে, এবং এইরূপ দৃষ্টি লইয়াই তুমি প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরীক্ষা কর ও তোমার মনে ঠিক যাহা আসে, তাহা আমাকে জানাও।

আমি—বাপুজী, এরূপ গুরু দায়িত্বের যোগ্য আমি নই।

গান্ধীজী—ব্যক্তিগতভাবে তোমার কথা নয়। আমি সত্যসন্ধানী সকল মানুষের কাছে অহিংস আদর্শ ও সাধনার সম্বন্ধে সম্যক্ বিচার চাই। শ্রদ্ধার সহিত, সহানুভূতির সহিত, মানুষ ভারতবর্ষে অহিংস প্রচেষ্টার সম্পর্কে অনুসন্ধান, বিচার এবং চিন্তা করুক, ইহাই আমার প্রার্থনা।

আশ্চর্য মানুষ! সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহার প্রভাবের দ্বারা আজ প্রভাবান্বিত হইয়াছে, ভারতে জনসাধারণের উদ্বুদ্ধ আত্মা যাঁহার ভাষায় ভাষা পায়, যাঁহার নির্দেশিত কর্মধারার মধ্য দিয়া যাহাদের মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করে, যিনি বিপথগামী জনশক্তিকে স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী সুনিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি ধরেন, নিজের সম্পর্কে তাঁহার কি আশ্চর্য অভিমানশূন্যতা, কি অসাধারণ কঠোর সত্যনিষ্ঠা! গান্ধীজী যে বলেন, 'পূর্বে আমি বলিতাম ঈশ্বর সত্যের মূর্তিতে প্রকাশিত হন, কিন্তু আজ বলি—সত্য-ই ব্রহ্মস্বরূপ', এ কথা উপনিষদের বাণীর মতই সংস্কারশূন্য অনুভবসিদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। হয়ত এমনই অপর একজন সত্যসন্ধানী সাধক বহুযুগ পূর্বে বলিয়াছিলেন—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

সত্যের স্বরূপ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত হইয়া আছে। আমার সত্যধর্মের উপলব্ধির জন্য, হে পূষন্, তুমি দৃষ্টিপথ হইতে সেই আচ্ছাদনকে অপসারিত কর।

নির্মলকুমার বসু

শরৎ-সাহিত্য-পরিচয়

(রেঙ্গুনের পত্র)

২

[চৈত্র ১৩১৯]

প্রিয় ফণীবাবু,—আপনার প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠাইয়াছি। প্রবন্ধ দুটী মন্দ নয় দেওয়া চলে, 'চক্ষু' সম্বন্ধে প্রবন্ধটা বেশ।

চন্দ্রনাথ লইয়া ভারী গোলমাল হইতেছে। না জানিয়া হাতে না পাইয়া এই সব বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দেওয়া ছেলেমানুষির এক শেষ। তাহারা সমস্ত বই চন্দ্রনাথ দিবে না, এজন্য মিথ্যা চেষ্টা করিবেন না। তবে, নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবে আমার একেবারে ইচ্ছা নয় আমার পুরাণ লেখা যেমন আছে তেমনিই প্রকাশ হয়। অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে সেগুলি সংশোধন করিতে যদি পাই ত ছাপা হইতে পারে অন্যথা

নিশ্চয় নয়। এক কাশীনাথ লইয়া আমি যথেষ্ট লজ্জিত হইয়াছি—আর যে বন্ধুবান্ধবদের নিকটে এই লইয়া লজ্জা পাই আমার ইচ্ছা নয়। তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলেচ্ছাই করিয়াছেন কিন্তু আমার মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। চন্দ্রনাথ বন্ধ থাক। চরিত্রহীন জ্যৈষ্ঠ থেকে সুরু করুন। আর যদি চন্দ্রনাথ বৈশাখে সুরু হইয়াই গিয়া থাকে (অবশ্য সে অবস্থায় আর উপায় নাই) তাহা হইলেও আমাকে বাকীটা পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন ইত্যাদি করিতেই হইবে। বৈশাখে কতটুকু বাহির হইয়াছে দেখিতে পাইলে আমি বাকীটা হাতে না পাইলেও খানিকটা খানিকটা করিয়া লিখিয়া দিব। যদি বৈশাখে ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলে চরিত্রহীন ছাপা হইবে।

আমি চরিত্রহীনের জন্য অনেক চিঠিপত্র পাইতেছি। কেহ টাকার লোভ কেহ সম্মানের লোভ কেহ বা দুইই কেহ বা বন্ধুত্বের অনুরোধও করিতেছেন। আমি কিছুই চাহি না—আপনাকে বলিয়াছি আপনার মঙ্গল যাতে হয় করিব—তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না।

আপনি দয়া করিয়া এই ঠিকানায় ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ যমুনা পাঠান B. Promathanath Bhattacharji. 19, Jugal Kisore Das Lane, Calcutta.

এঁরা অর্থাৎ গুরুদাসবাবুর পুত্র তাঁহার নূতন কাগজের জন্য আমার লেখার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন অবশ্য আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রমথর খাতিরে কিন্তু ঐ কথা আমার। যা হোক ফাল্গুন চৈত্র যমুনা তাঁকে দিন—তিনি তাঁর দল আমার কাশীনাথ সম্বন্ধে কিছু গোপন সমালোচনা করিয়াছেন। আরও এই একটা কথা যে, আমি নিয়মিত যমুনা ছাড়া আর কোথাও লিখিব না তাহাতেও একটা কাজ হইবে। আমার লেখা তুচ্ছ করিতে তাঁহারাও সাহস করিবেন না। আমি গণ্ডমূর্খ নই সে কথা প্রমথ জানে।

নিরুপমাকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি সত্যই লেখেন ভাল। এবং বাজারে নাম আছে। অনেক সময়ে এবং বেশী ভাগ সময়েই আমার চেয়েও তাঁর লেখা ভাল বলেই আমার মনে হয়। এর মধ্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত ফকির বাবুর সহিত যদি দেখা হয় বলিবেন তাঁর পত্র পাইয়াছি এবং শীঘ্র উত্তর দিব। আমারও জ্বর এই জন্য পত্র দিতে পারিতেছি না—শীঘ্র দিব।

আপনি একটা কথা বলিতে পারেন কি? আমার আরও কতদিন শ্রাদ্ধ "সাহিত্য" কাগজে হইবে? লোকে হয়ত মনে করিবে আমার লেখার ক্ষমতা 'কাশীনাথের' অধিক নয়। এটাতে যে নাম খারাপ হয় উপীন বেচারার বোধ হয় সে কথা মনেও ছিল না। তথাপি সে যে আমার আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছাতেই এরূপ করিয়াছে এই জন্যই কোন মতে সহ্য করিয়া আছি। আর উপায়ও নাই। তবে জিজ্ঞাসা করি, আরও ঐ রকমের গল্প তাঁদের হাতে আছে নাকি? যদি থাকে তা হলেই সারা হব দেখচি।

আরও একটা আপনাকে বলি। সে দিন গিরীনের পত্র পাই—তাঁহাদের সহিত উপীনের 'চন্দ্রনাথ' লইয়া কিছু বকাবকির মত হইয়া গিয়াছে। তাঁরা যদিও আপনার প্রতি বিরূপ নন, তত্রাচ এই ঘটনাটাতে এবং কাশীনাথের সাহিত্যে প্রকাশ হওয়া ব্যাপারে তাঁরা চন্দ্রনাথ দিতে সম্মত নন। তাঁরা আমার লেখাকে বড় ভালবাসেন। পাছে হারিয়ে যায় এই ভয় তাঁদের। এবং পাছে আর কোন কাগজওয়ালারা ওটা হাতে পায় এই জন্ম সুরেন নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবার মৎলব করিয়াছে। 'চন্দ্রনাথ' যদি বৈশাখে ছাপা হইয়া গিয়া থাকে আমাকে চিঠি লিখিয়া কিম্বা তার দিয়া জানান 'yes' or 'no' আমি তার পরে সুরেনকে আর একবার অনুরোধ করিয়া দেখিব। এই বাঁদের অনুরোধ যে আর উপায় নাই দিতেই হইবে। যদি ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলেই ভাল, কেন না চরিত্রহীন ছাপা হইতে পারিবে।

আমাকে গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাবেন। অন্যান্য আপনিই দেখিয়া দিবেন। যা তা গল্প ছাপা নয় অন্ততঃ হাত থাকিতে ছাপা না হয় এই আমার অভিপ্রায়।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতেছি (কাজের মধ্যেই) সেই জন্ম সব কথা তলাইয়া ভাবিতে পারিতেছি না, কিন্তু যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিকই জানিবেন।

দ্বিজুবাবুকে সম্পাদক করিয়া Grand ভাবে হরিদাসবাবু কাগজ বাহির করিতেছেন ; ভালই। তাঁরা টাকা দিবেন কাজেই ভাল লেখাও পাইবেন। তা ছাড়া তেলা-মাথায় তেল দিতে সকলেই উদ্যত এটা সংসারের ধর্ম্ম! এর জন্ম চিন্তার প্রয়োজন দেখি না।

জ্যৈষ্ঠের জন্ম যাহা পাঠাইব তাহা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাইব। শুধু 'চন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম। ওটা কেমন গল্প কি রকম লেখার প্রণালী না জেনে প্রকাশ করা উচিত নয় বলে ভয় হচ্চে। যা হোক অতি শীঘ্র এ বিষয়ে সংবাদ পাবার আশায় রইলাম।

ভাল নই—জ্বরোভাব কাল রাত্র থেকেই হয়ে আছে। না বাড়লেই ভাল আপনার দেহ কেমন? জ্বর সারল? ইতি আপনাদের স্নেহের শরৎ

14 Lower Pozoungdoung Street.
Rangoon, 3. 5. 13.

প্রিয় ফণীবাবু, আপনার পত্র পাইয়াছি এবং প্রেরিত কাগজগুলো অর্থাৎ প্রবাসী, মানসী, ভারতী, সাহিত্য ইত্যাদি সবগুলাই পাইয়াছি। চন্দ্রনাথের যাহা পরিবর্ত্তন উচিত মনে করিয়াছি তাহাই করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে এইরূপ করিয়াই দিব। চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলা অন্ততঃ প্রথম যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব ঐরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যখন হাতে পাইয়াছি তখন এটাকে ভাল উপন্যাসেই দাঁড় করান উচিত। অন্ততঃ

দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। প্রতি মাসে ২০ পাতা করিয়া দিলেও আশ্বিনের পূর্ব্বে শেষ হইবে কি না সন্দেহ। এই গল্পটির বিশেষত্ব এই, যে কোনরূপ— Immorality-র সংস্রব নাই। সকলেই পড়িতে পারিবে। "চরিত্রহীন" Art-এর হিসাবে এবং চরিত্র গঠনের হিসাবে, নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু এরকম ধরণের নয়। চরিত্রহীনের জন্য প্রমথ ক্রমাগত তাগিদ দিতেছিল, কিন্তু শেষের তাগিদ এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল যে বুঝি বা আজন্মের বন্ধুত্ব যায়। সেই ভয়ে তাকে আমি চরিত্রহীন পড়িতে পাঠাইয়াছি। অবশ্য কি তাহার মনের ভাব ঠিক বুঝি না, কিন্তু আমার মনের ভাব তাহাকে বেশ সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছি। এখন তাহার নিকট হইতে জবাব পাই নাই। পাইলে লিখিব। আমার এবং আপনার মধ্যে একটা স্নেহের সম্বন্ধ অতি প্রগাঢ়। আমার বয়স হইয়াছে—এই বয়সে যাহা হয় তাহাকে ইচ্ছামত নষ্ট করি না। কেন আপনি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্বিগ্ন হন। 'যমুনা'র উন্নতি আমার সকলের চেয়ে বেশী লক্ষ্য, তার পরে আর কিছু। চরিত্রহীন সেই অর্দ্ধেক লেখা হইয়াই আছে—কি হবে তাও জানি না, কবে শেষ হবে তাও বলতে পারি না। চন্দ্রনাথটা যাতে এ বৎসরে ভাল হয়ে বার হয় তার চেষ্টা করতেই হবে—কারণ সেটা already প্রকাশ করা হয়েছে। এ বৎসর যাতে যমুনা অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে, তারই চেষ্টা সব চেয়ে দরকার। তার পরে অর্থাৎ পর বৎসর আকারটা আরো বৃদ্ধি করে দেওয়া। এ বৎসর গ্রাহক কত? গত বৎসরের চেয়ে কম না বেশী? এটা লিখবেন। আমি যদি অন্য কাগজে লিখে নামটা আরো প্রচার করতে পারতাম তা হলে 'যমুনা'র সম্বন্ধে উপকার ছাড়া অপকার হত না. কিন্তু অপরের জন্য লিখতেই পারি না এবং তাহা হবেও না। তাড়াতাড়ি করলে হবে না ফণীবাবু, স্থির হয়ে বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হতে হবে। আমি বরাবরই আপনার কাজে লেগে থাকব—কিন্তু আমার ক্ষমতা বড়ই কম হয়ে গেছে। খাটতে পারিনে। আর একটা সমালোচনা লিখছি—দু তিন দিনেই শেষ হবে। খগেন্দ্র ঠাকুরের বিরুদ্ধে। (বোধ করি একটু অতিরিক্ত তীব্র হয়ে গেছে) ফাল্গুনের সাহিত্যে তিনি উড়িষ্যার খোন্দ জাতি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটা আগাগোড়াই ভুল। প্রত্নতত্ত্ব যা-তা লেখা না হয় (নাম বাজাবার জন্য), এইটাই আমার সমালোচনার উদ্দেশ্য, ঠিক জানি না খগেন্দ্র ঠাকুরের সহিত যমুনার কিরূপ সম্বন্ধ—যদি উচিত বিবেচনা করেন, ছাপাবেন, না হয় সাহিত্যে দেবেন। না, সে গল্প আজও পাইনি। নিরুপমা দেবীর কোন লেখা পেলেন কি? তাঁকে একটা কিছু ভার দিতে যদি পারেন তা হলে খুব ভাল হয়। অবশ্য সৌরীনবাবু যদি আমার অবর্ত্তমানে আমার ভার নেন তা হলে তো ভালই হয়, কিন্তু আমার বোধ হয় নিরুপমাও অনেকটা ভার নিতে পারে। সুরেন, গিরীন উপীনও। তবে প্রবন্ধ লিখতে এরা পারবে কি না জানি না। প্রবন্ধ লিখতে একটু পড়াশুনা থাকলে ভাল হয়—কেন না তাতে

মনে জোর থাকে। গল্প টল্প এঁরা যদি লেখেন, আমি তা হলে শুধু প্রবন্ধ নিয়েই থাকতে পারি। গল্প লেখা তেমন আসেও না, বড় ভালও লাগেও না। বয়স হয়েচে, এখন একটু চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতেই সাধ হয়। আমার গল্প লেখা অনেকটা জোর করে লেখা। জোর জবরদস্তির কাজ তেমন মোলায়েম হয় না। প্রমথর শেষ চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠালাম। আমার নাম যে 'অনিলা দেবী' কেউ যেন না জানে। প্রমথ নাকি 'আমি' আন্দাজ করে D. L. Royকে বলেচে। তাকে কড়া চিঠি লিখব।

আপনার কাগজ আমি নিজের কাগজই মনে করি। এর ক্ষতি করে কোন কাজ করব না। শুধু প্রমথকে নিয়েই একটু গোলে পড়েচি। সেও—Acquaintance নয়, পরম বন্ধু। চিরদিনের অতি স্নেহের পাত্র। তাহাতেই একটু ভাবিত হই, না হলে আর কি। প্রমথর চিঠি থেকে অনেক কথাই টের পাবেন। এখন জ্বর ১০২°৫। জ্বর রেঙ্গুনে হয় না—কিন্তু আমার জ্বর হয় অন্য কারণে। বোধ করি হার্ট সংক্রান্ত, General health এদেশের ভালই, তবে আমার সহ্য হচ্চে না। ইতি আঃ শরৎ।

২৮শে মার্চ ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রিয় ফণীবাবু—এই মাত্র আপনার রেজেষ্ট্রী প্যাকেট পাইলাম। যদি Registry করেন, তবে বাড়ীতে পাঠান কেন? আফিসের ঠিকানাই ভাল—কেন না বাড়ীতে যখন পিয়ন যায় তখন আমি আফিসে থাকি। যদি Unregistered পাঠান তবে বাড়ীর ঠিকানায় দেবেন। প্রবন্ধ দুটি দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্রই পাঠাব। বৈশাখের জন্য দেখি বড়ই গোলযোগ। যা হোক এ মাসটা এই রকমে চালান—(১) পথনির্দ্দেশ, (২) নারীর মূল্য এবং অন্যান্য প্রবন্ধ প্রভৃতি। চন্দ্রনাথ ছাপাবেন না, কারণ যদি ছাপানই মত হয় ত একটু নূতন করে দিতে হবে। জ্যৈষ্ঠ থেকে হয় চরিত্রহীন না হয় চন্দ্রনাথ আরও বড় এবং ভাল করে ক্রমশঃ। দেখি সুরেন গিরীন কি জবাব দেয়। বৈশাখে আর বিশেষ কোন উপায় হয় না দেখ্‌তেছি। অবশ্য আপনার Claim যে আমার উপর First তাহাতে আর সন্দেহ কি! আমি যে কটা দিন বাঁচিয়া আছি—আপনাকে বেশী কষ্ট পাইতে হবে না। তবে ভাই, আমার শরীর ত ভাল নয়—তা ছাড়া গল্পটল্প বড় লিখতেও প্রবৃত্তি হয় না। এ যেন আমার অনেকটা দায়ে পড়ে গল্প লেখা। যা হৌক লিখব—অন্ততঃ আপনার জন্যেও। সত্যই এর মধ্যে গল্প লিখে পাঠাবার অনেকগুলি নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে, কিন্তু আমি বোধ করি প্রায় নিরুপায়! অত গল্প লিখতে গেলে আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশী কিছুতে লিখি না—১০।১২ ঘণ্টা পড়ি—এ ক্ষতি আমার নিজের আমি কিছুতে করিব না। যা হৌক আপনার বৈশাখটা গোলেমালে এক রকম বার হয়ে যাক্, তার পরের মাস থেকে দেখা

যাবে। দেখুন প্রথমে আপনার গ্রাহকেরা কি বলে। তার পরে বুঝে কাজ করা। আমার পরম ভাগ্য যে আপনার মাতৃদেবীও আমার খোঁজ নেন। তাঁকে বলবেন আমি ভাল আছি। আশা করি অপরাপর মঙ্গল। বৈশাখেরটা তত ভাল যদি না হয়, একটু না হয় কাগজে সে বিষয়ে উল্লেখ করে দেবেন—যে আমার একটা গল্প প্রায় মাসেই থাকবে।

(আমার ঠিকানাটা আপনি যাকে তাকে দেন কেন ?) আমাকে অনেকেই বলেন, বড় কাগজে লিখতে। কেন না, তাতে বেশী নাম হবে। আপনার ছোট কাগজ—কটা লোকেই বা পড়ে ? অবশ্য এ কথা আমিও স্বীকার করি। লাভ লোকসানের বিচার করতে গেলে তাদের কথাই সত্য এবং সচরাচর সকলেই সেইরূপ করে। কিন্তু আমার একটু আত্মসম্ভ্রম আছে এবং একটু আত্মনির্ভরও আছে। তাই সকলে যে পথটাকে সুবিধা মনে করেন, আমিও সেটাকে সুবিধা মনে করিলেও আমার সমস্ত আশ্রয়ই তা নয়। আমি ছোট কাগজকে যদি চেষ্টা করিয়া বড় করিতে পারি—সেইটাকেই বেশী লাভ মনে করি। তা ছাড়া আপনাকে অনেকটা ভরসা দিয়েচি। এখন ইতরের মত অন্য রকম করিব না। আমার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু সমস্তটাই দোষে ভরা নয়। আমি অনেক সময়েই নিজের কথা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার এই চিঠিটা কাহাকেও পড়িতে দিবেন না। যদি বৈশাখে বোঝা যায় গ্রাহক কমিতেছে না, বরং বাড়িতেছে, তাহা হইলে আশা হইবে যে পরে আরও বাড়িবে। 'পথনির্দ্দেশটা' সমস্তটা একেবারেই ছাপিবেন। ক্রমশঃ ছাপিবেন না। আর এক কথা, 'নারীর লেখায়' বিস্তর ছাপার ভুল হইয়াছে, এক যায়গায় 'অনুরূপা'র বদলে 'আমোদিনীর' নাম হইয়া গিয়াছে। "ভূমার সঙ্গে ভূমির" ইত্যাদি এটা অনুরূপার আমোদিনীর নয়। নিরুপমাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যদি তাহার লেখা বেশী পাইতে পারেন চেষ্টা করিবেন। সে বাস্তবিকই ভাল লেখে। সে আমার ছোট বোনও বটে, ছাত্রীও বটে। শরৎ

প্রিয় ফণীবাবু,—আমার হইয়া একটা কাজ আপনাকে করিতে হইবে। আমি প্রচলিত মাসিক কাগজগুলার সম্বন্ধে প্রায়ই কিছুই জানিতে পারি না বলিয়া সমালোচনা লিখিতে পারি না। আমি নেহাৎ মন্দ সমালোচক নই—সুতরাং এই দিক্‌টায় একটু চেষ্টা করিব,—অবশ্য যমুনার জন্যই। সেই জন্য আপনাকে অনুরোধ করি, আমার হইয়া দুই তিনটি ভাল মাসিক কাগজ V. P. P. ডাকে যাহাতে এখানে আসে করিয়া দিবেন। আমি দাম দিয়া delivery লইব। 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'মানসী', 'ভারতী'। লেখা দিয়া কাগজগুলি বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না—অত লেখাই বা পাই কোথায় ? অবশ্য দুই একটা এখন খাতিরে পাইতেছি, কিন্তু ও খাতিরে আমার আবশ্যক

নাই। বরং লজ্জা পাইতেছি যে তাঁহারা কাগজ পাঠাইতেছেন, কিন্তু বিনিময়ে আমি কিছুই দিতে পারিতেছি না। মুখ ফুটিয়া একথা জানাইতেও লজ্জা করিতেছে। এই সব মনে করিয়াই এই অনুরোধ আপনাকে করি—ঠিকানা 14 Lower Pozoung Street. বৈশাখ থেকে যদি আসে বড় ভাল হয়। আমাদের ক্লাবে কাগজ আসে বটে, কিন্তু সে বড় অসুবিধা। আপনাকে অনেক রকম অনুরোধ করিয়া মাঝে মাঝে ব্যস্ত করিবই। আমার স্বভাবটাই এইরূপ। কিছু মনে করিবেন না—আপনি আমার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট। ছোট ভাইয়ের মতন মনে করি বলিয়াই এইরূপ ব্যাপার খাটিতে বলি। অন্য মেলে চিঠি ও লেখা প্রভৃতি পাঠাইব। ইতি শরৎ

14 Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon. [বৈশাখ ১৩২০]

প্রিয় ফণীবাবু,—গত মেলে চন্দ্রনাথের কতকটা পাঠাইয়াছি। আগামী মেলে আরও কতকটা পাঠাইব। অত্যন্ত পীড়িত। জ্যৈষ্ঠের "যমুনার" জন্য বিশেষ চিন্তিত রহিলাম। মাথার যন্ত্রণা এত অধিক যে কোন কাজ করিতে পারিতেছি না। অক্ষরের দিকে তাকাইবা মাত্রই কষ্ট হয়। বাধ্য হইয়া কাজকর্ম্ম পড়াশুনা সবই স্থগিত রাখিয়াছি। সৌরীন্দ্রবাবুকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবেন—এই ত ব্যাপার। যা হয় এ মাসটা একরকমে চালান—ভাল হলে আমাদের জন্য আর চিন্তা থাকিবে না। আমি সৌরীনকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না—তিনি আমাকে যাহা লিখিয়াছেন পড়িয়া সত্যই ভারী খুসী হইয়াছি। আমাকে কাছে ডাকিয়াছেন—দেখি। এমন সব বন্ধু যার তার বড় সৌভাগ্য। "চরিত্রহীন" অর্দ্ধলিখিত অবস্থাতেই প্রমথকে পড়িবার জন্য পাঠাইয়াছি। পুনঃ পুনঃ পীড়াপিড়ি করাতেই—আমি কিছুতেই তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ফিরিয়া পাইলে বাকীটা লিখিব। গল্প এ মাসে আর পারিব না—কেন না সময় নাই। একটা সমালোচনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, শেষ করিতে পারিলাম না। যদি শেষ হয় আপনার হাতে আসিতে ২৬ তারিখ হইয়া যাইবে—সুতরাং এ মাসে কাজে আসিবে না। বাস্তবিক বড় ভাবিত থাকিলাম—অনেক চেষ্টা করিয়াও লিখিতে পারিতেছি না। কেহ যদি লিখিয়া লইবার থাকিত তাহা হইলে বলিয়া যাইতে পারিতাম। তাও কাহাকে পাই না। বৈশাখের "যমুনা" সত্যই ভাল হইয়াছে। সৌরীনের গল্পটী বেশ। প্রবন্ধটীও ভাল। শরৎ

রেঙ্গুন, ১৪-৯-১৩

প্রিয়বরেষু,—আমার সংবাদ যে আপনার মাতৃদেবী গ্রহণ করেন, আমার এ বহু সৌভাগ্যের কথা, আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি তাঁহাকে জানাইবেন। আমার সংবাদ লইবার

লোক সংসারে প্রায় নাই, সেই জন্ত কেহ আমার ভাল মন্দ জানিতে চাহেন শুনিলে কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। আমার মত হতভাগ্য সংসারে খুবই কম।···উপকার করিতেছি, যশ মান স্বার্থ ত্যাগ করিতেছি ইত্যাদি বড় বড় ভাব আমার কোনও দিনই নাই। কোনো দিন ছিল না আজও নাই, এটা আর বেশি কথা কি? যশের কাঙ্গাল হইলে সেই রকম হয়ত ইতিপূর্ব্বেই চেষ্টা করিতাম, এত দিন এমন চুপ করিয়া থাকিতাম না।······আরো একটা কথা এই যে, শতধারী চণ্ডীপাঠক হইতে আমার লজ্জাও করে। একটা কাগজে নিয়মত লিখি এই যথেষ্ট। যে আমার লেখা পড়িতে ভালবাসে সে এই কাগজই পড়িবে এই আমার ধারণা। তা ছাড়া হোমিওপ্যাথী ডোজে এতে একটু ওতে একটু অশ্রদ্ধা করে যা-তা ক'রে, তর্জ্জমা করে, পরের ভাব চু'র ক'রে—এসব ক্ষুদ্রতা আমার ছেলেবেলা থেকেই নেই। আর এত লিখিতে গেলে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হয়, সেটা আমার মৃত্যু না হইলে আর পা'রব না।···· আমার ছোট গল্পগুলা কেমন যেন বড় হইয়া পড়ে, এটা ভারী অসুবিধার কথা। আরো এই যে আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারি না। 'বিন্দুর ছেলে' আমি ভাবিয়াছিলাম আপনার পছন্দ হইবে না, হয়ত প্রকাশ করিতে ইতস্তত: করিবেন। তাই পাছে আমার খাতিরে অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রকাশ করেন, এই আশঙ্কায় আপনাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছিলাম। অর্থাৎ sincere হওয়া চাই—যদি সত্যই আপনার ভাল লাগিয়া থাকে, ছাপাইয়া ভালই করিয়াছেন, তাতে পাঠক যাই বলুক। 'নারীর মূল্য' আগামী বারে শেষ করিয়া আর একটা সুরু করিব। নারীর মূল্যের বহু সুখ্যাতি হইয়াছে। আমি মনে করিয়াছি, ১৪টা মূল্য ঐ রকমের লিখিব। এবারে হয় প্রেমের মূল্য, না হয় ভগবানের মূল্য লিখিব। তার পরে ক্রমশ: ধর্ম্মের মূল্য, সমাজের মূল্য, আত্মার মূল্য, সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, নেশার মূল্য, সাংখ্যের মূল্য ও বেদান্তের মূল্য লিখিব।···চরিত্রহীন মাত্র ১৪।১৫ চ্যাপটার লেখা আছে, বাকীটা অন্যান্য খাতায় বা ছেঁড়া কাগজে লেখা আছে, কাপি করিতে হইবে। ইহার শেষ কয়েক চ্যাপটার যথার্থই grand করিব। লোকে প্রথমটা যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু শেষে তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইবেই। আমি মিথ্যা বড়াই করা ভালবাসি না এবং নিজের ঠিক ওজন না বুঝিয়াও কথা বলি না, তাই বলিতেছি, শেষটা সত্যই ভালো হইবে বলিয়াই মনে করি। আর moral সম্বন্ধে একটা কিছু ঠিক ধারণা করাও শক্ত। Immoral-ত' লোকে বলিতেছেই—কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে যা কিছু বাস্তবিক ভাল, তাতে এর চেয়ে ঢের বেশী immoral ঘটনার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। যাই হোক, সাহিত্যিকদের মতামত আমাকে জানাইয়া দিবে।··· ('যুগান্তর', ৩ মাঘ, ১৩৪৪)

রেঙ্গুন, ১০-১০-১৩

প্রিয়বরেষু—তোমার প্রেরিত 'বড়দিদি' পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই। তবে, ওটা বাল্যকালের রচনা, ছাপানো না হইলেই বোধ করি ভাল হইত।

আজকাল মাসিক পত্রে যে সমস্ত ছোট গল্প বাহির হয় তাহার পনেরো আনা সম্বন্ধে সমালোচনাই হয় না। সে সব গল্পও নয়, সাহিত্যও নয়—নিছক কালিকলমের অপব্যবহার এবং পাঠকের উপর অত্যাচার। এবার ··য় এতগুলো গল্প বাহির হইয়াছে অথচ একটাও ভাল নয়। অধিকাংশই অপাঠ্য। কোনটার মধ্যে বস্তু নাই, ভাব নাই, আছে শুধু কথার আড়ম্বর, ঘটনার সৃষ্টি আর জোরজবরদস্তির pathos; বুড়ো বেশ্যাকে সাজগোজ করিয়া যুবতী সাজিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করা দেখিলে মনের মধ্যে যেমন একটা বিতৃষ্ণা, লজ্জা অথবা করুণা জাগে, এই সব লেখকদের এই সব গল্প লেখার চেষ্টা দেখিলে সত্যই আমার মনে এমনিধারা একটা ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা আর যাই হোক, মোটেই healthy নয়। ছোট গল্পের কি দুরবস্থা আজকাল।······

দুই একটা কথা 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে বলি। এ সম্বন্ধে লোকে কে কি বলে শুনিলেই আমাকে জানাইবে। এই বইখানার বিষয়ে এত লোকের এত রকম অভিপ্রায় যে ঐ [moral] হোক immoral হোক, লোকে যেন বলে, "হ্যাঁ একটা লেখা বটে।" আর এতে আপনার বদনামের ভয় কি? বদ্‌নাম হয় ত আমার। তা ছাড়া কে বলিতেছে আমি গীতার টীকা করিতেছি' "চরিত্রহীন" এর নাম!—তখন পাঠককে ত পূর্ব্বাহ্নেই আভাস দিয়াছি—এটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়! টলষ্টয়ের "রিসরেক্‌সন্" তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। তা ছাড়া, ভাল বই, যাহা art হিসাবে—Psychology হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে! কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই?—টাকাই সব নয়, দেশের কাজ করা দরকার; পাঁচ জনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামীর অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কি আছে? আজ লোকে আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের কথা না শুনিতে পারে, কিন্তু একদিন শুনিবেই।··· একদিন এই সঙ্কল্প করিয়াই আমি সাহিত্যসভা গড়িয়াছিলাম, আজ আমার সে সভাও নাই, সে জোরও নাই।—('যুগান্তর', ৩ মাঘ, ১৩৪৪)

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

Rangoon, 15. 11. 15

প্রিয়বরেষু—···"শ্রীকান্তর ভ্রমণকাহিনী" যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ, তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল, সে সকল বে

কোন মতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না, সে ত জানা কথা। তবে, অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতেও পারে এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার মারফতে পাঠানো। যদি বলেন ত আরও লিখি—আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত শ্লেষ বিদ্রূপ ঐ পর্য্যন্তই। তবে শেষ পর্য্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

আমার নামটা যেন কোন মতেই প্রকাশ না পায়।······অবশ্য শ্রীকান্তর আত্ম-কাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তা ছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে। তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়াছি, অমুকের পা ঘেঁসিয়া বসিয়াছি—এসব নেই।···রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার সফল চেষ্টা করিয়াছেন! যাহারা লিখিতে জানে না, অর্থাৎ যাহাদের লেখার পরথ হয় নাই, তা তাহারা যত বড় লোকই হোক, না জানিয়া তাহাদের দীর্ঘ লেখা ছাপিবার অনেক দুঃখ। ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাইই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই লোককে দেখান শোনান দরকার। যারা ছবি আঁকতে জানে না, তারা যেমন ভুল হাতে করিয়া মনে করে, যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সেই শেষে টের পায় না, তা' নয়। অনেক বড় জিনিষ বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।··· যাই হোক শ্রীকান্ত পড়ে লোকে কি রকম ছি ছি করে দয়া করে আমাকে জানাবেন। হয়ত দিন শ্রীকান্ত একটি ছত্রও আর লিখব না।

আমি আবার একটা গল্প লিখচি। অর্থাৎ শেষ করব বলে লিখচি। ভালই হবে। comedy হবে, tragedy নয়। দেখি কত শীঘ্র শেষ হয়।

এ গল্পটা গোরার 'পরেশবাবুর' ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে 'অনুকরণ'। তবে ধরবার যো নেই। সামাজিক পারিবারিক গল্প। আমারও মনে বড় উৎসাহ হয়েচে যে চমৎকার হবে। তবে কি থেকে যে কি হয়ে যাবে বলবার যো নেই।···

54/36th Street, Rangoon. 22. 2. 16.

অনেক দিন আপনার পত্র পাই নাই। আশা করি সমস্ত ভাল। ভায়া আমি এবার বড়ই পড়িয়াছি। সুদূর হইতে প্রমথ ভায়ার বাতাস লাগিল না কি হইল বুঝিতে পারিতেছি না। এ আবার আরও খারাপ। এ শুনি বর্মাদেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোন দিন এও ছাড়ে না তাই দুয়ের এক বোধ করি অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে। কি জানি, ভগবান্ই জানেন। ভয় হয় হয়ত বা, চিরজীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব।···

মানসিক চঞ্চলতাবশতঃ কিছুই কাজ করিতে ইচ্ছা হয় নাই—এই কথাটি জলধর দাদাকে জানাইয়া এই 'সমাজ ধর্ম্মের মূল্য' পাঠাইতে দিবেন। ইহার fair copy করা এইটুকু মাত্র পাঠাইয়াছিলাম—বাকী লেখাটা fair করিয়া পরে পাঠাইতেছি। তার পরে যাহা লিখিব মনে করিয়াছি তাহা শুধুমাত্র অপরাপর দেশের সামাজিক নিয়মকানুনের সহিত আমাদের দেশের সমাজের একটি তুলনামূলক সমালোচনা ছাড়া আর কিছু না, সুতরাং সেদিকে কোনরূপ ব্যক্তিগত সমালোচনার ভয় নাই। জানি না এ প্রবন্ধ ভারতবর্ষে ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কি না, কিন্তু যদি না হয়, এটা আপনি ফেরৎ পাঠাইবেন, আমি ধীরে ধীরে সমস্তটা লিখিয়া একটা পুস্তকের মত করিয়া রাখিব। এবং ভবিষ্যতে ইহার ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দিয়া ছাপাইবার চেষ্টা করিব। বাস্তবিক, ভায়া, এই Sociology লইয়াই বহুদিন কাটাইয়াছি—অনেক কথা বলিবার জন্ম প্রাণটা যেন আনচান্ করে। অথচ, কি করিয়া যে এ সকল বেশ ভদ্রলোকের মত বলা যায় তাও ঠিক করিতে পারি না।···

জলধরদাকে অনেক আশা দিয়াছিলাম, কিন্তু গল্প লেখা মানসিক সুস্থিরতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি অদৃষ্ট আমার চিরকালের মত ভাঙিয়াও থাকে, তাহাও যদি ঠিক জানিতে পারি, তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই মহাদুঃখ বোধ করি সহিয়া যাইবে। হয়ত বা, তখন এই পঙ্গু হওয়াটাকেই ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনেও করিব এবং স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিতেও পারিব। আমার এই কাঠির মত শরীরে এইরূপ একটা ব্যামো যে কখনও সম্ভব হইতে পারিবে তাহাও মনে করি নাই। আর তাই যদি হয়—হয় ত বা শেষে ইহারই আমার আবশ্যকতা ছিল। ছেলেবেলায় ভগবান্‌কে বড় ভালবাসিতাম—মাঝে বোধ করি সম্পূর্ণ হারাইয়াছিলাম, আবার শেষ বয়সে যদি তিনিই দেখা দিতে আসেন—তাই ভাল।···

[মার্চ ১৯১৬]

আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু আজকাল সপ্তাহে মাত্র একখানি করিয়া জাহাজ যায় বলিয়া জবাবে এত দেরি হইল।

আমার অসুখের কথা শুনিয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি বোধ করি তাহা কল্পনা করিতেও ভরসা করিতাম না। অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হোন। ভগবান্ আপনাকে কখনো যেন কোন বিশেষ দুঃখ না দেন।

আমি পীড়িত—এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শাস্তি দেন—তাই ভাল। মাঝে মাঝে মনে করি বোধ করি আমার চলিয়া বেড়ানো শেষ হইয়াছে বলিয়াই তিনি পা দুটা বন্ধ করিয়া এবার শুধু হাত দিয়া কাজ করিতেই বলেন। তবে, এর একটা দোষ

এই যে হজম করিবার শক্তিও নাশ হইয়া আসিতে থাকে। এইটাই কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া পোষাইয়া লওয়া চাই।

আপনি আমাকে যাহা দান করিতে চাহিয়াছেন, সেই আমার যথেষ্ট। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি মরিয়া না যাই তাহা হইলে হয়ত বা টাকা কড়ির দেনাটা শোধ হইতেও পারে—অবশ্য কৃতজ্ঞতার দেনা ত শোধ হইবার নয়।···আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব। যে মেলের টিকিট পাইতে পারিব, তাহাতেই চলিয়া যাইবার আন্তরিক বাসনা।···আপনি আমাকে ৩০০৲ টাকা পাঠাইয়া দেবেন। তাহা হইলেই বেশ যাইতে পারি।···

এই হতভাগা স্থানটা পরিত্যাগ করিয়া আপনার আমার জন্য এই সমস্ত অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতির যদি কতকটা কমাইয়া আনিতে পারি—এই একটা বৎসর সেই চেষ্টাই করিব।

আমি একটু ভাল আছি। ফোলাটা একটু কম। কবিরাজী তেল মালিশ করিয়া দেখিতেছি। এটা ভাল কি মন্দ আগামী পূর্ণিমা নাগাদ টের পাইব। আমার কোটী কোটী আশীর্ব্বাদ জানিবেন। এমন করিয়া আশীর্ব্বাদ বোধ করি আপনাকে কম লোকেই করিয়াছে। ছুটিতে আপিস হইতে কি পাইব জানি না—এখানকার নিয়ম-কানুন সবই বড় সাহেবের মর্জ্জি। যাই পাই—আপনি যা আমাকে দিবেন সেই আমার বাস্তবিকই যথেষ্ট।

[মার্চ ১৯১৬]

···কাল আপনার দেওয়া তিনশ টাকা পাইয়াছি। ১১ই এপ্রিলের পূর্ব্বে আর কিছুতেই টিকিট পাওয়া যাইতেছে না। দেখি কি হয়।

[শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারকে লিখিত]

[ডিসেম্বর ১৯১৫]

প্রিয় সুধীর,—কাল রাত্রে তোমার পত্র পাইলাম। বিলম্ব যে হইতেছে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সে কি জানি না? তবে, প্রায় অধিকাংশই নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যদি দু' এক মাস দেরি হয় বরং সে ভাল, কিন্তু পাছে এমন করিয়া সুরু করিয়া খারাপ হইয়া শেষ হয়, সেই আমার বড় ভয়।

তবে, আর ছাপা বন্ধ হইবে না, পরের মেলেই একটা যাবে। হয়ত বেশী হইবে। আর একটা কথা, rewrite করার জন্য অনেক সময় ভয় হয়, পাছে যাহা একবার পূর্ব্বে বলিয়াছি, হয়ত আবার তাহা বলিতে পারি। যতটা ছাপা হইয়াছে, তাহার অনেক Copy আমি পাই নি। যদ Registry করিয়া সমস্ত ছাপাটা পাঠাও বোধ করি সিকি পরিশ্রম আমার কমিয়া যায়। অত অবশ্য সবটুকু গোড়া হইতে পাঠাইয়া দিবে।

তাড়াতাড়ি করিয়া ত সবটুকু ১৫ দিনে হয়; কিন্তু সে কি ভাল? তবে আর যত বিলম্বই হোক মাঘ মাসের শেষে বেশি ছাপা শেষ হয়ে যেতে পারবেই। আমার হাতের অবস্থা ঠিক তেমনি, বোধ করি আর ভালই হবে না। ইচ্ছা আছে ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় যাব। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—('আনন্দবাজার পত্রিকা', ৮ মাঘ ১৩৪৪)

[১৪ মার্চ ১৯১৬]

...শুনিয়াছ বোধ হয়, আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। হাঁটিতে পারি না বলিলেই চলে। তবে লেখাপড়ার কাজ পূর্ব্বের মতই করিতে পারি। কিন্তু মন এত বিমর্ষ যে, কোন কাজে হাত দিতে ইচ্ছা করে না—ক'রলেও তাহা ভাল হয় না। শুধু যেগুলা আগে লেখা ছিল—অর্থাৎ অর্দ্ধেক, বারো আনা, চার আনা, এমন অনেক লেখাই আমার আছে—সেইগুলাই কোন মতে জোড়া-তাড়া দিয়া দিই। চরিত্রহীন সম্বন্ধে ওটা করিতে চাই নাই বলিয়াই এত দিন ২ অধ্যায় করিয়া পাঠাইতেছিলাম। এবার তুমি আমার কাছে বসিয়া না হয় সবটা ঠিক করিয়া লইয়ো। আমি কবিরাজি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। এক বৎসর থাকিব। ১১ই এপ্রিল রওনা হইব। কারণ, তার আগে আর টিকিট পাওয়া কোন মতেই গেল না। আজকাল সপ্তাহে একটা, কখনও বা দেড় সপ্তাহে একখানা করিয়া জাহাজ ছাড়িতেছে।...বেশ ত আসতে ইচ্ছা কর এসো। কিন্তু টিকিট পাবে কি? ('আনন্দবাজার পত্রিকা', ৮ মাঘ ১৩৪৪)।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এসিয়া

সুদূর অতীতে সমগ্র এসিয়ার পক্ষে যদি নাও হয়, এসিয়ার অতি বৃহৎ অংশের পক্ষে ভারতবর্ষ মাতৃভূমিস্বরূপা ছিল। সেই পুরাতন স্মৃতি এসিয়ার অনেক অংশে এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এখনও এসিয়ার অনেক দেশ ভারতবর্ষকে সংস্কৃতিদাত্রী মাতা বলিয়া মনে করে। সুতরাং অন্য কোন দেশের লেজুড়ের ন্যায় অবস্থা ভারতবর্ষের হইতে পারে না। ভারতবর্ষ কখনও পদানত থাকিতে পারে না। অধীনতার পাশ্বধির মধ্য হইতে মুক্তি পাইবামাত্র ভারতবর্ষ পুনরায় তাহার পূর্বেকার সম্মানের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষের মর্যাদায় কেহই পরিবর্তন করিতে পারে না। ভারতবর্ষের কাহারা বন্ধু হইবে, তাহা ভারতবর্ষই মনোনয়ন করিবে এবং ভবিষ্যতে তাহার বৈদেশিক নীতি কি হইবে তাহাও ভারতবর্ষই স্থির করিবে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, জগতে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষই শান্তির উদ্দেশ্যে অধিকতর প্রয়াস করিয়াছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের ইহা উপলব্ধি করা উচিত যে, জগতে যদি সত্যকার শান্তি ও প্রগতি প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তাহা হইলে এক জাতিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান অপর এক জাতিমণ্ডলীর অভ্যন্তরে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে উহা হইবে না, স্বাধীন দেশসমূহের মধ্যে অনুসৃত শৃঙ্খলার উপরই উহাকে স্থাপন করিতে হইবে। ভারতবর্ষের অবস্থিতি এইরূপ যে সুদূর ও মধ্য এসিয়া এবং অন্যান্য যে সকল দেশের সহিত অতীতে তাহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তাহাদের সহিত একান্তভাবে তাহাকে সম্মিলিত হইতে হইবে। অন্যান্য দেশের সহিত যুক্ত হইবারও ভারতবর্ষের কোন বাধা নাই।—জওহরলাল নেহেরু: সমাবর্তন বক্তৃতা

সাহিত্য-মীমাংসা

উপোদ্‌ঘাত

আমাদের বর্তমান আলোচনার নাম সাহিত্য-মীমাংসা—ইংরেজী Literary Criticism শব্দের ইহা হুবহু প্রতিশব্দ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও অগ্রগতি হয়। যে জাতি বর্বরতার স্তর অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাহার সাহিত্য বলিতে কিছুই নাই। সাহিত্য সভ্যতার প্রতীক, এবং সাহিত্যের উন্নতির ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-বিচারের ধারাও ক্রমশ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। সাহিত্যের স্রষ্টা ও পাঠক, উভয় সম্প্রদায়ের মনেই স্বভাবতঃ এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়, সাহিত্য কি? ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? সাহিত্য-পাঠের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? কবিমনের উপাদান কি? সাহিত্যের সহিত অন্যান্য শিল্প ও কলা, যেমন চিত্র, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, যাহাদের ভিতর দিয়া সভ্য মানব নিজেদের অন্তর্লোকের আনন্দ ও আদর্শ বাহিরের লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া থাকে, তাহাদের ভেদ কি? এইরূপ শত শত জটিল প্রশ্নের সমাধানই সাহিত্য-মীমাংসা-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতের সভ্যতা বহু প্রাচীন। ইউরোপের বর্তমান সভ্য সমাজ যখন অরণ্যের গহন অন্ধকারে পশুশিকারে ব্যস্ত ছিল, আত্মরক্ষা ও শরীরধারণই ছিল যখন তাহাদের জীবনের প্রধান সমস্যা, তখন আমাদের এই প্রাচীন ভারতবর্ষে সভ্যতার প্লাবন বহিয়াছিল। বিজ্ঞানে, চিকিৎসাবিদ্যায়, ভাস্কর্যে, চিত্রে, দর্শনে, সাহিত্যে শত ধারায় ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় আদর্শ আপনাকে প্রকাশ করিতেছিল। আজ সে প্লাবন আর নাই, সে সকল ধারা শুষ্ক। কিন্তু তখনকার সাহিত্য ও সাহিত্য-মীমাংসার প্রণালী বহু অপঠিত ও অনাদৃত পুঁথির মধ্যে লুকাইয়া আছে। আমরা তাহাদের কোনও পরিচয়ই রাখি না। ইউরোপের সাহিত্যের উজ্জ্বলতায় আমরা মুগ্ধ, আমরা একান্ত শ্রদ্ধার সহিত গ্রীক্ মনীষী Aristotle এর সাহিত্য বিশ্লেষণ শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক। কিন্তু আমাদের প্রাচীন ভারতের নমস্য আচার্যগণ সাহিত্যের স্বরূপ-বিশ্লেষণের পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের অলৌকিক প্রজ্ঞাবলে শিল্প ও কলার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ধারণের যে সকল মানদণ্ড নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের বর্তমান শিল্প ও সাহিত্যক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য, এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের কোনও অনুসন্ধিৎসাই নাই।

অনেকে বলিবেন, সংস্কৃতে সাহিত্য সম্বন্ধে যে বিচারপদ্ধতি তাহা যে বর্তমানের লৌকিক সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইবে, ইহা ধারণা করা অন্যায়। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যে দৃষ্টিতে সাহিত্যের বিচার করিতেন, আমাদের বিচার করিবার দৃষ্টি তাহা হইতে বিভিন্ন ও নূতন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বর্তমান সাহিত্যের ন্যায় জটিলতা ছিল

না। তখন Realism এবং Idealism লইয়া কবি ও সমালোচকগণের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয় নাই। আধুনিক ভাষার ন্যায় উপন্যাস-সাহিত্য বলিয়া কোনও বিভাগ সংস্কৃত ভাষায় ছিল না। অভিনয় ও নাট্য তখনকার দিনে মানবজীবনের সহিত এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া উঠে নাই। পৌরাণিক ঘটনাই ছিল কাব্য ও নাট্যের প্রধান অবলম্বন। মহাভারত-রামায়ণের ন্যায় মহাকাব্য, কালিদাসের কুমারসম্ভব রঘুবংশ, মাঘের শিশুপালবধ, ভারবির কিরাতার্জুনীয়,—ইহাদের আদর্শে রচিত কতকগুলি কাব্য, মেঘদূতের ন্যায় কতকগুলি খণ্ডকাব্য, অভিজ্ঞানশকুন্তল উত্তররামচরিত প্রভৃতির অনুকরণে রচিত কতকগুলি পৌরাণিক নাটক, হাল্‌কা, নিতান্ত স্থূলধরনের কতকগুলি প্রহসন ও বাণভট্টের হর্ষচরিত ও কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা কয়েকখানি গদ্যকাব্যই ছিল সাহিত্য সমালোচকের সমালোচনার যথাসর্বস্ব পুঁজি—stock in trade। আজকাল আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্র বহু দিকে প্রসারিত হইয়াছে, সাহিত্যের জটিলতা বাড়িয়াছে। কবিত্বশক্তির ক্রমাভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, মানবজীবন ও সাহিত্যের মধ্যে সুগভীর সম্বন্ধ কবি ও সমালোচকগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আজ আর পৌরাণিক প্রেমকাহিনী, বীরত্বের কথা পাঠক ও দর্শকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। তাহারা নিজেদের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি সাহিত্যের মধ্যে নূতন বর্ণে অঙ্কিত দেখিবার জন্য উৎসুক। অতএব সাহিত্যের আদর্শ প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমান যুগে বহু পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং মৃত, প্রস্তরীভূত, নির্জীব সাহিত্যের সমালোচনার মানদণ্ড লইয়া সজীব এবং ক্রমবর্ধমান সাহিত্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করিতে বসিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।

অপর পক্ষে, ইউরোপীয় সাহিত্য-মীমাংসার ধারা সাহিত্যসৃষ্টির সহিত সমান বেগে প্রবাহিত হইয়াছে, দুয়ের মধ্যে কোনও ব্যবধান রচিত হয় নাই। ইউরোপীয় মনীষিগণ কখনও অন্ধভাবে অতীতের পূজা করেন নাই। যুগে যুগে বিখ্যাত সমালোচকগণ সমসাময়িক সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে, স্বাধীন চিন্তাশক্তির বশবর্তী হইয়া সাহিত্যের মাপকাঠি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী যুগে, আবার নূতন যুগসাহিত্যের প্রবাহে তাঁহাদের সেই তুলাদণ্ড হয়তো ভাসিয়া গিয়াছে। আবার তাৎকালিক সমালোচকগণ নূতন বিচার-পদ্ধতি প্রবর্তিত করিয়াছেন। এইভাবে সাহিত্যের সহিত সমালোচনারও ক্রমাভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে নবীনতা আছে, নূতন ভাবধারার সহিত সংমিশ্রণে তাহা প্রবহমান নদীর মত সজীব। সত্য বটে, ইউরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যও Aristotle এর কাব্য-মীমাংসা বিষয়ক চিরন্তন গ্রন্থের (*Poetics*) উপরই মুখ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা হইলেও Aristotle-এর মূল সূত্রগুলির যুগোপযোগী ব্যাখ্যার দ্বারা ইউরোপীয় মনীষিবৃন্দ

তাহাকে বর্তমান সাহিত্যের সহিত সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইভাবে তাঁহারা অতীতের সহিত বর্তমানের সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। বিচ্ছিন্ন, অপরিচিত, নির্জীব অতীতের দ্বারা সজীব বর্তমানের যাচাই করিবার প্রয়াস করেন নাই। কিন্তু এই যুক্তির দ্বারা ভারতীয় নিজস্ব সাহিত্য-সমালোচনা-রীতি ও প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা সমর্থন করা যায় না। আমাদেরও Aristotle স্থানীয় বহু মনীষী রহিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক একাধিক গ্রন্থও আজ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এক-একখানি পুস্তক অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার। ইউরোপীয় সাহিত্যিক ও সমালোচকবৃন্দ যেমনভাবে Aristotle, Horace প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণের সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া, সমসাময়িক সাহিত্যধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য নূতন দৃষ্টিতে তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, কই, সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তো আমরা আমাদের স্বদেশের শাস্ত্রের পঠন-পাঠন করিতেছি না! অথচ বিদেশীয় শাস্ত্রের প্রশংসায় আমরা পঞ্চমুখ! Bergson এর Creative Evolution-এর কথা উঠিলে আমাদের রসনা আর যেন বিশ্রান্ত হইতে চাহে না, অথচ আমাদের প্রত্যেকেই মৃত, আমাদের সৃজনীশক্তিও নাই, অভিব্যক্তিও নাই, সমস্ত দোষ প্রাচীনদের উপর চাপাইয়া আমরা সকল ভার হইতে যেন অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেই বাঁচি। প্রতীচীর বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত চক্রবালের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। ইউরোপের Aristotle আছেন, Horace আছেন, Dante আছেন, আমাদের ভরত নাই ভামহ নাই, দণ্ডী নাই, অভিনবগুপ্ত নাই? আজ প্রতীচ্য হইতে প্রাচ্যের আকাশের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। অতীতের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যে সকল রত্ন অনাদৃত অবহেলিতভাবে লুকাইয়া আছে, আজ আবার তাহাদের নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইতে হইবে, তাহাদের নূতন করিয়া সংস্কার করিতে হইবে। তখন দেখিতে পাইব, আমাদের প্রাচীন আচার্যগণ সাহিত্যের যে স্বরূপ নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, সাহিত্যের যে উদ্দেশ্য তাঁহারা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন, এক কথায় যেভাবে তাঁহারা সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনও নির্দিষ্ট কালের বা দেশের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ নহে, তাহা সর্বকালের, সর্বদেশের সাহিত্যের গুণাগুণ নিরূপণ করিবার শাশ্বত মানদণ্ডস্বরূপ। তাঁহারা জানিতেন, যুগে যুগে সাহিত্যের গতিপথ বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়, রচনার শৈলী পরিবর্তিত হয়, সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিষয়ে কবি ও সহৃদয় উভয়েরই ধারণার অভিব্যক্তি ঘটে। সংস্কৃত অলঙ্কার-সাহিত্যের ধারা যাঁহারা নিপুণভাবে সমীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা আচার্য ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ শতকের শেষভাগে মম্মটাচার্য পর্যন্ত বিস্তৃত এই দীর্ঘ সাহিত্য-মীমাংসকসম্প্রদায় কেবল পুরাতনেরই চর্চা করিয়া গিয়াছেন,

এইরূপ কথা অনভিজ্ঞ সংস্কৃত-বিদ্বেষীর মুখেই কেবল শোভা পায়। নূতন নূতন অলঙ্কার-গ্রন্থে নূতন নূতন প্রশ্নের উত্থাপন হইতেছে। ভরত যাহা জানিতেন না, ভামহ দণ্ডী উদ্ভট প্রভৃতি আচার্য তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার সমাধান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীনের দৃষ্টিতে যেখানে শব্দ অর্থ ও অলঙ্কার ভিন্ন সাহিত্যের অন্য কোনও উপাদান ধরা পড়ে নাই, নবীন সাহিত্য-মীমাংসকগণ সেখানে সাহিত্যের আত্মার অনুসন্ধানে ব্যস্ত, বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া অন্তরের তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহারা ব্যাপৃত। প্রাচীনেরা যখন গুণ ও অলঙ্কারের মধ্যে কোনও ভেদ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, নবীন আলঙ্কারিক সেখানে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আজকাল যেমন সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তুমুল বিবাদ উঠিয়াছে, তাহার সমাধানের কোনও কিনারা পাওয়া যাইতেছে না, আমাদের প্রাচীন আচার্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই জটিল সমস্যা লইয়া দীর্ঘ বিতণ্ডা চলিয়াছিল এবং তাঁহারা উহার যে সমাধান নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আজও আমরা আমাদের মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রের নবলব্ধ সমীক্ষা-প্রণালী ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য সত্ত্বেও তাহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কেবল, ভারতের অতীত আলঙ্কারিক সম্প্রদায় ও বর্তমানের ইউরোপীয় সমালোচক সম্প্রদায়ের মধ্যে তফাত এইটুকু মাত্র যে, আমাদের প্রাচীন আচার্যগণ যেখানে অতি অল্প কথায়, সংযতভাবে সাহিত্যবিষয়ক দুরূহ সমস্যা-সমূহের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের শেষ উত্তর দিয়াছেন, আধুনিক সমালোচকগণ সেখানে বিস্তৃত মনোবিশ্লেষণের অবতারণা করিয়া সমস্যাগুলিকে আরও দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন, শুধু নিজেদের পাণ্ডিত্য ও বাক্‌চাতুর্যের পরিচয় দিবার ছলে। ইহার কারণ আছে। আমাদের শাস্ত্রধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের প্রতিটি উক্তি উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা, হেতুর দ্বারা, দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের দ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন যে, হেতুশূন্য অযৌক্তিক কোনও সিদ্ধান্তই প্রতিবাদিগণ গ্রহণ করিবেন না, হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। 'একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ'। তাঁহাদের আলোচনার এই অত্যধিক যুক্তিমূলকতার কারণ ন্যায়শাস্ত্রের (আমরা যাহাকে Logic বলি) অত্যধিক পঠনপাঠন। আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়শাস্ত্র সমস্ত শাস্ত্রচর্চার প্রদীপস্বরূপ,—'প্রদীপঃ সর্বশাস্ত্রাণাম্ উপায়ঃ সর্বকর্মণাম্'। ন্যায়শাস্ত্রের সন্ধান্তানুযায়ী চিন্তা করিবার রীতি, শাস্ত্রবিচার করিবার প্রণালী আমাদের পূর্বাচার্যগণের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দুরূহ দার্শনিক বিচারে যেমন ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োগ ছিল, উপযোগিতা ছিল, সাহিত্য-মীমাংসা বিষয়েও তাহার প্রয়োগ ও উপযোগিতা কিছুমাত্র কম নয়। বর্তমানের ন্যায় Logic-এর চর্চা তাঁহাদের নিকট ব্যবহারজীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য, কেবলমাত্র প্রয়োগহীন academic studyতে পর্যবসিত হয় নাই।

তাঁহাদের চিন্তাধারার সহিত উহা অঙ্গাঙ্গিভাবে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত ছিল। কিন্তু আমাদের নিকট এই অত্যধিক যুক্তিনির্ভরতা, আন্বীক্ষিকীপ্রিয়তা—logicophilia, অসহ্য। বর্তমানের ইউরোপীয় মনীষিগণও Aristotle-এর Syllogism অনুযায়ী বিচার করিতে বসেন না।(১) আমাদের কাছে যুক্তি অপেক্ষা ভাবোচ্ছ্বাসই অধিকতর প্রিয়। তাহার মধ্যে অনেক বাষ্প আছে, কিন্তু উত্তাপ নাই; উন্মাদনা আছে, কিন্তু প্রেরণা নাই। সুতরাং আমরা যে প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণের যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থসমূহ ত্যাগ করিয়া বর্তমান ইউরোপের সমালোচকগণের উচ্ছ্বাসময় সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিব, ইহাতে বৈচিত্র্য কি?

আমরা অবাক্ হইয়া ভাবি, সাহিত্য-মীমাংসার গ্রন্থে এত অনুমান, এত সূক্ষ্ম তর্ক কিসের, এত চুলচেরা বিচারের কিসে প্রয়োজন? এত ঘটত্বাৎ পটত্ব'ৎ-এর সমাবেশ কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? কিন্তু এই বিস্ময়ের মূলে আছে সাহিত্য-মীমাংসার মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। সাহিত্য-মীমাংসা কেবল পাঠকের বা দর্শকের হৃদয়ের বস্তুশূন্য ভাবোচ্ছ্বাস নহে—যদি তাহাই হইত, তবে তাহা সাহিত্য-মীমাংসা না হইয়া সাহিত্যের মধ্যেই গণিত হইত। এবং বর্তমানের অধিকাংশ তথাকথিত সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থ সাহিত্যেরই স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। বস্তুতঃ সাহিত্য-মীমাংসা একটি স্বতন্ত্র দর্শন-বিশেষ। বন্ধনকাতর স্বাধীন কবিপ্রতিভা যেমন সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূল, সেইরূপ যথার্থ সাহিত্য-মীমাংসক যিনি, তাঁহার প্রতিভা অপেক্ষা বিচারবুদ্ধি (reason), কল্পনা অপেক্ষা তত্ত্বদৃষ্টি, বাস্তবজগতের প্রতি অসহিষ্ণুতা অপেক্ষা বস্তুপরতন্ত্রতাই অধিকতর প্রয়োজন। কবিকল্পনা যতই শৃঙ্খলহীন বলিয়া আপাততঃ প্রতিভাত হউক না কেন, তাহার মধ্যেও একটি অনুল্লঙ্ঘনীয় নীতি আছে, কার্যকারণ-ভাব আছে। সহৃদয় পাঠকের সৌন্দর্য ও রসবোধ যতই স্ব স্ব অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করুক না কেন, তাহার মধ্যেও একটি সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা নিহিত আছে। যিনি প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচক, তিনি কবির সাহিত্যসৃষ্টি এবং সহৃদয়ের রসোদ্বোধ এই উভয়ের অন্তর্নিহিত সাধারণ কার্যকারণতত্ত্ব ও শৃঙ্খলা—যাহা প্রাকৃতজনের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না,—তাহারই বিশ্লেষণ

(১) "...it seems to me that one of the reasons why our people are alive and flourishing, and have avoided many of the troubles that have fallen to less happy nations, is *because we have never been guided by Logic in anything we have done.*"—Baldwin : Prof. L. Susan Stebbing প্রণীত 'Thinking to Some Purpose' গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ১১ (Pelican Books).

এইরূপ কথা অনভিজ্ঞ সংস্কৃত-বিদ্বেষীর মুখেই কেবল শোভা পায়। নূতন নূতন অলঙ্কার-গ্রন্থে নূতন নূতন প্রশ্নের উত্থাপন হইতেছে। ভরত যাহা জানিতেন না, ভামহ দণ্ডী উদ্ভট প্রভৃতি আচার্য তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার সমাধান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীনের দৃষ্টিতে যেখানে শব্দ অর্থ ও অলঙ্কার ভিন্ন সাহিত্যের অন্য কোনও উপাদান ধরা পড়ে নাই, নবীন সাহিত্য-মীমাংসকগণ সেখানে সাহিত্যের আত্মার অনুসন্ধানে ব্যস্ত, বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া অন্তরের তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহারা ব্যাপৃত। প্রাচীনেরা যখন গুণ ও অলঙ্কারের মধ্যে কোনও ভেদ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, নবীন আলঙ্কারিক সেখানে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আজকাল যেমন সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তুমুল বিবাদ উঠিয়াছে, তাহার সমাধানের কোনও কিনারা পাওয়া যাইতেছে না, আমাদের প্রাচীন আচার্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই জটিল সমস্যা লইয়া দীর্ঘ বিতণ্ডা চলিয়াছিল এবং তাঁহারা উহার যে সমাধান নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আজও আমরা আমাদের মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রের নবলব্ধ সমীক্ষা-প্রণালী ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য সত্ত্বেও তাহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কেবল, ভারতের অতীত আলঙ্কারিক সম্প্রদায় ও বর্তমানের ইউরোপীয় সমালোচক সম্প্রদায়ের মধ্যে তফাত এইটুকু মাত্র যে, আমাদের প্রাচীন আচার্যগণ যেখানে অতি অল্প কথায়, সংযতভাবে সাহিত্যবিষয়ক দুরূহ সমস্যা-সমূহের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের শেষ উত্তর দিয়াছেন, আধুনিক সমালোচকগণ সেখানে বিস্তৃত মনোবিশ্লেষণের অবতারণা করিয়া সমস্যাগুলিকে আরও দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন, শুধু নিজেদের পাণ্ডিত্য ও বাক্‌চাতুর্যের পরিচয় দিবার ছলে। ইহার কারণ আছে। আমাদের শাস্ত্রধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের প্রতিটি উক্তি উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা, হেতুর দ্বারা, দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের দ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন যে, হেতুশূন্য অযৌক্তিক কোনও সিদ্ধান্তই প্রতিবাদিগণ গ্রহণ করিবেন না, হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। 'একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ'। তাঁহাদের আলোচনার এই অত্যধিক যুক্তিমূলকতার কারণ ন্যায়শাস্ত্রের (আমরা যাহাকে Logic বলি) অত্যধিক পঠনপাঠন। আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়শাস্ত্র সমস্ত শাস্ত্রচর্চার প্রদীপস্বরূপ,—'প্রদীপঃ সর্বশাস্ত্রাণাম্ উপায়ঃ সর্বকর্মণাম্'। ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী চিন্তা করিবার রীতি, শাস্ত্রবিচার করিবার প্রণালী আমাদের পূর্বাচার্যগণের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দুরূহ দার্শনিক বিচারে যেমন ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োগ ছিল, উপযোগিতা ছিল, সাহিত্য-মীমাংসা বিষয়েও তাহার প্রয়োগ ও উপযোগিতা কিছুমাত্র কম নয়। বর্তমানের ন্যায় Logic-এর চর্চা তাঁহাদের নিকট ব্যবহারজীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য, কেবলমাত্র প্রয়োগহীন academic studyতে পর্যবসিত হয় নাই।

তাঁহাদের চিন্তাধারার সহিত উহা অঙ্গাঙ্গিভাবে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত ছিল। কিন্তু আমাদের নিকট এই অত্যধিক যুক্তিনির্ভরতা, আন্বীক্ষিকীপ্রিয়তা—logicophilia, অসহ্য। বর্তমানের ইউরোপীয় মনীষিগণও Aristotle-এর Syllogism অনুযায়ী বিচার করিতে বসেন না।(১) আমাদের কাছে যুক্তি অপেক্ষা ভাবোচ্ছ্বাসই অধিকতর প্রিয়। তাহার মধ্যে অনেক বাষ্প আছে, কিন্তু উত্তাপ নাই; উন্মাদনা আছে, কিন্তু প্রেরণা নাই। সুতরাং আমরা যে প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণের যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থসমূহ ত্যাগ করিয়া বর্তমান ইউরোপের সমালোচকগণের উচ্ছ্বাসময় সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিব, ইহাতে বৈচিত্র্য কি?

আমরা অবাক্ হইয়া ভাবি, সাহিত্য-মীমাংসার গ্রন্থে এত অনুমান, এত সূক্ষ্ম তর্ক কিসের, এত চুলচেরা বিচারের কিসে প্রয়োজন? এত ঘটত্বাৎ পটত্বাৎ-এর সমাবেশ কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? কিন্তু এই বিস্ময়ের মূলে আছে সাহিত্য-মীমাংসার মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। সাহিত্য-মীমাংসা কেবল পাঠকের বা দর্শকের হৃদয়ের বস্তুশূন্য ভাবোচ্ছ্বাস নহে—যদি তাহাই হইত, তবে তাহা সাহিত্য-মীমাংসা না হইয়া সাহিত্যের মধ্যেই গণিত হইত। এবং বর্তমানের অধিকাংশ তথাকথিত সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থ সাহিত্যেরই স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। বস্তুতঃ সাহিত্য-মীমাংসা একটি স্বতন্ত্র দর্শন-বিশেষ। বন্ধনকাতর স্বাধীন কবিপ্রতিভা যেমন সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূল, সেইরূপ যথার্থ সাহিত্য-মীমাংসক যিনি, তাঁহার প্রতিভা অপেক্ষা বিচারবুদ্ধি (reason), কল্পনা অপেক্ষা তত্ত্বদৃষ্টি, বাস্তবজগতের প্রতি অসহিষ্ণুতা অপেক্ষা বস্তুপরতন্ত্রতাই অধিকতর প্রয়োজন। কবিকল্পনা যতই শৃঙ্খলহীন বলিয়া আপাততঃ প্রতিভাত হউক না কেন, তাহার মধ্যেও একটি অনুল্লঙ্ঘনীয় নীতি আছে, কার্যকারণ-ভাব আছে। সহৃদয় পাঠকের সৌন্দর্য ও রসবোধ যতই স্ব স্ব অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করুক না কেন, তাহার মধ্যেও একটি সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা নিহিত আছে। যিনি প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচক, তিনি কবির সাহিত্যসৃষ্টি এবং সহৃদয়ের রসোদ্বোধ এই উভয়ের অন্তর্নিহিত সাধারণ কার্যকারণতত্ত্ব ও শৃঙ্খলা—যাহা প্রাকৃতজনের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না,—তাহারই বিশ্লেষণ

(১) "...it seems to me that one of the reasons why our people are alive and flourishing, and have avoided many of the troubles that have fallen to less happy nations, is *because we have never been guided by Logic in anything we have done.*"—Baldwin : Prof. L. Susan Stebbing প্রণীত 'Thinking to Some Purpose' গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ১১ (Pelican Books).

করিবার চেষ্টা করেন। ইহাকে দর্শন ছাড়া আর কি বলিতে পারা যায়?(২) এবং ইহা তো সর্ববাদিসম্মত সত্য যে, ভাবোচ্ছ্বাস দার্শনিকতার পরিপন্থী। দার্শনিক তত্ত্বের মূল ভিত্তি স্থির অকম্পনীয় বিচারবুদ্ধি ও সুনিপুণ পদার্থ-বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমাদের প্রাচীন ভারতের যাঁহারা সাহিত্য-মীমাংসার বিভিন্ন প্রস্থানের পরমাচার্য—তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে অধিগতবিদ্য ছিলেন। ধ্বনিবাদের প্রবর্তক আচার্য আনন্দবর্ধন, বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনে পারঙ্গম ছিলেন। এই উভয় দর্শনের উপরেই তিনি একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ভরতের নাট্য-শাস্ত্রের টীকাকার ভট্টনায়ক একজন শ্রেষ্ঠ মীমাংসক ছিলেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত, যাঁহার ধ্বন্যালোকলোচন এবং অভিনবভারতী সাহিত্য-মীমাংসার রত্নভাণ্ডারবিশেষ, তিনিও একজন প্রধান দার্শনিক বলিয়াই খ্যাত, কাশ্মীরীয় প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। এইরূপে যদি আমরা অনুসন্ধান করি, তবে দেখিতে পাইব যে, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-মীমাংসক বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ দার্শনিকও বটে। শুধু আমাদের প্রাচীন ভারতেই নয়—প্রাচীন ইউরোপ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান ইউরোপের সাহিত্য-মীমাংসার ধারা পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইব,—যিনিই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তিনিই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক। Aristotle-এর দার্শনিকতার কথা কে না জানেন? পরবর্তী যুগের Horace, এবং Dante প্রত্যেকেই একাধারে কবি-দার্শনিক ও সমালোচক। বর্তমান ইউরোপের যাঁহারা মূর্ধাভিষিক্ত সাহিত্য-সমালোচক, তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রখ্যাতনামা দার্শনিক। ইংলণ্ডের Coleridge, Bain, Bradley, ইটালির Benedetto Croce, রুশিয়ার Tolstoy, ফ্রান্সের Henri Bergson, জার্মানির Kant, Hegel, Herder, Schopenhauer, ইঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া, বৃহত্তর

---

(২) "True criticism of art is certainly *aesthetic* criticism, but not because it disdains philosophy, like pseudo-aesthetic, but because it acts as philosophy and as conception of art..." —Benedetto Croce : *The Essence of Aesthetic*. p. 101. (London, William Heinemann, 1921).

পুনশ্চ— "...as we observe with the truly great critics, and above all with De Sanctis, in his "History of Italian Literature" and in his "Critical Essays", where he is as profound a critic of art as of philosophy, morality and politics ; he is profound in the one because profound in the other, and inversely : the strength of his pure aesthetic consideration of art is the strength of his pure moral consideration of morality, of his pure logical consideration of philosophy, and so on."—ঐ, পৃ. ১০৩।

মানবজীবন ও বিশ্বসৃষ্টির চরম এবং পরম লক্ষ্য ও পরিণতি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার জন্য প্রযত্নবান্ হইয়াছেন। যাঁহারা বৌদ্ধ শূন্যবাদীদের ন্যায় সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic) তাঁহাদের মতে সাহিত্যের লক্ষণ, রসাস্বাদের লক্ষণ, কোনও কিছুরই যথার্থ লক্ষণ অসম্ভব। কেন-না তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী ভাষার দ্বারা এই বিশ্বের কোনও বস্তুরই, অতি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম বস্তুরও, যাহাকে আমরা একান্ত পরিচিত বলিয়া মনে করিতেছি, তাহারও প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা অসম্ভব। সুতরাং কি করিয়া সাহিত্যের লক্ষণ ভাষায় প্রকাশ করিব, কি করিয়াই বা সাহিত্যপাঠের আনন্দ ও রসানুভূতির স্বরূপ ভাষার ভিতর দিয়া বর্ণনা করিব? অতএব কবি সাহিত্যসৃষ্টি করিতে থাকুন, আমরা আনন্দলাভ করি, ইহাই যথেষ্ট। তাহার কার্যকারণতত্ত্ব জানিয়া কি ফল, যখন জানিলেও ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার কোনও উপায়ই নাই? সুতরাং—'মূকত্বৈব বরম্'। আমরা যখন সাহিত্যে রসাভিব্যক্তি বিষয়ে আলোচনা করিব তখন দেখিতে পাইব যে, বিভিন্ন প্রস্থানের দার্শনিকগণ কিভাবে স্ব স্ব সিদ্ধান্তানুসারে রসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নৈয়ায়িক, মীমাংসক, বৈদান্তিক, শৈব প্রত্যভিজ্ঞাবাদী প্রত্যেকেরই মতবাদ পরস্পর-বিভিন্ন। Bergson তাঁহার Laughter শীর্ষক চিন্তাপূর্ণ পুস্তকে সাহিত্যে হাস্যরসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া স্বকীয় দার্শনিক মতবাদ creative evolution—জীবনতত্ত্বের ক্রম-বিবর্তনবাদকেই মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।(৩)

ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাহিত্য-সমালোচকগণের দার্শনিকতার ক্ষেত্রে এই

(৩) "...An idea is something that grows, buds, blossoms and ripens from the beginning to the end of a speech. It never halts, never repeats itself. It must be changing every moment, for to cease to change would be to cease to live. Then let gesture display a like animation! Let it accept the fundamental law of life, which is the complete negation of repetition! But I find that certain movement of hand or arm, a movement always the same, seems to return at regular intervals. If I notice it and it succeeds in diverting my attention, if I wait for it to occur and it occurs when I expect it, then involuntarily I laugh. Why? Because I now have before me a machine that works automatically. This is no longer life, it is automaton established in life and imitating it. It belongs to the comic'.'—*Laughter* : pp. 31-32. (Macmillan and Co. Ltd. 1935).